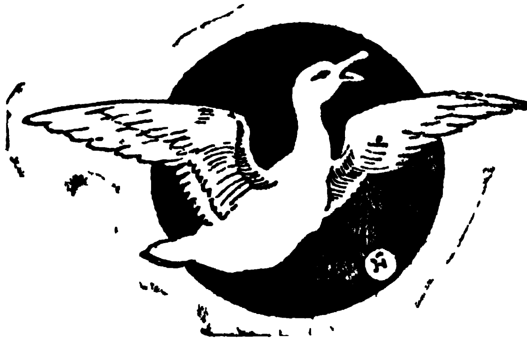


আমার দেশ

দ্বিতীয় বর্ষ। মাঘ ১৩২৮—পৌষ ১৩২৯

বর্ষসূচি।

বিশ্বশিল্পী ও তাঁহার চিত্র এবং চিত্র পরিচয়, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, অগ্রহায়ণ, পৌষ প্রভৃতি সংখ্যার মধ্যে আছে।



ছেলেমেয়েদের কয়েকখানি সুপাঠ্য বহি :—

বিজ্ঞান চিত্রে ও গল্পে (২য় সংস্করণ) শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার মিত্র বি এস্ সি (গ্লাস্‌গো)

এম্-আর-স্যান-ই (লণ্ডন) প্রণীত ১৲

পঞ্চুলাল	...	শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী	প্রণীত	৸০
ছেলেদের গান্ধী	...	শ্রীযুক্ত বিজয়রত্ন মজুমদার	„	১৲
সরল বাঙ্গালা সাহিত্য	...	রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন	„	২৲
বৈদিক ভারত	...	ঐ	„	২৲
ঠাকুরের ভোগ	...	ঐ	„	১৲
বৈশাখী	...	ঐ	„	১৷০
কিশোরী	...	শ্রীযুক্ত বিজয়রত্ন মজুমদার	„	১৲
নূতন বধূ	...	ঐ	„	১৷০
ছেলেদের সত্যগ্রাহী	..	ঐ	„	৷৷৴০
হাসির ছড়া	...	৺যতীন্দ্রনাথ পাল	„	৷০
মজার ছড়া	...	ঐ	„	৷০
ইংলণ্ড	...	শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	„	২৲
গল্পসল্প	...	শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার মিত্র বি-এ	„	৸০
রোমের গল্প	...	শ্রীযুক্ত রমেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী বি-এ	„	৸৴০
আবার বলো	...	শ্রীযুক্ত অন্নদাকান্ত মজুমদার	„	৷৷৴০

শিশুতোষ সিরিজের ২৮শ খানি বহি বাহির হইয়াছে, প্রত্যেক খানির মূল্য ৵০

সব বইগুলিই আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি ছেলেমেয়েদের মনোরঞ্জন করিবে।

শিশির পাবলিশিং হাউস্

কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

আমাদের কথা।

দেখিতে দেখিতে আমার দেশের প্রথম বর্ষ শেষ হইয়া গেল। প্রথম বর্ষে আমাদের অনেক ত্রুটী রহিয়া গিয়াছে—আশা করি দ্বিতীয় বর্ষে সেগুলি আর থাকিবে না।

আমার দেশের আকার অধিকাংশ গ্রাহকদের মতানুযায়ী পরিবর্ত্তিত হইল। তবে পৃষ্ঠা ও ছবির সংখ্যা অনেক বাড়িয়া গেল। অথচ মূল্য বাড়িল না।

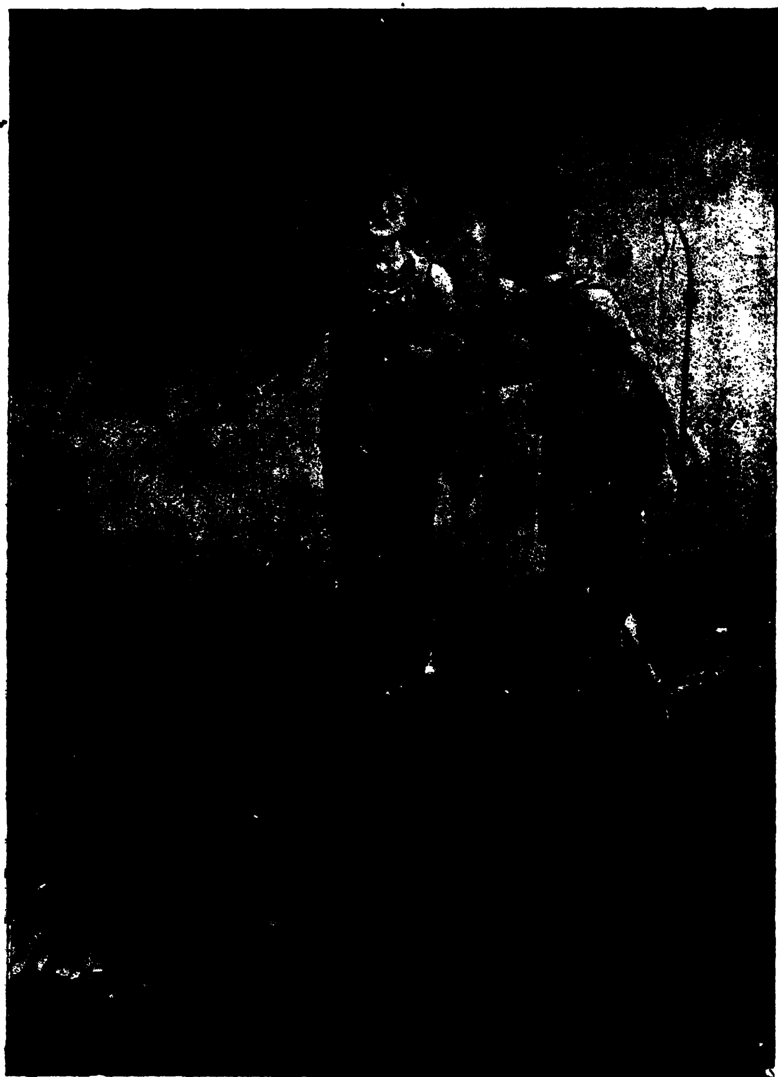
আমার দেশের প্রত্যেক গ্রাহকের আমার দেশের প্রতি একটি কর্ত্তব্য আছে। মাসিক পত্র চলে বিজ্ঞাপনের লাভে। কিন্তু ছেলেমেয়েদের মাসিক পত্রে বাজার চলতি বিজ্ঞাপন অনেক সময় আমরা লওয়া উচিত মনে করি না। কিন্তু বিনা বিজ্ঞাপনে ও এত অল্প মূল্যে এত বড় ও এরূপ সচিত্র মাসিক দেওয়া চলে, যদি তেমন গ্রাহক হয়। গ্রাহকেরা যদি তাঁহাদের বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে আমার দেশের প্রচার করেন তবেই আমরা উত্তরোত্তর ইহার আরও শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে পারিব। তাই বলিতেছিলাম, যাহাতে এরূপ সুন্দর ভাবেই প্রতি মাসে আমার দেশ বাহির করিতে পারি, সে সম্বন্ধে গ্রাহকদেরও কর্ত্তব্য আছে।

এই মাসে আমার দেশে প্রকাশের জন্য আরও কতকগুলি গল্প ও প্রবন্ধ স্থির হইয়াছিল। কিন্তু ইহার আকৃতি এত বাড়াইয়াও সেই প্রবন্ধগুলির জন্য স্থান করিতে পারিলাম না। 'স্বাস্থ্য চিত্রে ও গল্পে'র একটি গল্পও প্রস্তুত ছিল। কিন্তু স্থানাভাবের এ মাসে গেল না—আগামী মাসে যাইবে।

আমার দেশ

মাঘ, ১৩২৮

সূচী



বুদ্ধদেবের গৃহত্যাগ

আমার দেশ

২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা। মাঘ, ১৩২৮।

মহিমা।

কোশল রাজ্যে মহা উৎসব,
নৃপতি বিম্বিসার,
পাঠালেন তাঁর তনয় অশোকে
রাজ্য দেখিতে তাঁর।
হিন্দুরা সেথা গড়ে তুলেছেন
মুক্তি সেনার দল,
ভাঙ্গিতে তাদের চলে আয়োজন
নানা কৌশল ছল।
বৌদ্ধেরা সব খেপিয়া উঠেছে
আদেশ রটেছে তাই,
মুক্তি সেনারে দেখিতে পেলেই
শির নেওয়া তার চাই।
আদেশ রাজার লঙ্ঘিবে হেন
কাহার বুকের পাটা,
বিশাল নগরী জনহীন তাই
নাই যার পথ হাঁটা।
মগধ কুমার আসিছেন যবে
বিচিত্র হেম-রথে,
সহসা হাজার ব্রাহ্মণ বটু
আসিয়া দাঁড়ালো পথে।

বক্ষে তাদের জড়ানো রয়েছে
মুক্তি সেনার সাজ,
ঘিরেছে তাদিকে রাজার সৈন্য
রক্ষা নাহি ত আজ।
সহসা কুমার থামাইয়া রথ
নামিলা ধরণীতলে
বহে হিল্লোল অভিবাদনের
সেনা অসেনার দলে।
মুক্তি সেনারা গর্ব্বে বলিল
যুবরাজ, মোরা জানি,
এ সাজ পরিলে যাবে মস্তক
হত হবে বহু প্রাণী
তথাপি আমরা জীবন থাকিতে
ত্যজিব না সাজ কভু।
মস্তক পাতি দণ্ড লইব
ভগ্ন হবো না তবু।

জননীর মোরা অভাব ঘুচাবো,
সাম্য আনিব দেশে,
সেই উদ্দেশে শাস্তি লইতে
দাঁড়ায়েছি এই বেশে।
হাস্যে কুমার হানিয়া বিজলি
তাহাদের দলে ঢুকে,
মুক্তি সেনার শুভ্র চিহ্ন
আপনি নিলেন বুকে,
সেনানী হ'লাম্ এ দলের আমি—
তোমাদের যুবরাজ
তোমরা যা চাহ তাহাই করা যে
আমার প্রধান কাজ।
গৌরবে চলে কুমার অশোক
মুক্তি পতাকা ধরি
পশ্চাতে চলে মুক্তি সেনারা
জয় জয় রব করি।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।







বাপের প্রাণ

বৃন্দাবন মুখুর্য্যে ম'শায়ের ছেলে গোবর্দ্ধন মুখুর্য্যে কলকাতায় পড়তে এসে মহা সৌখীন "বাবু" হ'য়ে বস্‌লো। গোবর্দ্ধন নাম বদ্‌লে করলে জি মুখুর্য্যে। কেউ যদি পুরো নাম জিজ্ঞাসা করতো ভারি চটে যেতো। বাপের অনেক পয়সা ছিল, মিঃ মুখার্জ্জি কলকাতা সহরে খুব পয়সা ওড়াতে লেগে গেলো। বাপ বেচারী পাড়াগেঁয়ে লোক, ভাবতেন ছেলে খুব লেখাপড়া শিখ্‌ছে, তাই এত খরচ। তিনি ত আর জান্তেন না ছেলে ঘোড়দৌড়ে খুব ঘুরছে মোটর চড়ে, আরও কত কি করছে। আগে ছেলে মাঝে মাঝে তবু বাড়ী আসতো, এখন তাও ছেড়ে দিয়েছে।

ক্রমে নিধুর কাকা, রামের দাদা, শ্যামাপদ নিজে গোবর্দ্ধনের কাণ্ড কারখানা দেখে শুনে এসে বৃন্দাবনকে বল্লেন। শুনে বৃন্দাবনের মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। হায়! হায়! এমন সর্ব্বনাশ হ'ল। এদিকে টাকার তাগাদায় বুড়ো বাপের প্রাণ বেরিয়ে যাবার দাখিল। পাড়ায় যে সব আত্মীয়স্বজন জ্ঞাতি কুটুম্ব ছিল, তারা পরামর্শ দিলে, ওকে ত্যাজ্যপুত্র কর, নইলে যে রকম টাকাটা নষ্ট করছে ও, বুড়ো বয়সে শেষটা তোমাদের স্ত্রীপুরুষকে ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে করতে হবে। বৃন্দাবনও দেখলেন তা ছাড়া উপায় নেই।

কলকাতায় থেকেই মিঃ মুখার্জ্জি নিধুর কাকা, অথবা রামের দাদা যার মারফতেই হোক খবরটা পেলেন। শুনে বল্লেন—কে রাখতে চায় তাদের সঙ্গে সম্পর্ক। করুক্ গে ত্যাজ্য!

কিন্তু তার বন্ধুরা বুঝিয়ে দিলে যে মুখার্জ্জি বাড়ী গিয়ে থোক্ থাক্ কিছু টাকা আগে আদায় করে আনুক। তারপর যা হয় হোক গে। তারা ত ঠিকই জানে, বাপ ত্যজ্য করলে টাকার অভাব হবে এবং তাদেরও স্ফূর্ত্তি একদম মাটী হয়ে যাবে। মুখার্জ্জি রাজী হয়ে বাড়ী গেলো।

দূর থেকেই দেখ্‌তে পেলে, তাদের বাড়ীর দালানে মহা ভিড়। একেবারে লোকে লোকারণ্য। সে একটা আড়াল জায়গা থেকে লুকিয়ে শুন্‌তে লাগল। তাকেই ত্যজ্য পুত্র করার জন্যে মিটিং বসেছে। দলিল তৈরী, বাপ সই করলেই হয়। গোবর্দ্ধন দেখলে তার বাপ সই করলেন না, কাঁদতে কাঁদতে কাগজটী হাতে নিয়ে পাশের ঘরে তার মাকে বল্লেন—দেখ, আমি এখনি সই করতে পারব না। আরও কিছু-দিন যাক্—গোবর্দ্ধন এখনও ছেলে মানুষ। আর একটু বয়স হ'লে যখন বুঝতে পারবে তখন সে শুধ্‌রে যাবে—কি বল?



কাগজটি হাতে নিয়ে তার মাকে বল্লেন—

গোবর্দ্ধনের মাও কেঁদে বল্লেন তাই কর গো, তাই কর! পাঁচটা নয়, সাতটা নয়—ঐ একরত্তি বাছা আমার!

বাপ সভায় ফিরে এসে দলীলখানা সালিশিদের সামনে ফেলে দিয়ে বল্লেন—আর কিছুদিন যাক্। এত তাড়াতাড়ি কিছু করতে পারব না আমি।

সালিশী মশাইরা বল্লেন—আর দেরী করলে যে তোমাদের পথে দাঁড়াতে হ'বে বৃন্দাবন, সেটা বুঝছ না? অমন কুলাঙ্গার ছেলেকে আবার দয়া করতে আছে? বুঝে দেখ, বৃন্দাবন।

বৃন্দাবন বল্লেন—বুঝেই বলছি আমি। গোবর্দ্ধন আমার আজ মন্দ আছে, দু'দিন পরে সে ভালোও ত হ'তে পারে। আমি আরও কিছুদিন দেখব। আমার ত মনে হয় না গোবর্দ্ধন তার বুড়ো বাপ-মাকে কষ্ট দেবে!—বল্‌তে বল্‌তে বৃন্দাবন কেঁদে ফেল্লেন। বুকের চাদরখানা তুলে চোখ মুচ্ছেন, কে তাঁর দু'টি পা জড়িয়ে ধরে বলে উঠ্‌লো—না বাবা, গোবর্দ্ধন আপনাদের আর কষ্ট দেবে না।—বৃন্দাবন মুখ খুলে দেখেন, গোবর্দ্ধন।

সেই একগাদা লোকের মাঝখানে এসেই গোবর্দ্ধনের মা চোখের জলে ভাস্‌তে ভাস্‌তে ছেলেকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন।

বাপ-মা ছেলের চোখের জলের ধারা দেখে সেইসব সালিশী মশাইরা আর কি করবেন? বাড়ী চলে গেলেন।

গোবর্দ্ধন মায়ের বুকে মুখ রেখে বল্লে—আর মা আমি সহরে যাব না। তোমার কাছেই থাক্‌ব।

ছেলের মার চোখের জল আশীর্ব্বাদের মত ছেলের মাথায় ঝরে পড়তে লাগলো। মা বল্লেন—তাই থাকিস বাছা, অঞ্চলের নিধি তুই, অঞ্চলেই থাকিস।

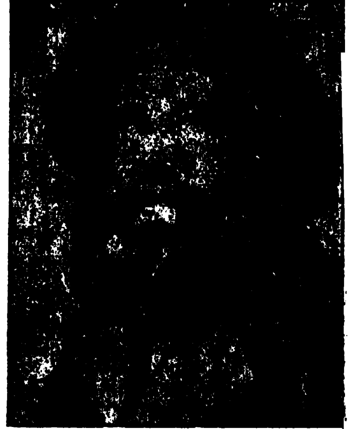
শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার।

——

তাজ্জব!

আইন বাঁধা দাড়ি

এক ভদ্রলোক বায়স্কোপ কোম্পানীতে "গুহাবাসী" সাজতেন। ফিলমে গুহাবাসীর যে অংশ থাকবে তা তিনিই সাজবেন এই ছিল তাঁর সর্ত্ত বায়স্কোপ কোম্পানীর সঙ্গে। কাজেই তিনি দাড়ী ও চুল কামাতেন না। তোমরা হয়ত বল্‌বে—কেন? পরচুল ইত্যাদি পরে চলতে পারত ত? হাঁ পারত বটে, কিন্তু তেমন স্বাভাবিকটি হ'ত না—তাই তিনি কামাতেন না। অমনি করে অনেক কাল কেটেছিল কিন্তু শেষে হ'ল কি? কামাবার তাঁর ভারী দরকার পড়ে গেল। একটি মেয়ের সঙ্গে তাঁর বিয়ের "সম্বন্ধ", স্থির; মেয়েটি কিন্তু ঐ দাড়ী দেখে ভড়কে গেল বল্লে, ও গুলো কামিয়ে ফেল। ভদ্রলোক কামাতে গেলেন, তাঁর অন্নদাতা কোম্পানী বল্লে—তা হবে না বাপু। তোমার সঙ্গে আমাদের এগ্রিমেণ্ট রয়েছে। শেষে দু'পক্ষ আদালতে হাজির হ'লেন, জজ রায় দিলেন, নাঃ। দাড়ী রাখতেই হবে; এগ্রিমেণ্টের আইনে বাঁধা। বেচারার দাড়ী কামানো আর হ'ল না। বিয়েটা হয়েছে কি না ঠিক বলতে পারিনে, তবে এগ্রিমেণ্টের কাল উত্তীর্ণ হলে মেয়েটি যদি অনূঢ়া থাকে—হয়ত হ'বে। কেমন মজা!!!



আমেরিকার দু'শো বাড়ীশুদ্ধ একটা সহরকে এক স্থানে থেকে আর একস্থান তুলে নিয়ে গেছে; সহরটা যেখানে ছিল, সেখানটায় খনিজ কাজ কর্ম্ম চল্‌বে। মজা মন্দ নয়। একটা আধটা চারা গাছকেই উপড়ে নিয়ে যাওয়া চল্‌ত, এখন বাড়ীসমেত সহরও উপড়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হ'ল। আমাদের সহরটা কেউ এমনি নিয়ে যায় ত বেশ হয়, কেমন?

প্রহ্লাদ।

(ছড়া।)

এক যে ছিল দেশ,
হরির কথা কয় না কেউ, রাজার আদেশ।
রাজপুত্র প্রহ্লাদ
হরির গুণ গাইতে তার বড়ই আহ্লাদ।
রাজা ক'ন রেগে
"মার্ পামরে, ফেল্ সাগরে, ভাতে বিষ দিগে।"
শিশু নাহি মরে
হরির গুণে সকল দুঃখ অকাতরে তরে।
রাজা তো আগুন,—
শুধান তারে "কোথায় হরি, কর্‌ব মেরে খুন।"
শিশু হেসে কয়
"সকল ঠাঁই হরি আমার, সবার সনে রয়।"
রাজা রোষে ছুটি'
কপাল দোষে পড়েন ভুঁয়ে মরণ-কোলে লুটি'!
শুন বলি ভাই,
প্রহ্লাদ হেন ভাল হলে কোন শঙ্কা নাই।
বাপের মত তার
হলেই কিন্তু জানিও ঠিক্ বিপদ অনিবার।

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

রাঁচি ভ্রমণ।

এবার আমরা পূজার সময় রাঁচিতে ছিলাম। রাঁচি ছোট নাগ্‌পুরের একটি বড় সহর। বেহার ও উড়িষ্যার লাট্ সাহেব গ্রীষ্মকালে কয় মাস এখানে বাস করেন। রাঁচি বাঙ্গালা দেশের চেয়ে অনেক উঁচু, চারিদ্দিকে পাহাড়, সহরটী সুশ্রী।

রাঁচিতে দেখ্‌বার অনেক জিনিষ আছে—তার মধ্যে মোরাবাদী পাহাড়, রাঁচি পাহাড়, জগন্নাথ পাহাড় আর হুড্‌রু জলপ্রপাত উল্লেখ যোগ্য। এখানে একটা পাগ্‌লা গারদ তৈরী হচ্ছে—এটীও দেখবার জিনিষ—আরম্ভ যা হয়েছে তা দেখে মনে হয়—শেষ হ'লে সত্যিই একটা বিরাট কাণ্ড হবে।

আমরা রাঁচিতে এসে প্রথম মোরাবাদী পাহাড় দেখ্‌তে যাই। পাহাড়টী খুব উচু না হ'লেও— নিতান্ত কম নয়। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এই পাহাড়টা বন্দোবস্ত নিয়ে—এই পাহাড়ের ওপর নিজে থাক্‌বার জন্য ছোট একখানি বাড়ী ও পাহাড়ের চুড়োর ওপর একটা পাথরের মন্দির তৈরী করেছেন। সেই মন্দিরের পার্শ্বেই একটী গুহা আছে। এই গুহাটী ভারি চমৎকার। এই গুহার ভিতর গেলে প্রাণে বেশ একটু উদাস ভাব আসে। রাঁচিতে যারা বেড়াতে আসেন তাঁরা সকলেই মোরাবাদী পাহাড় দেখ্‌তে যান।

তারপর জগন্নাথ পাহাড়—রাঁচি সহর থেকে জগন্নাথ পাহাড় প্রায় তিন ক্রোশ পথ। এটীও একটা ছোট পাহাড়—পাহাড়ের ওপর জগন্নাথ ঠাকুরের একটী মন্দির আছে—সেই জন্য এই পাহাড়টার নাম হয়েছে জগন্নাথ পাহাড়। রাঁচি পাহাড়টা রাঁচি সহরের ঠিক মাঝখানে—এই পাহাড়ের ওপরেও একটী ছোট পাথরের মন্দির আছে।

মোরাবাদী পাহাড়,—রাঁচি পাহাড়—জগন্নাথ পাহাড় দেখ্‌বার পর আমরা হুড্‌রু জলপ্রপাত দেখ্‌তে যাই। হুড্‌রু জলপ্রপাত রাঁচি থেকে প্রায় পনের ক্রোশ রাস্তা। হুড্‌রুতে মটরকারে যাওয়াই সুবিধে—কারণ খুব শিগ্‌গির পৌছান যায়। আমরা

খেয়ে দেয়ে বেলা এগারটার সময় হুড্রু জলপ্রপাত দেখ্বার জন্যে মটরকারে রওনা হলুম। প্রায় দেড় ঘণ্টা সাঁ সাঁ করে চলে—মটরকার এসে এক জায়গায় দাঁড়াল। শুন্লুম সেইখানেই আমাদের নাম্তে হবে। সেখান থেকে প্রপাত প্রায় এক ক্রোশ পথ। সে পথে আর গাড়ী চলে না—হেঁটে যাওয়া ভিন্ন আর উপায় নেই। কাজেই আমরা হাঁট্তে আরম্ভ কল্লুম—পাহাড়ে রোদ ঝাঁ ঝাঁ কচ্ছে—সে রোদ যেখানে লাগ্ছে সেইখানইটা মনে হচ্ছে পুড়ে. গেল। সেদিকে আমাদের ভ্রুক্ষেপ নেই—হুড্রু জলপ্রপাত দেখ্তেই হবে—সে উৎসাহ দেখে কে?

একটু যেতেই আমাদের সম্মুখে একটা ক্ষুদ্র জলস্রোত পড়্লো। সেটা আমরা জুতো খুলে অনায়াসেই পার হয়ে গেলুম। তার পর থেকেই আমরা হুড্রু জলপ্রপাতের গর্জ্জন শুন্তে পেলুম—বুঝলুম জলপ্রপাতে পৌঁছুতে আর আমাদের বেশী পথ নেই। মাঝে মাঝে সেই পাহাড়ে পথে আবার আমাদের পথ ভুল হয়ে যাচ্ছিল। যাক্ তাতে আমাদের বেশী ক্ষতি হয় নি—দু'জন কুলি আমাদের সঙ্গে—তারাই আমাদের পথ দেখিয়ে হুড্রু জলপ্রপাতের মাথায় নিয়ে গিয়ে হাজির কল্লে। রোদে পুড়ে—যে পরিশ্রম করে আমরা হুড্রু জলপ্রপাতের মাথায় এসে হাজির হলুম—প্রপাত দেখে আমাদের একেবারে আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেল। ওপরে দেখ্বার মত বিশেষ কিছু আমরা পেলুম না—ভাব্লুম এত পরিশ্রম বৃথা হয়ে গেল। আমাদের মত আরও অনেকে সেদিন হুড্রু জলপ্রপাত দেখ্তে গেছলেন। আমাদের যখন মনের এই অবস্থা তখন সেই রকম আর এক দলের সঙ্গে আমাদের দেখা হ'লো। তাঁদের মধ্যে যার পিঠে ফটো তোলবার যন্ত্র বাঁধা, তিনিই বল্লেন,—"মশাই আপনারা এখানে বক্ছেন কি, নীচে গিয়ে দেখুন—সত্যিই দেখবার জিনিষ।"

আমাদের সঙ্গে সতীশবাবু ছিলেন,—তাঁকে তোমরা নিশ্চয়ই চেন—তিনি ছবি আঁকেন। তাঁকে তোমরা না দেখ্লেও তাঁর আঁকা ছবি তোমরা নিশ্চয়ই দেখ্ছ। এই

কথা শুনে তিনি বল্লে উঠ্‌লেন,—"দেখ্‌বার একটা কিছু না থাক্‌লে মানুষ কখন এত কষ্ট করে দেখ্‌তে আসে? চলুন—চলুন—নীচে গিয়ে দেখে আসা যাক্।"

রোদের তাপে—এত রাস্তা হেঁটে এসে নীচে নামবার আমার ইচ্ছা একেবারে ছিল না বল্‌লেই হয় কিন্তু সতীশবাবুর আগ্রহে না বল্‌তে পাল্লুম না। কুলিদের রাস্তা দেখিয়ে আগে আগে যেতে বলে আমরা তাদের পিছনে পিছনে নীচে নাম্‌বার রাস্তার দিকে চল্লুম। সে কি ভয়ানক রাস্তা। পাহাড় থকে ঢালু নীচের দিকে নেমে গেছে। সোজা হয়ে নামবার উপায় নেই। বানরের মত হামাগুড়ি দিয়ে—পাথর ধরে গাছ ধরে কোনক্রমে আমরা নামতে আরম্ভ কল্লুম। এই ভাবে প্রায় তিনশত ফুট নীচে নাম্‌তে হবে—আমরা অর্দ্ধেক নেমেছি পা আমাদের ঠক্ ঠক্ করে কাঁপ্‌ছে—বুকের ভেতর এমন ঢিপ্ ঢিপ্ কচ্ছে যে মনে হচ্ছে যেন দম বন্ধ হয়ে এল। কিন্তু এত দূর নেমে আর ফেরা চলে না—কাজেই আমাদের নামতে হ'লো, বহু কষ্টে এক রকম গড়াতে গড়াতে আমরা জলপ্রপাতের তলায় গিয়ে পৌছু-



হুড়ুর জলপ্রপাত।

নেমে যা দেখ্‌লুম তাতে আমাদের সব কষ্ট এক নিমিষে দূর হয়ে গেল।

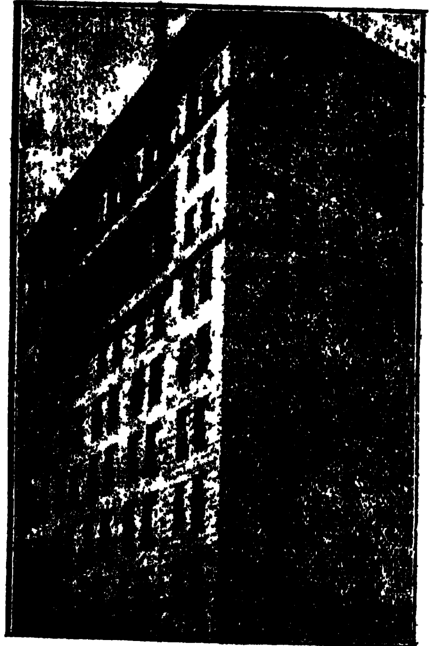
হুড্রু জলপ্রপাত সত্যিই দেখবার জিনিষ। তিনশো ফুট উঁচু থেকে হুড় হুড় কে জল নীচে এসে পড়্ছে। সে যে কি বাহার তা চোখে না দেখ্লে বোঝবা উপায় নেই। জলটা যেখানে এসে পড়েছে একশটা ধুনুরী এক সঙ্গে তুলো ধুনে যেমন দেখ্তে হয় সেখানটায় তেমনি একটা কাণ্ড হচ্ছে। সেখানটা হাওয়া এমনি ঠাণ্ডা যে গায়ে লাগ্লে মনে হয় যেন গায়ে বরফ ছড়িয়ে দিচ্ছে সেখানে আমরা ঘণ্টা খানেক জিরিয়ে আবার ওপরে উঠ্তে আরম্ভ কল্লুম। কি ওঠা যে কি কঠিন ব্যাপার বা তখন আমরা একেবারেই বুঝ্তে পারিনি পাহাড়ে রাস্তা খাড়াই ওপরে উঠেছে—তার ওপর ফুলের গাছ চারদি এমন বন হয়ে আছে—সেখানে হাওয়া যাবার সম্ভাবনা নেই। আমরা যতই ওপ উঠ্তে লাগলুম ততই দর দর করে ঘাম বেরুতে লাগ্লো। একে একে গায়ের জা খুলে হাওয়া দেওয়া ভিন্ন আর উপায় রইল না। সেই সময় অপর এক দল নী নেমে আস্ছেন—তাদের মধ্যে দুই তিনটী মেয়েও আছেন। তাঁদের তখনকার অবস্থা দেখ্লুম—তাতে তাঁরা কেমন করে আবার ওপরে উঠ্বেন তা তাঁরাই জানে আমবা দু' তিনবার পড়ে কোন ক্রমে তো ওপবে উঠে এলুম। ওপরে উঠে সতীশব তো অজ্ঞান। আমাদের অবস্থাও কতকটা তাই। তাড়াতাড়ি গাছের ডাল ভেঙ্গে অনেকক্ষণ হাওয়া করবার পর—সতীশবাবু কতকটা ধাতস্থ হলেন। আমরা মরে ঝ কোন ক্রমে এসে মটরে উঠ্লুম। কষ্ট যথেষ্টই হয়েছিল বটে—কিন্তু একটা দেখ্ব মত জিনিষ দেখ্লুম বলে আমরা সে কষ্ট ভুলে গেলুম। তোমরা যখন বড় হ তখন তোমরা অনেক দেশে গিয়ে অনেক জিনিষ দেখ্বে। যদি কখন তোমরা রাঁচি য হুড্রু জলপ্রপাত দেখ্তে ভুল না। ভারতবর্ষের মধ্যে এত বড় জলপ্রপাত আর না কোথায় নেই। রাঁচিতে আরও অনেক জিনিষ দেখেছি, কিন্তু এই হুডরু জলপ্রপাতে মত এমন সুন্দর আর কিছু দেখি নাই।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ পা

তাজ্জব!

আঠারো-তোলা বাড়ী।

আমার দেশের পাঠক পাঠিকা! বল ত তোমবা ক'তোলা বাড়ী দেখিযাছ? পাঁচ তোলার বেশী কেহ দেখিয়াছ বলিয়া মনে হয না। আমেবিকায় একটা বাডী আছে সেটা আঠারো তোলা উঁচু। আচ্ছা এই যে বাডীটা, অনুমান কবিযা দেখ দেখি, কত উঁচু। শুধু সিঁড়ি বাহিয়া উঠিতেই খুব জোয়ান লোকও হাঁপাইয়া পড়িবে, তোমাদের ত কথাই নাই। কলকাতায় তিন তোলা চার তোলা বাড়ীর আফিসগুলিতেই লিফট আছে, বৈদ্যুতী কলে চলে, যার যে তোলায় দরকার টুক্ করিয়া যায় আসে। আমেরিকার এই উঁচু বাড়ীতেও যে লিফট আছে সে বিষয়ে ত সন্দেহই নাই। তা যদি না থাকিত একবার কেহ উপর হইতে নীচে নামিয়া আবার উঠিতে হইলে কাঁদিয়া ফেলিত।



সিঁড়ি লিফট ত দূরের কথা, মিষ্টার হাসলার নামে এক ভদ্রলোক একবার এই আঠারো তোলা বাড়ীটার গা বাহিয়া নামিয়াছিলেন। তাহা দেখিবার জন্ত সেদিন সেখানে হাজার হাজার লোক জমা হইয়াছিল। প্রথমে হাস্লার সাহেব একটা দড়ি ধরিয়া আঠারো তোলার ছাদ



সহসা কুমার থামাইয়া রথ

নামিলা ধরণী তলে,

বহে হিল্লোল অভিবাদনের

সেনা-অসেনার দলে।

হইতে ঝুলিয়া পড়িয়া, ইঁটপাথরের ফাটলে হাত দিয়া দড়িটা ছাড়িয়া দিলেন। সাহসটা দেখ একবার! একবার যদি একটি কি দুটি ভাঙ্গিয়া যায়, পিছলাইয়া যায় কি হয়? একবার হইয়াছিলও তাই। পা পিছলাইয়াছিল কিন্তু হাতের আঙুল দিয়া এমনি দৃঢ় করিয়া তিনি বাড়ীর ফাটলটি ধরিয়াছিলেন যে তাঁহাকে পড়িয়া মরিতে হয় নাই। নীচে হাজার হাজার দর্শক 'গেল গেল' করিয়া উঠিল, কিন্তু হাস্‌লার সাহেব অল্পক্ষণ পরে আস্তে আস্তে নামিয়া পড়িলেন। লোকে ত অবাক্, শেষে তাহারা তাঁহাকে মাথায় করিয়া নাচিয়াছিল।

ছবিটি নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলে তোমরাও অসমসাহসিক হাসলার সাহেবের আকাশ অবতরণ দেখিতে পাইবে।

আরও জল খাও

অনেকেরই ধারণা আমাদের শরীরের ভার প্রধানতঃ হাড়ের জন্যে। বাস্তবিক কিন্তু তাহা নয়। নরশরীরের ওজনের চারিভাগের মধ্যে কিছু কম তিন ভাগ—জল।

শরীরের পক্ষে জল অতি প্রয়োজনীয়। জলের এক প্রধান কার্য্য হইতেছে দেহের সমতা রক্ষা করা। সংক্ষেপে, যন্ত্রপাতির পক্ষে যেমন তেল, শরীরের পক্ষে তেমনি জল।

হজমের কাজে জল অনেক সাহায্য করে—যাহাদের বদহজম হয় তাহাদের জল ছাড়া আর কোন ওষুধের দরকার করে না। পর্য্যাপ্ত পরিমাণে জল খাও। মানুষের মস্তিষ্কেও প্রচুর জলের দরকার।

খুব জল খাও বলছি বলে ভাত খাবার সময় যেন ঢোঁক ঢোঁক করে সের খানেক জল খাইও না। খাইতে খাইতে এক আধ চুমুক জল খাইতে হানি নাই কিন্তু ঢক্ ঢক করে জল খাওয়াটা ভাত খাবার খানিকটা পরে করাই ভাল।

সাধারণ সুস্থদেহে লোকের দিনে ছয় পাঁইট জল খাওয়া দরকার। ভাত ডাল তরি তরকারী শাক সব্জী প্রভৃতি খাদ্য ইহার অর্দ্ধেক সরবরাহ করে—বাকীটুকুকে সেরেফ পান করিয়া পাইতে হয়।

শ্রীধানি লক্ষ্মা।






সোনার মেডেল

হালিসহর স্কুলে পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ি। যোগেন পণ্ডিত মহাশয় ছিলেন আমাদের একমাত্র ও অদ্বিতীয় শিক্ষক। একমাত্র, কেন না আর কোন মাষ্টার আমাদের ক্লাশে ঢুকিতেন না। অদ্বিতীয় যেহেতু কদিচ কখনও তিনি কামাই করিলে সেই দিনটা যে মাষ্টারই কেন আসুন না, চেয়ারে বসিয়া পড়াইয়াই যাইতেন, ছাত্রদের পিঠের ও গালের সঙ্গে তাঁহার হাতের কোন সম্বন্ধই থাকিত না। সোজা কথায় সে দিনটা আমরা যেন বাঁচিয়া যাইতাম। যদি শুনিতাম যোগেন পণ্ডিত মহাশয় পীড়িত, আমরা মিশনরি স্কুলে একযোগে যাইবেল পড়ার মত বলিতাম—হে বিভু করুণাময়! আমাদের অসুখে বিসুখে সাগু খাইয়াই ত কত দিন কাটাইতে হয়, তাঁহার কেন হইবে না? কিন্তু পরের দিনই স্কুলে আসিয়া দেখিতাম, লাল বিলাতী কম্বল জড়াইয়া 'অসুস্থ' পণ্ডিত মহাশয় যেন হাঁসপাতালে আসিয়াছেন। সে দিন আরও বিপদ। একে ত রুক্ষ, তায় অসুস্থ, আর কি রক্ষা আছে!

আমাদের ক্লাসে তিনি নিয়ম করিয়াছিলেন, সমস্ত দিনের পর রেজেষ্টারী করিবেন। উপস্থিত স্যার, এবজেণ্ট স্যার বলিলে চলিত না। কে কতবার কথা বলিয়াছে ফিস্ ফিস্ করিয়া—তাহাই বলিতে হইত। পাঁচঘণ্টায় পাঁচটা কথা মঞ্জুর ছিল। কাজেই, আমরা সকলেই পাঁচ বলিতাম। যে পঁচিশ বার কথা বলিয়াছে, সেও বলিত ফাইভ্ [illegible] আর একটা আইন ছিল, যে ছেলে বেশী বাহিরে যাইবে, তাহার নামের পাশে

লিখিতেন ব্যাঙ। বাহিরে যাওয়াটাও আমরা বন্ধ করিয়া দিয়াছিলাম। অন্য ক্লাসের ছেলেরা বকুলতলায় পুকুর পাড়ে কাঁচা আমের সময়ে আম গাছ তলায় মনের আনন্দে ঘুরিয়া বেড়াইত, খাঁচার পাখীর মত আমরা নীল আকাশের দিকে চাহিয়া তাহাই ভাবিতাম, আর মনে মনে...থাক্, গুরু নিন্দাটা এখন আর নাই করিলাম।

তারক কোথা হইতে আসিয়া একদিন বহিপত্র লইয়া আমাদের ক্লাশে ভর্ত্তি হইল। খুব গৌরবর্ণ পাতলা চেহারাটি, মাথায় মস্ত মস্ত চুল কিন্তু পরিষ্কার করিয়া আঁচড়ানো পরিচ্ছন্ন বেশ এবং চোখে একজোড়া সোনার চশমা! প্রথম দিন রেজেষ্টারীর সময় তারকের নাম ডাকা হইল বটে, কিন্তু সে সাড়া দিল না, পণ্ডিত মহাশয় নিজেই কি লিখিয়া লইলেন। স্কুলের শেষে সে আমাদের জিজ্ঞাসিল—তোমরা সবাই পাঁচ বল কেন? আমরা তাহাকে বুঝাইয়া দিলাম। পথটা সে আমাদের হাসাইতে হাসাইতে চলিল। ক্লাসে তাহাকে দেখিয়া আমরা বলা-বলি করিয়াছিলাম (যদিও রেজেষ্টারীর সময় পাঁচ ছাড়া ছয় কেউ বলি না) যে সে নেহাৎ বেচারা ও ভ্যাবাগঙ্গারাম! ও মা! বাহিরে আসিয়া দেখি, আমাদের এক হাটে



আমাদের ক্লাশে ভর্ত্তি হইল।

বেচিয়া সে অন্য হাটে কিনিতে পারে। এত গল্প জানে, এত হাসাইতে পারে, কি বলিব? তড়াক করিয়া পরেশদের নারিকেল গাছে উঠিয়া পরেশকে, আমাকে আর মহিমকে তিনটা ডাব পাড়িয়া দিল। সে যখন খালি গাঁ করিল, চেহারাটা তাহার পাতলা বটে, বুকটা এতো বড় আর হাতের গুলিগুলা প্রায় রামমূর্ত্তির মত!

পরের দিন যখন তাহার নাম ডাকা হইল, সে বলিল—টুয়েলভ স্যার।

পণ্ডিত মহাশয় জিজ্ঞাসিলেন—বারো বার কথা বলিয়াছ? ছিঃ

তারক মাথা নত করিল। আমরা বলাবলি করিতে লাগিলাম, কৈ ও এত কথা কখন কহিল? বাহিরে আসিলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে বলিল, পেন্সিলটা খারাপ, চারবার শিশ্ ভাঙিল, ছুরী চাহিলাম। আমার চোখটা একটু খারাপ কি না, বোর্ডের লেখা দেখিতে পাই না—সেও আটবার রমেশকে জিজ্ঞাসা করিয়া লইয়াছি। —শুনিয়া আমরা হাসিয়া উঠিলাম। চারু বলিল খুব বুদ্ধি ত তোমার! উহাকে বুঝি কথা কওয়া বলে! ছিঃ ছিঃ বোর্ডের লেখা জানিয়া লইয়াছ, উহা ধরিলে কেন? হ্যাঁ ছুরী চাওয়া চারবার বরং ধরিতে পার, কিন্তু আমরা তাও ধরি না।

তারক বলিল—আমি যত বার কথা বলি, তত বারই ধরি।

পরের দিনও সে দশ না কত বলিল। তার পরের দিন বলিল এক! শেষে তারক কেবল নামডাকার সময় দাঁড়াইয়া উঠিত। পণ্ডিত মহাশয় একদিন তাহার মুখের দিকে চাহিয়া 'ছিঃ' করিয়াছিলেন, এখনও তাহার মুখের পানে রোজই চাহিতেন, কিন্তু তাঁহার মুখখানিও বেশ প্রফুল্ল দেখিতাম।

হঠাৎ একদিন তারক বলিল—পাঁচ।

আমরা জিজ্ঞাসিলাম, কি ব্যাপার! সে বলিল, ভাই, বড়ই মুস্কিল হইয়াছিল, চোখটা [illegible] ভালই ছিল, আবার আজ দুপুরে জল পড়িয়াছে তাই বীরেনকে আনাতন [illegible]।

তারপরদিন আমার নাম ডাকার সময় আমিও নতমুখে শুধু দাঁড়াইলাম, পণ্ডিত মহাশয় জিজ্ঞাসিলেন, একটীও নয়? আমি বলিলাম—না।

ক্রমে এমন দিনও আসিল, যখন পণ্ডিত মহাশয় রেজেষ্টারী খাতা আর খুলিতেন-ই না।

বছরের শেষে একদিন পণ্ডিত মহাশয় স্কুলের সমস্ত ছেলেকে 'হলে' জড় করিয়া বলিলেন—এই হলে হাজার ছেলের মধ্যে একটি ছেলে আছে যাহার পোষাক দেখিয়া কেহ তাহাকে বড় বলিয়া বুঝিবে না—অন্য সকলের মতই তাহার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাপড় চোপড়, আর কিছু না, কিন্তু সবার চেয়ে সে বড়। তাহার অনেক গুণ আছে—সে তোমাদের পরে বলিব কিন্তু সে-যে সত্য-আশ্রয়ী, সত্য ছাড়া মিথ্যা জানে না—এইটী তার প্রধান গুণ! তাহাকেই স্বর্ণপদক দিবার জন্য সম্পাদক মহাশয় আসিয়াছেন। কিন্তু আমরা তাহার নাম বলিব না। তোমরা কেহ বলিয়া দাও।

সর্ব্ব প্রথমে আমিই বলিয়া উঠিলাম, তারক গুপ্ত।

শেষে প্রায় সকল ছেলেই বলিল, তারক গুপ্ত, মহাশয়।

তারক মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সম্পাদক কিশোরী বাবু তাহার গলায় সোনার মেডেল পরাইয়া উচ্চ মঞ্চের দিকে লইয়া গেলেন।

সেদিনও তারক পথে পড়িয়া পরেশদের গাছে উঠিয়া আমাদের তৃষ্ণা দূর করিল।

'বাঙ্গালার মেয়ে'

সুর "ধন-ধান্যে-পুষ্পে ভরা—"

১

স্নেহ দিয়ে হৃদয় গড়া,
প্রাণের মাঝে সুধা ভরা,
হাসি মাখা মুখটি তাদের
ফুলের মতই দেহ;
তেমন ফুলে উজল সদা
বঙ্গ মায়ের গেহ।
আছে তা'দের সৌরভেতে
সারাটি দেশ ছেয়ে;—
বাংলা দেশের আশার জিনিস
বাংলা দেশের মেয়ে।

২

ভাষায় তা'দের মধু ঝরে
সকল ব্যথা নেয়গো হরে,'
পরকে তা'রা মুখের কথায়
আপন করে ফেলে,
সাঁঝে তা'রা ঠাকুর ঘরে
প্রদীপটি দেয় জ্বেলে।
কোথাও এমন মিল্‌বে নাকো
খুঁজে দেখ যেয়ে,
বাংলা দেশের আশার জিনিস,
বাংলা দেশের মেয়ে।

৩

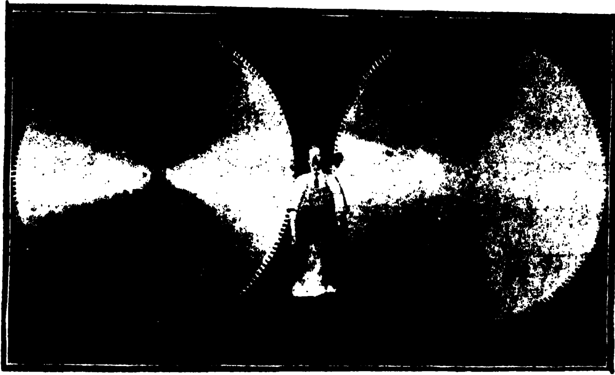
স্নেহের অমল রাখী নিয়ে
ভা'য়ের করে দেয় পরিয়ে,
দেশের-দশের সেবার তরে
প্রাণখানি দেয় ঢেলে,
আঁধার দেশে দেয়গো, হেসে
মঙ্গলদীপ জ্বেলে।
অবাক্ হয়ে দেখুক জগৎ
তা'দের পানে চেয়ে,
বাংলা দেশের আশার জিনিস
বাংলা দেশের মেয়ে।

শ্রীসুরেন্দ্র বিজয় দে।

তাজ্জব !

পৃথিবীর সব চেয়ে বড় করাত।

তোমরা লম্বা করাতই সচরাচর দেখিতে পাও। কল-কারখানায়, রেলের কারখানায়



গোল করাত আছে। পার্শ্বে যে ছবিটী দেখিতেছ ঐ দু'খানি কি জান? দু'খানি করাত। এই দুখানা করাত দ্বারা যত বড় গাছ দরকার কাটিয়া ফেলা যায়। এর এক খানার ওজন কত জান? প্রায় দশ মন। আর এক ঘণ্টায় ১৩০ মাইলের বেগে ঘোরে। যখন এই করাত ঘোরে তখন যত বড়ই কেন গাছ দাও না, ছুরী দ্বারা পাকা আম কাটার মত কুচ্ কুচ্ করে কেটে যাবে। এই করাত দু'খানা ক্যানাডা দেশের ইঞ্জিনীয়ারদের তৈয়ারী। এমনি কৌশলে সৃষ্টি যে যদি কোন দাঁত ভেঙ্গে যায় ত ফ্রেম থেকে এত বড় বিশাল করাত খুলে লণ্ডভণ্ড না করে টুক্ করে অন্য দাঁত পরিয়ে দেওয়া চলে। এক একখানার পরিধি নয় ফিট, আর প্রত্যেকটায় দাঁত আছে একশ' নব্বইটা। এত বড় করাত পৃথিবীতে আর নাই।

সরল বাঙ্গালা-সাহিত্য

নাথ-গীতিকা ঃ

গোরক্ষ-বিজয়।

নাথ-সম্প্রদায় নামক এক শ্রেণীর লোক ইং ১১০০।১২০০ সনে বঙ্গদেশে এবং ভারত-বর্ষের অপরাপর স্থানে প্রবল হইয়া উঠেন। ইহাঁরা বৌদ্ধধর্ম্ম ও শৈবধর্ম্ম এই দুই ধর্ম্ম হইতে মত সংগ্রহ করিয়া একটা মাঝামাঝি ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, এই ধর্ম্মের নাম নাথ-ধর্ম্ম।

এই ধর্ম্মের গুরু ছিলেন মীননাথ। মীননাথের প্রধান শিষ্য গোরক্ষনাথ সম্ভবতঃ পাঞ্জাবে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু গোরক্ষনাথ বাঙ্গালা দেশেই অনেক কাল কাটাইয়াছিলেন, এদেশে তাঁহার অনেক শিষ্য হইয়াছিল। 'গোরক্ষ বিজয়' নামক একখানি পুরাণো কাব্য পাওয়া গিয়াছে। এই পুস্তকের খসড়া তৈরী হইয়াছিল ১১০০।১২০০ সনে, তার পরে অনেক কবি সেই খসড়ার উপর হাত বুলাইয়া ভাষাটা শেষে কতকটা সহজ করিয়া ফেলিয়াছেন,—এই কবিদিগের মধ্যে ভবানী দাস, ফয়জুল্লা, ও ভীমদাস সেন প্রধান।

গোরক্ষনাথের জীবনের অনেক কথা এই বই গুলিতে পাওয়া যায়। ইহার লেখা কতকটা পুরাণে লিখিত গল্পের ন্যায়—তথাপি ইহাতে খুব উচ্চাঙ্গের নীতি ও ধর্ম্মের কথা আছে

একদিন শিবঠাকুর খুব নিরালায় সমুদ্রের উপর একটা "টঙ্গী"তে বসিয়া দুর্গাকে জীবন-মৃত্যু সম্বন্ধে নানা উপদেশ দিতেছিলেন। এই উপদেশের নাম "মহাজ্ঞান"। ইহা যে শোনে সে মড়াকে বাঁচাইতে পারে ও সকল দেবতারা তার বশীভূত হন। যেখানে শিব-দুর্গা কথাবার্ত্তা বলিতেছিলেন, সেই স্থান হইতে খুব নীচে সমুদ্রের জলের তলায় বসিয়া সেই সময় মীননাথ তপস্যা করিতেছিলেন। তিনি দৈবাৎ শিবের মহাজ্ঞানের তত্ত্ব শুনিতে পান। শিব বুঝিতে পারিলেন, মীননাথ চুরি করিয়া তাঁর সব জ্ঞান শিখিয়া লইয়াছেন। তখন তাঁহাকে অভিশাপ দেন—"আমি স্ত্রীর সঙ্গে নিরালায়

যাহা বলিতেছিলাম তাহা তুমি যেরূপ চোরের মত শুনিয়া লইয়াছ, তাহার দণ্ড এই হইবে যে তুমি স্ত্রীলোকের মায়ায় বদ্ধ হইয়া সেই জ্ঞান হারাইবে।"

কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যে মীননাথ তাঁহার জ্ঞান হাড়িপা, কালুপা, গোরক্ষনাথ প্রভৃতি শিষ্যদিগকে শিখাইয়া ফেলিলেন।

একদিন দুর্গা শিবকে বলিলেন, "তুমি তোমার সাধুদের বৃথা বড়াই করিয়া থাক, স্ত্রীলোকেরা ইচ্ছা করিলে চোখের চাউনি দিয়া তাঁহাদিগকে পাগল করিতে পারে। স্ত্রীলোকের মায়ায় বশীভূত না হয়, এরূপ সাধু জগতে নাই।"

শিব-ঠাকুর বলিলেন—"আচ্ছা তুমি আমার সাধুদিগকে পরীক্ষা করিয়া দেখ, তাহাদের মন টলাইতে পার কিনা।"

তখন দুর্গা পরমাসুন্দরী রূপসী সাজিয়া সাধুদিগের নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া প্রথম ভুলিলেন, গুরু মীননাথ। তিনি বলিলেন, "যদি এমন সুন্দরী স্ত্রী পাই, তবে আমি "মহাজ্ঞান" পর্য্যন্ত ছাড়িয়া দিতে পারি।" দেবী বলিলেন "তাহাই হউক, তুমি কদলী-পত্তন নামক দেশে যাও, সেখানে আমার মত ষোলশ' সুন্দরী আছে, তাহাদিগকে পাইবে, কিন্তু মহাজ্ঞান হারাইবে।" মীননাথ কদলী-পত্তনের দিকে চলিয়া গেলেন। তার পর ভুলিলেন হাড়িপা। তিনি বলিলেন, "যদি এইরূপ সুন্দরী পাই, তবে আমি অতি হেয় ও নীচ হাঁড়ির কাজ করিতেও রাজী আছি।" দেবী বলিলেন "তাহাই হউক তুমি ঝাঁটা ও হাঁড়ি হাতে লইয়া মেহেরকুলে যাও, সেখানে রাণী ময়নামতী আমার মতই সুন্দরী, তাঁহাকে পাইবে কিন্তু তোমায় হাঁড়ি হইয়া রাস্তা ঘাট ঝাঁট দিতে হইবে।" হাড়িপা মেহেরকুলের দিকে চলিয়া গেলেন। তার পর ভুলিলেন কালুপা—তিনি বলিলেন "যদি এমন সুন্দরী পাই, তবে আমার ডান হাতখানি যদি কেউ কাটিয়া ফেলে, তবে তাও সহিতে পারিব।" দেবী তাঁহাকে সেই বর দিলেন, কালুপা অপর এক দেশে চলিয়া গেলেন।

কিন্তু গোরক্ষনাথ অচল, অটল—দেবী কত হাব ভাব দেখাইলেন,—কত মন-ভুলানো চাউনি চাহিলেন। গোরক্ষ যোগী বলিলেন "ছিঃ ছেলের কাছে কি মায়ের এই এই সকল ভাব সাজে?" পুনঃ পুনঃ দেবী গোরক্ষকে ভুলাইবার নানা ফন্দী করিলেন,—গোরক্ষ যদিও পরম সুন্দর নব যুবক,—তথাপি তিনি খাঁটি সাধু, তাঁহাকে দেবী এক তিলও নড়াইতে পারিলেন না,—মহাদেবের কাছে দেবীর মুখ এতটুকু হইয়া গেল; তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইল, জগতে একজন লোকও এমন আছে, যাহাকে স্ত্রীলোক রূপের মায়াজাল বিস্তার করিয়াও টলাইতে পারে না।

গোরক্ষ যোগী একদিন এক নবীন যোগীর ব্যবহারের দোষ ধরিয়াছিলেন, তাহাতে সে রাগিয়া তাঁহাকে বলিল—"আপনি কি যোগবলের বড়াই করিতেছেন? আপনার গুরুভক্তি নাই, আপনি আবার অপরকে নীতি শিখাইতে আইসেন? আপনার গুরু মীননাথ কদলী পত্তন নগরে যাইয়া ষোলশ' রূপবতী স্ত্রীলোকের মায়ায় পড়িয়া "মহাজ্ঞান" হারাইয়াছেন,—তিনি আর তিনদিন পরে মারা পড়িবেন, আর আপনি তাঁহার উদ্ধারের কোন উপায় না করিয়া এইখানে যোগের বড়াই করিতেছেন। আপনার গুরুর দাঁতগুলি পড়িয়া গিয়াছে, চোখের জ্যোতি কমিয়াছে, গাল ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, শরীর নুইয়া গিয়াছে—আর আপনি অপর যোগী শিষ্যকে ভক্তি শিখাইতেছেন—আপনাকে ধিক্!"

গোরক্ষনাথ তখনই কদলী-পত্তনের দিকে যাত্রা করিলেন। কদলী পত্তনে এখন মীননাথ রাজা,—সে রাজ্যে একটিও পুরুষ মানুষ নাই,—সকলেই স্ত্রীলোক, সকলেই সুন্দরী, তাহাদের এক একজন শত শত সাধুর মন টলাইতে পারে, এমনই তাহাদের রূপ ও মায়া। মীননাথ সে রাজ্যের রাজা হইয়া আশঙ্কা করিলেন, যদি আর কোন যোগী আসিয়া যোগবলে তাঁহার এই সুখের রাজ্য কাড়িয়া লয়, এইজন্য আদেশ করিলেন, তাঁহার সেই রাজ্যে কোন যোগী ঢুকিতে পারিবে না,

"বুড়ো যোগী পাইলে চোপাড়ে (১) ভাঙ্গে গাল।
গাভুর (২) যোগী পাইলে তুলিয়া দেন শাল (৩)॥

(১) থাপড় দিয়া। (২) গাভুর-যুবক। (৩) শালে দিয়া হত্যা করে।

অধ বসী যোগী পাইলে মৈধ্য দেশ কাটে ।
পোলা যোগী পাইলে পাটাত তুলি বাটে ॥"



সুন্দরী স্ত্রীলোক সাজিয়া মৃদঙ্গ বাজাইতে লাগিলেন।

গোরক্ষ যখন সেই নগরে ঢুকিলেন, তখন তাঁহাকে দেখিয়া একটি বারুই জাতীয় রূপসী স্ত্রীলোক ভুলিয়া গেল এবং সাধুর বেশে গেলে যে তাঁহাকে মারিয়া ফেলিবে এই কথা বলিয়া দিল। গোরক্ষনাথ কোনরূপে তাহার হাত এড়াইয়া রাজপুরীর নিকটে যাইয়া নিজে পরমা সুন্দরী স্ত্রীলোক সাজিয়া মৃদঙ্গ বাজাইতে লাগিলেন, তাঁহার হাতে মৃদঙ্গের বোলে যেন রাজপুরী কাঁপিয়া উঠিল। সেই আওয়াজ মীননাথের কাণে প্রবেশ করা মাত্র, তিনি কি যেন কথা ভুলিয়া গিয়াছিলেন, তাহা একটু একটু

গেলে সুস্বর কোথায় লুকাইয়া থাকে?" ইহা ছাড়া আর প্রায় সকল গুলি যোগ সম্বন্ধীয় —তাহা আমাদের বুঝিবার সাধ্য নাই।

গোরক্ষনাথ মীনকে আবার 'মহাজ্ঞান' দিতে পারিয়াছিলেন—পুস্তকখানির এক নাম 'গোরক্ষ বিজয়' আর এক নাম 'মীন-চেতন'। মীননাথ চৈতন্য ফিরিয়া পাইয়াছিলেন বলিয়া এই পুস্তকের নাম "মীন-চেতন।"

এই পুস্তকের যতগুলি পুরাণো পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, তাহার সকল গুলিই পূর্ব্ববঙ্গের। সুতরাং সবই যে পূর্ব্ববঙ্গের লেখকগণ লিখিয়াছিলেন তৎসম্বন্ধে সন্দেহ নাই। এই পুস্তকে "বিক্রমপুর"-কেই ধর্ম্মের আদিস্থান বলিয়া লেখা হইয়াছে; সুতরাং পূর্ব্ববঙ্গকেই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। (ক্রমশঃ)

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।



" সরোবরে পদ্ম ফুটিয়া রহিয়াছে············জাভা দ্বীপ।

তাজ্জব !

নায়াগ্রা প্রপাতের ঘুর্ণি।

নায়াগ্রা জল প্রপাতের কথা তোমরা জান। আমাদের দেশে জব্বলপুরে নর্ম্মদা জলপ্রপাত হয়ত অনেকেই দেখিয়াছ। জল-প্রপাত মাত্রেরই জল পাহাড় হইতে নামিয়া হু হু শব্দে উত্তাল তরঙ্গ তুলিয়া ছুটিয়া চলে। কন্তু নায়াগ্রার জল স্রোত এত প্রবল ও ভীষণ যে সেই জলে সাঁতার দিতে গিয়া কাপ্তেন ওয়েব্ আরও কত লোক প্রাণ হারাইয়াছেন। এর এমনি ঘুর্ণী আর তুফান যে, যে সব বড় বড় গাছ যাহা ভাঙ্গিয়া নায়াগ্রায় ভাসিয়া আসে, তাহা ঘুর্ণী তুফানে পড়িয়া ঠিক ফুটবল খেলার বলের মত একবার শূন্যে, একবার জলে তর তর করিয়া লাফাইতে লাফাইতে চলে। সব চেয়ে আশ্চর্য্য এই যে দুই কূলের চেয়ে নায়াগ্রা নদীর মধ্যস্থলের জল খুব উঁচু, অর্থাৎ ফাঁপা। এর কারণ আর কিছু নয় চারিদিকের ঘুর্ণী ঠেলিয়া ঠেলিয়া তরঙ্গগুলিকে মাঝ খানে আনিয়া ফাঁপাইয়া তুলিয়াছে। পার্শ্বের ছবিটি মন দিয়া দেখিলে, তোমরা এ'টি দেখিতে পাইবে।



সরস্বতী পূজো।

সরস্বতী পূজো এলো,
একটী বছর পরে ;
প্রতিমা তাই গড়্ছে কুমোর,
পাঠ শালার ঘরে।
আহ্লাদে তাই নাচ্ছে আজি,
সকল ছেলে জুটী ;
লেখা পড়া বন্ধ দু' দিন,
ভারি মজার ছুটী।
কেনারাম গুরুমশাই,
গ্রামে বেজায় মান ;
যেমনি গোঁপ তেমনি টিকি,
দেখ্লে কাঁপে প্রাণ।
হুঙ্কার দেন বেজায় রকম,
পড়রে সবাই পড় ;
দুষ্টু ছেলে সিধে করেন,
দিয়ে কেমন চড়।
ছুটির ঠিক আগের দিন,
গুরুমশাই হেসে ;

বল্লেন ওরে ছোড়ারা সব,
সন্ধ্যের পর এসে—
প্রতিমার সাজগুলো দিস্,
সাজিয়ে সকল অঙ্গে ;
পূজোর জন্যে যে যা দিবি,
অমনি আনিস সঙ্গে।
এই না বলে গুরুমশাই,
তুলে দু'টী পা ;
নাক্ ডাকিয়ে নিদ্রা দিলেন,
মুখটী করে হাঁ।
ঘুমটী যখন ভাঙ্গ্লো তখন,
গুটিয়ে পাততাড়ী ;
হুঙ্কার দিয়ে উঠ্লেন তিনি,
যাবেন বলে বাড়ী।
সন্ধ্যের পর ছেলেরা সব,
সারলে আপন কাজ ;
মনের মতন করে মাকে,
পরিয়ে ডাকের সাজ।



রাত পোয়ালো দিনের আলো,
চোখটী মেলে চায় ;
চেলি প'রে সকল ছেলে,
পাঠশালাতে যায়।
অঞ্জলি আজ দেবে সবাই,
মায়ের চরণ তলে ;
জুট্‌ছে এসে পাঠাশালাতে,
তাইতে দলে দলে।
এমন সময় গুরুমশাই,
এলেন কেনারাম ;
ছেলেরা হয় কেঁচোর মত
শুন্‌লে যার নাম।
এসে দেখেন ছেলেরা সব,
হাস্‌ছে ফিক্ ফিক্ ;
সরস্বতীর গোঁপ ঝুলছে,
ঠোঁটের ওপর ঠিক।
আগুণ হয়ে কেনারাম,
বল্লেন ওরে গাধা ;
কে করেছে এমন কাজ,
কোন হারামজাদা ?
মায়ের সঙ্গে ঠাট্টা করা,
বিদ্যে হবে রম্ভা ;
তো ব্যাটারা অতি পাজি,
জুতিয়ে কর্ব্বো লম্বা।
কারুর মুখে কথাটি নেই,
সবাই থতমত ;
গোবেচারী সবাই যেন,
ভাল মানুষ কত।

চটে মটে গুরুমশাই,
রেগে বেজায় ফুলে ;
সরস্বতীর গোঁপ জোড়াটা,
দিলেন টেনে খুলে।
পাশ থেকে এক দুষ্টু ছেলে,
বল্লে মিহি স্বরে ;
ফেল্‌বেন না গুরুমশাই,
নে যান ওটা ঘরে।
ওটা আপনার মাথার টিকি,
আঠা দিয়ে আঁটা ;
সরস্বতীর গোঁপের জন্যে
কাল হয়েছে কাটা।
এই কথাতে কেনারামের,
পড়্‌লো মাথায় বাজ ;



এত দিনের টিকিটী তাঁর,
নাইকো মাথায় আজ।
মাথায় হাত দিয়ে দেখেন,
সত্যি কথা খাঁটি ;
দুঃখে রাগে তুলে নিলেন,
মস্ত এক লাঠি।



লাঠী দেখে হো হো করে,
পালায় সকল ছেলে ;
রাগের চোটে কেনারাম,
ঠাকুর দিলে ফেলে।

হ'লো নাকো পূজো সেবার,
সকল হ'লো মাটি ,
গুরুমশাই কেনারাম,
ঘুরোন কেবল লাঠি।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ পাল।

কোচম্যান

একদা এক ভদ্রলোক এক কোচম্যানের জন্য বিজ্ঞাপন দেন। তিনজন পদপ্রার্থী তাহাতে হইল—তিনজনেরই ভাল ভাল সুপারিশ ও সার্টিফিকেট। কাহাকে রাখিয়া যে কাহাকে লইবেন, ভদ্রলোকটী এই এক সমস্যায় পড়িয়া গেলেন।

শেষে তিনি তাহাদের একজনকে সুধাইলেন, "তোমাকে যদি কোন খাড়া পাহাড়ের কিনারা দিয়ে গাড়ী চালাতে বলি, ও কিনারার কত কাছ পর্য্যন্ত যেতে সাহস করতে পার ?"

"আজ্ঞে, কিনারার এক হাতের মধ্যে যেতে পারি।"

দ্বিতীয় ব্যক্তিকে তিনি তখন সুধাইলেন, "কত কাছ পর্য্যন্ত তুমি যেতে পার ?

"আজ্ঞে, গাড়ীর চাকা যতটা পুরু ততখানি জায়গা পর্য্যন্ত।"

"আর তুমি ?" তিনি তৃতীয় ব্যক্তিকে সুধাইলেন।

সে বলিল, "মহাশয়, আমি এ কখনও চেষ্টা করে দেখিনি সুতরাং কিছু বলতে পারি না। কিন্তু আপনি আমাকে যতটুকু দূরে থাকতে দেবেন, আমি ততটুকু দূরেই থাকব।"

বলিয়া দিতে হইবে কি যে তৃতীয় ব্যক্তিকেই মনোনীত করা হইয়াছিল ? আর বলিয়া দিতে হইবে কি যে, যে সকল লোক পাহাড়ের রগ দিয়া চলিতে প্রলুব্ধ হয়, তাহাদের পক্ষে ইহার উপদেশই সর্ব্বোত্তম ?

শ্রীধানি লজ্জা।



দশ বছরের ছেলে সে !

স্কুল হইতে বাড়ী ফিরিতেছিল। একটি ষোল বছরের ছেলে কোথা হইতে আসিয়া ছোট ছেলেটির কাঁধে হাত দিয়া বলিল কি হে ! এত সকাল সকাল ফিরিলে যে।

ছোট ছেলেটি বলিল, সকাল কই ? স্কুলে যে ছুটি হইয়া গিয়াছে। তুমি বুঝি আজ স্কুলে যাও নাই ? কিন্তু তোমার হাতে বই কেন ?

বড় ছেলেটি কহিল, কেন খেলিতে ছিলাম। বাড়ীতে জানে স্কুলে আসিয়াছি, তাই ত জিজ্ঞাসা করলাম যে সকাল সকাল কেন ! তাহ'লে ঠিক সময়ে চলিয়াছি—কি বল ?

ছোট ছেলেটি বলিয়া উঠিল, স্কুল পালিয়েছ তুমি ! ছিঃ !

বড় ছেলেটির রাগ হইল। হইবারই কথা। ছোট একটা ছেলে মুখের উপর বলে কি না—ছিঃ ! সে রাগ সামালাইতে পারিল না, ছোট ছেলেটির মাথায় একটা চড় মারিল বলিল, বড় জ্যাঠা হইয়াছিস্—না।

ছোট ছেলেটি কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল—মার কেন ? আমি কাল ·········

বড় ছেলেটির আরও রাগ বাড়িল। ছেলেটির হাতটা মুচড়াইয়া দিয়া আর একটা চড় মারিয়া সে একটা গলির মধ্যে ঢুকিয়া গেল।

ছোট ছেলেটি আর কি করিবে ? আহা, বেচারা জামার আস্তিনে চক্ষু মুছিতে মুছিতে বাড়ী ফিরিল।

পরদিন স্কুল বসিতেই বড় ছেলেটির বিচার আরম্ভ হইল। পাঁচজন ছেলে বসিয়া বিচার করিল, দণ্ড হইল পনোর দিন তাহার সহিত কেহ কথা কহিবে না, খেলিবে না—এমন কি, সে যে বেঞ্চে বসিবে, সে বেঞ্চে অন্য ছেলে কেহ থাকিবে না।

বড় ছেলেটি কাঁদিয়া ফেলিল। তারপর ছোট ছেলেটির হাত ধরিয়া ক্ষমা চাহিতে, বিচারকেরা তাহার দণ্ড কমাইয়া তিনদিন করিয়া দিল। তিনদিন পরে সে আবার সকলের সঙ্গে কথা কহিয়া খেলা করিয়া বাঁচিল।

আর একদিন ছেলেরা সব স্কুল ঘরে বসিয়া আছে। এই সময়ে একজন দুষ্ট ছেলে একজন বৃদ্ধ শিক্ষককে মুখ ভ্যাঙচাইল। শিক্ষক মহাশয় তাহার সহপাঠিদের বলিতেই তাহারা বিচার করিয়া ছেলেটির শাস্তির হুকুম দিল এই যে এখন হইতে যতদিন না তাহার চরিত্রের উন্নতি হয় ততদিন সে স্কুলের কোন কাজে বা কথায় থাকিতে পাইবে না।

সে আবার কি? স্কুলের কোন কাজে ছেলেরা আবার কবে থাকে। স্কুলের কোন কাজে, কোন কথায় কি তোমরা থাক ?—কিছুতেই না, কি বল ? কিন্তু এমন দেশ আছে যেখানে শিক্ষকের যা কিছু কাজ সব ছাত্রেরাই করিয়া থাকে। আইন গড়ে—ছাত্রেরা; বিচার করে—ছাত্রেরা। রুটিন তৈয়ারী করে—ছাত্রেরা। সভা করে—ছাত্রেরা। শিক্ষকেরা শুধু শিক্ষা দেন, আর সব কাজে প্রয়োজন মত নিজেদের মতামত প্রকাশ করিয়া ছাত্রদের সহায্য করেন।

সেই দেশে ইহাকে কি বলে জানি ? বলে স্কুল রাজ্য—

এই দেশে স্কুলের অনেক কাজ ছেলে মেয়েরাই করিয়া থাকে। দেশনায়কদের বিশ্বাস শিশুকাল হইতে এই শিক্ষা না পাইলে তাহারা স্বদেশ ও সমাজ শাসন করিতে পারিবে না। স্কুলে সাহিত্য ইতিহাস—পাঠের সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদের জন্মভূমির প্রতি সম্মান, কর্ত্তব্য শিক্ষা পাইয়া থাকে। প্রত্যেক শিশু অন্তরে তাহাদের জন্মভূমিকে মায়ের মত শ্রদ্ধা করে—এ শিক্ষা যাহার সম্পূর্ণ না হয় লোকে তাহাকে অত্যন্ত অবজ্ঞা ও ঘৃণার চোখে দেখিয়া থাকে। আরো অশ্চর্য্য এই যে এ দেশের ছেলে মেয়েরা অবজ্ঞা বা ঘৃণা সহ্য করিতে পারে না। কাজেই স্বদেশ প্রীতি, স্বজাতি মমতা সে দেশের ছোট ছোট বুকগুলিতে ভরিয়া থাকে!

কোথায় কোন সোনার দেশে তাহাদের জন্ম। কোন দেব রাজ্যে তাহাদের বসতি ? সে হইল জাপান দেশ। ভারতের উত্তর দিকে চীনেদের বিশাল সাম্রাজ্য—তাহারই পূর্ব্বদিকে যে একটি ছোট দ্বীপ আছে—সেই দ্বীপটির নামই জাপান। ঐ যে ছেলেদের কথা বলিলাম, ওরা জাপান দেশেরই ছেলে। আর ঐ যে শিক্ষলয়ের কথা বলিলাম, সে শিক্ষালয়ও জাপানদেশের রূপকথার ঘুমন্ত রাজকুমারীর মতই সে কত যুগ যুগান্তর ধরিয়া ঘুমাইয়াছে, তাহার পর একদিন সোনার কাঠির পরশে তাহার সে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে সোনার কাটি আনিয়াছিল রুষেরা। অত বড় বিশাল সাম্রাজ্য ঐ রুষেদের কোথায় এক কোণে একটা নগণ্য ঘুমন্ত রাজ্য কত যুগ ধরিয়া পড়িয়া আছে। ইহা কি তাহাদের সহ্য হয় ? রুষের বীরপুঙ্গবেরা তাই চলিল তাহাদের বিরাটবাহিনী লইয়া ক্ষুদ্র জাপনকে দলিয়া পিশিয়া মারিয়া ফেলিতে।

সে সংবাদ যখন জাপান শুনিল তখন তাহার তন্দ্রার ঘোর কাটিয়া গিয়াছে, বিস্ময়ে চোখ মেলিয়া চাহিয়া দেখে শিয়রে শত্রু সোনার কাটি লইয়া দাঁড়াইয়া। নিদ্রাতুর জাপান তখন জাগিয়াছে—তাহার মধ্যে আর সে অলসতা নাই, সে জড়তা নাই। দেশের লোকের এই ঘোর বিপদে জাপানের ছেলে, বুড়ো, মেয়ে সব সাড়া দিল। তাহার পর, মরণের আগে শেষ চেষ্টা করিয়া দেখার মতই, তাহারা একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিল যদি অসম্ভবকে সম্ভব করা যায়। রুষের বিপুল বাহিনী তখন জাপানের দ্বারে জয় নাদ করিতেছে—বুঝিবা তাহাদের মিলিত নিশ্বাসে ফুতকারেই জাপানকে উড়াইয়া দেয়। জাপান সে ডাকের সাড়া দিল। সে এক অদ্ভুত যুদ্ধ—হাতি মশার লড়াইর মত। কিন্তু জাপান তখন ক্ষেপিয়া গিয়াছে, যে করিয়া হউক নিজেদের দেশকে রক্ষা করিতে হইবে। মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়াও দলে দলে লোক জীবন বিসর্জ্জনের জন্য প্রস্তুত হইল। অর্থের অনটন পড়িলে জাপানী মেয়েরা নিজদের গাত্রাভরণ খুলিয়া দিয়াছে, দেশের ও দশের কল্যাণের জন্য ঐশ্বর্য্যের শেষ কণাটি পর্য্যন্ত তাহারা যুদ্ধের জন্য দান করিয়াছে। কিন্তু তাহাতেও যখন কুলাইল না তখন জাপানী মেয়েরা যাহা করিয়াছে তাহা সত্যই অদ্ভুত। জাপানী মেয়েরা তাহাদের বড় সাধের লম্বা বেণী কাটিয়া বিক্রয় করিয়াছে—যুদ্ধের খোরাকের জন্য। শেষে জাপানী নিষ্ঠা, ভক্তি ও সাধনার

জয় হইল। রুষের বিপুল বাহিনী পরাজিত হইল ক্ষুদ্র মুষ্টিমেয় স্বদেশ প্রেমিক জাপানী সৈন্যের নিকট।

জাপানের এই বিজয় বার্ত্তা শুনিয়া সারা পৃথিবীর লোক স্তম্ভিত হইল। সভ্য রুষ—অর্দ্ধ এসিয়া ও অর্দ্ধ ইউরোপের মালিক তাহারা। সভ্যতার একমাত্র মালিক ইউরোপের জন সাধারণ-এই ছিল তখনকার লোকের ধারণা। এসিয়া বন্য পশুদের মতই অসভ্য,এবং এইরূপই চিরটা কাল থাকিবে এই ছিল তাহাদের আশা। কিন্তু সহসা তাহাদের সে সুখ স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। একদিন প্রাতে পৃথিবী শুনিল অসম্ভব সম্ভব হইয়াছে—অসভ্য মুষ্টিমেয় জাপান সভ্য রুষবাহিনীকে পরাজিত করিয়াছে।



জাপানী মেয়ে তাহাদের বড় সাধের লম্বা বেণী কাটিয়া দিতেছে।

তাহার পর এসিয়ায় এক নূতন যুগ আসিল,—সে যুগের প্রবর্ত্তক জাপান। এসিয়ায় লোক দেখিল তাহারাও হীন নহে—হেয় নহে। তাহাদের সবই ছিল, ছিল না শুধু আত্ম-বিশ্বাস, ছিল না শুধু স্বদেশ প্রেম। তাই নূতন এসিয়ার জাপানকে শিক্ষাগুরু করিয়া এক নূতন যুগের পানে চলিল। এই নূতন যুগের ধ্বনি এসিয়া প্রত্যেক নর-নারীর চিত্তে আজিও ধ্বনিত হইতেছে।

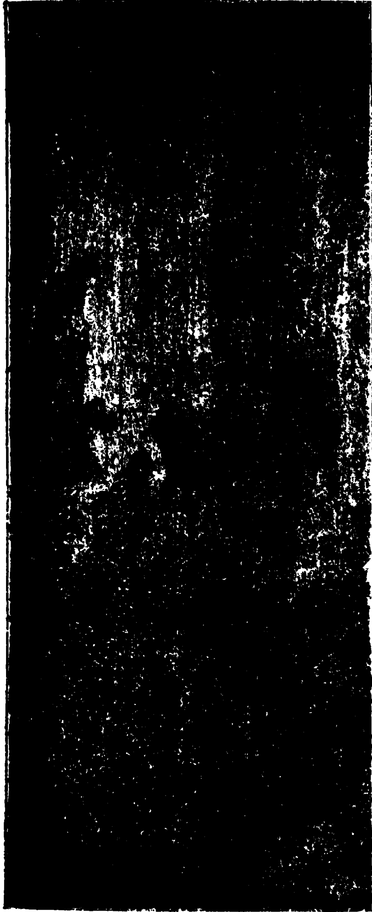
এই নবিন এসিয়ার শিক্ষাগুরু নব্য জাপান। এই নব্য জাপান আর সে ঘুমন্ত জাপান নয়। নব্য জাপান ইউরোপের সভ্যতাকে অনুকরণ করিয়াছে বটে, কিন্তু তাহাদের নিজেদের

স্বাতন্ত্র্য ভুলে নাই। এসিয়ার নরনারী এই পূর্ব্ব ও পশ্চিমের অপূর্ব্ব মিলনকে তাই বরণ করিয়া লইয়াছে।

পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে এই নবীন জাপানের সৃষ্টি হইয়াছে। সৃষ্টি হইয়াছে বলিলাম বলিয়া তোমরা যেন ভুল বুঝিও না যে আগে জাপান দেশটা ছিলই না। জাপান ছিল, কিন্তু আজ যে জাপান সে জাপান পঞ্চাশ বছর আগে ছিল না। আগেকার জাপান খাইত, খেলিত, ঘুমাইত— এই ছিল জাপানের জীবন। এখন জাপানের নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে। জাপান জাগিয়াছে। জাপান কত শত বছরের অকাতর নিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠিয়া পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যেই বিশ্বজগৎকে বিস্মিত স্তম্ভিত করিয়া দিল। যেদিন জাপান জাগিল, সেদিন জাপানের সৌধশিখরে, পর্ব্বতচূড়ে নূতন আলোকরশ্মি পড়িয়া দেশবাসীকে মুগ্ধ করিয়া দিয়াছিল সেই দিন জাপান প্রতিজ্ঞা করিল—আর ঘুমাইবে না। নর-নারী কার্য্যে বাহির হইয়া পড়িল; কাননে, কান্তারে, প্রান্তরে বহুকাল পরে জমিতে লাঙ্গল পড়িল, বীজ রোপিত হইল; ঘরে ঘরে চরকা বসিল; জাপান্ জাগিল। তখন পৃথিবীর অন্য কোন অংশের সহিত জাপানের কোন যোগ ছিল না। জাপান দেখিল, তাহাদের তৈরী জিনিষপত্র এত প্রচুর হইয়াছে যে দেশে আর স্থান নাই—দেশ-বিদেশে জাপান এক পয়সার চুষিকাঠি হইতে মহামূল্য পশম দ্রব্যাদি চালান দিতে লাগিল। জাপানের পুতুলগুলি তোমার কেমন লাগে? বিলাত মার্কিন প্রভৃতি দেশের ছেলেমেয়েরা জাপানী পুতুল না পাইলে কান্নাকাটি জুড়িয়া দেয়। দেশে দেশে ঘরে ঘরে জাপান নিজের সামগ্রী ছড়াইয়া দিল; শুধু যে ছড়াইয়া দিল তা নয়,— এমন করিয়া সেগুলি পাঠাইল যে সে দেশের লোক আর কখনই সে জিনিষ ত্যাগ করিতে পারিল না। ফলে জাপান প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করিতে লাগিল।

এই সময়েই মার্কপোলো লিখিয়াছেন—জাপান দ্বীপে নূতন সূর্য্য উঠিয়াছে, জাপানে নূতন জীবনের সূচনা দেখা দিয়াছে। জাপান কাহারো পিছনে থাকিবে না—জাপান বিশ্বমধ্যে নিজের আসন অতি দৃঢ় করিয়া তুলিতেছে। জাপান পরমুখাপেক্ষী নয়, জাপান দ্বীপে সোনা ফলিতেছে।

মার্কপোলো সত্য কথা লিখিয়াছিলেন, জাপান কাহারো মুখাপেক্ষী নয়। জাপান যে এত শীঘ্র এত উন্নতি করিয়াছে ইহাই তাহার শ্রেষ্ঠ কারণ। জাপান এক পয়সার দিয়াশলাই বাক্সের জন্য অন্য দেশের মুখের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকে না; জাপান বিলাসিতার সামগ্রীর জন্যও কাহারো অপেক্ষা রাখে না।


যেখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অতুলনীয়।

কিন্তু কথা এই যে ছোট বড় জাপানীরা এই শিক্ষা কোথা হইতে পায়? জাপানের ছেলে মেয়েরা স্কুলে ত লেখা পড়া শিখেই। তাহা ছাড়া স্কুলের ছুটির দিনে এখানে ওখানে গিয়া চড়ুই ভাতি করিয়া আসে। জাপানের ছেলেমেয়েদের পিতামাতা বা শিক্ষকগণ ছুটির দিনে তাহাদের এমন সব স্থানে লইয়া যান যেখানে গেলে শুধু যে তাহারা আমোদ পায় তাহাই নহে, এমন স্থানে লইয়া যান—যেখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অতুলনীয়। যেখানে গেলে তাহাদের দেশপ্রীতি জাগিয়া উঠে। জাপান দ্বীপটিই অতি সুন্দর। তাহার মাঝে যে নদ-নদী গিরি উপত্যকা আছে সেগুলি আরো সুন্দর। জাপানে চিরবসন্ত বিরাজিত। সেই রকমের কোন এক সুন্দর রমনীয় দৃশ্যময় স্থানে লইয়া গিয়া শিক্ষক বা পিতামাতা বলেন—তোমরা কত বই পড়িয়াছ, কত ছবি দেখিয়াছ কিন্তু এমন সৌন্দর্য্য কি কোথাও দেখিয়াছ? কি অপরূপ সৌন্দর্য্য! গাছের পাতায়, নদীর বুকে, পর্ব্বতের গায়ে, আকাশে সে কি রঙের শোভা!

ছেলেদের চোখের সামনে যেন নিদ্রার পরীরাজ্য নামিয়া আসিয়াছে; যেন তাহারা সত্য সত্যই স্বপ্ন রাজ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কিন্তু সে স্বপ্ন নয়—তাহাদের পিতামাতা সেই অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যময় দৃশ্যের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ভক্তিগদগদকণ্ঠে বলিতে থাকেন—এ স্বপ্ন নয়, এ তোমাদের দেশ। এ গল্পও নয়, ছবিও নয়—এই তোমাদের জন্মভূমি! এই জাপান!

অতি শিশুকালে জাপানের ছেলেমেয়েরা যে শিক্ষা পাইল আর কি তাহারা জীবনে কোনদিনই ভুলিবে? সেই সুন্দর মহিমাময় দৃশ্যের সম্মুখে দাঁড়াইয়া গুরুর কথার সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদের কচি কচি বুকগুলিতে ধ্বনিত হইতে লাগিল,—এই দেশ, এই জন্মভূমি! তাহাদের মাথা গুলি তখনই নত হইয়া পড়িল। জাপান আর কাহারো কাছে মাথা নামায় না—কিন্তু যেখানে তাহাদের ধনধান্যে পুষ্পে ভরা সুজলা সুফলা জন্মভূমির ছায়াটিও দেখিতে পায়—জাপানবাসী নগ্নপদে ভক্তিভরে সেখানে লুটাইয়া পড়ে।

এই দেশভক্তি লইয়াই জাপান্ বড় বড় দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়ী হইয়াছিল। রাশিয়ার তুলনায় জাপান ত এতটুকু স্থান! কিন্তু যুদ্ধে জাপান জয়লাভ করিয়া তাহাদের মাতৃভূমিকে পরপদানত হইতে দেয় নাই। জাপানের প্রত্যেক শিশুকে এই শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে যে তোমার সর্ব্বপেক্ষা বিপদ সেইদিন যেদিন তোমার জন্মভূমি বিপন্ন—আর সেইদিন তোমার সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবের দিন যেদিন তুমি মাতৃভূমির মঙ্গলের জন্য মরিতে পারিবে।

জাপানীরা অত্যন্ত ধর্ম্মবিশ্বাসী। তাহারা দেশকে পূজা করে, দেবতাকেও পূজা করে। আমাদের বুদ্ধদেবই জাপানের গৃহ দেবতা। তোমাদের মধ্যে যদি কেহ বড় হইয়া জাপানে যাও দেখিবে সেথায় ঘাটে, হাটে, পথে, মাঠে, সর্ব্বত্রই বুদ্ধমূর্ত্তি। তোমাদের মধ্যে অনেকে বারাণসীতে শিবলিঙ্গ দেখিয়াছ। এখানেও অগণিত বুদ্ধমূর্ত্তি আছে—পাঁচ সাত দিন অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াও গণিয়া শেষ করা যায় না। এক একটির আকারও অসাধারণ। কামাকুরায় একটি বুদ্ধমূর্ত্তি আছে—সে'টি ৫০ ফিট উচ্চ আর ১০০ ফিট চওড়া।

জাপানবাসীরা অধিকাংশই নিরামিশাসী। জাপানীরা খুব রংচঙে অথচ অল্প দামের কাপড় পরিয়া থাকিতে খুব ভালো বাসে। তাহাদের ধারণা সাদা কাপড়ের চেয়ে রঙীন

কাপড়ে মনটা না-কি বেশ রঙীনই থাকে। জাপানীরা অলস নয়, বরং ভয়ানক কর্ম্মপ্রিয়, একটি মুহূর্ত্তও তাহারা অপব্যয় করিতে জানে না। তাহারা সময়ের যদি অপব্যয় করিত, পঞ্চাশ কেন পাঁচহাজার বছরেও জাপান এতটা উন্নতি করিতে পারিত না।

জাপান দেশে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের একটা বড় অদ্ভুত সংমিশ্রন দেখা যায়। জাপান পাশ্চাত্য শিক্ষাকে বরণ করিয়া লইয়াছে সত্য। পাশ্চাত্য জগতের যাহা কিছু ভাল তাহা লইতে নব্য জাপান কোন দিনই দ্বিধা বোধ করে নাই। কিন্তু তাই বলিয়া জাপান পাশ্চাত্য সভ্যতাকে অন্ধভাবে অনুকরণ করে নাই, নিজেদের বিশেষত্ব হারায় নাই। জাপানে কল কারখানার অভাব নাই—এ বিষয়ে তাহাদের শিক্ষালয় পশ্চিম দেশ। কিন্তু তাই বলিয়া অন্ধ ভাবে তাহারা নিজেদের গৃহ শিল্পেরও উচ্ছেদ করে নাই। একটা উদাহরণ দিই।—তোমরা অনেকে রঙ-বেরঙের জাপানী বাক্স দেখিয়াছ—কত সুন্দর, অথচ কত সস্তা। ও সবেতেই জাপানী মেয়েরা তুলী ধরিয়া রঙ ফলাইয়াছে—সবই হাতের কাজ। পাশ্চাত্য জগত চির-কালই বলিয়া আসিতেছে ওরূপ জিনিস কলে তৈরী করিলে অনেক সস্তায় দেওয়া যায়। কিন্তু ফলে দেখা যায় কার্য্যতঃ তাহারা জাপানী গৃহ-শিল্পীদের নিকট হটিয়া গিয়াছে।

এর মূলে কিন্তু জাপানের অদম্য অধ্যবসায়। অবসর মুহূর্ত্তটুকু গল্প গুজবে না কাটা-ইয়া জাপানের ছেলে মেয়ে



জাপানের ছেলে মেয়ে বুড়ো এইরূপেই শিল্পের উন্নতি করিয়া হৃদয়ে অতুল আনন্দ পায়।

বুড়ো এইরূপেই শিল্পের উন্নতি করিয়া হৃদয়ে অতুল আনন্দ পায়, ও সঙ্গে সঙ্গে দেশের ধনভাণ্ডার বৃদ্ধি করিতে সাহায্য করে। স্বাধীন ভাবে অবসর মুহূর্ত্তে কার্য্য করিয়া তাহারা সামান্য যাহা কিছু পায় তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকে।

আজ জগত জাপানের কাছে এই শিক্ষা পাইয়াছে গৃহ-শিল্পও অবহেলার বিষয় নহে; গৃহ-শিল্পও পাশ্চাত্য জগতের কলকারখানার নিকট সমান ভাবে মাথা উচু করিয়া দাঁড়াইতে পারে—একটা জাতি কর্ম্মী ও উদ্যমশীল হইলে কল কারখানার মিথ্যা আড়ম্বড় না করিয়াও উন্নতির পথে শনৈঃ অগ্রসর হইতে পারে।

কত জিনিসে জাপান তাহাদের স্বাতন্ত্র্য এখনও বজায় রাখিয়াছে। একটি দৃশ্য এই বিংশতি শতাব্দীতে বড়ই সুন্দর দেখায়। এই মটর ইলেক্‌ট্রিক ষ্টিম গাড়ীর যুগে তোমরা যখন রাস্তায় মানুষে টানা গাড়ী রিক্‌স দেখ তখন তোমাদের নিকট তাহা হয়ত খুবই অদ্ভুত ঠেকে। আজ বিংশতি শতাব্দীতে এই সকল দ্রুতগামী যানের নিকট এ কি পরিহাস! কিন্তু এ পরিহাস নহে, এই বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের যুগে জাপানী ছেলে মেয়ে বুড়ো মটরগাড়ী না চড়িয়া রিকস্‌ চড়িয়া বেড়ায়। এইখানেই জাপানের বিশেষত্ব। পাশ্চাত্য আড়ম্বরে প্রাচ্যের সে স্থির ধীর ভাব সে শিক্ষা দীক্ষা জাপান এখনও বিস্মিত হয় নাই। কার্য্যকোলাহলময় জাপানের মধ্যে তাই ঐ রিক্‌স স্থান পাইয়াছে।

তোমরা ভুলিয়া যাইও না জাপান প্রাচ্য প্রতীচ্যের সংমিশ্রনে নিজেদের গড়িয়া তুলিয়াছে। জাপান শিক্ষার, কার্য্য করিবার এক নূতন আদর্শ জগতের সম্মুখে ধরিয়াছে—সে শিক্ষা পাইয়া, সেইরূপ কার্য্য করিয়া জাপান আজ এত বড় হইয়াছে—এ বিষয়ে জাপান এসিয়ার শিক্ষাগুরু। ইহাতে আমাদের এই শেখা উচিত প্রাচ্য কিংবা পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ না করিয়া, নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া আমাদের সকলকেই আজ জাপানের মত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে হইবে।

পুতুলের বিয়ে

খোকা আজ ব্যস্ত ভারি
পুতুলের তার বিয়ে
খোকন হ'ল বরের বাপ,
দিদির তার মেয়ে।

বাড়ী শুদ্ধ নেমন্তন্ন
যাবে ববযাত্রী
দিদির বন্ধু আসবে সব
বীণাপাণির ছাত্রী।

ছোট খোকা নিতবর
নাপিত হ'ল হাজারা
কিন্‌তে গেছে রাম-চাকর
লুচী ভাজা ঝাঁঝ্‌রা।

মা'র কাছে পেলে চেলী
বাবার কাছে নোট্‌,
ঠাকুমা দেবে ঘি-ময়দা
জ্যেঠী আংটি গোট।

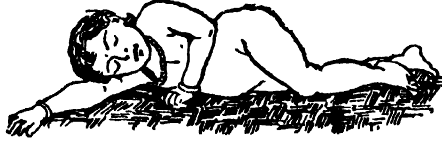
বড়দা' দেছে দু'দিন ছুটি
পড়তে নাহি হ'বে ;
(আহা) কি আনন্দ খোকার আজ
হ'বে ছেলের বে।

সারা দুপুর ছাদের' পরে
পেতে হাঁড়ী কলসী
কত রান্না রেঁধেছে খোকা,
ছিঁড়ে পাতা-তুলশী।

সন্ধ্যেবেলা বিয়ের লগন,
নিয়ে যাবে বর ;
বর যাবে পাল্কী চড়ে'—
হেঁটে অনুচর।

দিদি আছে সাজিয়ে ক'নে
সন্ধ্যে যখন হ'ল ;
"বর আসে না কেন এখন"—
সাড়া পড়ে গেল।

পুষ্পরাণী এসে দেখে,
আন্‌তে গিয়ে বর,
বরের বাপ খাটে ঘুমায়,
নীরব নিথর।



শ্রীমতী মায়াময়ী মজুমদার।

ছোবড়া

এক চোর কতকগুলো নারকেল চুরি করে পালাচ্ছিল। এখন রাস্তা দিয়ে সেই সময়ে এক পথিক নিজের মনে হাসতে হাসতে যাচ্ছিল। চোর কিন্তু তাকে দেখে ভাবলে, "তাই ত, এই লোকটা বোধ হয় বুঝতে পেরেছে, তাই হাসছে।" সে হেঁকে পথিককে শুধাল, "এই বুঝেছিস ?"

পথিক কিছুমাত্র ইতস্তত না কোরে বল্‌ল, "হুঃ।"

চোর জিজ্ঞেস করল, "কি বলদিকি নি ?"

পথিক ত আর বাস্তবিকই কিছু বোঝে নি, তাই সে হাসিমুখেই উত্তর দিল, "ছোবড়া।" অর্থাৎ কিছু না।

চোর কিন্তু ভাবলে, "তবেই ত হয়েছে। এ সবই বুঝতে পেরেছে। এত লোকের সামনে স্পষ্ট কোরে নারকেল না বলে, সাঁটে বল্‌লে, 'ছোবড়া'।" সে তাড়াতাড়ি পথিককে বল্‌ল, "এই দেখ, বলিস নি। তোর আদ্ধেক, আমার আদ্ধেক।"

শ্রীধানি লঙ্কা।

ব্রত কথা

শীতল ষষ্ঠী

(ষাট ছেলে)

এক দেশে এক সওদাগর ছিলেন—তাঁর কিছুরই অভাব ছিল না। সিন্দুক ভরা টাকা ছিল—গোয়াল ভরা গরু ছিল—অশ্বশালে ঘোড়া ছিল—হাতিশালে হাতী ছিল—মানুষে যা যা চায় সওদাগরের সবই ছিল। মনের মত স্ত্রী ছিল—ঘর আলো করা ছেলে ছিল। সওদাগরের সুখের আর শেষ ছিল না। এই ভাবে মহা সুখে সওদাগরের দিন যায়। রূপবান ছেলে গুণবান হয়ে দিন দিন বড় হয়ে উঠলো। সওদাগরের স্ত্রী সওদাগরকে বল্লেন,—"ওগো ছেলে বড় হ'লো—এইবার ছেলের বিয়ে দিয়ে একটী ঘর আলো বউ নিয়ে এস।"

স্ত্রীর কথায় সওদাগরের চৈতন্য হ'লো—তাইতো ছেলে উপযুক্ত হয়েছে এইবার বিয়ে দিয়ে একটী চাঁদের মতন বউ ঘরে আন্‌তে হবে। চারদিকে বউয়ের খোঁজ খোঁজ পড়ে গেল। অনেক খুঁজাখুজির পর সওদাগর মহা ধূমধাম করে ছেলের বিয়ে দিয়ে একটী ঘর আলো করা বউ ঘরে আন্‌লেন। সেই বৌ আনবার সঙ্গে সঙ্গে সওদাগরের সুখ যেন উত্‌লে উঠ্‌তে লাগলো। এইবার একটী টুক্‌টুকে নাতি পাবার আশায় সওদাগর আর স্ত্রী দিন গুণ্‌তে লাগ্‌লেন। বছরের পর বছর চলে গেল, সওদাগরের বউএর তবু কিন্তু ছেলেপিলে হ'লো না। বউএর ছেলেপিলে না হওয়ায় সওদাগরের স্ত্রীর দিনে রাতে মনের সুখ ঘুচে গেল। ছেলের বিয়ে দিয়ে যদি নাতিই না হ'লো তা হ'লে আর হ'লো কি? সওদাগরও ভেবে আকুল—শেষ বংশটা থাক্‌বে না সেও কি একটা কথা। স্বামী স্ত্রীতে দিন রাত শুধু এই কথা ভাবেন আর দুঃখ করেন। সওদাগরের স্ত্রী দিন রাতই বলেন,—"হে মা ষষ্ঠী, আমার বউএর একটা ব্যাটা দাও।"

সওদাগরের স্ত্রী একটী ষষ্ঠী পুজো বাদ দেন না—কায়মনে কেবল ষষ্ঠীরই পূজো করেন। সওদাগরের স্ত্রীর ভক্তি দেখে ষষ্ঠীদেবী আর স্থির হয়ে থাক্‌তে পাল্লেন না। তাঁর কৃপায় অনেক দিনের পর সওদাগরের ব্যাটার বউ পোয়াতী হ'লো। এক মাস যায় দু মাস যায় এমনি করে দশ মাস গেল—এগার মাসও যায় তবু আর ব্যাটার বউএর ছেলে হয় না। সওদাগর আর তার স্ত্রী আবার ভেবে অস্থির হয়েন। এগার মাস হয়ে গেল এখন বউএর ব্যাটা হয় না কেন? ষষ্ঠীদেবী এ কি কল্লেন? সওদাগরের স্ত্রী আবার দিন রাত ষষ্ঠীর কাছে মাথা খুঁড়্‌তে লাগ্‌লেন। সেই সময় একদিন হঠাৎ ঘাট থেকে নাম্‌তে গিয়ে পায়ে কাপড় আট্‌কে বউ মেঝের ওপর উল্‌টে পড়্‌লেন। সেই পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বউ একটী থলের মত কি একটা প্রসব কল্লেন। সওদাগরের স্ত্রী তাই দেখে তো একেবারে কেঁদে সারা—এত কষ্টে বউ প্রসব কল্লে তাও আবার একটা থলে। সওদাগরের স্ত্রী কাঠি দিয়ে সেই থলেটা যেই নেড়ে দেখ্‌তে যাবেন অমনি থলেটা ফেটে একেবারে পিল পিল করে কতকগুলো ছেলে বেরিয়ে পড়্‌লো। সওদাগরের স্ত্রী গুণে দেখলেন ষাট্‌টী। এখন আর তাঁর আনন্দ ধরে না। তিনি ছুটে গিয়ে সওদাগরকে খবর দিলেন—সওদাগর নাতি দেখতে ছুটে এলেন—চারদিকে ধূম পড়ে গেল। একমাস পরে সওদাগরের স্ত্রী মহা ধূমধাম করে ষষ্ঠী পূজা কল্লেন। নাতী গুলিকে নিয়ে তিনি মহা আনন্দে দিন কাটাতে লাগ্‌লেন। এদিকে ষাটটী নাতি হয়েছে, সওদাগরের ষাটটি নাতির জন্যে ষাটটী ঘর তৈরী করলেন। এত গুলি নাতি, তার বিয়ে থা দিতে হবে—এইটুকু বাড়ীতে কি চলে! কাজেই ষাটটী নাতির উপযুক্তই সওদাগরের ঘর ও বাড়ী হ'লো। সওদাগরের বাড়ী দেখে দেশের লোক একেবারে ধন্যি ধন্যি করে উঠলো।

ষাট নাতি বড় হয়ে উঠলো। সওদাগর তাদের বিয়ে দেওয়ার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। কিন্তু সওদাগরের বউ শাশুড়ীর কাছে আবদার করে বল্‌লো,—এমন ঘরে আমি আমার ছেলেদের বিয়ে দিতে চাই, যার আমার মত ষাটটী মেয়ে—তা না হ'লে আমি আমার ছেলেদের মোটেই বিয়ে দেব না।"

শাশুড়ী বৌকে অনেক করে বোঝালেন কিন্তু বৌ যা জেদ্ ধরেছে তাতে সে অটল হয়ে রইল। সওদাগরের স্ত্রী তখন কি করেন—তাঁর একটী বৌ, তার আব্দারই বা ফেলেন কি করে—কাজেই স্বামীকে গিয়ে সব কথা বল্লেন। সওদাগর তো স্ত্রীর মুখে সব কথা শুনে একেবারে মাথায় হাত দিয়ে বস্‌লেন। বৌএর ইচ্ছা মত মেয়ে কোথায় পাওয়া যায়। যাহক্ বৌ যখন ধরেছে তখন তার তো একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। সওদাগর সাত ডিঙ্গি ধন বোঝাই করে নাতিদের জন্যে ক'নে খুজ্‌তে বের হ'লেন। এ দেশ যান—সে দেশ যান কোথাও আর ক'নের সন্ধান পাওয়া যায় না। এমনি করে দেশের পর দেশ তিনি ক'নে সন্ধান করে বেড়াতে লাগলেন। এ ভাবে নদী বেয়ে যেতে যেতে সওদাগর একদিন সকাল বেলা দেখেন—নদীর এক ঘাটে চাঁদের মত এক রাশ মেয়ে চান কচ্ছে—তারা সকলেই এক বয়সী—তাদের দেখ্‌তে সকলকেই এক রকম। সওদাগর তখনি সেই ঘাটে ডিঙ্গি বাঁধ্‌লেন। এক এক করে গুণে দেখ্‌লেন—আশ্চর্য্য, ঠিক ষাটটী মেয়ে। সওদাগর অমনি মেয়েগুলি কার সন্ধান নেবার জন্যে ঘাটে উঠ্‌লেন—ঘাটে উঠেই দেখেন একটী বৌ বিড় বিড় করে কি বক্‌তে বক্‌তে ঘাটের দিকে আস্‌ছেন। সওদাগর সেই বৌটীকে জিজ্ঞাসা কল্লেন, "বল্‌তে পারো বাছা এই মেয়েগুলি কার?" বৌটা এক হাত ঘোমটা টেনে—লজ্জায় এতটুকু হয়ে বল্লে,—"কার আর এমন পোড়া বরাত হবে—যে একেবারে ষাটটী মেয়ে হবে। আমার পোড়া বরাৎ তাই ভগবান আমাকে ষাটটী মেয়ে দিয়েছেন। এদের যে কেমন করে বিয়ে দেব তাই ভেবেই সারা হচ্ছি।"

সওদাগর তখন নিজের পরিচয় দিয়ে—নাতিদের কথা বলে সেই মেয়ে ক'টীর সঙ্গে তাদের বিয়ে দেবার জন্যে—সেই বৌকে জেদাজেদী কর্ত্তে লাগলেন। যার মেয়ে সেই বৌ সওদাগরের কথায় হাতে স্বর্গ পেলে। সেই দিনই বিয়ের সব বন্দোবস্ত হয়ে গেল। খুব ধুমধামে ঘটা করে সওদাগর তার নাতিদের বিয়ে দিয়ে ষাটটী নাত বৌ ঘরে নিয়ে গেলেন। সওদাগরের স্ত্রীর আর আনন্দ ধরে না—তিনি তার বৌকে বল্লেন,—"বৌ, ষষ্ঠীদেবী তোমার মুখ রেখেছেন—ধুমধাম করে তাঁর পুজো দাও।"

খুব ধূমধাম করে ষষ্টীর পূজো হ'লো। সওদাগর বৌ ব্যাটা নাতি নাত্‌বৌদের নিয়ে সুখে সচ্ছন্দে ঘরকন্না কর্ত্তে লাগলেন। এই ভাবে দিন যায়—সেটা মাঘমাস শীতটা কিছু জাঁকিয়ে পড়েচে—তার ওপর হ'লো সেদিন "শীতল ষষ্টী"। সওদাগরের বৌরা শীতল ষষ্টীর আয়োজন কচ্ছে। সেই সময় তাদের শাশুড়ী তাদের ডেকে বল্লে,—"বৌ, আজকে আমার বড় ইচ্ছে হচ্ছে গরম জলে স্নান করে গরম মাছের ঝোল দিয়ে গরম ভাত খাই। পার যদি আমাকে তাই রেঁধে খাওয়াও।"

বৌরা বল্লে, "তার আর ভাবনা কি—তোমার ষাট বৌ তোমার আবার তার জন্যে ভাবনা? এখনি আমরা তোমার সব যোগাড় করে দিচ্ছি।"

বৌরা সব যোগাড় যন্ত্র করে শাশুড়ীকে খেতে দিলে। সওদাগরের বৌ গরম জলে স্নান করে গরম মাছের ঝোল দিয়ে ভাত খেয়ে পান চিবুতে লাগ্‌লো। আর সবাই সেদিন শীতল ষষ্টী দই পান্তা গোটা সিদ্ধ খেয়ে শীতল ষষ্টী কল্লে। দিনটা তো এক রকম কেটে গেল। রাত্রে বৌরা যে যার ঘরে গিয়ে শুল। সওদাগরের বৌও ঘরে গিয়ে দোর দিয়ে শুল কিন্তু তার পর দিন ভোরে উঠে দেখে যে—বাড়ী শুদ্ধ সব মরে আছে। শাশুড়ী মরেছে—শশুর মরেছে—স্বামী মরেছে—ষাট্ ছেলে মরেছে—ষাট বৌ মরেছে—গোয়ালে গরু মরেছে ঘোড়াশালে ঘোড়া মরেছে, হাতীশালে হাতী মরেছে, কোথায়ও আর কেউ বেঁচে নেই। সওদাগরের বৌ এই না দেখে একেবারে ডুক্‌রে কেঁদে উঠ্‌লেন। তাঁর কান্না শুনে পাড়া প্রতিবেশীরা ছুটে এলো। ব্যাপার দেখে সকলের একেবারে আক্কেল গুড়ুম—সবাই সবাইকে জিজ্ঞাসা কর্ত্তে লাগ্‌লো এমন ধারা কেমন করে হ'লো। সেই সময় ষষ্টীদেবী লজ্জা বুড়ীর বেশ ধরে সেইখানে এসে উপস্থিত হলেন। গোদের ভারে বুড়ি চল্‌তেই পারে না—লাটিতে ভর দিয়ে কোন ক্রমে এসে সওদাগরের বৌএর সম্মুখে এসে দাঁড়াল। বুড়ি সওদাগরের বৌয়ের দিকে রক্ত চোখে চেয়ে দাঁত কিড়িমিড়ি করে বল্লে,—

কালকে গেছে শেতল ষষ্টী খেলি গরম ভাতের কাঁড়ী
তাইতে তোর সাত গোষ্টী গেছে যমের বাড়ী॥

বুড়ীর এই কথা শুনে সওদাগরের বউ মনে মনে ভাবলেন—আমি যে কাল গরম ভাত খেয়েছি এ বুড়ী কেমন করে জানলে—এ নিশ্চয়ই ষষ্ঠী দেবী। তখন সওদাগরের বউ বুড়ীর পা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বল্লে,—"মা আমি তোমায় চিনিছি—তুমিই ষষ্ঠীদেবী। আমার সকল দোষ ক্ষমা কর—আমি আর তখন শীতল ষষ্ঠীর দিন গরম ভাত খাব না।"



সওদাগরের বউ অনবরত সেই বুড়ীর পায়ে মাথা খুঁড়তে লাগল।

সওদাগরের বউ অনবরত সেই বুড়ীর পায়ে মাথা খুড়তে লাগ্‌ল—আর ভেউ ভেউ করে কাঁদতে লাগ্‌লো। হাজার হক্ দেবতার মেয়ে ষষ্ঠীদেবী—তাঁর প্রাণ টল্‌তে কতক্ষণ! সওদাগরের বউএর কান্না তাঁর প্রাণে গিয়ে লাগল। তিনি সদয় হয়ে বল্লেন,—"খবরদার আর কখন শীতল ষষ্ঠীর দিন গরম ভাত খাস্‌নি। যা আমার এই পা ধোয়া জল নিয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে দিগে—তা হ'লে আবার সবাই বেঁচে উঠ্‌বে।"

এই বলে বুড়ী অন্তর্দ্ধান হ'লেন। সওদাগরের বউ ষষ্ঠীদেবীর পা ধোয়া জল চারিদিকে ছড়িয়ে দিলে। দেখ্‌তে দেখ্‌তে ষষ্ঠীদেবীর কৃপায় আবার সমস্তই বেঁচে উঠ্‌লো। সওদাগরের বউএর যাট ছেলে যাট বউ যেমন ছিল তেমনি হ'লো। সওদাগরের বউ সারা দিন উপোস করে মহা ধূমধামে ষষ্ঠীদেবীর পূজো দিলে।

শীতল ষষ্ঠী মহা ষষ্ঠী—
দেবীর হুকুম জারি।
দই পান্তা গোটা সেদ্ধ,
খাবে সকল নারী॥
অন্যথায় বিপদ আছে,
মরে ছেলে মেয়ে।
সওদাগরের বউ হারালে,
ষাটটী ছেলে পেয়ে॥
বাসী করে সকল জিনিষ,
বাড়িও তবে হাত।
রুষ্ট হবেন ষষ্ঠী দেবী,
খেলে গরম ভাত॥

———

বুদ্ধের বৈরাগ্য

বুদ্ধ রাজার ছেলে—অতুল বৈভবের মালিক। কিন্তু সে সবে তাহার মন উঠিত না। যে ঐশ্বর্য্যে জগতের শোক তাপ নিবারণ করা যায় না সে ঐশ্বর্য্য পাইয়া লাভ কি ?

কুসুম অপেক্ষাও তাহার মন কোমল ছিল—তাই পৃথিবীর জরা, ব্যাধি, শোক, তাপ দেখিয়া তাহার মন কাঁদিয়া উঠিল। এই কি মানুষের শেষ পরিণাম ?

তাহার পর সেদিন যখন সে দেখিল সেই রুক্ষকেশ, রুগ্নদেহ, শোকতাপ জরাগ্রস্থ, বৃদ্ধের শেষ সম্বল নশ্বর দেহও চিতাকুণ্ডে পুড়িয়া ভস্মসাৎ হইয়া যাইতেছে তখন তাহার মন চঞ্চল হইয়া উঠিল—সংসারের উপর তাহার বৈরাগ্য আসিল।

চিতাকুণ্ডের শেষ অগ্নি-শিখা নিবিয়া গিয়াছে—সারথি ছন্দক ডাকিল,

"দেব, গৃহে ফিরুন"

বুদ্ধদেবের দৃষ্টি তখনও সেই মহা শ্মশানের দিকে, ছন্দকের এই আহ্বানে সে চমকিয়া উঠিল, বলিল,

ছন্দক, এই যদি জীবনের শেষ পরিণাম হয় তবে কি কাজ আর গৃহে ফিরিয়া ? ঈশ্বর কোন্ মহৎ উদ্দেশ্যে মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন আমি জানি না, তবে এ পরিণতি কখনও তাঁহার অভিপ্রেত হইতে পারে না। না ছন্দক, আমি গৃহে ফিরিব না, মানুষ উন্মাদের ন্যায় ধ্বংসের পথে চলিয়াছে—আমাকেই তাহাদের মুক্তির উপায় ভাবিতে হইবে।







রাজ টীকা।

বুড়ী—বড্ডই বুড়ী।

আহা বেচারী, শীতকালের সকালবেলায় পোষা পাঁঠাটির গলায় দড়ি বেঁধে টান্‌তে টান্‌তে হাটে যাচ্ছিল। হাট তাদের গ্রাম থেকে অনেকখানি দূর, দু তিনটে গ্রাম পার হ'য়ে তবে যেতে হয়। বুড়ী চলেছে, মাঝে মাঝে থাম্‌ছে আবার চল্‌ছে।

এক গাছের তলায় তেঁতুল কাঠের গুঁড়িতে আগুণ ধরিয়ে জ্যোতিষী ঠাকুর অনেক লোকের হাত গুণ্‌ছিলেন, কারো বা ঠিকুঝি মেলাচ্ছিলেন, হঠাৎ বুড়ীর কালো কুচ্‌কুচে পাঁঠাটির নধর শরীর দেখে ঠাকুরের হাত গোণা বন্ধ হ'য়ে গেল। তিনি লোকগুলিকে বল্‌লেন, বাপু, তোমরা এখন যাও, সময় মত বিকেলে এসো, এখন হঠাৎ আমি প্রভুর দর্শন পেয়েছি—যাও, যাও।

লোকগুলো চলে গেল, বুড়ী ঠুক্ ঠুক্ করতে করতে দেখা দিলে। পাঁঠাটি কি একটা পাতা চিবুচ্ছে, মাঝে মাঝে শিঙ দু'টি নাড়ছে, ঠাকুরমশায়ের গালের মধ্যে জিভ দু'টি ভারি ভিজে উঠ্‌ল।

ঠাকুরমশাই বুড়ীকে জিজ্ঞাসা করলেন—বুড়ী এটাকে তুই কোথায় নিয়ে যাচ্ছিস্?

বুড়ী গলায় পৈতা দেখে দণ্ডবৎ হ'য়ে বল্লে—ঠাকুরমশাই গো, হাটে যাব, তা ও মুখপোড়া ঘরে থাক্‌বে না, তাই বেঁধে নিয়ে যাচ্ছি।

ঠাকুরমশাই হাঁ হাঁ করে উঠ্‌লেন, বল্লেন—মুখপোড়া তুই কা'কে বল্‌ছিস্? জানিস্ এ কে?

বুড়ী অবাক হ'য়ে বল্লে—এক বছর রয়েছে আমার ঘরে আমি আর জানিনে ঠাকুর!—ও আমার পাঁঠা, পাঁঠা!

আরে বুড়ী! পাঁঠা বটে, কিন্তু যে-সে পাঁঠা নয়, শাপভ্রষ্ট দেবতা রে, দেবতা।

বল কি ঠাকুর?

আরে এই ত বলি!—ঠাকুরমশাই গম্ভীর ভাবে জীবটির আপদ মস্তক পরীক্ষা করতে লাগলেন। গায়ে মাছিটি বস্‌লে পিছলে যায়, আহা!

বুড়ী ঠাকুরমশাইকে ও-রকম করে' চাইতে দেখে বল্লে—হ্যাঁ বাবা ঠাকুর, তুমি ত গণ্‌তে জান, গুণে বল্‌ছ?

গুণেই ত বল্‌ছি রে! আরো গুণ্‌তে হ'বে। আমার যেন বোধ হ'চ্ছে শাপ মোচন হ'লেই পাঁঠাটি তোমার রাজা হ'বে। ওর কপালে যে সাদা টিপ্‌টি দেখ্‌ছ এ'টি হচ্ছে রাজটীকে, রাজার মাথায় থাকে।

রাজা হবে?

রাজা হ'বে। মহারাজও হ'তে পারে, না গুণে ঠিক বল্‌তে পারছি নে। এ'টিকে তুই রেখে যা, আমি গুণে দেখি। আর দেখ, বামুনকে দিয়ে গোণাচ্ছিস, দক্ষিণে কিছু দিস্।

বুড়ী আহ্লাদে আটখানা হ'য়ে তখনই রাজী হল, বল্লে, দোব বইকি বাবাঠাকুর। কি আজ্ঞা কর?

তুই ত হাটেই যাচ্ছিস্—বেশী কিছু নয়। সের খানেক ঘি, আর সের দুই আলু, আর এক খুলি দই—এ তোর বেশী পড়বে না, ভয় নেই'। আর তোর পাঁঠা যখন রাজাই হ'বে, তোর ভাবনা কি?

তাই আনছি বাবাঠাকুর। তুমি ভাল করে গুণে রাখ।—বলে বুড়ী হাটে গেল।

ঠাকুরমশাই গুণে এক কোপে পাঁঠার শাপ মোচন করে দিলেন। বুড়ী ফেরবার আগেই আবার গাছতলাতে এসে বসে মাটিতে আঁকড় কাটতে লাগলেন।

বুড়ী ঘি, আলু ও দধির হাঁড়ী নামিয়ে বল্লে—কি দেখ্‌লে বাবা?

ঠাকুর বল্লেন—আমার গণায় কি ভুল হয়? একেবারে রাজা। তবে—একটা ফাঁড়া আছে বলেই শাপটি মোচন হ'চ্ছে না, তিন দিন হোম টোম করলেই ওঁর পাঁঠা জন্ম ঘুচে যাবে, আর ও রাজা হ'বে। আমি সব হোম আরম্ভ করে দিইছি। তুই এখন যা, পর্শু এসে একবার খবর নিস্?

বুড়ী জিজ্ঞাসা করলে—হ্যাঁ বাবা, হ'বে ত?

ঠাকুর রাগতভাবে বল্লেন—হ'বে না! তুই এমন গণৎকার পেলি আমায়?

বুড়ী চলে গেল। এদিকে ঠাকুরমশাই তিনদিন ধরে মোলায়েম মাংস ভক্ষণ করেন, আর লোকের হাত দেখেন।

তিনদিনের দিন ভোরেই বুড়ী এসে বাবাঠাকুরের দরজায় ধন্না দিয়ে পড়লো। বাবাঠাকুর তখনও উঠেন নাই, বুড়ী কত কথাই ভাবছে, ফাঁড়াটা যদি কেটে গিয়ে থাকে, আহা,......

ঠাকুরমশাই দরজা খুলেই দেখেন বুড়ী। আহ্লাদে গদগদ হ'য়ে বল্লেন—এই যে বুড়ী, তুই এসেছিস্।

কি হ'ল বাবাঠাকুর?

হ'বে আবার কি! দেখ্‌গে যা ঐ চপলে গিয়ে, তোর পাঁঠা চপলের রাজা হ'য়েছে।

হ্যাঁ বাবা, হ'য়েছে, হয়েছে?

বুড়ীর আহ্লাদ দেখে কে? বুড়ী বাবাঠাকুরকে দু'টি টাকা প্রণামী দিয়ে দণ্ডবৎ হ'য়ে বাড়ী এল। খাওয়া দাওয়া করে সেইদিনই বুড়ী চপল দেশের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ল।

চপল অনেক দিনের পথ, বুড়ী মরতে মরতে তিন চারদিন হেঁটে চপলে পৌঁছুল।

পৌঁছে শুনলে, রাজা বাগানে হাওয়া খাচ্ছেন। বুড়ী দেখে' বাগানের মালীরা তাকে ঢুকতে দিলে। বুড়ী ঢুকে দেখে, সত্যি রাজা হাওয়া খাচ্ছে, ছেলেমানুষ রাজা, সুন্দর রূপ, সুন্দর মুখ। বুড়ী অবাক হ'য়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লো।

রাজা এদিকে আস্‌তেই বুড়ীকে দেখ্‌তে পেয়ে বল্লেন—তুই কে?

বুড়ী ঘাড় নেড়ে বল্লে—এখন আর চিন্‌তে পারবে কেন? এখন যে রাজা হ'য়েছ। এখন কি আর বুড়ীকে মনে ধরে?

রাজা ভাবলেন, পাগল। বল্লেন—তুই কে রে?



দেখ—দেখি, এটা কি মনে পড়ছে?

বুড়ী কাপড়ের ভেতর থেকে এক গাছা দড়ী বার ক'রে বল্লে—চিন্তে পারছ না? দেখ—দেখি, এটা কি মনে পড়ছে?

রাজা চেঁচিয়ে মালী ডাক্‌তে যাবেন, বুড়ী বলে উঠ্‌লো—ওরে নেমকহারাম, একটুকু

বাচ্ছা এনে এতখানি করলাম, টাকা খরচ ক'রে ফাঁড়া কাটালাম, এখন আর চিন্তেই পার না। এমনই নেমকহারাম জাত বটে!—এই না বলে বুড়ী দড়ি গাছটি ঘুরিয়ে রাজাকে বাঁধতে গেলো, রাজা ত্রাহি ত্রাহি লাফ্ ছাড়লেন।

বুড়ী রাজার সঙ্গে সঙ্গে ছোটে আর বলে—ওরে নেমকহারাম! রাজা হ'য়েছ, রাজটীকে পরেছ! এখন আর বুড়ীকে চিন্‌বে কেন? চ, আবার বাবাঠাকুরের কাছে বেঁধে নিয়ে যাই, বলি আমার যে পাঁঠা ছিল সেই পাঁঠা করে দাও।

রাজার ডাক শুনে মালীরা ছুটে এসে বুড়ীকে বেঁধে ফেল্লে। বুড়ী কেবলই বাবাঠাকুরকে ডাক্‌তে লাগ্‌লো, বাবাঠাকুর, তুমি ত অন্তরযামী বাবা, সব বুঝতে পারছ, একে আবার পাঁঠা করে দাও বাবা, ও রাজা হ'য়ে আমাকে বড় দুঃখু দিয়েছে বাবা!

রাজার লোকজন তা'কে ধরে ফেলে জিজ্ঞাসা কল্লে, তুই পাঁঠা পাঁঠা কি বল্‌ছিস বুড়ী?

বুড়ী রেগে টং হ'য়ে বল্লে—কা'কে আবার বলব! ঐ—ওকে। ওযে আমার পাঁঠা ছিল, ঠাকুরমশাই মন্ত্র পড়ে হোম ক'রে ওকে রাজা করে দিয়েছে।

রাজার লোকরা তখন বুঝতে পারলে যে বোকা বুড়ীকে এমনি করে কেউ ঠকিয়েছে। বল্লে—যা তোর ঠাকুরমশাইকে ডেকে নিয়ে আয়। আরও হোম যাগ যজ্ঞ করতে হ'বে।

বুড়ী বল্লে—তা যাচ্ছি। কিন্তু এবারও যদি রাজা আমায় না চিন্তে পারে তা হ'লে আমি ওকে এই দড়ী দিয়ে বেঁধে নিয়ে চলে যাব—কিন্তু।

রাজার লোকজন বল্লে—আচ্ছা, আচ্ছা—তাই হ'বে। তুই ঠাকুরমশাইকে নিয়ে আয়।

বুড়ী দেশে ফিরে দেখ্‌লে, ঠাকুরমশাই নেই। তল্পী তল্পা বেঁধে কোথায় সরে পড়েছে।

গ্রামের লোক বল্লে—পাঁঠা কখন রাজা হয় বুড়ী? পাঁঠা যা হয় তাই হয়েছে, ঠাকুর-মশায়ের পেটের ভেতর ব্যা ব্যা করছে। ঘি, আলু, দই—বুঝলি নে?

বুড়ী সেই লোকটার দিকে হাঁ করে চেয়ে রইল। শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার।



সে অনেক দিনের কথা—কত হাজার হাজার বৎসর তাহার পর চলিয়া গিয়াছে। ভারতের পথ, ঘাট, মাঠ তখন ঠিক এমনই সুন্দর ছিল, গিরিবর হিমালয় তখন ঠিক এমনই মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিত। পুণ্যতোয়া স্রোতস্বিনী জাহ্নবী দুইকুল ফলে ফুলে সুশোভিত করিয়া তখন ঠিক এমনই বহিয়া যাইত। সেই যুগের কথা।.........

হিমালয়ের গিরিপথ দিয়া ও কাহারা ভারতবর্ষে ঢুকিল? ও কি রকম মানুষ তাহারা?—লম্বা লম্বা কটা চুল, খেঁদা নাক, মেঘের মত কালো রঙ, বনমানুষের মত চেহারা। আবার ও কিরকম তাদের আচার ব্যবহার!—রাঁধিতে জানে না, চাষ করিতে জানে না, বন্য জীবজন্তুর মতনই বনে জঙ্গলে বাস করে, তাহাদের মত বন্য ফল মূল, কাচা মাংস খাইয়া দিন কাটায়। ইহারা কে জান? ইহারাই হইল ভারতের আদিম অধিবাসী। হিমালয়ের গিরিবর্ত্ত দিয়া ইহারাই প্রথম ভারতবর্ষে আসিয়াছিল। ভীল সাঁওতাল প্রভৃতি কত জাতি ত তোমরা নিত্যই দেখিয়া থাক। তাহাদেরই পূর্ব্বপুরুষ হইতেছে ভারতের প্রথম অতিথি ঐ আদিম অধিবাসিগণ।

কতদিন যায়! হিমালয়ের গিরিপথ দিয়া আবার ও কাহারা ইহাদের সঙ্গে আসে? ইহারা ত উহাদের মত নয়। যবের শীষ্ ইহাদের সঙ্গে—তবে কি ইহারা চাষ করিতে জানে? আহা কিবা অপরূপ চেহারা!—হাতে তীর ধনুক, পরণে সুন্দর কাপড়, সর্ব্বাঙ্গে গহনা—কেমন তালে তালে পা ফেলিতে ফেলিতে চলিয়াছে। ইহারা কে জান? ইহারাও ভারতের অতিথি—নবাগত আদিম অধিবাসী।

ভারতে আসিয়া ইহাদের প্রথম সংঘর্ষ বাঁধিল ভারতের প্রথম অতিথি সেই আদিম অধিবাসিগণের সহিত। কিন্তু এই নবাগত সভ্যদের সহিত ঐ অসভ্য আদিম অধিবাসিগণ পারিবে কেন?—ইহাদের যে অস্ত্র শস্ত্র আছে, ইহারা যে দশে মিলিয়া কাজ করিতে জানে। পারিলও না। বিপক্ষ দলকে ছত্রভঙ্গ করিয়া নবাগত আদিম অধিবাসিগণ বীরবিক্রমে দ্রাবীড় দেশে চলিয়া গেল, কতক উত্তর ভারতেও রহিল। আর অধিকাংশ পরাজিত বিপর্য্যস্ত আদিম অধিবাসী ভারতের পূর্ব্ব পশ্চিম প্রদেশে গহন কাননে গিরিশঙ্কটে পলাইয়া প্রাণ বাঁচাইল।

ভারতে আসিয়া নবগত অতিথিরা দেখিল পথ, ঘাট সব অপরিষ্কার—সমস্ত দেশটা জঙ্গলময়। তাহাদের উৎসাহ ছিল অদম্য, তাই তাহারা পথ, ঘাট পরিষ্কার করিল, জঙ্গল কাটিল। এই সুন্দর পৃথিবী—কি করিয়া ইহার সব সৌন্দর্য্যটা উপভোগ করিতে হয়—তা তাহারা জানিত। নদ নদীর উপকূলে, উর্ব্বর ভূমিতে—যেখানে শ্যামল শস্য সারা বর্ষ মৃদু পবণ হিল্লোলে বহিয়া যায়, যেখানে বিহগকুল আনন্দে গান গায়—তাহারা যাইয়া দশে মিলিয়া এমনই স্থানে কুটীর বাঁধিল।

ভারতের আদিম অধিবাসিগণের দিনগুলি, সুখে দুঃখে একরূপ কাটিয়া যাইতেছিল। কিন্তু এমনও বুঝি আর কাটে না। সে দিন ভারতের উত্তর গিরি অন্য দিনের মতই প্রভাত সূর্য্যে রঙিন হইয়া উঠিয়াছিল, অন্য দিনের মতই সেদিন ভারতের আদিম অধিবাসিগণ প্রভাত বন্দনা শেষ করিয়া নিজ নিজ কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিল; সহসা তাহারা দেখিল হিমগিরি অতিক্রম করিয়া পঞ্চনদকূলে আসিয়া দাঁড়াইল কে একদল নূতন যাত্রী।



তাহাদের গৌরবর্ণ দিব্যকান্তির নিকট প্রভাত সূর্য্যও যেন ম্লান হইয়া গিয়াছে। কি সুন্দ তাহাদের বসন ভূষণ!—পরিধানে কারুকার্য্য খচিত ধুতি চাদর, সর্ব্বাঙ্গে অলঙ্কার—হা বালা বাজু, গলায় মুক্তার মালা, কাণে কুণ্ডল। শুধু কি ইহারা একদলই আসিয়াছে দলের পর দল অগন্তি লোক তখনও দূর গগনে দেখা যাইতেছিল। ইহারা সকলেই আ সন্তান। মধ্য এসিয়া হইতে এই নূতন পথের পথিক সব স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, গৃহপালিত প আসবাব পত্র লইয়া কোন্ অজানা দেশের উদ্দেশে যাত্রা করিয়াছিল—কে জানে? কত দেশ নদ, নদী, মরুভূমি অতিক্রম করিয়া শেষে আর্য্যরা ভারতের শ্যামল ক্ষেত্রে আসিয়া দাঁড়াইল ভারতের আদিম অধিবাসী—অনার্য্যরা দূরে দাঁড়াইয়া বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া এই দৃশ্য দেখিল।

পর ?·········আবার সংঘর্ষ—অস্ত্রের ঝনৎকার, হতাহতের আর্ত্তনাদ। ণ ভাব ধারণ করিল। ভারতবর্ষে কে প্রভুত্ব করিবে—আর্য্য না অনার্য্য



…রবর্ণ আর্য্যসন্তান যখন পঞ্চনদকূলে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন ভারতের উত্তর ও মধ্য প্রদেশের অধিকারী নবাগত কৃষ্ণবর্ণ অনার্য্যগণ …শর লইয়া তাহাদিগকে বাধা দিল। আর পূর্ব্ব ও পশ্চিম প্রদেশের গহন কাননবাসী বিস্ময় বিমূঢ় আদি[illegible] অসভ্য …ার্য্যগণ সুযোগ পাইলেই বৃক্ষান্তরাল হইতে ইট পাটকেল ছুড়িয়া আর্য্যদের বল ক্ষয় করিত। ভারতের [illegible] প্রকাণ্ড …্য পর্ব্বত থাকার দরুণ দক্ষিণাত্যে এ সংবাদ পঁহছিল না—তাঁহারা যেমন সুখে ঘর সংসার করিতেছিল [illegible]সিল।

একদিকে শিক্ষিত, সভ্য গৌরবর্ণ আর্য্য অস্ত্র শস্ত্র লইয়া যুদ্ধ করিতেছে, অন্যদিকে তেমন শিক্ষিত নবাগত কৃষ্ণবর্ণ অনার্য্যগণ অস্ত্রশস্ত্র লইয়া তাহাদিগকে বাধা দিতেছে। আ বিস্ময় বিমূঢ় ভারতের আদিম অধিবাসী অসভ্য অনার্য্যগণ সুযোগ পাইলেই বৃক্ষান্তরাল হইতে ইঁটপাটকেল ছুঁড়িয়া আর্য্যদের বলক্ষয় করে। কিন্তু শেষটা আর্য্যদেরই জয় হইল। আর্য্যদে শিক্ষা ও সভ্যতা দুইই ছিল খুব উচ্চ ধরণের, তাই শেষ পর্য্যন্ত অনার্য্যরা তাহাদের সা পারিয়া উঠিল না। ক্রমে উত্তর ভারত সবটাই আর্য্যদের অধিকারে আসিল। যুদ্ধে বন অনার্য্যদের আর্য্যরা দাস করিয়া রাখিল।

আর্য্যেরা কিন্তু দক্ষিণ ভারতে বড় সুবিধা করিয়া উঠিতে পারে নাই। তখন দক্ষি ভারতে নবাগত সভ্য অনার্য্যরা রাজত্ব করিতেছিল। আর্য্যরা ত এই সব অনার্য্যদের উত্ত ভারত হইতে হটাইয়া দিয়াছিল, কিন্তু দক্ষিণ ভারতে সুবিধা করিতে পারিল না কেন জান ভারতবর্ষের মাঝখানে একটা মস্ত বড় পাহাড় আছে—নাম তার বিন্ধ্যপর্ব্বত। ঐ পর্ব্বত মাঝখা থাকিয়া ভারতবর্ষকে দুইভাগে ভাগ করিয়া দিয়াছে। বিন্ধ্যপর্ব্বতের উত্তরে যে ভাগটু আছে সেইখানেই আর্য্যরা থাকিত—তাহার নাম আর্য্যাবর্ত্ত, আর দক্ষিণের ভাগে যে অংশটু আছে তাহার নাম দাক্ষিণাত্য। এখন যেমন পাহাড় কাটিয়া বড় বড় রাস্তা রেল সম তৈরী হইয়াছে তখনকার কালে ত আর সে সব ছিল না। কাজেই যুদ্ধ করিতে করি অতবড় বিন্ধ্যপর্ব্বত ডিঙ্গাইয়া দক্ষিণ ভারতে যাওয়া ত আর সম্ভব নয়। তাই তাহ যাইতে পারে নাই; কিন্তু তাহাদের লোলুপ দৃষ্টি বরাবরই সমভাবে দাক্ষিণাত্য প্রদেশে উপর ছিল। তবে দু একবার যে অন্য উদ্দেশ্যে তাহারা দক্ষিণ ভারতে গিয়াছিল তাহার প্রম পাওয়া যায়। সে সম্বন্ধে একটি বড় মজার গল্প আছে।

[illegible] বিন্ধ্যপর্ব্বতের মাথা এত উচু হইয়া উঠিল যে আকাশে ঠেকে আর কি [illegible]দের ভারী ভয় হইল—সূর্য্যদেব দেখিলেন তাঁহার চলাফেরা বন্ধ হইয়া য পৃথিবীর লোক আর আলো পায় না। কি হইবে? তখন সকলে অগস্ত্য মুনির ক করিতে করিতে বলিলেন, "প্রভু, বিন্ধ্যপর্ব্বতের মাথা নীচু করিবার একটা উপায় আপনা



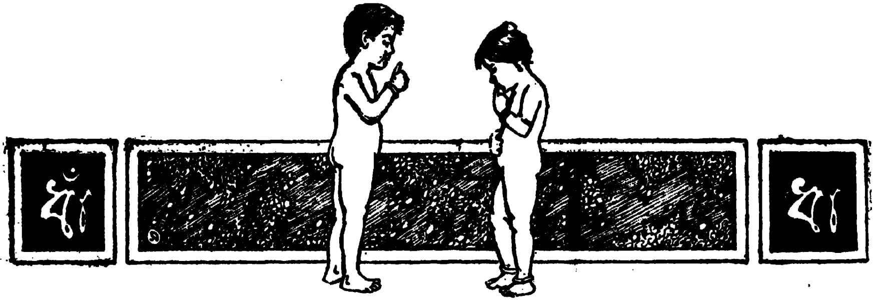
যুদ্ধ করিতে করিতে অত বড় বিন্ধ্য পর্ব্বত ডিঙ্গাইয়া ভারতে যাওয়াও আর সম্ভব নয়। তাই তাহারা বাই[illegible]নাই; তাহাদের লোলুপ দৃষ্টি বরাবরই সমভাবে দাক্ষিণাত্য প্রদেশের উপর ছিল।

করিতেই হইবে।” অগস্ত্য মুনি তখন বিন্ধ্যপর্ব্বতের কাছে উপস্থিত হইলেন। অত বড় একজন মুনি, যিনি ইচ্ছা করিলেই শাপ দিয়া সমস্ত ভস্ম করিয়া দিতে পারেন, তাঁহাকে দেখিয়া বিন্ধ্যপর্ব্বতের ভয় হইল। বিন্ধ্য তাড়াতাড়ি মাথা নীচু করিয়া মুনিকে প্রণাম করিলেন, মুনি আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, “বৎস, যতদিন না আমি দক্ষিণ দেশ হইতে ফিরিয়া আসি ততদিন তুমি মাথা নীচু করিয়াই দাঁড়াইয়া থাক।” এই বলিয়া অগস্ত্য মুনি বিন্ধ্যপর্ব্বত ছাড়াইয়া দক্ষিণদিকে চলিয়া গেলেন, আর ফিরিলেন না। কাজেই বিন্ধ্যও আর মাথা তুলিতে পারিলেন না। এই জন্যই লোকে বলে অগস্ত্য যাত্রা—এমন যাত্রা যে, যেখানে যায় সেখান হইতে লোক আর ফেরে না।

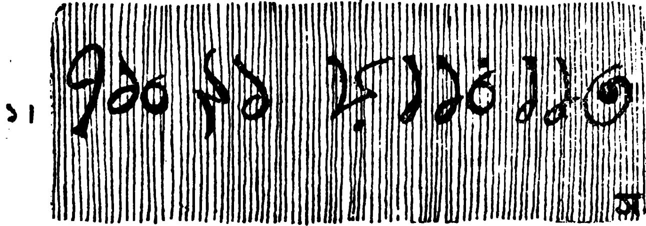
এই অগস্ত্য মুনির গল্প হইতেই আমরা বুঝিতে পারি যে আর্য্যরা দক্ষিণ ভারতে গিয়াছিল। রামচন্দ্রও পিতৃ আজ্ঞায় বিন্ধ্য পর্ব্বত পার হইয়া দক্ষিণ দিকে বনবাসে গিয়াছিলেন। কিন্তু এসব যাওয়া বেড়াইতে যাওয়ার মত, দক্ষিণ ভারত সে যুগে অনার্য্যদেরই ছিল, আর্য্যরা সেখানে বড় সুবিধা করিয়া উঠিতে পারে নাই।

আর্য্যাবর্ত্তে এই সময়ে অনেকগুলি ছোট বড় রাজ্য হইয়াছিল—তাহাদের সম্বন্ধে অনেক গল্পও আছে। রামায়ণ, মহাভারতের গল্প তোমরা নিশ্চয়ই শুনিয়াছ, সেই সব গল্প পড়িয়া সে যুগের অনেক কথা জানা যায়। সেই গল্পই তোমাদের এখন বলিব। (ক্রমশঃ)

শ্রীশিশিরকুমার মিত্র।



নূতন ধাঁধা।

১। 

এটি কি বল দেখি ?

২। (ক) "রামোজামরানরাহয়" (খ) "হায়রামনর ভাতনার" (গ) "মোরগদনায
মেদাঙ্গা——ইহা হইতে (ক) এক মহাত্মা, (খ) দুইখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ও (গ) তিনটি নদীর নাম কর।

শ্রীমতী সাবিত্রী দেবী, বলিহার।

৩। তিন অক্ষরে নাম মোর বৃক্ষশিরে বাস,
শেষাক্ষর ত্যজ যদি মাঝির লাগে ত্রাস ;
প্রথমাক্ষর ছেড়ে আমি সবার মাঝে বসি
মধ্যাক্ষর ছাড় যদি ঘুরে ফিরে আসি।

শ্রীসুধাংশুশেখর গুপ্ত, ঢাকা।

৪। ভোঁ ভোঁ করে ভোমরা নয়,
কাঁধে পৈতে, বামুন নয়।
সেজন থাকে যাহার ঘরে,
ভাতের দুঃখে সে না মরে।
আমার দেশের ঘরে ঘরে—
দেখ্‌তে কবে পাব তারে ?

কুমারী প্রেমলতা বসু, গিরিডি।

পৌষ মাসের ধাঁধার উত্তর।

১। লবণ।

২। কাশী।

৩। কপি।

৪। নর।

নিম্নলিখিত গ্রাহক-গ্রাহিকারা চারিটী ধাঁধারই উত্তর দিয়াছেন :—

কুমারী হাসিরাণী মিত্র, কলিকাতা; কিরণ শঙ্কর সাহা, পাবনা; প্রমীলা দেবী, কলিকাতা; করুণাময় দে, শ্রীহট্ট; সভ্যবৃন্দ—পল্লী লাইব্রেরী, পাইকপাড়া; সুব্রত সেন, রঘুনাথগঞ্জ; সুস্থ, কলিকাতা; অমূল্যরত্ন দাসগুপ্ত, মাদারীপুর; কুমারী নীলিমা ভাদুড়ী, হরদই; সুবর্ণলতা কর, শিলচর; এ, কে, ফজলল করিম, যোনী; বীণাপানি বিশ্বাস, দেউলপুর; বিজয়ভূষণ মজুমদার, বড়পেটা; বিনয়েন্দ্রনারায়ণ সিংহ, ভাগলপুর; পুষ্পলতা বসু, গিরিধি; মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কুড়িগ্রাম; নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, জলুর ঘাট; ব্রজেন্দ্রনারায়ণ নন্দী, বালীগঞ্জ; সুব্রতকুমার ঘোষ, কলিকাতা; মঙ্গলচরণ গাঙ্গুলী, গোরক্ষপুর; কুমারী সুমনা গুহ, ডুমডুমা; সুধীন্দ্রলাল বিশ্বাস, কুমিল্লা; সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায়, কান্‌পুর; সীতালাল, বিষ্ণুপুর; ভবেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ধানকোড়া; বেলা ঘোষ, কলিকাতা; সভ্যবৃন্দ—শিবনাথ লাইব্রেরী, ময়মনসিংহ; অমিয়রঞ্জন রায় চৌধুরী, কালীঘাট; বিনয়কুমার লাহিড়ী, গৌহাটী; সৌদামিনী বড়াল, দিনাজপুর; সুবিমল রায়, ভবানীপুর; সত্যবালা দত্ত, চন্দননগর; প্রফুল্লশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা; সুধীরকুমার বসু, কাশীপুর; বিজলী মোহন চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা; কুমারী রাধারাণী দেবী, বৈদ্যের বাজার; কুমারী পরিমল বালা বসু, পাটনা; রবীন্দ্রকুমার বসাক, কলিকাতা।

নিম্নলিখিত গ্রাহক-গ্রাহিকারা তিনটী ধাঁধার উত্তর দিয়াছেন :—

কণকপ্রভা দাস গুপ্ত, শিলং; সুধীরচন্দ্র বসু, কটক; নৃপেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী,

উয়ারী ; নির্ম্মলকুমার মুখোপাধ্যায়, সাল্‌কিয়া ; সুকুমার মিত্র, যশোহর ; কুমারী নীলিমা সুন্দরী রায়, মধুপুর ; হেণারাণী ঘোষ, কলিকাতা ; কুমারী বীণাপানি মিত্র ; কলিকাতা ক্ষীরোদকুমার চৌধুরী, ভবানীপুর ; নির্ম্মলচন্দ্র নিয়োগী, কলিকাতা ; প্রশান্তকুমার দে, কলিকাতা ; বিভূতিভূষণ মিত্র, বর্দ্ধমান ; সুধাংশুশেখর গুপ্ত, ঢাকা ; সুধীন্দ্রমোহন সেন, কলিকাতা ; অমিয়সিন্ধু রায়. পাটনা ; সত্যেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, পাটনা জংসন ; সনৎকুমার ভট্টাচার্য্য, গুপ্তিপাড়া ; আশামুকুল দত্ত, করিমগঞ্জ ; মণ্টু বাবু, পুরুলিয়া ; দেবব্রত বিশ্বাস কিশোর গঞ্জ ; সুধাশুকুমার ঘোষ, কলিকাতা ; নৃপেন্দ্রলাল দত্ত, ডুমডুমা ; অংশুবালা ও হিমাংশুবালা দে, মীরাট ; শচীন্দ্রনাথ মিত্র, পাটনা ; প্রমোদনাথ মুখোপাধ্যায়, বরিশাল শচীন্দ্রকুমার চৌধুরী, কলিকাতা ; জীবন চক্রবর্ত্তী. চট্টগ্রাম ; কুমারী পরিবালা দেবী, বর্দ্ধমান ; মণীন্দ্রনাথ চৌধুরী,, মেদিনীপুর ; কুমারী মলিনাবিকাশ মণ্ডল, রেঙ্গুন ; সাবিত্রী দেবী, বলিহার।

নিম্নলিখিত গ্রাহক-গ্রাহিকারা একটী ধাঁধাঁর উত্তর দিতে পারিয়াছেন :—

অদ্রীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পুণা ; অমলকুমার ঘোষ, সালকিয়া ; হবিবর রহমান, আলমডাঙ্গা ; নিবারণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ব্রাহ্মণ গাঁ ; তরুণচন্দ্র সিংহ, কলিকাতা ; সন্তোষকুমার রায় সিদ্ধান্ত, বাঘমারী।

নিম্নলিখিত গ্রাহক-গ্রাহিকারা একটী ধাঁধাঁর উত্তর দিয়াছেন :—

কুমারী কণকপ্রভা দাসগুপ্ত, শিলং ; সুবিমল ও পরিমল পাল ; শিলং ; কুমারী শশাঙ্কপ্রভা দাস পুরকায়স্থ, শ্রীহট্ট ; রেণুবালা বসু, কলিকাতা।

প্রকাশক—শ্রীশিশিরকুমার মিত্র বি, এ।
শিশির পাব্লিশিং হাউস, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।
প্রিণ্টার—শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।
বিদ্যোদয় প্রেস, ৮।২ কাশী ঘোষ লেন বিডন. ষ্ট্রীট, কলিকাতা

আমার দেশের নিয়মাবলী।

"আমার দেশ" ছেলেমেয়েদের সচিত্র মাসিক পত্র। মাসের প্রথম সপ্তাহেই প্রকাশিত হয়। গ্রাহক গ্রাহিকারা প্রতি মাসের ১৫ই এর মধ্যে না পাইলে, ডাকঘরে খোঁজ লইয়া, পরে আমাদের চিঠি লিখিবেন।

যে সকল গ্রাহক-গ্রাহিকা নূতন ধাঁধা পাঠাইবেন, তাঁহারা ধাঁধার উত্তর ঐ সঙ্গে না পাঠাইলে আমরা তাহা ছাপিতে পারি না। ধাঁধার উত্তর বা নূতন ধাঁধা পাঠাইবার সময় গ্রাহক নম্বর দিতে ভুল করিবেন না।

"আমার দেশে" প্রবন্ধ কবিতাদি পাঠাইবার সময় নকল রাখিয়া পাঠাইলে ভাল হয়। অনেক সময় অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ দিবার সুবিধা ঘটিয়া উঠে না।

মাসের ২২শে তারিখের মধ্যে ধাঁধার উত্তর আমাদের হস্তগত না হইলে সে মাসে গ্রাহক গ্রাহিকার নামটি ছাপা হইবার আশা বড় কম।

ধাঁধা সম্বন্ধে আমরা আর একটা কথা বলিতে চাই। পুরাতন প্রকাশিত ধাঁধাগুলিকে সামান্য একটু আধটু পরিবর্ত্তন করিয়া অনেকে পাঠাইয়া থাকেন, দেখা গিয়াছে। দু'একটা হয়ত কাগজে আমরা বাহির করিয়াও ফেলিয়াছি। এরূপ করা কোন গ্রাহক গ্রাহিকারই উচিৎ নয়। ধাঁধা তাঁহারা রচনা করিবেন, ইহাই আমরা আশা করিয়া থাকি। ইহা দ্বারা তাঁহাদের বুদ্ধিবৃত্তি উৎকর্ষতা লাভ করিবে—ধাঁধার ইহাই উদ্দেশ্য। তাঁহারা অঙ্ক কসিয়া থাকেন, অঙ্ক হইতেই নানারূপ ধাঁধা তৈয়ারী হইতে পারে। একখানি অভিধান খুলিয়া শব্দ পরীক্ষা করিতে করিতে আপনি ধাঁধার সৃষ্টি হয়—ইহা হইতে তাঁহাদের ভাষা জ্ঞান ও শব্দসম্পদ বাড়িবার সম্ভাবনা। আমাদের আশা ও অনুরোধ তাঁহারা এইরূপই করিবেন।

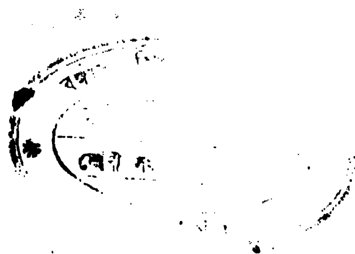
কার্য্যাধ্যক্ষ,

শিশির পাব্লিশিং হাউস

কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

সূচী

ফাল্গুন ১৩২৮





দেবী সরস্বতী।



২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা। ফাল্গুন, ১৩২৮।

ভ্রান্ত।

আলোই যদি বাসিস্ ভাল
দিনে কেন ঘুমুস্ তোরা।
তারার মিটি আলো পেতে
জেগে মারস্ রাতটা সারা।

বল্লে কথা বুঝিস্ না'ত,
রবির আলো উজল কত
একটুখানি সকাল জেগে
করনা বারেক পরখ তোরা।

ফুলের সুবাস বাসিস্ ভাল,
ছুটিস্ কেন পলাশ হেরে
রূপ আছে তাই ভাবিস্ মনে
গন্ধটিও থাক্‌বে কি'রে ?

নিরাশরে ভাই হোস্‌ত খালি,
দেখনা বারেক কমল তুলি,
সত্য যা চাস্ পাস্ কি না তা'
দেখনা বারেক পরখ করে।

মধুর গাহে জানিস্ পাখী,—
মাছরাঙা তোর খাঁচায় তাই!
গুণটি রূপের চির সখী
এই কি তোরা ভাবিস্ ভাই ?

দেখতে কোকিল বড়ই কাল
ভাবিস্ কি তাই গায়না ভাল ?
দেখনা কোকিল একটা এনে
কোন্‌টা ভাল গাহে ভাই।

শ্রীবিকাশচন্দ্র মল্লিক।

মতীন্দ্রের ব্যবসায়।

যে সময়ের কথা আমি বলিতেছি ভারতবর্ষের লোকে তখন চাকরী-বাকরী করা ছাড়িয়া স্বাধীন ভাবে ব্যবসায় করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। যোয়ান ছেলেরা চাকরীর উমেদারীতে পথে পথে না ঘুরিয়া যে-যেমন পারিত ছোট খাট কাজ কর্ম্মে মন দিয়াছিল। এখন হইতে কতদিন আগে বা কতদিন পরে তা আমি বলিব না, যখনই হোক,—

মতীন্দ্র একটা অজ্ পাড়াগাঁয়ে গিয়া চাল তৈরীর কারবার খুলিয়া দিয়াছিল। গাঁয়ের নাম, মগরা। মগরায় মতীন্দ্রের বাপ-পিতামহের বাস ছিল। তবে মতীন্দ্রের বাবা এখানকার বাস তুলিয়া দিয়া সহরে গিয়া চাকরী করিয়াছিলেন এবং ছেলেকে কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছিলেন। ছেলে যখন গোটা তিনেক পাশ করিয়া ফেলিল, ছেলের বাপ-ও চাকরী- বাকরী ছাড়িয়া এমন কি সব ফেলিয়া এমন একটা স্থানে চলিয়া গেলেন যে ফিরিবার আর কোন আশা রহিল না। মতীন্দ্র মগরায় আসিল।

পাড়াগাঁয়ের লোকে নিজেদের দরকার মত ধান সিদ্ধ করিয়া, শুকাইয়া, ঢেঁকিতে কুটিয়া চাল তৈয়ারী করিয়া লইত, তাহারা প্রথমে পয়সা দিয়া চাল তৈয়ারী করিতে কিছুতেই রাজী হইল না। শেষে মতীন্দ্র নিয়ম করিল, নগদ পয়সা নয়, মন-করা পাঁচ সের ধান পাইলেই সে সন্তুষ্ট হইবে। তখন গাঁয়ের মেয়ে পুরুষ সবাই রাজী হইল। মেয়েরা দেখিল, ধান ভানিয়া চাল করিতে যে সময় লাগে সেই সময়টা তাহারা অন্য কাজে লাগাইতে পারিবে, আর দিতে হইবে মোটে মন-করা পাঁচ সের বইত নয়।

মতীন্দ্রের কারবার খুব চলিতেছে। কল-টল তার নাই, শ'খানেক ঢেঁকি,

গোটা দশেক গরুর দ্বারা কাজ হয়। ঢেঁকি-কলটা সে এমনি বুদ্ধি করিয়া খাটা-ইয়াছিল যে গরুগুলি ঘুরিবে আর ঐ একশ' ঢেঁকি পড়িবে ও উঠিবে—যেন ঠিক মানুষেই পা দিয়া উঠাইতেছে বা নামাইতেছে। প্রথম কিছুদিন যেমন তাহার টানাটানি গিয়াছিল, এখন বেশ স্বচ্ছল অবস্থা হইয়াছে। মতীন্দ্র ইহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতে পারিত কিন্তু মানুষের আশা! সে কি কখনও মেটে ভাই?

হরিহর দাস মস্ত চাষী। বিশ গোলা ভরা তার ধান, বস্তা বস্তা মুগ কলাই, পুকুর, বাগান—সে অঞ্চলে তার মত ধনী আর বড় চাষী কেহ ছিল না। হরিহরের মস্ত পরিবার। ছেলে-পুলে, ভাই বোন্, মাসী পিসী, কৃষাণ, রাখালে বাড়ী ভর্ত্তি। তার পয়সাও যেমন বেশী, খরচও তেমনি, হপ্তায় হপ্তায় একশ মন করিয়া তাহার ধান আসে—চাল হইতে। সে আবার চালের ব্যবসাও করে কি-না! তবে বিদেশে নয়, ঐ গাঁয়ে ঘরেই ছিল তার ব্যবসা।

আমাদের মতীন্দ্রের যখন পয়সা কড়ি বিশেষ ছিল না তখন সে ভাবিত স্বচ্ছলভাবে সংসার চলিয়া গেলেই হইল। কিন্তু সংসার যখন স্বচ্ছল হইল তখন তাহার লোভই বল, আর আকাঙ্ক্ষাই বল, একটু বাড়িয়া গেল। সে হরিহরের একশ' মন হইতে কুড়ি মন অবশ্য প্রাপ্য ত লইলই, আরও দশ মন সরাইয়া ফেলিল। পরের হপ্তাতেও ঐ ত্রিশ মনই লইল। হরিহরের প্রকাণ্ড কারবার, দশ বিশ মনের এদিক-ওদিকে কি আসে যায়! এমনি করিয়া বছর খানেক কাটিল। এই বছর খানেকে সে বেশ অর্থবান হইল। সর্ব্ব প্রথম—যেদিন সে হরিহরের ধানের বস্তা হইতে বিশ মনের সঙ্গে দশ মন চুরী করিল সেদিন কিন্তু তাহার মনটা ভারি খারাপ হইয়া গেল। সে একটা খোঁড়া ভিখারিণীকে দেখিতে পাইয়া, তাহার দুঃখের কাহিনী শুনিয়া তাহাকে হঠাৎ পাঁচ মন ধান দান করিয়া ফেলিল। ভাবিল, দরিদ্রের উপকার করাই ধর্ম্ম। বুড়ী তাহাকে

অনেক আশার্ব্বাদ করিয়া চলিয়া গেল ; গ্রামে তাহার অনেক সুখ্যাতিও রটিল।

তা রটুক, কিন্তু মতীন্দ্র দিনে দিনে যত অর্থ করিতে লাগিল, তাহার মন হইতে সুখ শান্তি ততই দূর হইতেছিল। তাহার একটি ছোট ভাই রোজ সকালে তাহারই পাশে বসিয়া পড়িত, "সদা সত্য কথা বলিবে, না বলিয়া পরের দ্রব্য লইলে চুরী করা হয়, চোরকে সকলেই ঘৃণা করে"—মতীন্দ্রর ভাই যতীন্দ্র দাদাকে জিজ্ঞাসিত—হ্যাঁ দাদা, চোরকে সকলে ঘৃণা করে কেন দাদা?—মতীন্দ্র উত্তর দিতে পারিত না, উঠিয়া যাইত। একদিন রাত্রে যতীন্দ্র কাঁদিয়া উঠিল, মতীন্দ্র জিজ্ঞাসিল—কাঁদ কেন যতীন? যতীন কাঁদিয়া বলিল—বড় খিদে পেয়েছে। মতীন্দ্র বলিল—ঐ সেল্‌ফে খাবার আছে, উঠিয়া খাও না! কাঁদ কেন? যতীন্দ্র জিজ্ঞাসিল খাবার কার? আমার? তাহার দাদা বলিল—মা রাখিয়াছেন, কাহার জানি না, তুমি যাহা পার খাও—বাকীটা থাকুক। যতীন খাইল না, কাঁদিতে লাগিল। মতীন্দ্র বিরক্ত হইয়া জিজ্ঞাসিল—আবার কেন কাঁদ যতীন, বলিলাম ত খাও। তাহার সেই ছোটভাই কি বলিল—জান? সে বলিল—মা রাখিয়াছেন, তাঁহার জিনিষ, তাঁহাকে না বলিয়া খাইব কেন? তখন যে আমায় সবাই চোর বলিবে, আর তোমরাই তখন ঘৃণা করিবে, যতীন চোর, যতীন চোর। তাহার দাদা বলিতে গেল, দুইটা খাইলে মা জানিতেও পারিবেন না, জানিলেও তোমাকে বকিবেন না! যতীন্দ্র ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল—তিনি নাই বা জানিলেন, না-ই বা বকিলেন, আমি ত চোর হইলাম।

মতীন্দ্র কথা কহিল না। মা'কে ডাকিয়া আনিল। মা খুসী হইয়া অনেকগুলি রসগোল্লা যতীনের হাতে তুলিয়া দিলেন।

মতীন্দ্র ভাবিতে লাগিল—তিনি নাই বা জানিলেন......আমি ত চোর হইলাম!

আগে হইতেই মতীন্দ্রের মন ভালো ছিল না—এখন একেবারে সে লজ্জায় ঘৃণায় মরিয়া যাইতে লাগিল। ছিঃ ছিঃ—তাহার ঐ অতটুকু ভাইটি কতখানি সৎ, আর সে ···!

এদিকে হরিহরের একজন পুরোণো সরকার দু'তিন হপ্তা হইতে কেমন সন্দেহ করিতেছে যে যতটা চাল পাইবার কথা তাহার চেয়ে যেন কম আসিতেছে। দু' হপ্তা ওজন করাইয়া তৃতীয় হপ্তায় হরিহরকে বলিল। হরিহর হাসিয়া বলিল —দূর! ও খুব সৎ লোক ওর বাপ·দাদার সঙ্গে কাজ কারবার করেছি—ওদের আমি খুব জানি। তোমার ওজনে ভুল হইয়াছে। তৃতীয় হপ্তার ওজনেও কম! হরিহর হাসিয়া বলিল—তোমার ওজনের দোষ। মতীন বাবু সহরের 'খালিজে' নেকাপড়া শেখা নোক, পাশ করা, ওর বাপ-দাদা খুব ধার্ম্মিক ইত্যাদি! আচ্ছা আসচে হপ্তায় চাল এলে আমাকে ডেকো, ওজন করব!

মতীন্দ্র স্থির করিল—হরিহরের যে পরিমান ধান্য সে চুরী করিয়াছে, এখন হইতে আস্তে আস্তে সব ফিরাইয়া দিতে হইবে। শেষ কণাটি পর্য্যন্ত! সে হিসাব করিয়া, প্রতি হপ্তায় চালের সঙ্গে ফিরাইতে লাগিল এবং শাস্তি স্বরূপ নিজের যে পাচ মন প্রাপ্য তাহাও চাল করিয়া সে ঐ সঙ্গে দিতে লাগিল।

হরিহর নিজে আসিয়া ওজন করিয়া দেখিল, যা আসিবার কথা, তার চেরে অনেক বেশী আসিয়াছে! সে সরকারের দিকে চাহিয়া হাসিল। আর বলিয়া দিল, বেশীটা আলাদা করিয়া রাখ, আসচে হপ্তায় দেখা যাক্—তার পর যাহা হয় করা যাইবে।

আস্‌চে হপ্তায়ও তাই! হরিহর ধর্ম্মভীরু লোক! সে বেশীটা পৃথক রাখাইয়া মতীন্দ্রের সঙ্গে দেখা করিতে চলিল। রোগা রোগা চেহারাটি, মাথায় বড় বড় চুল,—চাদর গায়ে, খালি পা, প্রকাণ্ডলাঠি হাতে! তাহার চেহারা ছিল

ভারি শক্ত আর গলার স্বরটাও ছিল বাজখেঁয়ে। দেখিয়া শুনিয়া মতীন্দ্র ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল।



বলি, দেখে শুনে ছ্যাও, না কি ?

মতীন্দ্র কথা কহিতে পারে না। হরিহর আবার কহিল—এমনি করেই ব্যবসা কর তুমি ?—এবারে মতীন্দ্র একেবারে মাটীতে বসিয়া পড়িয়া বলিল—আমায় এবারকার মত মাপ করুন।...হরিহর ভাবিল, ব্যাপার কি ?—তাহাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া মতীন্দ্র আবার বলিল—আপনার যা নিয়েছি—সব

ফিরাইয়া দিতেছি। তবে পাছে আপনাদের সন্দেহ হয় এই জন্য অল্পে অল্পে দিতেছিলাম। এখন আপনি ত সমস্তই জানিয়াছেন, আজই সব পাঠাইয়া দিব।

সে সমস্ত খুলিয়া বলিল।

হরিহর সাধাসিধা লোক, বলিল—আহা ঠাকুর, ভুলচুক ত আছেই। তা পাঠাইয়া দিও। আর মন-করা পাঁচ সেরে যদি না কুলোয় কিছু বাড়াইয়া লইতে পার, সকলেই দিবে। কি-বল?

মতীন্দ্র বাড়ী আসিয়া যতীন্দ্রকে এক সের রসগোল্লা কিনিয়া দিল।

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার।





দীপ্তিমান ঘড়ি জ্বলে কিসে ?

অন্ধকারে দীপ্তিমান ঘড়ি গুলোর আজকাল খুব রেওয়াজ হয়েছে—কিন্তু এই সব ঘড়ির কাঁটা ও সংখ্যাগুলি অন্ধকারে কিসে জ্বলে বলতে পার ?

তোমরা বোধ হয় Zinc sulphideএর নাম শুনেছ। Zinc sulphide এক রকম রাসায়নিক লবণ। এর একটা গুণ এই যে দু এক সেকেণ্ডের তরেও যদি এতে আলোক লাগে, তা' হলে ওথেকে, বৈজ্ঞানিকের ভাষায় এক ফুস্ফুরক জ্যোতিঃ বেরোয়, সাদা কথায় ইহা নিজেই জ্বলে, সে জ্বলুনি আলোতে দেখা যায় না, অন্ধকারেই দেখতে পাওয়া যায়, আর তার কোন উত্তাপ বা তাত নেই। ঐ স্ফুরজ্জ্যোতিঃ কিন্তু বেশীক্ষণ থাকে না,—অচিরেই বিলীন হয়ে যায়—তবে ওকে নিত্যস্থায়ীও করা যেতে পারে। কি করে ? যদি ওতে আলো লাগাটা চিরস্থায়ী করা যায় তা' হলে ওর জ্বলাটাও থামবে না। কিন্তু তা' করা যেতে পারে কি করে ?

রেডিয়ামের নামও বোধ হয় তোমরা শুনেছ। ম্যাডেম্ কুরী রেডিয়াম আবিস্কার করেন। রেডিয়াম থেকে আপনা আপনি অদৃশ্য আলোকরশ্মি বেরোয়, সে বেরুনোর বিরাম নেই। অতএব Zinc sulphideএর সঙ্গে যদি অল্প একটু রেডিয়াম মেশাও, তা' হলে কি হয়? রেডিয়াম থাকা হেতু অনবরত আলোক পায় বলে Zinc sulphideএর স্ফুরজ্যোতিঃ আর নিভতে পায় না,—অবিশ্রান্ত জ্বলে।

রেডিয়াম না মিশিয়ে mesothorium মিশালেও একই ফল পাওয়া যায়—কিন্তু সে ফল স্থায়ী হয় না; কএক বছর পরেই বিলুপ্ত হয়। ২০০০ বৎসরেও রেডিয়ামের আলোক-বিকীরণ করিবার ক্ষমতার অর্দ্ধেকও নাশ হয় না।

চালাক লোকে যাই টের পেল অম্নি রেডিয়াম বা মেসোথোরিয়াম ও zinc sulphide দিয়ে এক রকম রং তৈরী করে বেচতে লাগল,—সে রংএর নাম হল "লুমিনাস পেণ্ট"—বা ভাস্বর রং। যে জিনিসটাকেই রাত্রিতে উজ্জ্বল দেখতে চাও—তাতেই এই রং লাগিয়ে দাও,—রাত্রে দিব্যি জ্বল জ্বল করবে। দীপ্তিমান ঘড়িগুলো এই রং দিয়েই রং করা, তাই রাত্রিতে ও অন্ধকারে, ওদের কাঁটা ও সংখ্যাগুলো দেখতে পাও। এখন বোধ হয় বুঝতে পারলে, ওরা কেন ও কিসে জ্বলে?

বিক্রীত সমুদায় রঙেই মিশ্রিত রেডিয়ামের হার এক নয়। কাজেই দামও সকলকার এক নয়, তাই এই রঙের ৩০০৲ টাকায় আউন্সও আছে; আবার ৩০০০৲ টাকায় আউন্সও আছে। উৎকৃষ্ট রঙে দশ আউন্স zinc sulphideএ এক গ্রেণ রেডিয়াম লবণ মিশ্রিত করা হয়। সকল রঙেই কিছু আবার রেডিয়াম থাকে না—কারুতে কারুতে মেশান থাকে। এ গুলো দামে কম। এই জন্যই

দামী ঘড়িগুলো ২০০০ বছর বাদেও যেমন তেম্নি জ্বলবে, কিন্তু কম দামের গুলোর চার পাঁচ বছর বাদেই জ্বলবার শক্তি ফুরিয়ে যায়।

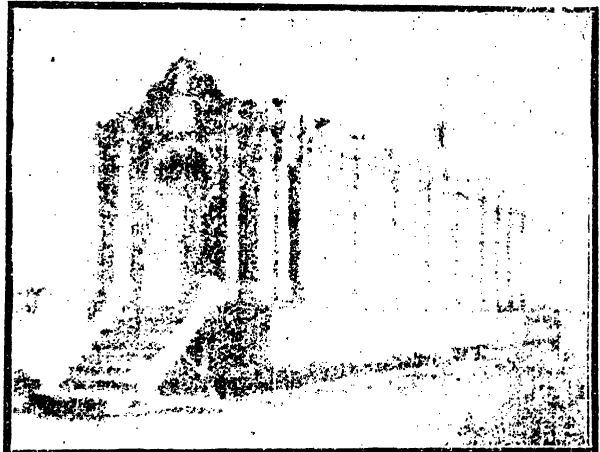
ঐ রং তৈরীতে হাজার হাজার টাকার রেডিয়াম প্রত্যেক বছরে খরচ হয়ে থাকে। ঘড়িতে, কামানে, বঁড়শীতে, কম্পাসে, সাইনপোষ্টে, ও খনিতে প্রধানতঃ এর ব্যবহার হচ্ছে।

শ্রীধানি লঙ্কা।

তাজ্জব!

গাড়ী।

চলন্ত গির্জ্জা



পার্শ্বের ছবিটি দেখিয়া তোমার কি মনে হয়? একটা গির্জ্জা। কেমন? হাঁ, গির্জ্জাই বটে, তবে যেমন তেমন গির্জ্জা নয়, এ'টি চলন্ত গির্জ্জা। রুমানিয়ার সৈন্যগণ যুদ্ধর সময়গির্জ্জায় গিয়া উপাসনা করিয়া আসিবার অবসর পাইত না, তাই গির্জ্জাটিকেই তাহাদের কাছে আসিতে হইত। গির্জ্জার তলায় চাকা আছে, আর মাটীতে রেল লাইন পাতা, রেলগাড়ীর মত চালাইয়া লইয়া যাওয়া যায়। তাই বলিয়া গির্জ্জাটি যেন খেলাঘরের ভাবিও না। উহার মধ্যে একসঙ্গে অনেক লোক ঢকিয়া উপাসনা করিতে পারে এমন স্থানও আছে।

রেণুর বুদ্ধি।

'মা' 'মা' বলে রেণু কাঁদে একদিন
আঁখি দু'টী ছল ছল,
শুধালাম তায় "বাবা কিবা মায়
কারে চাও ঠিক বল ?"
ক্ষণেক নীরবে থাকিয়া সে কয়
"চাহি আমি দু'জনায় !"
"কোথায় রাখিবে বাবারে তোমার
"কোথার রাখিবে মায় ?"
শুধালাম হাসি, রেণু কয় ধীরে
"বাবারে রাখিব পিঠে,
আমার এ বুকে মায়েরে রাখিব,
মার মাই বড় মিঠে !"
হাসিয়া আবার শুধাইনু "রেণু
ঠাকু'মা কোথায় রবে ?"
অমনি সে কয় "আমার মাথায়
ঠাকু'মার ঠাঁই হবে !"

ক্ষুদ্র শিশুটী অবাক্ করিল,
কোলেতে লইনু তুলি'—
শিরে হাত দিয়া আশীষি কহিনু
"এ কথা যেওনা ভুলি!"

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

খোকার বুদ্ধি

মা কুলুঙ্গিতে পাঁচটি কমলা লেবু রাখিতেই খুকী আধ আধ গলায় "আমি তাব" "আমি তাব" করিয়া উঠিল। তাহার বড্ড সর্দ্দি হইয়াছে, মা তাহাকে একটা খেলনা দিয়া অন্যত্র লইয়া গেলেন। খোকা কাছেই দাঁড়াইয়াছিল, মা জিজ্ঞাসিলেন—বল ত বাবু, ঐ পাঁচটা লেবুর একটা যদি খুকী খাইয়া ফেলে তবে কটা থাকিবে? বাবু একবার লেবুগুলির দিকে চাহিল, একবার খুকীকে দেখিয়া লইল; পরে বলিল একটাও থাক্‌বে না মা। মা হাসিয়া বলিলেন তুমি কিচ্ছু জান না বাবু! খুকী একটা খাইলে চারিটি থাকিবে। বাবু বলিল, বাঃ রে, আমি বুঝি খেয়ে ফেলব না!

স্বাস্থ্য চিত্রে ও গল্পে।

ব্যায়াম।

সে এক রাজা—মস্ত বড় তাহার রাজত্ব, বিস্তর তাহার ধন দৌলত, মণি মাণিক্য। রাজার হাতীশালে হাতী, ঘোড়াশালে ঘোড়া। প্রজা মন্ত্রী আমলা—সব সময়েই রাজার সভা গম্ গম্ করিত।

রাজার ভারী অসুখ। দেশশুদ্ধ হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। ডাক্তার আসিল; কবিরাজ আসিল; হকিম আসিল। কিন্তু অসুখ আর সারে না। হারি হারি কারি কারি ঔষধ রাজা নিত্যই খান, কিন্তু হায় হায় রাজার অসুখও সারে না, রাজার দুঃখও ঘোচে না। শেষে ডাক্তার সাহেব আসিলেন— খাস বিলাতী ডাক্তার—তিনি আসিয়া সব দেখিয়া শুনিয়া বলিলেন,

"রাজা বাহাদুর, এক কাজ করুন, প্রত্যহ সকালে রোদ না উঠিতে, বিকালে রোদ না পড়িতে ডন করুন, কুস্তি করুন, না হয় ফুটবল, টেনিস খেলুন, আর কিছুই না পারেন অন্ততঃ খুব জোরে প্রত্যহ দুবেলা খানিকটা করিয়া হাটুন"।

সর্ব্বনাশ! রাজাবাহাদুর—এত বড় রাজ্যের মালিক—তিনি কি না রামা শ্যামার মত খেলিবেন, হাঁটিবেন! রাজা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। অমনি পাত্র, মিত্র, সভাসদগণ সকলেই হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

"ডাক্তার সাহেব বলে কি?—নিশ্চয়ই পাগল!"

রাজার পেট আবার কন্ কন্ করে, মাথা ঝন্ ঝন্ করে, বুক ধড়ফড় করে। এখন উপায়?

পাত্র মিত্র, সবাই আসিল, সবাই বলিল, "তাইতো এখন উপায়?"

রাজার পেট আবার কন্ কন্ করিয়া উঠিল, তিনি যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া বলিলেন,—

"অর্দ্ধেক রাজ্য আর রাজ কন্যা—যে আমার অসুখ সারিয়া দিবে"

তখনই ঢাক ঢোল পিটাইয়া রাজার লোকজন দেশ বিদেশে ছুটিল এই সংবাদ রটাইতে।

এত বড় রাজার অর্দ্ধেক রাজত্ব, আর অমন সুন্দরী রাজকন্যা—আর কি লোক স্থির থাকিতে পারে, দেশ বিদেশের হকিম, কবিরাজ, ডাক্তারে রাজ্য ভরিয়া গেল।

রাজা নিত্য হারি হারি ঔষধ, কারি কারি পথ্য গেলেন, আর ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়েন।

তবু অসুখ ত সারে না।

রাজা কাঁদেন, রাণী কাঁদেন, রাজ্য শুদ্ধ সব লোক কাঁদে—অসুখ আর সারে না।

শেষে আসিল জ্যোৎস্নাকুমার—জ্যোৎস্নার মত ফুটফুটে দিব্য কান্তি, বলিষ্ঠ দেহ—রূপ ও স্বাস্থ্য যেন সর্ব্বাঙ্গে উথলিয়া পড়িতেছে।

সভাশুদ্ধ লোক সে রূপ দেখিয়া চমকিয়া উঠিল।

জ্যোৎস্নাকুমার রাজাকে অভিবাদন করিয়া বলিল,

"আমি রাজার অসুখ সারাইব।"

সভাশুদ্ধ লোক সে কথা শুনিয়া অবাক হইল।

"তাইত—এ বলে কি?"

রাজা বলিলেন—"ক্ষতি কি—দেখি-না?"

সভাসদেরাও বলিল—"তাইত ক্ষতি কি?"

জ্যোৎস্নাকুমার তখন সভাসদগণের দিকে চাহিয়া একটু হাসিল, বলিল,

"মহারাজ, আমি ভোজ বাজি জানি। আমাকে যেমন তেমন যাদুকর ভাবিবেন না—পারস্য, আফগণিস্থান, তুরস্কের যাদুকরেরা পর্য্যন্ত আমার নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়াছে। আমি যে যাদুবিদ্যা শিখিয়াছি তাহা দ্বারা পৃথিবীতে এমন কোন ব্যাধি নাই যাহা আমি আরোগ্য না করিতে পারি। মহারাজ আমার ক্ষমতাটা একবার দেখুন"

এই বলিয়া তাহার এক সঙ্গীর নিকট হইতে এক অদ্ভুত গদা লইয়া রাজার নিকট রাখিল। বলিল,

"মহারাজ, ইহাকে সামান্য গদা ভাবিবেন না। এই যে কাষ্ঠ দেখিতেছেন ইহা মিসর দেশের মন্ত্রঃপূত কাষ্ঠ। যাদুবিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবতাদের মূর্ত্তি এই গদার উপর অঙ্কিত—আর আমি স্বয়ং ইহাকে মন্ত্রঃপূত করিয়াছি। এই গদা দ্বারাই মহারাজ আমি আপনার ব্যাধি আরোগ্য করিব। প্রত্যহ প্রাতে



মহারাজ, ইহাকে সামান্য গদা ভাবিবেন না।

ও সন্ধ্যায় আপনি ও আমি এই গদা লইয়া আরোগ্যের জন্য যে সকল প্রক্রিয়া করা দরকার—করিব।"

পরদিন প্রাতে জ্যোৎস্নাকুমার রাজার বাগানের এক খোলা যায়গায় রাজাকে লইয়া গিয়া বলিল,

"মহারাজ, দেশ বিদেশ হইতে গাছ, গাছড়া, ঔষধি সংগ্রহ করিয়া গদার মধ্যে রাখিয়াছি। প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় যতক্ষণ না আপনার শরীর ঘর্ম্মাক্ত হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত আপনাকে এই গদা ঘুরাইতে হইবে। দেহ ঘর্ম্মাক্ত হইলেই গদার ভিতর যে মন্ত্রঃপূত ঔষধি আছে তাহা কাজ করিতে আরম্ভ করিবে।"

মহারাজ প্রতিদিনই তুইবার করিয়া সেই মন্ত্রঃপূত গদা লইয়া খেলেন। প্রথম দিনেই মহারাজের পেট কন্ কন্, বুক ধড়ফড় করা বন্ধ হইল। দ্বিতীয় দিনে মহারাজের আর মাথা কড় মড় করিল না। তিন দিন, চার দিন, এক সপ্তাহ, তু সপ্তাহ, তিন সপ্তাহ, এক মাস গেল—মহারাজের দিব্য শরীর হইল—মহারাজ আরোগ্য লাভ করিলেন।

আবার রাজার মুখে হাসি ফুটিল, রাণীর মুখে হাসি ফুটিল, রাজ্যের লোক আমোদ আহ্লাদে মত্ত হইল।

জ্যোৎস্নাকুমার রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন, রাজত্বের অর্দ্ধেক পাইয়াছেন।

সেদিন মস্ত বড় সভা বসিয়াছে। মহারাজ ও জ্যোৎস্নাকুমার তুইজন তুই সিংহাসনে বসিয়াছেন।

সভাশুদ্ধ লোক জ্যোৎস্নকুমারকে দেখিয়া ধন্য ধন্য করিয়া উঠিল—এত বড় যাতুকর, এমন ক্ষমতা তাহার—ভূভারতে এমনটি আর কেহ কখন দেখে নাই। এই সময়ে জ্যোৎস্নকুমার সিংহাসন ছাড়িয়া উঠিল। বলিল,

"মহারাজ, সভাসদগণ, আপনারা হয় ত আমার ক্ষমতা ও এই মন্ত্রঃপুত গদার শক্তি দেখিয়া খুবই বিস্মিত হইয়াছেন। আমি নগন্য, আর আমার এই গদা ততোধিক নগন্য। কিন্তু এই শক্তি তবে কোথা হইতে আসিল"………

রাজা ও সভাসদগণ সকলেই বলিয়া উঠিল,

"এ শক্তি তবে কোথা হইতে আসিল ?"

জ্যোৎস্নাকুমার বলিল,

"হ্যাঁ মহারাজ, সেই উত্তর দিবার জন্যই আমি আজ আপনার নিকট আসিয়াছি। এই গদা নগন্যও বটে, অমূল্য সম্পত্তিও বটে। সোনা রূপার দ্বারা এই গদার মূল্য নিরুপণ করা যায় না, কারণ আপনারা ত সকলেই দেখিলেন কিরূপে এই গদার মন্ত্র প্রভাবে রাজ্যেশ্বর রাজার অমূল্য প্রাণ রক্ষা পাইল, অথচ মহারাজ, ইহার মূল্য অকিঞ্চিৎকর, কারণ আপনার রাজ্যের ক্ষুদ্রতম প্রজাও এই মন্ত্রযুক্ত গদা বিনা আয়াসে সংগ্রহ করিতে পারে।

রাজা ও সভাসদগণ সকলেই বিস্ময়ে পরস্পরের মুখের দিকে তাকাইতে লাগিল।

জ্যোৎস্নাকুমার আবার বলিল—

"হ্যাঁ মহারাজ, সত্যই তাই। এই গদা সাধারণ কাষ্ঠে নির্ম্মিত—এই কাষ্ঠের গদাই আপনার রোগ আরোগ্য করিয়াছে।"

"কিন্তু ইহার নিহিত মন্ত্র ?"

"সে মন্ত্র হইল—এই সামান্য কাষ্ঠে নির্ম্মিত গদায় আপনাদের অগাধ বিশ্বাস—যে, এই কাষ্ঠ নির্ম্মিত গদা অসাধারণ ঐশ্বরিক শক্তি-সম্পন্ন, যে এই গদার প্রভাবেই মানুষের সকল রকম রোগ আরাম হয়।"

তাহার পর রাজার দিকে চাহিয়া বলিল,

"মহারাজ, আপনারা সহজ কথা বিশ্বাস করেন না বলিয়াই এই গদার শক্তি প্রতিপন্ন করিতে মিথ্যা কথা বলিতে হইয়াছে। তাহার জন্য আমায় ক্ষমা করুন। কিন্তু মহারাজ আমার কথায় বিশ্বাস করুন সামান্য কাষ্ঠ নির্ম্মিত গদাই আপনার রোগ মুক্তির কারণ, আর এই গদায় আপনার বিশ্বাসই এত সহজে ও অল্প সময়ে আপনাকে রোগমুক্ত করিয়াছে।

তাহার পর সভাদগণের দিকে চাহিয়া বলিল—

"মহাশয়, সকল সময়েই আপনারা যে কোন উপায়ে শরীর চালনা করিবেন, আর এই বিশ্বাস রাখিবেন যে এইরূপ ব্যায়ামই শরীর সুস্থ ও সবল রাখিবার একমাত্র অমোঘ ঔষধ। এই বিশ্বাস রাখিয়া ব্যায়াম করিলে, দেখিবেন শরীর আপনার নিরোগ থাকিবে।"

শরীরকে সুস্থ ও সবল করিতে হইলে শরীরের প্রত্যেক অঙ্গকে প্রত্যহ চালনা করা দরকার। যে অঙ্গকে বেশী চালনা করা হইবে, সেই অঙ্গই অধিক বলশালী হইবে, যে অঙ্গকে কম চালন করা হইবে সে অঙ্গ তেমনি দুর্ব্বল হইবে। ইহাই হইল প্রকৃতির নিয়ম।

যে কোন জিনিস ব্যবহার না করিলে তাহাতে মরিচা পড়িয়া যায়। শেষে তাহা ব্যবহারের আর উপযোগী থাকে না। আমাদের শরীরের যে অঙ্গ আমরা ব্যবহার করি না, সে অঙ্গও ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। শেষে কার্য্যের অনুপযোগী হয়।

যাহারা হাতুড়ী পিটিয়া থাকে—তাহাদের হাত দেখ কত শক্ত—তাহারা হাতের ব্যবহারই বেশী করিয়া থাকে। আমাদের হাত তেমন শক্ত হয় না।

কারণ আমরা উহার সেরূপ ব্যবহার করি না। আমাদের শরীরের প্রত্যেক অঙ্গই হাতুড়ের হাতের মত শক্ত ও বলশালী হইতে পারে, যদি আমরা আমাদের অঙ্গগুলির তেমন ব্যবহার করিতে পারি।

তোমরা সেই প্রসিদ্ধ বলবান জোয়ান স্যাণ্ডোর নাম নিশ্চয়ই শুনিয়াছ। স্যাণ্ডোর প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ লোহার ন্যায় শক্ত, তিনি দেশবিদেশে তাঁহার শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। বাল্যকালে তিনি নিতান্ত দুর্ব্বল ছিলেন, তাঁহার আত্মীয় বন্ধু বান্ধবেরা তখন তাহার জীবনের আশা করেন নাই। কিন্তু তিনি নিজে ডাক্তার ছিলেন, তিনি জানিতেন শরীরকে সবল ও সুস্থ করিবার চাবি কাঠি লোকের নিজের হাতেই আছে। তিনি শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নিয়মিত ভাবে চালনা করিতে লাগিলেন, এবং ফলে তাঁহার শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গই সুস্থ ও সবল হইয়া উঠিল। শরীর চালনার দিকে তিনি এরূপ মন দিয়াছিলেন যে কালে তাঁহার সময়ে তাঁহার মত বলিষ্ঠ ও সবল লোক আর ছিল না। শুধু শরীর চালনা করিয়া তিনি এরূপ অদ্ভুত ফল পাইয়াছেন বলিয়াই তিনি সকলকে ব্যায়াম করিতে বলিয়াছেন। মানুষকে সুস্থ ও সবল করিবার জন্য তিনি এক নূতন ধরণের ব্যায়াম পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। গৃহের বাহির না হইয়া যাহারা শরীর চালনা করিতে চাহেন তাহাদের পক্ষে তাঁহার প্রবর্ত্তিত ব্যায়াম পদ্ধতি অত্যুৎকৃষ্ট সন্দেহ নাই। তোমাদের মধ্যে যাহাদের খোলা মাঠে যাইয়া খেলিবার সুযোগ ঘটিয়া উঠে না তাহারা স্যাণ্ডোর গ্রিপ ডাম্বেল, কিম্বা ডেভলপার লইয়া প্রত্যহ কিছুক্ষণ খেলিতে পার। স্যাণ্ডো বলেন, তাঁহার প্রবর্ত্তিত গ্রিপ ডাম্বেল কিম্বা ডেভলপার লইয়া প্রত্যহ শরীর পরিচালনা করিলে যে কোন মানুষ নিরোগ ও সুস্থ হইতে পারে। মানুষের পক্ষে ইহা কম বড় সৌভাগ্য নয়।

খোলা যায়গায় আলো ও বাতাসের মধ্যে ব্যায়াম করা ভাল। যে সকল বালক খোলা যায়গায় খেলে কিম্বা কাজ করে তাহাদের দেহ সুস্থ ও সবল হয়। কিন্তু যাহারা ঘরের মধ্যে বসিয়া থাকে তাহারা ক্রমশঃই দুর্ব্বল হয় ও শেষে তাহাদের স্বাস্থ্য একেবারে নষ্ট হইয়া যায়।

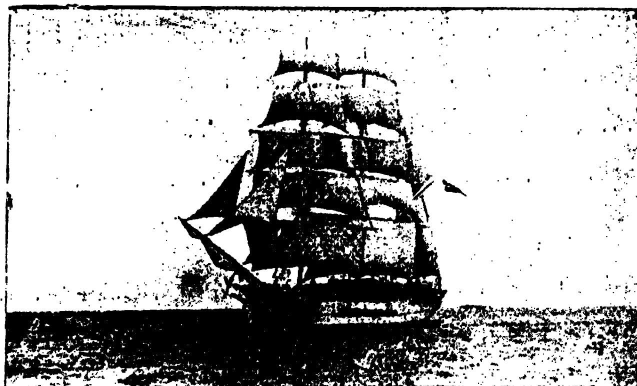
যাহাদের সুযোগ হইবে তাহারা খোলা মাঠে ফুটবল, ক্রিকেট টেনিস প্রভৃতি খেলিতে পার। যাহাদের তেমন সুযোগ হইবে না তাহারা প্রত্যহ স্যাণ্ডোর গ্রিপ ডাম্বেল কিম্বা ডেভলপার দ্বারা শরীর চালনা করিবে। কিন্তু ঐ সব ব্যায়াম করার সুযোগও যাহাদের হইবে না তাহারা প্রত্যহ খুব জোরে খানিকটা করিয়া বেড়াইবে। এরূপ ব্যায়াম করা যেরূপ সহজ তেমনি উপকারী।

কিন্তু সাবধান, শরীরে যেরূপ সহে সেইরূপ ব্যায়াম করাই ভাল। শরীরে যেরূপ সহে তাহার অতিরিক্ত ব্যায়াম করিলে উপকার অপেক্ষা অনুপকারই বেশী হয়।

আমরা যেন শুধু এই কথাটি সর্ব্বদা মনে রাখি শরীরকে সবল ও সুস্থ রাখিতে মুক্ত বায়ুতে নিয়মিত শরীর চালনা করা দরকার। দেহের স্বাস্থ্যের উপর এই ব্যায়াম ভোজবাজীর ন্যায়ই কার্য্য করে। এবং এই ব্যায়াম ভিন্ন দেহকে সুস্থ করিবার আর অন্য কোন উপায় নাই।

এই কথাটি ভাল করে মনে রেখ ভাই।
সকাল সাঁঝে একটু খানি ব্যায়াম করা চাই॥
ফাঁকা মাঠে ফাঁকা হাওয়ায় সহ্য যেমন হবে।
স্ফূর্ত্তি করে কোমর বেঁধে কর্ব্বে ব্যায়াম সবে।

আসবে খানিক কোসে হেটে যেমন হবে ভোর ॥
দেখবে কেমন থাকবে শরীর নিত্য পাবে জোর।
অসুখ ব্যাধি পালায় ছুটে মুখটি করে চুণ।
ব্যায়াম হলো এমনি জিনিস এমনি তার গুণ ॥



সেকালের যুদ্ধ জাহাজ

তাজ্জব !

সাপের গাঁদি।



ব্যাপারটা দেখ একবার ! এই রকম স্থানে গিয়ে পড়লেই হ'য়েছে আর কি ! উঃ কি ভীষণ কাণ্ড ! তবে সাধারণতঃ এ রকম দল বেঁধে ওরা থাকে না, বসন্তকাল ছাড়া। সেই সময়েই তাদের বাচ্ছা হ'বার সময়। আর যে দলটি দেখছ—এ দলে খুব বিষাক্ত সাপ নেই, ঢোঁড়া, জলঢোঁড়া এরাই তাল পাকিয়ে আছে। কাজেই ওদের মধ্যে যদিই গিয়ে পড়, তোমার বিশেষ কোন ভয় নেই।

কুড়ানো ছেলের কাহিনী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

উঁসলে তিন দিন ছিলাম। চতুর্থ দিন আবার আমরা যাত্রা করিলাম। কোথায় যাইতেছি জানিনা। পূর্ব্বে হইলে ভিটোলিস্‌কে জিজ্ঞাসা করিতেও সাহস হইত না, এখন তাহাকে আর তেমন ভয় করি না। চলিতে চলিতে পথে একদিন জিজ্ঞাসা করিলাম—আমরা কোথায় যাইতেছি ?

ভিটেলিস্ বলিলেন—"তুমি কি এদিককার সকল স্থানের নাম জান ?"

আমি বলিলাম, না। তখন তিনি বলিলেন, "তবে তোমার জিজ্ঞাসা করিয়া কি লাভ ?"

আমি চুপ করিয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি পড়িতে জান ?"

আমি বলিলাম—"না"

"তুমি পড়িবে ? তাহা হইলে আমরা কোথায় যাইতেছি জানিতে পারিবে। তাছাড়া আরও কত কি জানিতে পারিবে।"

আমার চিরদিনই লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহ ছিল। আমার আগ্রহ দেখিয়া তিনি সেই দিন হইতেই আমাকে লেখাপড়া শিখাইতে আরম্ভ করিলেন।

পড়াইবার সময় তাঁহার ধৈর্য্য দেখিয়া আমি আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। আমি সকল সময় মনোযোগ রাখিতে পারিতাম না, এক কথা কত সময় বারবার ভুলিয়া যাইতাম। কিন্তু তিনি বিরক্ত হইতেন না, একবারও তিনি শক্ত কথা বলিতেন না। বরং শিখাইবার তাঁহার আগ্রহ দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়া যাইতাম।

একদিন তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি গান গাহিতে পার ?"

আমি বলিলাম—"না।"

"গান শিখিবে? গান শিখিতে তোমার ইচ্ছা হয়?"

"হাঁ আমার গান শিখিতে খুবই ইচ্ছা হয়। আপনার মত যদি আমি গাহিতে পারিতাম!"

আমি যখন গাই তখন তোমার ভাল লাগে?"

"খুব ভাল লাগে। এমন আর আমার কিছুই ভাল লাগে না। আপনার গান শুনিতে শুনিতে এক এক সময় আমার কেমন কান্না পায়; কেন জানি না, কিন্তু চোখের জল আমি রাখিতে পারি না। আবার এক এক সময় মনে খুব আনন্দও হয়। তখন মনে হয় আমার যেন কোন দুঃখ কষ্টই থাকে না, আমি যেন কিছুই হারাই নাই, আমার যেন সবই আছে। মা-বাবাকে দেখিতে পাই; মনে হয় আমি যেন আমার সেই ছোট্ট বাগানটিতে খেলিয়া বেড়াইতেছি।"

আমার কথা শুনিতে শুনিতে তাঁহার চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। তিনি কি আমার কথায় দুঃখিত হইলেন? আমি জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি সস্নেহে আমাকে তাঁহার কোলের কাছে টানিয়া বলিলেন—"না বাছা, তোমার কথায় আমি কিছুমাত্র দুঃখিত হই নাই। তবে তোমার কথা শুনিতে শুনিতে আমার বহুদিন পূর্ব্বেকার কথা মনে আসিতেছিল। আজ তুমি আমার গান শুনিয়া কাঁদ, আনন্দিতও হও—তেমনি যখন আমার বয়স অল্প ছিল তখন এমনি আমি গান গাহিয়া কত লোককে হাসাইয়াছি, কাঁদাইয়াছি। তোমার কথা শুনিয়া মনে হইতেছে তুমিও একদিন গান গাহিয়া লোকদের হাসাইতে কাঁদাইতে পারিবে।"

এই বলিয়া তিনি চুপ করিলেন। তাঁহার জীবনের কথা আমি কিছুই জানিনা, কত সময় তাহা জানিবার ইচ্ছা হইয়াছে, আজ তাঁহার জীবনের সামান্য

একটু মাত্র আভাস পাইয়া তাঁহার জীবনের ইতিহাস জানিবার জন্য আরও আগ্রহ জন্মিল। কিন্তু এ সম্বন্ধে তাঁহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হইল না। ভবিষ্যতে কোন সুযোগের অপেক্ষায় রহিলাম।

পরদিন হইতেই ভিটেলিসের নিকট আমার সঙ্গীত শিক্ষা আরম্ভ হইল। আমার প্রথম দিনের গান শুনিয়াই তিনি এতদূর আনন্দিত হইলেন যে সজোরে আমার পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন যে, একদিন আমি একজন মস্ত বড় গুণী, ওস্তাদ হইব। (ক্রমশঃ)

শ্রীতেজেশচন্দ্র সেন।

সরল বাঙ্গালা সাহিত্য।

ময়নামতীর গান।

যাঁহারা গোরক্ষনাথের গান রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদেরই একদল লেখক ময়নামতীর গানও তৈরী করিয়াছিলেন। গোরক্ষনাথের গানে যেরূপ গোরক্ষের মহিমা ও কীর্ত্তির কথা আছে, ময়নামতীর গানে সেইরূপ হাড়িপা বা হাড়িসিদ্ধা এবং তাঁহার শিষ্যা ময়নামতীর সম্বন্ধে নানারূপ ঘটনা লেখা আছে। ময়নামতীর গানেও গোরক্ষনাথের কথা অনেক জায়গায় পাওয়া যায়।

মেহেরকুলের রাজা তিলকচন্দ্রের কন্যা ছিলেন ময়নামতী। তাঁহার শৈশবের নাম ছিল শিশুমতি। মেয়েটির যখন দশ বৎসর বয়স, তখন একদিন

গোরক্ষনাথ যোগী রাজবাড়ীতে উপস্থিত হন, তখন শিশুমতি তাঁহাকে খুব ভক্তি শ্রদ্ধা দেখান ও গোরক্ষ যোগী সন্তুষ্ট হইয়া কুমারীকে "মহা-জ্ঞান" শিখাইয়া দেন এবং তাঁহার নাম রাখেন—"ময়না-সুন্দর" বা ময়নামতী।

বঙ্গের রাজা মাণিকচন্দ্র এই ময়নামতীকে বিবাহ করেন। সে কালের রাজারা এক বিবাহ করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতেন না। মাণিকচন্দ্র সুন্দরী দেখিয়া আর অনেকগুলি বিবাহ করেন। ময়নামতী বুড়ী হইলেন এবং নূতন রাণীরা বয়সের সাথে সাথে দেখিতে খুব সুন্দরী হইয়া উঠিলেন, গতিকে বুড় রাজা সেই ছোট রাণীদের বাধ্য হইলেন। ময়নামতী তাহাদের সঙ্গে ঝগড়া করিতেন। মাণিকচাঁদ রাজা ময়নাকে রাজবাড়ী হইতে দূর করিয়া দিলেন,—তিনি ফেরুসা নামক জায়গায় যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন।

তোমাদের বলিয়াছি, গোরক্ষনাথের হাড়িপা বা হাড়িসিদ্ধা নামে আর একজন শিষ্য ছিলেন। ময়নামতী ও হাড়িসিদ্ধা একই গুরুর শিষ্য,—সুতরাং তাহাদের মধ্যে খুব ভাব ছিল। ময়নামতী হাড়িসিদ্ধাকে সহোদরের মত ভালবাসিতেন।

একদিন ফেরুসা নগরে ময়না বসিয়াছিলেন, এমন সময় মাণিকচাঁদ রাজার ভাই নেঙ্গা আসিয়া খবর দিল রাজা ছয়মাস যাবৎ রোগ শয্যায় শুইয়া আছেন, তাঁহাকে একবার শেষ দেখা দেখিতে চান। ময়নামতী আসিয়া রাজাকে খুব কাতর দেখিয়া বলিলেন, "তুমি আমার নিকট মহাজ্ঞান শিখিয়া লও, তাহা হইলে মৃত্যুর ভয় থাকিবে না।" রাজা বলিলেন—"নিজের স্ত্রীকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়া জ্ঞান শিখিব? প্রাণ থাকিতে নয়।" এ দিকে যম-দূতেরা উঁকি ঝুঁকি মারিতে লাগিল তাহারা ময়নাকে বড় ভয় করিত, কারণ ময়না মহাজ্ঞান জানিত—সে থাকিতে তাঁহারা রাজার প্রাণ লইতে সাহস করিল না।

রাজা বলিলেন "ময়না, তুমি নিজে গঙ্গা হইতে এক ঘড়া জল লইয়া আইস আমি তৃষ্ণায় মরিয়া যাইতেছি। আমি অন্য কাহারও হাতের জল খাইব না।" ময়না রাজাকে একা রাখিয়া যাইতে ইতস্তত করিতে লাগিলেন কিন্তু রাজা জেদ করিলেন; তখন ময়না লক্ষটাকা দামের মণিমাণিক্য বসানো গাড়ু হাতে লইয়া গঙ্গার ঘাটে জল আনিতে গেলেন, ইহার মধ্যে যমদূতেরা আসিয়া রাজার প্রাণ লইয়া গেল।

রাজার প্রাণ চলিয়া গিয়াছে, শুনিয়া ঝড়ের মত ময়না যমদূতদের পিছনে পিছনে ছুটিলেন। তিনি সাবিত্রীর মত জোড় হাতে যমরাজের পাছে পাছে স্বামীর প্রাণ ভিক্ষা চাহিতে গেলেন না, একেবার লাঠি হাতে যমকে মারিয়া ফেলিবার জন্য দাপটে চলিয়া গেলেন, ভয়ে যম চিংড়িমাছ হইয়া জলের মধ্যে ঢুকিলেন, ময়না পানিকাউড় হইয়া চিংড়ি মাছ খুঁজিয়া বাহির করিলেন, যম চিল হইয়া আকাশে উড়িলেন, ময়না বাজ হইয়া চিলকে তাড়া করিলেন। যম সাধু সাজিয়া বৈষ্ণবদের মধ্যে বসিলেন। ময়না মধুর মাছি হইয়া সাধুর মাথায় হুল ফুটাইলেন। কিন্তু যমকে মারিয়া ধরিয়া কোন ফল হইল না। মাণিকচাঁদ প্রাণ আর ফিরিয়া পাইলেন না। কিন্তু ধর্ম্মের বরে বুড় বয়সে রাণীর এক পুত্র হইল, ইনিই রাজা গোবিন্দচন্দ্র বা গোপীচন্দ্র। এই রাজা যখন ছোট ছিলেন, তখন ময়নামতী হাড়িসিদ্ধার মন্ত্রনা লইয়া রাজ্য শাসন করিতেন, কিন্তু যখন গোবিন্দচন্দ্রের বয়স ১৮ বছর হইল, তখন তাঁহাকে বলিলেন "তোমার হাড়িসিদ্ধাকে গুরু বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে, এবং তাঁহার আজ্ঞায় ১২ বছরের জন্য সন্ন্যাসী হইয়া রাজধানী ছাড়িয়া থাকিতে হইবে।"

এই অদ্ভুত আজ্ঞা শুনিয়া গোবিন্দ রাজা একবারে স্তব্ধ হইয়া গেলেন,

সেই বয়সেই তিনি কয়েকটি বিবাহ করিয়াছিলেন, এই স্ত্রীদের মধ্যে সাভারের হরিশ্চন্দ্র রাজার মেয়ে অদুনা খুব সুন্দরী ও স্বামীর প্রতি অনুরাগী ছিলেন। তিনি এবং অপরাপর স্ত্রীরা বিষম ক্ষেপিয়া গেলেন এবং রাণী সম্বন্ধে নানা খারাপ কথা বলিতে লাগিলেন, হাড়িসিদ্ধার সঙ্গে ময়নামতীর নানা কলঙ্ক দিতে লাগিলেন। গোবিন্দ রাজা মাতাকে বলিলেন "তুমি এবং হাড়িসিদ্ধ আমাকে তাড়াইয়া দিয়া এখানে নিরাপদে রাজ্য করিবে এই ফন্দী করিয়াছ। তোমার নামে নানা কথা শুনিতেছি, তুমি হাড়িসিদ্ধার বুদ্ধি লইয়া আমার পিতাকে বিষ খাওয়াইয়া মারিয়াছ। তুমি যদি খুব ভাল হইতে, তবে আমার পিতার মৃত্যুর পর তাহার সহিত সহমরণে গেলে না কেন? আমি নীচ হাঁড়ি বেটার নিকটে কিছুতেই মন্ত্র লইয়া তাহাকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিতে পারিব না। সে হাট-বাজারে নর্দ্দমা পরিস্কার করে, আমি এত বড় রাজা হইয়া সেই হাড়ি বেটার পায়ে প্রণাম করিতে পারিব না।" রাণী বলিলেন, "তোকে আমি বুকের রক্ত দিয়া মানুষ করিয়াছি, তুই ছেলে হইয়া এরূপ কদর্য্য কথা আমাকে বলিতেছিস্! তুই জন্মিয়াই মরিলি না কেন? হাড়ি সিদ্ধা আমার গুরু-ভাই, তাহার শক্তির কথা তুই কিছুই জানিস না, সে খড়ম পায়ে দিয়া নদী পার হয়, ইন্দ্রের পুত্র মেঘনাল তাহার মাথায় ছাতি ধরে, সে চাঁদের পিঠে রান্না করিয়া খায়, ইচ্ছা হইলে চাঁদ আর সূর্য্যকে কুণ্ডল করিয়া দুই কানে পরে, সে যমের ঝুটি ধরিয়া লইয়া আসে—তার আরও কত কি শক্তি আছে, তুই তাকে চিনিলি না। আর তোকে সন্ন্যাসী করিয়া বনে পাঠাইলে কি আমি সুখে থাকিব? তুই আমার একমাত্র ছেলে। আমার গুরু বলিয়াছেন, "তুই ১৮ বছর বয়সে সন্ন্যাসী হইয়া যদি ১২ বছর রাজ্য হইতে দূরে না থাকিস্, তবে তোর আয়ু আর বেশী নাই। ১৯ বছরে পা দিতে দিতে তোর মৃত্যু হইবে। আমি

তোর দীর্ঘজীবন কামনা করিয়া বড় দুঃখে বুক বাঁধিয়া বনে পাঠাইতেছি। আর তুই যে বলিলি আমি তোর পিতার সঙ্গে সহমরণ যাই নাই। এ কথা ঠিক নয়, আমি তোর পিতার জ্বলন্ত চিতায় চড়িয়া ছিলাম। কিন্তু মহাজ্ঞান থাকাতে আমার মৃত্যু হয় নাই।"

স্ত্রীদিগের পরামর্শে গোবিন্দ রাজা বলিলেন, "আচ্ছা দেখি, তোমার মহাজ্ঞান কিরূপ? তোমাকে তপ্ত তৈলের কড়ার মধ্যে ফেলিব! দেখি তুমি কিরূপে রক্ষা পাও।"

উত্তপ্ত ৮০ মন তৈলের কড়ার মধ্যে রাণীকে ফেলা হইল। সাত দিন ক্রমাগত অগ্নি জ্বাল হইয়া সেই তৈল ফুটিতে লাগিল—কিন্তু ময়নার এক গাছি চুলও পুড়িল না, গায়ে একটা ফোস্কাও পড়িল না। অদুনা প্রভৃতি স্ত্রীরা নানারূপ বুদ্ধি করিয়া ময়নামতীকে বিষ কিনিয়া সন্দেশের মধ্যে ভরিয়া খাওয়াইল—মহাজ্ঞানের বলে ময়না বাঁচিয়া উঠিলেন।

তখন গোবিন্দচন্দ্র রাজা সন্ন্যাসী হইলেন। ১২ বছর হাড়িসিদ্ধার উপদেশে নানা স্থানে ঘুরিয়া হীরা নটীর চাকর হইলেন, হীরা গোবিন্দচন্দ্রের অপূর্ব্ব সুন্দর মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহাকে ভুলাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু নানারূপ অত্যাচার সহ্য করিয়াও গোবিন্দচন্দ্র খাঁটি রহিলেন, তাঁহার চরিত্রের কোন দোষ ঘটিল না।

বার বছর পরে যখন জটা মাথায়, বাকল-পরা রাজা উস্ক শুষ্ক মুখে নিজ রাজ-বাড়ীর অন্দরে ঢুকিতে চেষ্টা করিলেন, তখন অদুনা তাহাকে চিনিতে না পারিয়া রাজ বাড়ীর প্রকাণ্ড কুকুর লেলাইয়া দিয়া তাড়া করিলেন, কুকুর স্বীয় প্রভুকে চিনিতে পারিয়া আনন্দে লেজ নাড়িতে লাগিল। অদুনা প্রকাণ্ড রাজহস্তীটাকে লেলিয়া দিলেন, অচেনা অতিথকে পায়ে দলিয়া মারিতে।

হাতী স্বীয় প্রভুকে চিনেতে পারিয়া হাটুগাড়িয়া বসিয়া শুঁড় ঘুরাইয়া প্রণাম জানাইল ও তার দুই চোখের জল পড়িতে লাগিল। তখন হঠাৎ অদুনা স্বামীকে চিনিতে পারিলেন, বার বছর শেষ হইয়াছে—সে কথা মনে পড়িল, তখন নীচে নামিয়া আসিয়া মাথার চুল দিয়া গোবিন্দচন্দ্রের পা দুখানি 'যেন বাঁধিয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন "প্রভু, অবোধ পশুরা তোমাকে চিনিল আর তোমার হতভাগিনী রাণী তোমাকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিতে চাহিয়াছে!"

শূন্য পুরাণ।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে বুদ্ধকে ছোট লোকেরা ধর্ম্মঠাকুর বলিয়া পূজা করিত। রমাই পণ্ডিত একজন ধর্ম্ম পূজার প্রধান পুরোহিত ছিলেন। ইনি ধর্ম্মপালের সময় বিদ্যমান ছিলেন, সুতরাং ইং ১০।১১ শতসনের মধ্যে কোন সময়ে তিনি জন্মিয়াছিলেন। শূন্য পুরাণ রমাই পণ্ডিত লিখিয়াছিলেন। ইহাতে ধর্ম্মঠাকুরকে কি ভাবে পূজা করিতে হয়,তাহার সম্বন্ধে খুঁটি নাটি অনেক কথা আছে। সৃষ্টি কেমন করিয়া হইল, সৃষ্টির প্রথমে নিরঞ্জন প্রভুর কিরূপ উৎপত্তি হইল এবং তাঁহার বাহন উলুক কি কি করিলেন, সে সকল কথা এই পুস্তকে আছে। সর্ব্বপ্রথম শিবঠাকুর ধর্ম্মকে পূজা করেন, তিনি কোন কোন সময় উলঙ্গ থাকেন কোন কোন সময় দুর্গন্ধ বাঘ ছাল পরেন, কোন সময়ে ভিক্ষা করিয়া চাল পান, কখন শুধু হরতকী খাইয়া ক্ষুধা নিবৃত্তি করেন, কখনও বা উপোস করেন। এই সকল দেখিয়া এক ভক্ত তাঁহাকে চাষ করিয়া ধান বুনিতে বলিতেছেন, কাপাস বুনিয়া তুলো তৈরী করিয়া সূতোর কাপড় তৈরী করিতে বলিতেছেন এবং তিনি ছাই মাখিয়া শরীরটা একবারে খরখরে করিয়া ফেলিয়াছেন দেখিয়া ভক্ত তাঁহাকে তিল বুনিয়া তৈল বানাইতে অনুরোধ করিয়া কান্না কাটি করিতেছেন—এই সকলও শূন্য পুরাণে আছে, ইহা ছাড়া হনুমান

ধর্ম্ম-মন্দিরের কোন্ কোন্ দ্বার রক্ষা করেন, সেতাই পণ্ডিত, কংসাই পণ্ডিত কোন দ্বার রক্ষা করেন, তাহাও আছে। মীননাথ, চৌরঙ্গী প্রভৃতি সাধুগণের নাম জায়গায় জায়গায় উল্লেখ আছে। এই পুস্তকের কতক অংশ কবিতায়, আর কতকাংশ গদ্যে লিখিত হইয়াছে। সাপের মন্ত্র ছাড়া এই সকল গদ্য হইতে পুরাণ বাঙ্গলা গদ্য আর কোথায়ও পাওয়া যায় না।

শূন্য পুরাণের ভাষার অনেক্ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কিন্তু এক এক জায়গায় ঠিক পুরাণ সেই আদিকালের ভাষা আছে, যথা

"একল রমাই পণ্ডিত সরল অবধান" ইহার অর্থ "একা রমাই পণ্ডিতকে সকলটির তুল্য বলিয়া জানিও।"

ধর্ম্মঠাকুর যে বুদ্ধদেব ভিন্ন আর কেহ নন, এই পুস্তকের জায়গায় জায়গায় তাহা স্পষ্টই বোঝা যায়। এক স্থানে আছে "ধর্ম্মরাজ যজ্ঞ নিন্দা করে" জয়দেব কবি বুদ্ধদেব সম্বন্ধে যে স্তব লিখিয়াছেন—তাহাতে বুদ্ধদেবের পরিচয় স্থলে লিখিয়াছেন,—"বুদ্ধদেব যজ্ঞের নিন্দা করেন।"

শূন্য পুরাণের আর এক স্থলে আছে—"সিংহলে শ্রীধর্ম্মরাজের বহুত সম্মান" সকলেই জানেন সিংহলে, বৌদ্ধদের সংখ্যা খুব বেশী।

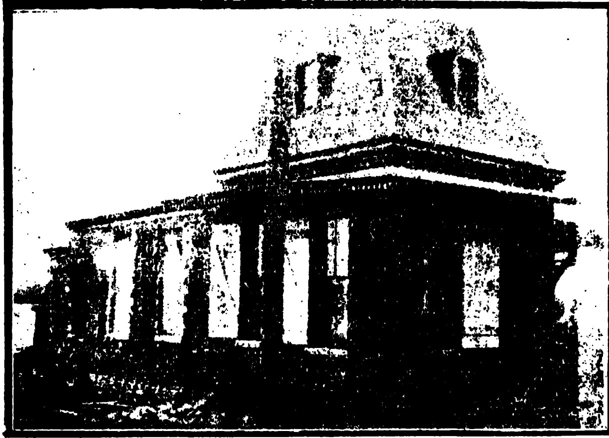
শূন্য পুরাণের শেষের দিকে জাজপুরে মুসলমানের অত্যাচারের কথা আছে, সে অংশটা রামাই পণ্ডিতের লেখা বলিয়া মনে হয় না, বোধ হয় শেষে কোন লেখক উহা শূন্য পুরাণে জুড়িয়া দিয়াছেন।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

———

তাজ্জব !

কয়লা ওয়ালার বাড়ি।



একজন কয়লার খনির মালিক ঐ বাড়ীখানি করিয়াছেন,—কেমন দেখতে বল দেখি ? বেশ, না ? আচ্ছা, অনুমান করে বল ত বাড়ীটা কিসের তৈরী ? ইট, কাঠ পাথর—এই ত বলছ ? না, গো, না—তা নয়, কয়লার খনির মালিকের বাড়ীটি বিলকুল কয়লা দিয়ে তৈরী। পৃথিবীতে এই একটা বাড়ীরই খবর পাওয়া যায়। বাড়ীটার একটা মজা এই যে প্রচণ্ড গ্রীষ্মে যখন অন্যলোকে আইঢাই করে, এ বাড়ীটার মধ্যে যারা বাস করে—তারা কিন্তু পাখা টানা বন্ধ করে, বেশ আরাম করে শুয়ে বসে থাকে।

ইতরপ্রাণীর চিন্তা-শক্তি

মানুষ ছাড়া আর কোন জীবজন্তু চিন্তা করে কি না, এ প্রশ্নটি হয়ত তোমরা নিজেরাও অনেকবার নিজেকে করিয়াছ। সত্যই, এ একটা প্রশ্নের মত প্রশ্ন বটে। সাধারণতঃ যে সমস্ত জীবজন্তু আমাদের সংস্রবে আসে বা নজরে পড়ে, তাহাদের কার্য্যকলাপ নিরীক্ষণ করিলে বিশেষ কিছু জানিতে পারা যায় না। তবে একেবারেই যে কিছু দেখা যায় না, তা নয়। আমরা ছেলেবেলায় দেখিতাম, সহিস বেলা দশটার সময় আস্তাবলে ঢুকিলেই আমাদের ঘোড়াটা একবার মুখ ফিরাইয়া চিঁ হিঁ করিয়া আমাদের দেখিয়া লইত, সে ভাবিত বুঝি, ইহারা যখন হাজির হইয়াছে. তখন আমার পিঠেও সাজ পড়িবে এবং স্কুলে না যাইয়া উপায় নাই—কিন্তু এ হয়ত তাহার অভ্যাসের গুণে! আমার নিজের একটা পাখী ছিল। কোন দিন কোন কারণে আমার বদলে যদি আর কেউ তাহাকে খাবার দিতে যাইত, সে চ্যাঁ চ্যাঁ করিয়া বাড়াটাই কাঁপাইয়া তুলিত। আমার বাড়ীর লোকে বলিতেন, পাখীটা আমারই 'নেওটা' হইয়া পড়িয়াছে। আসলে কিন্তু তা নয়; আমার হাতে না হইলে যেমন তাহার খাওয়া চলিত না, এমন দিন ছিল না যে দিন না আমার হাতের কোন না কোন স্থান রক্তারক্তি করিয়া সে ছাড়িত। বাড়ীর লোক বলিতেন আদর! আমারও বিশ্বাস তাই ছিল,—আদর! বিশ্বাসের ভুলেই আমি যখন তাহাকে খাবার দিতাম, সে একটু স্বাধীনতা পাইত এবং একদিন খাঁচার দ্বারটি খুলিয়া তাহার খাবার মাখিতেছি, পাখীটা বার দুই ক্যাঁ ক্যাঁ করিয়া ফুড়ুৎ করিয়া উড়িয়া ছাদের পাঁচালে বসিল। তাহার উপর আমার বিশ্বাস এমনি ছিল যে আমি তাহার দিকে চাহিয়া হাসিতে লাগিলাম, সে যে তখনই ফিরিয়া আসিয়া উপাদেয় খাদ্য খাইবেই তাহা খুব ভাল রূপই জানিতাম। কিন্তু পাখীটা বার দুই মুখ 'ভ্যাংচাইয়া বোঁ করিয়া আকাশে পাখা দুলাইয়া দিল; তখনও

আশা ছিল; দু'দিন তিন দিন পর্য্যন্ত ছিল, কিন্তু কোথায় কে? তখন সে যে সেই মুখ ভ্যাংচাইয়া গিয়াছিল তাহার অর্থ আমি এই করিলাম যে তখন সে ঠিক এই কথাই ভাবিতেছিল—কেমন? ধরিবে আর?

বুনো ঘোড়ারা বনের মধ্যে তাহাদের দলপতিকে সুশিক্ষিত সেনাপতির মতই মানিয়া চলে; দলপতির আদেশ প্রাণপণে পালন করিয়া থাকে। তাহারা যখনই বনে বিচরণে, আহার অন্বেষণে বাহির হয়, তখন একজনকে নেতা করিয়া লয়। হয় বৃদ্ধ অশ্বিনী নয়ত খুব জোয়ান ছোকরা গোছের একজন এই সম্মানের পদ পায়। তখন সে থাকে সকলের আগে, আর সবাই তাহার পিছনে। খাবার খুঁজিতে খুঁজিতে অনেকেই দল ছাড়া হইয়া পড়ে তখন দুই রকম সঙ্কেতের শব্দ করিয়া তাহারা বিপদের আশঙ্কা জানায়। খুব টানিয়া চিহিঁহি......শব্দ শুনিলে বুঝিতে হইবে যে পলায়নের সময় সন্নিকট; আর ছোট টানের চিহিঁতে দলের সকলকে একস্থানে জড় হইতে বলা হয়। বিপদের সম্ভাবনা দেখিলেই এই ঘোড়ারা প্রথমে গ্রীবাটা আর লেজটা উচু করিয়া নাড়িতে থাকে। যদি মানুষের সন্ধান পায় ত এমন বিকট চীৎকার করে যে আধ মাইল দূর অবধি তা শোনা যায়। এই রকম শব্দ টব্দ যা কিছু তা এই দলপতিই করিয়া থাকে, কারণ সেই থাকে সব চেয়ে বেশী সতর্ক আর সব দিকে ঘুরে ফিরে সেই লোকটিই পাহারা দিয়া থাকে। দলপতির 'বিউগেল' (ঐ চিঁহিঁহিঁ) বাজিলেই দলের সকলেই একত্রিত হইয়া ছুট্ দেয়। এলোমেলো হ'য়ে ছুটে না, বেশ নিয়ম ও সারিবদ্ধ হইয়া পালাইতে থাকে। দলপতি প্রথমে,সর্ব্বাগ্রে,সবার পিছনে দলের মজবুত 'লোক' যাহারা,আর মাঝখানে বাচ্ছারা।

দক্ষিণ আমেরিকায় এক রকমের ছোট ছোট শূকর আছে তাদের বলে পিকারী। তারাও যখন বনে বাহির হয়, শিকারীর সন্ধান পাইলেই তাহাদের দলপতি একরকম শব্দ ক'রে সবাইকে জড় করে আর এমনি ছুট দেয় যে শিকারীর

হাতের অস্ত্র হাতেই থাকিয়া যায় আর ধূলায় নাক মুখ চোখ সব বন্ধ হয়। তাহাদের ডাক-টা প্রায় এই-রকমের, উফ্ উফ্ উফ্! (আমাদের হনুমানেরা উপ্ উপ্ করে শুনিয়াছ বোধ হয়, এও কতকটা সেই রকম) পিকারী-শিকারী ঐ শব্দ শিক্ষা করিয়া বনে যায়, আর ঐ উফ্ উফ্ করিয়াই বেচারাদের ভুলাইয়া আনিয়া গুলি করে।

আফ্রিকার বন মানুষেরা অনেক দেশের পুলিসের চেয়েও নিয়মবদ্ধ হইয়া বেড়ায়। তারাও একজন দলপতি করে। যখন কোন বিপজ্জনক স্থানে খাইতে যায়, দলপতি বাছিয়া বাছিয়া ষণ্ডামার্ক দেখিয়া শান্ত্রী-পাহারা তৈরী করিয়া চারদিকে তফাতে তফাতে বসাইয়া দেয়। এই শান্ত্রী-পাহারা চুপ করিয়া বসিয়া পাহারা দেবে—এই তাহাদের কাজ। এর মধ্যে যদি কেউ কোন বিপদের সন্ধান বোঝে সেই প্রথম চেঁচিয়ে ওঠে, তখন্ সবাই সব কাজ ছাড়িয়া জমা হইয়া যায়। তখন সে যদি আবার শব্দ করে, আবার এরা কাজে লেগে যায়। তার মানে বিপদ তত নিকটে নহে।. কিন্তু আবার যদি শব্দ হয় তখন দলপতি পালাবার হুকুম দেয় আর মুহূর্ত্ত মধ্যেই সব অদৃশ্য হইয়া যায়। তাহাদের পালাবার কায়দাটি বেশ, আগে পিছু পাহারা ত থাকেই, আবার গাছের ডালে ডালে যতদূর সম্ভব পাহারাও দিয়া চলে।

বনমানুষেরা রাত্রে একজনকে পাহারায় না রাখিয়া নিদ্রা যায় না। সাধারণতঃ তাহারা পর্ব্বতগুহার মধ্যে বাস করে। রাত্রে সবাই যখন শুইতে গেল একজন শুধু গাছে চড়েই হোক্ বা পাহাড়ের মাথাতেই হোক জাগিয়া বসিয়া রইল। বেবুনের পরম শত্রু চিতাবাঘও এ হেন সময়ে তাহাদের আক্রমণ করতে সাহস পায় না, যতক্ষণ না সে সেই পাহারাওয়ালাটিকে মারিয়া ফেলিতে পারে।

মোটের্ উপর ইতরজন্তুদের মধ্যে স্কুল পাঠশালা না থাকিলেও রাশি রাশি পড়বার বই না থাকিলেও—তাহারা ভাবিতেও জানে, খাবার জোগাড় করে খাইতেও জানে, আর আত্মরক্ষা করিতে খুব ভালোরকমই জানে—বুঝিতে পারিলে ভাই? বি।

রাল দুর্গার ব্রত কথা।

(কুটে বামুন)

ফাল্গুন মাস।

সে দিন বৈকুণ্ঠে বিশেষ কোন কাজ কর্ম্ম নাই। নারায়ণ সারা দিনই ঘরে বসে আছেন। সারা দিন ঘরে বসে বসে তিনি একেবারে বিরক্ত হয়ে ছিলেন। সমস্ত দিন কোন ক্রমে কাটিয়া গেল, কিন্তু সন্ধ্যাটা আর কিছুতেই কাট্‌তে চায় না। নারায়ণ লক্ষ্মীকে ডেকে বল্‌লেন, "লক্ষ্মী, সারা দিন ঘরে বসে বসে আর কিছুই ভাল লাগছে না, এস একটু পাশা খেলা করা যাক্।"

লক্ষ্মী তো তাই চান। লক্ষ্মী পাশা খেল্‌তে বড় ভাল বাস্‌তেন। নারায়ণের এই কথা শুনে লক্ষ্মী তাড়াতাড়ি পাশার ছক্ বের করে আন্‌লেন। পাশার ছক্ পাতা হলে নারায়ণ আর লক্ষ্মী পাশা খেল্‌তে বস্‌লেন। এখন সেইখান দিয়ে একটা বামুন যাচ্ছিল, বামুনও পাশা খেলায় খুব মজ্‌বুত ছিল। লক্ষ্মী নারায়ণ পাশা খেলছেন দেখে সে এসে সেখানে দাঁড়াল। বামুনকে সেইখানে এসে দাঁড়াতে দেখে নারায়ণ তার দিকে চেয়ে বল্‌লেন "দেখ বামুন, তুমি যদি লক্ষ্মীকে কোন কথা বলে দাও তা হ'লে আমি তোমাকে কুটে করে দেব।"

লক্ষ্মী নারায়ণের এই কথা শুনে বামুণের দিকে চোখ রাঙ্গিয়ে বল্‌লেন "বামুণ, তুমি যদি নারায়ণকে কোন কথা বলে দাও তাহ'লে আমি তোমাকে ভস্ম করে ফেল্‌বো।"

বামুন মহা বিপদে পড়ে গেলেন। তিনি মনে মনে ভাবলেন—ভস্ম হওয়ার

চেয়ে কুটে হওয়া ভাল। তাই তিনি লক্ষ্মীকেই বলে দিতে আরম্ভ কল্লেন। লক্ষ্মী নারায়ণের দিকে চেয়ে খেল্ দিলেন কাজেই লক্ষ্মীরই জিত হ'লো। লক্ষ্মী যেমন জিতেছেন অমনি নারায়ণ মহা গরম হয়ে উঠলেন। তিনি রেগে তখনই বামুনকে কুটে করে দিলেন। বামুন কুটে হয়ে নারায়ণের অনেক স্তব স্তুতি করতে লাগলেন, লক্ষ্মী বামুনের জন্যে নারায়ণকে অনেক ধরে পড়্লেন, বল্লেন, "বামুনের অপরাধ কি? তুমি খেল্তে জান না, তাই হেরে গেছ, এর জন্যে বামুনের উপর তোমার রাগ করা অন্যায়। বামুনকে ভাল করে দাও।"

বামুনের স্তব স্তুতিতে নারায়ণের রাগ অনেকটা পড়ে এসেছিল তিনি বামুনের দিকে চেয়ে বল্লেন,"তুমি যখন আমাকে হারিয়ে দিয়েছ তখন কুট ভোগ তোমাকে কর্ত্তেই হবে। তবে মর্ত্ত্যে এক রাজার মেয়ে আছে তার নাম ইচ্ছামতী। সে সূর্য্য দেবের বড় ভক্ত। সে যদি ইচ্ছা করে কোন দিন তোমার গলায় মালা দেয় তাহ'লেই তুমি এই কুট রোগ থেকে মুক্তি পাবে, নইলে আর তোমার উদ্ধার নেই।

নায়ায়ণের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে বামুন কুট রোগ গ্রস্থ হয়ে মর্ত্ত্যে গেল। মর্ত্ত্যে গিয়ে এক রাস্তার ধারে পড়ে থাকে। আর রোগের যন্ত্রণায় চেঁচায়। হাতে পায়ে কুট, নড়ে চড়ে যে কোথায় যাবে তার ও কোন উপায় নেই। পথের ধারে পড়ে পড়ে চেঁচায় দয়া করে যে যা দেয় তাই খেয়ে দিন কাটায়। বামুন রাস্তার মাঝে এমন জায়গায় বসে যে লোকে রাস্তা দিয়ে চল্তে পারে না কেউ ডিঙ্গিয়ে যায়, কেউ মাড়িয়ে যায়। গালাগালি দিতে কেউ কসুর করে না. বলে "কুটের মরণ রাস্তার উপরে হয়েছে—লোকে যে যাবে আস্বে তার জায়গাটা পর্য্যন্ত রাখেনি। নিজে তো মর্ছে আবার লোক্কেও না মজিয়ে ছাড়বে না।"

এই ভাবে কুটে বামুনের দিন কাটে। এক দিন হয়েছে কি জান, ভোর বেলা বামুন যন্ত্রণায় পড়ে পড়ে চেঁচাচ্ছে এমন সময়ে সেই পথ দিয়ে রাজার কন্যা ইচ্ছামতী



তুমি একটু পথ দাও, আমার শিব পুজোর বেলা হয়ে যাচ্ছে।

ফুলের সাজী হাতে করে শিবপূজা কর্ত্তে যাচ্ছিল। রাজার মেয়ে ইচ্ছামতী কিছুদূরে এসে দেখেন এক কুটে বামুন রাস্তার ধারে পড়ে আছে। রাজ কন্যা ইচ্ছামতী এই দেখে বামুনকে বল্লেন—"বামুন, ঠাকুর একটু সরে আমায় পথ দাও, শিবপূজো কর্ত্তে হবে।

বামুন রাজকন্যার কথা শুনে বল্‌লেন, আমার তো নড়বার ক্ষমতা নেই। তুমি এক কাজ কর, সকলে যেমন আমাকে ডিঙ্গিয়ে যায় তুমিও আমাকে সেই রকম ডিঙ্গিয়ে যাও।"

ইচ্ছামতী রাজার কন্যা, বামুনকে ডিঙ্গিয়ে যান কেমন করে। তিনি বামুনকে বল্লেন, "বামুন, তুমি বামুন, তোমাকে তো আমি ডিঙ্গিয়ে যেতে পারিনি, তুমি একটু পথ দাও আমার শিবপূজোর বেলা হচ্ছে।"

কুটে বামুন কিন্তু কিছুতেই নড়েন না। তেমনি পড়ে রইলেন। এদিকে ইচ্ছামতী রাজকন্যার শিব পূজোর বেলা ক্রমেই বেড়ে যেতে লাগল। তিনি বামুনকে একটু সরবার জন্যে অনেক মিনতি কর্ত্তে লাগলেন। কিন্তু বামুন যেমন পড়ে ছিলেন তেমনই পড়ে রইলেন। শেষ রাজ কন্যাকে অনেক মিনতি করে বল্‌লেন, "তুমি যদি স্বেচ্ছায় আমার গলায় মালা দিয়ে আমায় বিয়ে কর তা হ'লে আমি তোমায় পথ দিতে পারি।"

রাজ কন্যা আর করেন কি! বামুন না সর্‌লে তাঁর শিবপূজো কর্ত্তে যাওয়া হয় না। কাজেই তিনি তাতেই রাজি হলেন। বামুনের গলায় মালা দিয়ে বামুনকে বিয়ে কল্লেন। বামুন তখন রাস্তা দিলেন, রাজ কন্যা শিবপূজো কর্ত্তে গেলেন। শিবপূজো শেষ করে রাজ কন্যা বাড়ী ফিরে রাজারাণীকে সব কথা বল্লেন। মেয়ের কথা শুনে রাজা একেবারে রেগে আগুন হয়ে গেলেন, এবং তখনই মেয়েকে বনে পাঠিয়ে দিলেন। রাজ কন্যা ইচ্ছামতী তাঁর কুটে স্বামীকে

সঙ্গে নিয়ে বনবাসে গেলেন। এক বছর যায়—দু'বছর যায় এমনি করে কত বছর চলে গেল। ইচ্ছামতী দিন রাত কুটে স্বামীর সেবা করেন কিন্তু বামুনের আর রোগ কিছুতেই ভাল হয় না। স্বামী রাত্রে ঘুমুলে ইচ্ছামতী কাঁদেন আর রোজ বলেন—

কুটে স্বামীর সেবা করে জন্ম কেটে গেল।
তবু আমার স্বামীর কুট ভাল না হইল॥

একদিন এই কথা বলে ইচ্ছামতী কাঁদ্‌ছেন সেই সময় লক্ষ্মী গাছের উপর লক্ষ্মী প্যাঁচা সেজে এসে একটা পাতা ইচ্ছে করে গায়ে ফেলে দিলেন। রাজ কন্যা তাড়াতাড়ি সেই পাতা তুলে দেখেন তাতে রাল দুর্গার ব্রত করবার নিয়ম লেখা আছে। তিনি সেই পাতা-খানা যেমন পড়েছেন অমনি সেই প্যাঁচাটী গাছ থেকে বলে উঠলো,—

"রাল দুর্গার ব্রত তুমি কর ইচ্ছামতী।
তার কৃপায় রোগ মুক্ত হবে তোমার পতি॥"

ইচ্ছামতী প্যাঁচার মুখে এই কথা শুনে ভারি খুসি হলেন তিনি তারপর দিন উঠে শুদ্ধ হয়ে সতরটী ধান সাতটী দুর্ব্বা ও দুই কলা নিয়ে একটী তামার ঠাটে রাখলেন। সেই ঠাটে রোজ সকালে উঠে ফুল দেন, গঙ্গার জল দেন, এমনি করে পূর্ণিমা এলো। সেই দিন তিনি রাল দুর্গার ষোড়োশোপচারে পূজো করে আর সতর মুঠা চালের গুড়ি খেয়ে রইলেন। এমনি করে পৌষ মাস এলো। পৌষমাসের পূর্ণিমার দিন রাল দুর্গার পূজো করে সতেরো মুঠো চালের পায়েস খেয়ে রইলেন। তার পর মাঘ মাসে আবার পূর্ণিমায় সেই রকম পূজো করে দই খেয়ে রইলেন। তারপর শেষ ফাল্গুন মাস এলো, সেই মাসেই হ'লো এই ব্রতের

আসল পূজো। **ফাল্গুন মাসের** পূর্ণিমাতে রাল দুর্গার ভক্তি করে পূজো করে সেই তামার ঠাট্‌কে জলে ভাসিয়ে দিলেন আর সাতরো মুঠো চালের পুলি পিটে খেয়ে রইলেন। সেই দিন রাত্রে সূর্য্যদেব ইচ্ছামতীকে দেখা দিয়ে বল্লেন, "ইচ্ছামতী তুমি মনের মত বর নাও।"

ইচ্ছামতী সূর্য্যদেবকে সম্মুখে দেখে বল্‌লেন,—

"আমার কন্দর্পের মত পতি হ'ক।
গুণবান পুত্র হক॥
রাজার মত ঐশ্বর্য্য হ'ক॥"

ইচ্ছামতী যে যে বর চাইলেন—সূর্য্যদেব তাঁকে সেই সেই বর দিয়ে অন্তর্ধান হলেন। সূর্য্যদেবের কৃপায় বামুনের কুট রোগ ভাল হয়ে গেল। তাঁর কন্দর্পের মত রূপ হ'লো। রাজার মত ঐশ্বর্য্য হ'লো, গুণবান পুত্র হ'লো। ইচ্ছামতী স্বামী পুত্র নিয়ে বাবার কাছে ফিরে এলেন। রাজা মেয়ে জামাইকে পেয়ে কোল দিলেন। চারদিকে সুখের হুলাহুলি পড়ে গেল। ইচ্ছামতী যতদিন বেঁচে ছিলেন বরাবর রাল দুর্গার ব্রত কর্ত্তে লাগলেন। শেষে বুড় বয়সে তাঁরা স্বামী স্ত্রীতে লক্ষ্মী-নারায়ণের কৃপায় স্বর্গে গেলেন। সেই থেকে রাল দুর্গার ব্রত এ দেশে প্রচার হ'লো। কোন কোন দেশে এই ব্রত ফাল্গুন মাসে উদ্‌যাপন কর্ত্তে হয় বলে এই ব্রতকে ফাল্গুনে ব্রত বলে।

রাল দুর্গার কল্লে ব্রত দুঃখ নাহি রয়।
সূর্য্যদেবের কৃপায় হয় সর্ব্বত্র জয়॥

———

ছেলেদের হিন্দুস্থান

রামায়ণ।

অযোধ্যার রাজা দশরথ—স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল তাঁহার ভয়ে কম্পমান। এত মান সম্ভ্রম কিন্তু রাজার মনে সুখ ছিল না। রাজা নিঃসন্তান। কিন্তু চিরদিন ত আর



কৌশল্যা স্বপ্ন দেখলেন স্বয়ং নারায়ণ তাঁহার গর্ভে আসিতেছেন।

মানুষের সমান যায় না, রাজারও সুখের দিন আসিল। জ্যেষ্ঠা রাজমহিষী কৌশল্যা স্বপ্ন দেখিলেন, স্বয়ং নারায়ণ তাঁহার গর্ভে আসিতেছেন। কত দান ধ্যান তপস্যা করিয়া শেষে রাজার তিন রাণীর গর্ভে চারিটি সন্তান হইল। রাজার মুখে হাসি আর ধরে না।

রাজার চার ছেলে রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন—সকলেই রূপে গুণে অতুলনীয়। দিব্য কান্তি, বলিষ্ঠ দেহ, সুতীক্ষ্ণ মেধা—চার রাজপুত্রের সুখ্যাতিতে রাজধানী মুখরিত হইয়া উঠিল। ক্রমে সেই যশোসৌরভ সারা অযোধ্যায় ছড়াইয়া পড়িল। রাজার সুখের আর অবধি রহিল না।

কিন্তু এত সুখ বুঝি মানুষের সহে না। এক সুখ নিশি পোহাইতেই মহাতপা বিশ্বামিত্র আসিলেন রাজার সম্মুখে, বলিলেন,

"রাজন্, রাক্ষসেরা আমাদের তপস্যার বিঘ্ন উৎপাদন করিতেছে। আপনি আমার সঙ্গে আপনার মহাতেজা দুই পুত্র রাম ও লক্ষ্মণকে দিন—তাহারাই ধর্ম্মের বিঘ্ন এই রাক্ষসদের বিলোপ-সাধন করিবে।"

রাজা চঞ্চল হইলেন। তাঁহার নয়নের মণি রাম ও লক্ষ্মণকে ভীষণ দর্শন রাক্ষসের সহিত যুদ্ধে পাঠাইতে তাহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। কিন্তু ঋষিবরের আদেশ। সূর্য্যবংশীয় রাজা কেহ কখনও মুনি ঋষির আজ্ঞা অবহেলা করেন নাই। তাই আজ রাজা দশরথকেও এই আজ্ঞা মাথা পাতিয়া লইতে হইল।

রাম ও লক্ষ্মণ সদলবলে তপস্যার বিঘ্নকারী রাক্ষসদের মারিয়া আশ্রম নিষ্কণ্টক করিলেন। সেই রাক্ষস দলের নেতা ছিল রাক্ষসী তাড়কা। রামচন্দ্রের বাণে রাক্ষসী এক বিকট চীৎকার করিল—সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রাণ পাখী উড়িয়া গেল। রাজকুমার দ্বয়ের অলৌকিক শক্তি দেখিয়া মুনিবর তাহাদিগকে লইয়া গেলেন জনক রাজদুহিতার স্বয়ম্বর সভায়।



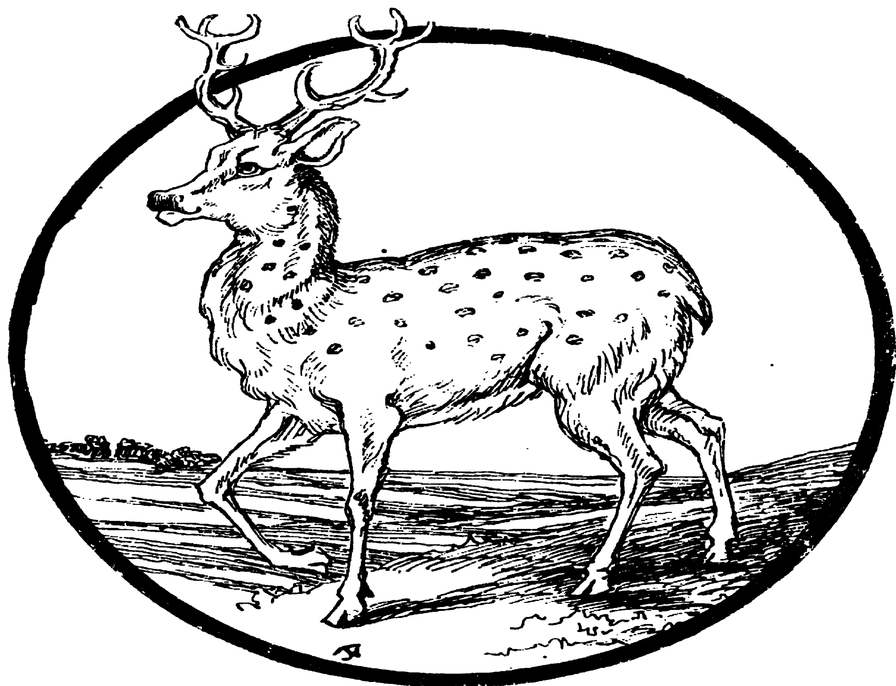
রাম, লক্ষ্মণ ও রাক্ষসী তাড়কা।

অসামান্যা সুন্দরী রাজ কন্যা সীতা—তাঁহারই স্বয়ম্বর। দেশবিদেশ হইতে রাজপুত্রেরা আসিয়াছিলেন সেই কন্যাকে বরণ করিয়া লইতে। তাঁহাদেরই মধ্যে যিনি রূপে গুণে বীর্য্যে শ্রেষ্ঠ হইবেন তাঁহাকেই রাজ কন্যা সীতা বরণ করিবেন। বিরাট স্বয়ম্বর সভা বসিয়াছে। জনক রাজা বলিলেন, মহাদেবের প্রদত্ত এক প্রকাণ্ড ধনুক তাঁহার নিকটে আছে, যিনি সেই ধনুকে গুণ দিতে পারিবেন রাজদুহিতা সীতা তাঁহাকেই বরণ করিবে। রাজ পুত্রেরা আসিয়া বিস্তর চেষ্টা করিল, কিন্তু গুণ দেওয়া দূরে থাকুক তাহারা হরধনুক নোয়াইতে পর্য্যন্ত পারিল না। সভার লোক চঞ্চল হইয়া উঠিল।

এই সময়ে বিশ্বামিত্র রাম ও লক্ষণকে লইয়া সভাস্থলে উপস্থিত হইলেন। তাহাদের দিব্য কান্তি দেখিয়া জনকরাজা মোহিত হইলেন, তাহাদের বীরত্বের কথা শুনিয়া রাজার আশা হইল, তিনি সভাস্থলে পুনরায় তাহার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন—যিনি এই ধনুকে গুণ দিতে পারিবেন সীতা তাহাকেই বরণ করিবে। রামচন্দ্র হাসিয়া সেই ধনুকে গুণ দিলেন। এত জোরেই তিনি ধনুক টানিয়াছিলেন যে তাহা ভাঙ্গিয়া দুইখণ্ড হইয়া গেল। পূর্ণবয়স্কা রূপবতী সীতা তখন পিতার অনুমতি লইয়া রামচন্দ্রকে বরণ করিলেন। পরে রাজা দশরথ আসিয়া মহাসমারোহে তাহাদের বিবাহ ক্রিয়া সম্পন্ন করেন।

বৃদ্ধ রাজা দশরথ জীবনের সায়াহ্নে স্থির করিলেন, জ্যেষ্ঠ কুমার রামচন্দ্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া তিনি রাজকার্য্য হইতে বিশ্রাম লইবেন। মহাসমারোহে অভিষেকের আনন্দোৎসব চলিতে লাগিল। আজ যুবরাজ রামচন্দ্রের অভিষেক—সকলের মনই আজ তাই আনন্দে মাতোয়ারা।

কিন্তু এক জনের মনে আজ আনন্দ ছিল না। তিনি রাণী কৈকেয়ী। তাঁহার দাসী মন্থরা তাহাকে বুঝাইয়াছিলেন রামচন্দ্র রাজা হইলে কৌশল্যা রাজ-



মায়া মৃগ।

মাতা হইবেন, আর তাহাকে চিরকাল কৌশল্যার আজ্ঞা মানিয়া চলিতে হইবে। পূর্ব্বে কোন এক কালে রাজা দশরথ কৈকেয়ীকে দুইটি বর দিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন। আজ সময় বুঝিয়া কৈকেয়ী রাজার নিকট প্রতিশ্রুত সেই দুইটি বর চাহিলেন। একটি বর—রামের পরিবর্ত্তে ভরতের অভিষেক হইবে, আর একটি বর—রামকে চৌদ্দ বৎসরের জন্য বনে পাঠাইতে হইবে।

রাজ্যময় হাহাকার পড়িয়া গেল। বৃদ্ধ রাজা দশরথ আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন। সকলেই চঞ্চল হইয়াছিল, কিন্তু এই বিপদে কুমার রামচন্দ্র অটল স্থির। তিনি আসিয়া সকলকে প্রবোধ দিলেন ও পিতৃ-সত্য রক্ষার জন্য চৌদ্দ বৎসরের তরে বনে যাইতে প্রস্তুত হইলেন। তাঁহার সাথী হইলেন ভার্য্যা সীতা ও ভ্রাতা লক্ষ্মণ। তাঁহারাও সংসারের সকল রকম সুখ পরিত্যাগ করিয়া বনবাসের কষ্ট মাথা পাতিয়া লইলেন।

ভরত ছিলেন মাতুলালয়ে, তিনি যখন আসিয়া সব কথা শুনিলেন তখন দুঃখে কষ্টে তাহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। বৃদ্ধ রাজা দশরথ এ আঘাত সহ্য করিতে পারেন নাই, তিনি ইতিপূর্ব্বেই জীবন লীলা সাঙ্গ করিয়াছিলেন। ভরত তাঁহার অন্ত্যেষ্টি সৎকার করিয়া ভ্রাতা রামচন্দ্রকে হাতে পায়ে ধরিয়া ফিরাইবার জন্য গহন কাননে রামের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। রামচন্দ্র পথিমধ্যে গুহক চণ্ডালের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, ভরত সেইখানে যাইয়া রামচন্দ্রের সহিত সাক্ষাত করেন। ভরত অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু রামচন্দ্র পিতৃসত্য ভঙ্গের ভয়ে রাজ্যে ফিরিয়া গেলেন না। ভরত কাঁদিতে কাঁদিতে রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন, ও চৌদ্দ বৎসরকাল রামচন্দ্রের পাদুকা সিংহাসনের উপর রাখিয়া রামচন্দ্রের নামে রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন।

পঞ্চবটী বনের এক কোণে রামচন্দ্র পতিপ্রাণা সাধ্বী স্ত্রী সীতাদেবী ও ভ্রাতা



৫ রাবণ কর্ত্তৃক সীতা হরণ।



জটায়ু।

মুমূর্ষু জটায়ু, রাম ও লক্ষ্মণ।

লক্ষ্মণকে লইয়া কুটির বাঁধিয়া আছেন, রক্ষোরাজ রাবণের দৃষ্টি পড়িল সেই ক্ষুদ্র কুটিরটির উপর। তাহার পর একদিন এক মায়ামৃগের ছলনায় সে দুই ভাইকে গৃহ হইতে বাহির করিয়া আনিল। বন হইতে দুই ভাই ফিরিয়া দেখেন গৃহ শূন্য—সেখানে সীতাদেবী নাই।

গহন, কানন, প্রান্তর, তন্ন তন্ন করিয়া দুই ভাই খুঁজিল, কিন্তু কোথাও সীতাদেবীর সন্ধান মিলিল না। এই সময়ে পথিমধ্যে দেখা হইল, রক্তাক্ত কলেবর মুমূর্ষু বিহগ শ্রেষ্ঠ জটায়ুর সঙ্গে। জটায়ু বলিল, রক্ষোরাজ রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া পলাইতেছিল, সে বাধা দিয়াছিল, কিন্তু রক্ষোরাজের সহিত যুদ্ধে তাহার পরাজয় হইয়াছে, তাহার দুই ডানা রাবণের তরবারিতে ছিন্ন হইয়াছে, এখন সে মৃতপ্রায়। এই বলিতে বলিতে বৃদ্ধ বিহগবর জটায়ু প্রাণত্যাগ করিল।

রামচন্দ্র এই বিপদে মিতালি করিল বানর রাজ সুগ্রীবের সঙ্গে। কিষ্কিন্ধার চারিদিকে বানর চর ছুটিল সীতা দেবীর সন্ধানে। শেষে বীর হনুমান আসিয়া জানাইলেন—সীতা দেবীকে হরণ করিয়াছে লঙ্কার রাবণ।

লঙ্কার রাবণ সে—অসীম তাহার প্রতাপ, অতুল তাহার বৈভব। আজ সে তাহার সকল বৈভব সকল ঐশ্বর্য্য সীতাদেবীর পাদমূলে লইয়া রাখিল—যদি এত করিয়াও সীতাদেবীর মন ভুলাইতে পারে। কিন্তু দুঃখিনী সীতা—সে যে রাম অন্ত প্রাণ। এ সব ঐশ্বর্য্যের দিকে সে একবার চাহিয়াও দেখিল না। কাঁদিতে কাঁদিতে সে লঙ্কায় প্রবেশ করিয়াছিল—কত দিন রাত্রি চলিয়া গেল, তথাপি সে অশ্রুবারি আর তাহার শুকাইল না। ক্রমশঃ।



যশোদা ও শ্রীকৃষ্ণ

যশোদা ও শ্রীকৃষ্ণ

মা যশোদা বসেছিলেন,
দুধের কেঁড়ে নিয়ে ;
মায়ের যাদু ননি চোরা,
পড়লো কোলে গিয়ে।
ছেলের পানে চেয়ে মায়ের
গলে গেল প্রাণ ;
দ্যুলোক ভূলোক পুলক হ'লো
ছুট্‌লো স্নেহের বান।
দুধ দাও মা বলে গোপাল,
বাড়িয়ে দিলে কর ;
ব্রজের কালো দুলাল সোনা,
কালো ব্রজেশ্বর।



দোল।

[১]

ফাগ আবিরের ছড়াছড়ি,
আজকে হলো দোল ;
ছেলেরা সব আবির গুলে,
কচ্ছে গণ্ডগোল।

[২]

ভূতের মতন রং মেখে সব,
ওতটি আছে পেতে ;
নাওয়া খাওয়া ভুলে গেছে,
আবির খেলায় মেতে।

[৩]

পিচ্‌কিরিতে রং পুরে আছে,
দিচ্ছে সবার গায় ;
ছেলে বুড়ো বাদ দেয় না,
রাস্তা চলা দায়।

[৪]

নারাণ পুরুত ফিচ্ছে বাড়ি,
দশটা তখন বেলা ;
সাম্‌লে চলে ছেলেদের এই,
দেখে আবির খেলা।

[৫]

আজ কাল্‌কার ভূতের মতন,
বেয়াড়া সব ছেলে ;
সাম্‌নে থেকে ছুটে এসে,
রং পাছে দেয় ঢেলে।

[৬]

পুরুত নারাণ সাবধানে তাই,
চলেন ধীরে ধীরে ;
ছেলে গুলো কচ্ছে কি সব,
দেখেন ফিরে ফিরে।

[৭]

দেখেন তারা আপনা আপনি,
মাখ্‌ছে ফাগের গুঁড়ো ;
এক পাশেতে সরে দাঁড়ায়,
দেখ্‌তে পেলে বুড়ো।

[৮]

এই না দেখে নারাণ পুরুত,
বলেন টিকি নেড়ে ;
আজ কালকার ছেলেরা সব,
দেখচি খাসা বেড়ে।

[৯]

আমোদ করে নিজেরা সব,
মাখ্‌ছে ফাগের গুড়ো ;
সম্মান দেয় যথোচিত,
দেখ্‌তে পেলে বুড়ো।

[১০]

আম্‌রা কিন্তু দোলের দিনে,
দেখলে পথে লোক ;
তার গায়েতেই রং দেওয়াই,
ছিল মোদের রোগ।

[১১]

বুড়ো দেখে মোটেই মোরা,
পেতুম না কো ভয় ;
এদের চেয়ে আমরা ছিলুম,
দুষ্ট অতিশয়।

[১২]

এই সময়ে ছেলেরা সব,
এগিয়ে খানিক গিয়ে ;
হি হি করে উঠ্‌লো হেসে,
হাত তালি দিয়ে।

[১৩]

নারাণ পুরুত দেখেন ফিরে,
ল্যাজ একটী বাঁধা ;
কাঁচার সঙ্গে ঝুলছে সেটা,
লেখা তাতে গাধা।





[১৪]

হামা দিয়ে একটা ছেলে,
পালিয়ে ছুটে যায় ;
নারাণ পুরুত হতভম্ব,
ফ্যাল্ ফেলিয়ে চায় ।

[১৫]

দুষ্টুমিতে সবাই বড়,
সবাই সবার চেয়ে ;
নারাণ পুরুত বুঝ্‌লেন বেশ,
ল্যাজ একটী পেয়ে ।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ পাল।

নূতন ধাঁধা।

১। ধোঁয়াতে নিশান যদি
জুড়ে দাও ভাই
অমনি আকাশে তারে
দেখিবারে পাই।

২। জুড়ে দাও কান যদি
কলসীর গায়
মহাবীর গাঢ় ঘুমে
অমনি লুটায়।

শ্রীতরুণচন্দ্র সিংহ।

(১) পর্ব্বতে আছি আমি, নাহি গিরি-শিরে
পুষ্পের ভিতরে-বাহিরে আছি সৌরভেতে ভরে।
পেতে পার হেথা সেথা যেথা মোরে চাও
পবনে নাচাই আমি দেখিতেই পাও।
বায়ু কিন্তু নাহি সেথা, নাহি সমীরণ
পরাণে জড়ায়ে আছি—নাহি ত জীবন।
ব্যঞ্জনের বর্ণ এক বলে দিনু খুলে
চল্‌তে তোমায় হ'বেই হ'বে "আ"টি যোড়া দিলে।

(২) পড়ে আছে অসীম, চলে যায় লোক
মারে কাটে পেটে তবু নাহি করে শোক।
আছে সেটা বলেই মোরা চল্‌তে পারি ভাই
উল্টে.যদি পড় তুমি ভাঙ্গতে পারে পা-ই।

কুমারী মায়াময়ী মজুমদার।

———

মাঘ মাসের ধাঁধার উত্তর।

১। আমার দেশ (আর্শির ভিতর দিয়া দেখ)

২। রাজা রামমোহন রায়, রামায়ণ, মহাভারত, মেঘনা, দামোদর, গঙ্গা।

৩। বানর

৪। চরকা

নিম্নলিখিত গ্রাহক গ্রাহিকাগণ চারিটি ধাঁধারই উত্তর দিয়াছেন ঃ—

কুমারী আভারাণী মজুমদার, কলিকাতা; সুকুমার বসু, ঢাকা; প্রফুল্লকুমার মিত্র, হাওড়া; সভ্যবৃন্দ, শিবনাথ লাইব্রেরী ময়মনসিংহ; কুমারী মীনা সেন, পাটনা; মঙ্গলাচরণ গাঙ্গুলী, গোরক্ষপুর; হবিবর রহমন, আলমডাঙ্গা; জীবন চক্রবর্ত্তী, চট্টগ্রাম; সৌদামিনী বড়াল, দিনাজপুর; বিজলীপ্রভা দেবী, মুক্তাগাছা; রবীন্দ্রকুমার ও সুধীন্দ্রকুমার বসাক, কলিকাতা; বিনয়েন্দ্রনাথ দে, পাবনা; হরিদাস গাঙ্গুলী, সিলং; সৌরেন্দ্রকুমার দত্তগুপ্ত, রাণাঘাট; সুবোধচন্দ্র মিত্র, বালিহার, শচীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, কলিকাতা; পাইকপাড়া পল্লী লাইব্রেরী; মায়া দেবী, বিজনোর; দেবব্রত বিশ্বাস, কিশোরগঞ্জ; সত্যেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, পাটনা; সভ্যবৃন্দ বাঁকুড়া লাইব্রেরী; সিলং সান্‌ডে স্কুল, সিলং; নারায়ণচন্দ্র চৌধুরী; সুজাতা রায়, গৌহাটী; সাবিত্রী দেবী, বালিহার; কুমারী কনকপ্রভা দাসগুপ্ত, সিলং; প্রশান্তকুমার দে, কলিকাতা; যতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, ইন্দোর; জ্যোতির্ম্ময়ানন্দ বাহুবলীন্দ্র; উমেশচন্দ্র সাহা, চট্টগ্রাম; সন্তোষকুমার রায় সিদ্ধান্ত, বাগমারা; বিভূতিভূষণ মিত্র, বর্দ্ধমান; বিকাশচন্দ্র মল্লিক, কলিকাতা; সুবিমল রায়, কলিকাতা; ইন্দিরা দত্ত, ঢাকা; বেলা ঘোষ, কলিকাতা; বীণাপানি দে, পাটনা, সবিতা চৌধুরী, বালিগঞ্জ; ক্ষীরোদকুমার চৌধুরী, ভবানীপুর; কুমারী বাসন্তী দেবী, সিলং; শিশিরকুমার সেন,

বালিহার ; বীণাপানি মিত্র, কলিকাতা ; শোভারাণী সিংহ, কলিকাতা ; প্রমোদনাথ মুখোপাধ্যায়, বরিশাল ; সুধীন্দ্রনাথ রায়, বেহালা ; নিবারণচন্দ্র ও সুধীরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ব্রাহ্মণগাঁও ; হেরম্ব প্রসাদ বড়ুয়া, শালখাড়া, নর্থ ; মণিমোহন রায় চৌধুরী, খাগড়া ; অজীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শান্তি-নিকেতন ; কুমারী হাসিরাণী মিত্র, কলিকাতা ; নির্ম্মলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ভবানীপুর ; সুধাংশুশোভন মিত্র, কলিকাতা ; সত্যবালা দত্ত, চন্দননগর ; অশ্রুবিন্দু দত্ত, সাহেবগঞ্জ ; সুধীরচন্দ্র সেন, কলিকাতা ; হেণারাণী ঘোষ, কলিকাতা ; অমিয়রঞ্জন রায় চৌধুরী, কলিকাতা ; সুধাংশুশেখর গুপ্ত, ঢাকা ; রবীন্দ্রনাথ দত্ত, কলিকাতা ; কুমারী মায়াময়ী মজুমদার, কলিকাতা ;

নিম্নলিখিত গ্রাহক গ্রাহিকাগণ তিনটি ধাঁধার উত্তর দিয়াছেন ঃ—

কুমারী মলিনাবিকাশ মণ্ডল, রেঙ্গুন ; সুবোধচন্দ্র সোম, মালখাঁশগর ; শচীন্দ্রনাথ মিত্র, পাটনা ; বনেহানিধি মহান্তী, কলিকাতা ; কালীচরণ দে, কৃষ্ণনগর ; প্রফুল্লচন্দ্র গাঙ্গুলী, ময়মনসিংহ ; কুমারী নিলীমা ভাদুড়ী, হরদই ; সুকুমারী মিত্র, যশোহর ; অনিলকুমার বসু, চুঁচুড়া ; সুরমাবালা মিত্র ; ক্ষিতীশচন্দ্র মিত্র, রায়গঞ্জ ; কুশলচন্দ্র নিয়োগী, রেঙ্গুন ; রাজকুমার মুখোপাধ্যায়, লক্ষ্ণৌ ; লীলাবতী দেবী, ডাউ হিল্ ; আব্দুল আজিজ, জাল্লালপার ; প্রমিলাবালা রায়, পুরী ; প্রভাতরঞ্জন বৈতালিক কাঁঠালদহ ; সুকুমার মিত্র, বারাণসী ; লালমোহন সিংহ রায়, মান্দড়া ; সভ্যবৃন্দ মন্নুলাল মেমোরিয়াল লাইব্রেরী, বহরমপুর ; দেবীচরণ সেনগুপ্ত, পাটনা ; কুমারী সুহাসিনী দাশগুপ্তা, চাঁদপুর ; হরিমোহন গুহ, বাগবাজার ; জীতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ; সুব্রত সেন, রঘুনাথগঞ্জ ; সৌরীন্দ্রমোহন ঘোষ, কেতকা, পুরুলিয়া ; তরুণচন্দ্র সিংহ শর্ম্মা, কলিকাতা ; নির্ম্মলচন্দ্র নিয়োগী, বাগবাজার ; বিধুশেখর বসু, পালঘাট ; মন্তিরাণী, রাঁচি ; কমলা পালিত, কলিকাতা ; অর্দ্ধেন্দু বসু, ঝাঁসি ; রাজপৎ সিং, জিয়াগঞ্জ ; লীলা রায়, কলিকাতা ; সুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বারাণসী ; বলাইকৃষ্ণ গোল, হুগলী ; নৃপেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী, ঢাকা ; কালীকুমার কুণ্ডু, কুমারখালি ;

হিমাংশুবালা ও শীতাংশুবালা দে ; কমলা ঘোষ, কলিকাতা ; চন্দ্রকান্ত দত্ত, কামারপাড়া ; কিরণশঙ্কর সাহা, সিরাজগঞ্জ ;

নিম্নলিখিত গ্রাহক-গ্রাহিকাগণ দুইটি ধাঁধার উত্তর দিতে পারিয়াছেন ঃ—

কুমারী বারিবালা দেবী, বর্দ্ধমান ; নৃপেন্দ্রনাথ দত্ত, শিবশাগর ; সিদ্ধেশ্বর সাহা, নেত্রকোণা ; সুধীরকুমার বসু মল্লিক, কলিকাতা ; রমণীমোহন পাইন, আলিপুর ; কুমারী বীণাপানি দেবী, বর্দ্ধমান ; সুবিমলচন্দ্র ও পরিমলচন্দ্র পাল, সিলং ; বীরেন্দ্রকিশোর গুপ্ত, শিলচর ; সুধীরকুমার বসু, কলিকাতা ; অনাদিনাথ মুখোপাধ্যায় ও গৌরীপ্রভা দেবী, চুঁচুড়া ; অদ্রীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পুণা ; রমাচরণ সান্ন্যাল, কালনা ; রেণুলা বসু, কলিকাতা।

নিম্নলিখিত গ্রাহক গ্রাহিকাগণ মাত্র একটি ধাঁধার উত্তর দিয়াছেন ঃ—

শীতাংশুবালা দে, মীরাট ; রবীন্দ্রনাথ বসু, বরিশাল ; মনিন্দ্রনাথ সান্ন্যাল, বালিহার ; পরিমলকুমার বাগচি।



প্রকাশক—শ্রীশিশিরকুমার মিত্র বি, এ। প্রিণ্টার—শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।
শিশির পাব্লিশিং হাউস, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা। বিদ্যোদয় প্রেস, ৮।২ কাশী ঘোষ লেন, কলিকাতা





সোণার বালক যুবরাজের হাতে ঢলিয়া পড়িল।

Lakshmibilas Press.



২য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা। চৈত্র, ১৩২৮

স্বাস্থ্য চিত্রে ও গল্পে

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা।

রাজ্যের ছেলেমেয়ে বুড়ো সকলেই আজ আনন্দে মাতিয়াছে—সকলের মুখেই হাসি যেন আর ধরে না। আজ রাজধানির প্রত্যেক গৃহ প্রাচীর বিচিত্র সাজে সজ্জিত হইয়াছে—সারা রাজ্যময় আজ যেন আনন্দের লহর খেলিয়া যাইতেছে।

আজ কিসের এত আনন্দ কোলাহল?

যুবরাজ যুদ্ধে জিতিয়া রাজধানীতে ফিরিয়া আসিতেছেন—তাই এত আনন্দ, তাই এত কোলাহল। তাই, ঐ দেখ তোরণ দ্বার অপূর্ব্ব সাজে সজ্জিত হইয়াছে, তাই ঐ দেখ প্রত্যেক গৃহ চুড়ায় বিজয়পতাকা উড়িতেছে।

যুবরাজ সম্মুখ যুদ্ধে শত্রুকে পরাজিত করিয়া দেশের মান সম্ভ্রম রক্ষা করিয়াছেন, দেশের লোক তাই বিজয়ী বীরকে উপযুক্ত সম্বর্দ্ধনা করিবেন। ঐ দেখ স্বয়ং রাজ্যেশ্বর রাজা রাজপরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া যুবরাজের সম্বর্দ্ধনায় আসিয়াছেন। চারণ বালকগণ জয়-গান করিতে করিতে ঐ দেখ যুবরাজের অভ্যর্থনা করিতেছেন। ঐ শুন, পুরমহিলাগণ অন্তঃপুর হইতে মাঙ্গলিক শঙ্খধ্বনি করিতেছেন।

রাজধানীর প্রবেশ পথে অপূর্ব্ব কারুকার্য্য খচিত তোরণদ্বার প্রস্তুত হইয়াছে যুবরাজ সেখানে আসিয়া রথ হইতে নামিলেন। রাজাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন, তাহার পর সমবেত প্রজাপুঞ্জকে সহাস্য বদনে অভিবাদন করিলেন।

যুবরাজ যেদিকে চাহেন সেইদিকেই দেখেন নানা বর্ণের বসন ভূষণে সজ্জিত হইয়া সারা রাজ্য যেন আজ আনন্দে মাতিয়া উঠিয়াছে, যেদিকে চাহেন সেইদিকেই দেখেন, চিত্তচমকপ্রদ অপূর্ব্ব দৃশ্য। কিন্তু সম্মুখে যে সুন্দর ও অপার্থিব দৃশ্য দেখিলেন, তাহাতে তিনি একেবারে চমকিয়া উঠিলেন।

ঐ যে সোণার বালক!

তবে কি এ সোণার প্রতিমা?—না, তাওত নয়, ঐ দেখ বালক হাত তুলিয়া যুবরাজকে অভিবাদন করিতেছে, যুবরাজ সানন্দে যাইয়া বালকের হাত ধরিলেন। কিন্তু বালকের মুখে আর সে হাসি নাই, চোখে আর সে ত্বরিত চাহনি নাই—বালক নীরব নিস্পন্দ। একি! একি! যুবরাজকে অভিবাদন করিয়াই সেই প্রফুল্ল বদন সোণার বালক যুবরাজের হাতে ঢলিয়া পড়িল।

মুহূর্ত্তের মধ্যে এ ঘটনা ঘটিয়া গেল, মুহূর্ত্তের মধ্যে সে আনন্দ কোলাহল নিরানন্দে পরিণত হইল। সেদিনকার আর আমোদ তেমন জমিল না।

সোণার বালক ?—যুবরাজের অভ্যর্থনার জন্য বালকের সারা অঙ্গ সোণালি রঙে চিত্রিত হইয়াছে। বালক অসুস্থ হইতেই তাহার অঙ্গ হইতে সে সোণালী রঙ ধুইয়া ফেলা হইল। কিন্তু হায়, বালক আর উঠিল না, ধুইয়া ফেলিবার পূর্ব্বেই বালকের শেষ নিশ্বাস বহিয়া গিয়াছে।

কেন এমন হইল ?

তোমার আমার সকলের শরীরের মধ্যে কত কি পদার্থ আছে, কিন্তু সে সব ঢাকিয়া রাখিয়াছে আমাদের শরীরের উপরের খোলস চামড়া। তোমার শরীরের এক খণ্ড চামড়া অনুবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা দেখিলে দেখিতে পাইবে তাহার মধ্যে অনেকগুলি ছোট ছোট ছিদ্র আছে। চামড়ার নীচে মাংস আছে ইহা তোমরা নিশ্চয়ই জান। সেই মাংস হইতে চামড়ার মধ্য দিয়া এক প্রকার ছোট ছোট নল বাহির হইয়া আসিয়াছে—ঐ ছোট ছোট ছিদ্রগুলিই সেই নলের মুখ।

বাড়ীর মধ্যে যেমন জানালা থাকে, আমাদের শরীরের মধ্যেও তেমনি ঐরূপ ছোট ছোট ছিদ্র আছে। বৃষ্টি রৌদ্র প্রভৃতি নানারকম উৎপাত হইতে বাঁচিবার জন্য আমরা বাড়ী ঘর প্রস্তুত করি। কিন্তু আলো বাতাস যাইবার জন্য বাড়ীর দেওয়ালের মধ্যে মধ্যে আবার ছোট ছোট জানালা ফুটাই। আমাদের শরীরের ভিতরের মাংস প্রভৃতিকে নানারকম উৎপাত হইতে বাঁচাইবার জন্য আমাদেরও চামড়া আছে, আর এই চামড়া ঘেরা শরীরের জানালার কার্য্য করে ঐ ক্ষুদ্র ছিদ্রগুলি। জানালা খুলিলে ঘরের দূষিত বায়ু সব বাহির হইয়া যায়, এবং সেই স্থানে বিশুদ্ধ বায়ু আসিয়া ঢোকে। আমাদের শরীরের ক্ষুদ্র ছিদ্রগুলিও ঠিক ঐরূপ জানালার কাজই করে। তাহারাও শরীরের ভিতরের দূষিত বায়ু ও ময়লা রস, বাহির করিয়া দেয়, বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করে।

তোমরা প্রতিদিনই দেখিতে পাইবে শরীরের উপর অনেক ময়লা জমিয়াছে—কিম্বা হয়ত ঘামিতেছ। ঐ সকল ময়লা শরীরের ভিতর হইতে ঐ সকল ছোট ছোট ছিদ্র দিয়া আসে, বাহির হইতে আসে না, আর ঐ ঘর্ম্মও শরীরের ভিতরের ময়লা রস, উহাও ঐ ক্ষুদ্র ছিদ্র হইতে আসিয়াছে।

তোমরা বল দেখি, হঠাৎ যদি তোমার ঘরের সব জানালা দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় তবে ব্যাপারটা কিরূপ দাঁড়ায়। তোমাদের আগেই বলিয়াছি তাহা হইলে দূষিত বায়ু সেবন করিয়া নিশ্চয়ই তোমরা বেশীক্ষণ বাঁচিতে পার না। আমাদের শরীরের এই জানালা দরজা বন্ধ করিয়া দিলে আমাদের অনেকটা একইরূপ অবস্থা হয়। আমাদের চামড়ার উপরের ঐ ছিদ্রগুলি বন্ধ হইয়া গেলে আমরা অচিরে অসুস্থ হইয়া জীবন হারাইব।

ঐ সোণার বালকটির শরীরের উপরের সব ছিদ্রগুলি সোণার রঙে বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। তখন তাহার শরীরের ভিতরে কি ভীষণ হুলুস্থুল বাঁধিয়া গেল তাহা তোমরা সহজেই বুঝিতে পার। যত ময়লা ও দূষিত বায়ু সব জমিতে লাগিল, বাহির হইবার পথ বন্ধ। আর বিশুদ্ধ বায়ু প্রবেশের পথও বন্ধ। কাজেই অল্প সময়ের মধ্যেই বালক অসুস্থ হইল এবং অচিরে প্রাণ হারাইল।

আমাদের চামড়ার উপর শরীরের ভিতরকার ময়লা অনবরত জমিতেছে। সে সব যদি আমরা প্রত্যহ পরিষ্কার না করি তবে কাজে কাজেই ঐ ময়লাতে সে গুলি বন্ধ হইয়া যাইবে, আর জানালার কাজ করিতে পারে না। ফলে ক্রমশঃ শরীর অসুস্থ হয়।

গরম পড়িলে আমরা ভয়ানক ঘামিয়া থাকি। কোনরকম শরীর চালনা করার পরও আমরা তেমনি ঘামিয়া থাকি। ঐ ঘামের সঙ্গে শরীরের ভিতরকার কতরকম ময়লা বাহির হইয়া আসে। খানিকক্ষণ পরে ঐ ঘাম

শুকাইয়া যায়, ও ময়লাগুলি চামড়ার উপরেই থাকিয়া যায়। আমরা যদি প্রত্যহ ভাল করিয়া সর্ব্বাঙ্গ না ধুইয়া ফেলি তবে ক্রমশঃ ঐসকল ময়লা চামড়ার উপরকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্রগুলি বন্ধ করিয়া ফেলিবে।

আমাদের শরীরের উপরের চামড়াগুলি যদি পরিষ্কার থ'কে তবে ঐ ছিদ্রগুলি দিবারাত্র তাহাদের কার্য্য করিতে পারে। কিন্তু ছিদ্রগুলি বন্ধ হইয়া গেলে তাহারা আর কোন কাজ করিতে পারে না। কাজেই আমাদের সুস্থ ও সবল হইতে হইলে প্রত্যহ শরীরের উপরের চামড়াকে পরিষ্কার রাখিতে হইবে।

শরীর যে না রাখ্‌তে জানে তাকেই ধরে রোগ,
খোস পাঁচড়া লেগেই থাকে দিন রাত্তির ভোগ।
দেহের প্রতি দৃষ্টিটুকু রাখ্‌বে সদা ভাই,
কেমন ক'রে স্বাস্থ্য থাকে জেনে রাখা চাই।
পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাক্‌বে তুমি যত,
স্বাস্থ্য তোমার থাক্‌বে ভাল দেখবে তুমি তত।
দাঁতটী মেজে মুখটী ধোবে প্রতি সকাল বেলা,
তার পরেতে লেখাপড়া তার পরেতে খেলা।

— ———



ভুলো মানুষ।

[১]

বাবা আমার ভুলো মানুষ
বেজায় হয় ভুল ;
এমন কি তাঁর মনে থাকে না,
কাট্‌তে মাথার চুল।

[২]

ঝালা পালা মা জননী,
বকে মরেণ তাই ;
বাবার কিন্তু এমনি স্বভাব,
ভুলটি করা চাই।

[৩]

মা যদি দেন কর্ত্তে তাঁকে,
গোটা পাঁচেক কাজ ;
বাড়ী ফিরে বলেন তিনি,
"ভুলে গেছি আজ।"

[৪]

এমনি ধারা নিত্য ভুলে,
মা তো রেগে খুন ;
ফ্যাল ফেলিয়ে থাকেন বাবা,
মুখটি করে চূণ।

[৫]

অফিস যাবেন বাবা আমার,
দশটা গেছে বেজে ;
মা জননী ঘরে এলেন,
পানটি নিয়ে সেজে।



"চুলে তোমার ফালি বেঁধে
দিইছি আমি তাই।"

[৬]

বল্লেন এসে, "ভুল করো না—
খুকির ঔষধ চাই ;
চুলে তোমার ফালি বেঁধে,
দিইছি আমি তাই।

[৭]

"যে ফালিটা জড়িয়ে দিছি,
তোমার গলার সনে,
চিঠি গুলো ফেল্‌তে ডাকে,
করিয়ে দেবে মনে।

[৮]

"বিস্কুট চাই বড় খোকার,
মরছে শুধু কেঁদে ;
ওই ফালিটা তাইতে দিছি,
আঙ্গুলটাতে বেঁধে।

[৯]

"তোষোক খানা ছিঁড়ে গেছে,
এনো একটা খেরো ;
কোঁচার মুড়োয় তাইতে গো ঐ,
দিইছি তোমার গেরো।

[১০]

"কোমরে তোমার বেঁধে দিছি,
দেখছ ঐ যে দড়ি ;
আন্‌তে হবে ওর মানে গো,
ঝোলে দিবার বড়ি।

[১১]

"আফিম তোমার ফুরিয়ে গেছে,
আনতে হবে আজ ;
তাইতে ফালি বেঁধে দিছি,
জুতোর ফিতের মাঝ।

[১২]

"এমন করে বেঁধে ফালি,
দিলুম অঙ্গ মুড়ে ;
এতেও যদি ভুল কর তো,
মর্ব্বো মাথা খুড়ে।"

[১৩]

"এতে কি আর ভুল করি গো"
এই কথা না বলে ;
ঘাড়টি নেড়ে বাবা তখন,
আফিস গেলেন চলে

[১৪]

আফিস থেকে ফিরে বাবা,
এলেন যখন বাড়ী ;
খাবার নিয়ে মা জননী,
গেলেন তাড়াতাড়ি।

[১৫]

দেখেন গিয়ে তেমনি বাঁধা,
আছে সকল ফালি,
আসে নিকো একটী জিনিস,
শূন্য হাত খালি।

[১৬]

চটে বলেন মা জননী'
মুখটি করে ভার ;
"তোমার মতন ভুলো মানুষ,
দেখিনি কো আর।"

[১৭]

বাবা তখন চুলকে মাথা,
পেয়ে বেজায় লাজ ;
চুচু করে বলেন শুধু,
"ভুলে গেছি আজ।"

শ্রীযতীন্দ্রনাথ পাল।

নির্লোভ রোমক বীর।

এককালে রোমরাজ্য খুব বড় হ'য়ে উঠেছিল। রোমান জাতি অত্যন্ত শক্তিমান জাত বলে খ্যাত ছিল। তখন রোমের অধিবাসীরা ছিল, অতি সৎ, স্বাধীনচিত্ত, পরিশ্রমী। তারা নিজের দেশকে প্রাণের মত ভালোবাসত, খুব সুচারুভাবে দেশ শাসন ও রক্ষা করত আর শত্রুর সামনে দাঁড়িয়ে বীরের মত যুদ্ধ করত। তখনকার দিনে রোম প্রায়ই শত্রুদ্বারা আক্রান্ত হ'ত তখন সমস্ত লোক কাজকর্ম্ম ছেড়ে, চাষবাস ফেলে ছুটে আস্ত---এসে লড়াই করত: রোম এই রকম করেই বড় হ'য়েছিল।

তাদের মধ্যে বীর অনেক ছিল, একজন চাষা বীরের নাম তখন সবাকার উপরে উঠেছিল। তার কথাই আমি বলছি আজকে !

দেনতেতাস্ চাষী ছিলেন। উপরি উপরি তিনবার যখন রোম শত্রুদ্বারা আক্রান্ত হ'ল, দেন্তেতাস্ অনেকদূর থেকে চাষ বাস ছেড়ে নগরে এসে রোম

ও তার অধিবাসীদের বাঁচিয়ে ছিলেন। তাঁরই বুদ্ধিবলে, তাঁরই বীরত্বে রোম তিনবারই জয়লাভ করলে! রোমকগণ তাঁকে রোমের শাসন কর্ত্তা করলে, রাজার সম্মান দিলে, কিন্তু যেমন যুদ্ধ শেষ হওয়া অমনি দেনতেতাস্‌ও তাঁর সেই গাঁয়ে গিয়ে নিজের লোকজন নিয়ে ক্ষেতে খামারে চাষ করতে লেগে গেলেন। রোমকগণ তাঁর কাছে এই অভয় পেয়েছিল যে দেশের বিপদে-আপদে দেনতেতাস্ দেশের কাজে অবহেলা করবেন না।

রোমের প্রবল শত্রু সামনাইতরা দেখ্‌লে দেনতেতাস্ থাক্‌তে রোম-জয় করা সহজ হ'বে না। দেনতেতাস্ দরিদ্র চাষী, কিন্তু তার বুদ্ধি ও বীরত্ব রাজার মত—তা'কে হাত করবার জন্য অনেক ধনরত্ন, স্বর্ণ-রৌপ্য যৌতুক নিয়ে একদল সামনাইত দেনতেতাসের কাছে এল। তারা এসে দেখ্‌লে দেনতেতাস্ মাটীর ভাঁড়ে রান্না চড়িয়ে বসে আছেন। তারা ভাবলে, আহা বড় গরীব, আর আমরা এনেছি একেবারে রাজার দৌলত। দেনতেতাস তা'দের অতিথি হিসাবে যত্ন করে অভ্যর্থনা করেছিলেন, কিন্তু ধনরত্নের হাঁড়া দেখেই জ্বলে উঠ্‌লেন। বল্লেন—দেশের সেবা যে করে, সে ধনরত্ন চায় না; আমি দরিদ্র, চিরদিনই দরিদ্র থাকিব। যুদ্ধে আমার পরাক্রম যদি অসামান্য হয়, ধনরত্নে আমার ঘৃণাও অসামান্য নয়। সামনাইতরা লজ্জায় মুখ কালো করে' চলে গেলো।

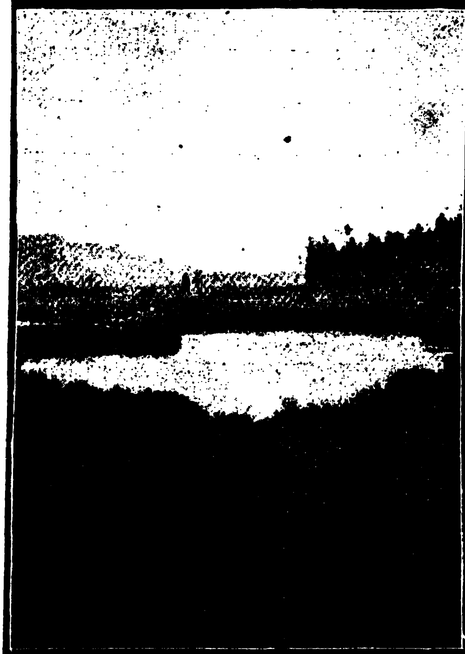
এই রকম লোকের জন্যই রোম বড় হ'তে পেরেছিল। কিন্তু যখনই লোভ বিলাসিতা, সুখের চেষ্টা রোম্যান্‌দের মধ্যে ফুটে উঠ্‌ল, তখনই রোম ধ্বংস পেয়েছিল।

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার।

তাজ্জব !

অদৃশ্য নদী :

আমেরিকার অন্তর্গত আরিজোনা ষ্টেটে একটা বড় মজার নদী আছে। নদীটা বেশ আছে, বইছে, ঢেউ উঠ্‌ছে, বাতাসে নাচ্‌ছে, ঝড়ে ফুল্‌ছে, রৌদ্র



কিরণে চিক্‌মিক্ করছে—হঠাৎ একদিন কোথায় চলে গেল, কেউ সন্ধান পেলে না। নদীটা যে কম গভীর তা'ও না, বালি জমে জমে যে চাপা পড়ে যায়—তাও নয়, হঠাৎ লুকিয়ে পড়ে। আবার একদিন অনেক দূরে নদীটাকে বইতে দেখা যায়। সাধারণতঃ গ্রীষ্মকালেই নদীটির সন্ধান পাওয়া যায় না।

আমাদের দেশে ফল্গু নদীটা দেখেছি অন্তঃসলিলা। অর্থাৎ বাইরে দিব্যি বালিভূমি, হেঁটে অবধি যাওয়া চল্‌ছে—একটু খুঁড়লেই জল দেখতে পাওয়া যায়।

শিশুর মায়া।

মাণিক ভায়া খেলা করে কাঁদে যখন 'উঃ উঃ উঃ'
রেণু পারুল ছুটে এসে বলে "খা একটু দুধু!"
মায়ের মত মাথা ধরে ছোট্ট পেনি তুলে
মাণিকে দেয় মাই খেতে—যায় না কভু ভুলে।
রেণু বলে "আগে আমার" পারুল ডাকে "কাকু"
"কাকুর" হল বিষম বিপদ পড়্‌ল দু'টী ডাকু!
কাড়াকাড়ি মারামারি মাইটী দিবার তরে,—
আবার তারা ভয় দেখায় কেমন মজা করে;
"যে তিতো ঔষধ লাগিয়ে দেব,খেওনা বেশী আর!"
শিশু দু'টীর মায়ার খেলা দেখ্‌ছি চমৎকার!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

———

ব্রতকথা

চৈত্র মাস।

লক্ষ্মী দেবী।

(বামুন বাম্‌নী)

চৈত্র মাস, সে দিন বারুণী যোগ। গঙ্গাস্থানের বেজায় ধূম পড়ে গেছে। সবাই গঙ্গাস্নানে ছুটেছে। সবাই গঙ্গাস্নান কর্ত্তে যাচ্ছে দেখে নারায়ণেরও সখ হ'লো গঙ্গাস্নানে যাবার। তিনি তখনই দারুক্‌কে ডেকে বল্লেন—"দারুক রথ সাজাও আমি গঙ্গাস্নানে যাব।"

এখন লক্ষ্মী ছিলেন ঘরের ভিতর, তিনি যেমন শুন্‌লেন—নারায়ণ দারুককে রথ সাজাতে বল্লেন—গঙ্গাস্নানে যাবার জন্যে—আর কি তিনি ঘরের ভেতর বসে থাক্‌তে পারেন—তিনি তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বার হয়ে এলেন। নারায়ণের কাছটীতে গিয়ে বল্লেন,—"আমিও তোমার সঙ্গে গঙ্গাস্নান কর্ত্তে যাব।"

লক্ষ্মীর এই কথা শুনে নারায়ণ ঘাড় নেড়ে বল্লেন.—"উঁ হুঁ তাও কি কখন হয়? তুমি কোথায় যাবে! তুমি মেয়ে মানুষ—তোমার যাওয়া হ'তেই পারে না। শাস্ত্রে একেবারে স্পষ্ট লেখা আছে—মেয়ে মানুষকে সঙ্গে নিয়ে কোথায়ও যাবে না।"

নারায়ণের সে কথা কি লক্ষ্মী শোনেন। তিনি প্রথম সঙ্গে যাবার জন্যে

যেটী বারণ করি তুমি সেইটী কর—এখন তার ফল ভোগ করোগে! আজ বারুণীর দিনে তুমি বামুনের কাপাস ফুল তুলেছ—এখন যাও সেই বামুনের বাড়ী গিয়ে বার বৎসর থাক্‌বে—তবে তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে। সাধে তোমায় বলেছিলুম—যে তুমি আমার সঙ্গে গঙ্গাস্নানে এস না। তোমরা মেয়ে মানুষ তোমাদের বড় লোভ—এখন সেই লোভের সাজা ভোগ গে যাও। স্বামীর কথা না শুনলে মেয়ে মানুষের এই রকমই সাজা পেতে হয়। যাও আর দেরী করোনা—রথ থেকে নাম।”

নারায়ণের এই কথা শুনে লক্ষ্মীর চোখ দিয়ে টস্‌টস্‌ করে জল গড়িয়ে পড়্‌লো। নারায়ণ বল্লেন, “লক্ষ্মী কেঁদে আর কি করবে বলো। কাজ যখন করেছ তখন তার সাজা তোমাকে ভোগ কর্ত্তে হবে। যাও বামুনের বাড়ী গিয়ে বার বছর থাকগে—বার বছর বাদে আবার এই বারুণীর দিনে আমি এসে তোমাকে বৈকুণ্ঠে নিয়ে যাব।”

লক্ষ্মী চোখের জল ফেল্‌তে ফেল্‌তে রথ থেকে নাম্‌লেন। মর্ত্তে তো আজ বারুণী যোগ; না বলে কয়ে বামুনের ক্ষেত থেকে তিনি কাপাস ফুল তোলেন কোন অধিকারে। তিনি যে পাপ করেছেন তার ভোগ তাঁকে ভুগ্‌তেই হবে। রথ থেকে নেমে লক্ষ্মী নারায়ণকে একটা ঢিপ করে গড় করে বামুনের বাড়ীর দিকে চলে গেলেন। নারায়ণ চালককে—বল্লেন—“রথ চালাও।”

লক্ষ্মী যখন বামুনের বাড়ীর দোরে গিয়ে পৌছুলেন, সেই সময় বামুন গঙ্গাস্নান কর্ত্তে যাচ্ছিলেন। বাড়ীর দোরে মেয়ে মানুষকে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে দেখে জিজ্ঞাসা কল্লেন, “মা—তুমি কাদের বাছা গো। এমন করে আমার বাড়ীর দোরের গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছ কেন?”

লক্ষ্মী বল্লেন,—"আমি বামুণের মেয়ে, আমাকে স্বামী বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। তাই একটু আশ্রয় চাচ্ছি।"

লক্ষ্মীর কথায় বামুন বল্লেন—"তা মা আশ্রয়ের ভাবনা কি? তুমি আমার বাড়ীতে এস, যত দিন ইচ্ছে থাক, কোন কষ্ট হবে না।"

এই বলে বামুন লক্ষ্মীকে বাড়ীর ভেতর নিয়ে গিয়ে বামণীকে বল্লেন,—"বামণী একটা বামুনের মেয়ে স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করে আমাদের বাড়ী থাক্‌তে এসেছে। বামুনের মেয়ে যত্ন করে রাখ্। এঁটো কাঁটা ফেল্‌তে দিস্‌নি এঁটো ভাত খেতে দিসনি, বামুনের মেয়ে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিসনি।"

এদিকে বামুন যেমন ভাল লোক ছিল—বাম্‌ণী ছিল ঠিক্ তার বিপরীত। তার ঝগড়ার জ্বালায় বাড়ীতে কাক্ চিল টিক্‌তে পার্‌তো না। লক্ষ্মীকে দেখে বাম্‌ণীর গা তো জ্বলে গেল। বামুনের সাম্‌নে কিছু বল্লে না বটে—কিন্তু মনে মনে বল্লে,—হুঁ যত্নে রাখ্‌বো না—ঝেঁটিয়ে বিদেয় কর্ব্ব। মুখে বল্লে—"এস বাছা এস।"

সেই থেকে লক্ষ্মী বামুনের বাড়ীতে র'য়ে গেলেন। লক্ষ্মী আসা অবধি বাম্‌নী একেবারে হাত গুটিয়ে বস্‌লেন। শুধু ছ'বেলা দু'বার রাঁধেন—বাকি সমস্ত কাজ লক্ষ্মীকেই কর্ত্তে হয়। এঁটো-কাটা পাতে যা পড়ে থাকে তাই লক্ষ্মীকে খেতে দেন—লক্ষ্মী সেগুলো না খেয়ে বাড়ীর পেছনে পাঁস-গাদায় পুঁতে রেখে আসেন। বামুন পূজো ক'রে ঠাকুরের যা প্রসাদ তাঁকে দেন তাই খেয়ে লক্ষ্মী থাকেন। তাতেও বাম্‌নী সন্তুষ্ট নন—তবুও দিনরাত খ্যাচ খ্যাচ করেন। লক্ষ্মীর বড় কষ্ট, কিন্তু কি কর্ব্বেন—বারবৎসর না হ'লে তো আর যাবার উপায় নেই তাই সব কষ্ট স'য়ে দিন কাটান। এইভাবে লক্ষ্মীর বামুনের বাড়ীতে দশবৎসর কেটে গেল। বাকি আর দু'বৎসর—আর

দু'বৎসর কাটাতে পাল্লেই তিনি অব্যাহতি পান। সেই দু'বৎসর কেমন ক'রে কাটবে লক্ষ্মী দিনরাত কেবল তাই ভাবেন। এইভাবে আর একবৎসর কেটে গেল। লক্ষ্মী দেখেন বামুন প্রত্যেক দিন যখন হাটে যান, তখন বাম্‌নী চরকা দিয়ে সুতো কেটে এক ধামা করে বামুনকে দেন। বামুন তাই হাটে বেচে এক ধামা কড়ি নিয়ে আসেন। একদিন বামুন হাটে যাবার জন্যে সুতো নিয়ে বেরিয়েছেন সেই সময় লক্ষ্মী এসে বল্লেন,—"আমি একটু সুতো কেটেছি, এটুকুও হাটে নিয়ে যাও।"

বামুন লক্ষ্মীর সুতোটুকু কোঁচার মুড়োয় বেধে হাটে গেলেন। হাটে গিয়ে বাম্‌নীর দেওয়া এক ধামা সুতো বেচে এক ধামা কড়ি পেলেন, তাই নিয়ে বাড়ী ফিরলেন—পথে আসতে আসতে লক্ষ্মীর সুতোটুকুর কথা তাঁর মনে হ'লো। তাই বামুন আবার তাড়াতাড়ি হাটে ফিরে গেলেন। তারপর কোঁচার মুড়ো থেকে লক্ষ্মীর সুতোটুকু বা'র ক'রে সুতো ওয়ালার কাছে গিয়ে সেই সুতোটুকু বেচতে চাইলেন। সুতো ওয়ালা সুতো দেখে অবাক—এ যে সোণার সুতো। সুতোওয়ালা সেই সুতোটুকু নিয়ে বামুনকে এক ধামা টাকা দিলেন, বামুন সেই এক ধামা টাকা নিয়ে বাড়ী গেলেন। বাড়ী গিয়ে এই বামনীকে মার, আর সেই বাম্‌নীকে মার। "তুই এক ধামা সুতো দিস তাতে শুধু এক ধামা কড়ি হয়—আর মা একরত্তি সুতো দিয়াছিল তাতে এক ধামা টাকা হ'লো। তুই কেমন সুতো কাটিস রে! রাম, রাম, —সুতোটাও ভাল করে কাট্‌তে পারিসনি।"

বাম্‌নী ডুক্‌রে কেঁদে উঠ্‌লো। বামুনকে কিছু না বল্‌তে পেরে—সেই রাগ গিয়ে পড়্‌লো তাঁর লক্ষীর ওপর—সেদিন থেকে লক্ষ্মীর যন্ত্রণা আরও বাড়লো। উঠ্‌তে বস্‌তে বাম্‌নী কেবলই দূর দূর ক'র্ত্তে লাগল। এমনি ভাবে

নানা কষ্টে লক্ষ্মী বামুনের ঘরে বার বৎসর কাটালেন। আবার বার বৎসর পরে সেই বারুণী যোগ এসে উপস্থিত হ'লো। বামুন বাম্‌নী গঙ্গাস্নানে যাবার আয়োজন কল্লে। বামুন বাম্‌নীকে নিয়ে গঙ্গাস্নান কর্ত্তে যাবার জন্যে বাড়ী থেকে বার হচ্ছেন সেই সময় লক্ষ্মী এসে বামুনের হাতে পাঁচটা কড়ি দিয়ে বল্লেন,—"তোমরা গঙ্গাস্নানে যাচ্ছ—আমার এই পাঁচ কড়ার পূজো দিয়ে এস।"

বামুন লক্ষ্মীর কড়ি কটি কোঁচার খুঁটোয় বেঁধে নিলেন। গঙ্গাতীরে এসে দেখেন—গঙ্গা নাইবার মহা ভীড় পড়ে গেছে। সকলেই মা গঙ্গার ষোড়শোপচারে পূজো দিচ্ছে। বামুনও তাই দিলেন। তার পর লক্ষ্মীর কড়ি পাঁচটা নিয়ে ভাব্‌লেন—এ দিয়ে আর কি মায়ের পূজো হবে—তার চেয়ে এই পাঁচ কড়া কড়ি গঙ্গায় ফেলে দিই। এই ভেবে বামুন যেই সেই পাঁচ কড়া কড়ি ফেলে দিয়েছেন,—অমনি সাক্ষাৎ মা-গঙ্গা হাত বাড়িয়ে কড়ি পাঁচটী ধরে নিলেন। এই দেখে বামুন সেইখানে আছাড় খেয়ে পড়ে বলতে লাগলেন,—"মা তোমায় লোকে ষোড়শোপচারে পূজো দিয়ে কেউ দেখ্‌তে পেলে না। আর সেই বামুনের মেয়ের পাঁচ কড়া কড়ি তুমি হাত বাড়িয়ে ধরে নিলে সে মেয়ে তো সামান্য মেয়ে নয়। সে মেয়ে কে আমায় বল্‌তে হবে—নইলে আমি তোমার কুলে না খেয়ে না দেয়ে মর্ব্বো। ব্রহ্ম হত্যার পাতক তোমায় হ'তে হবে।"

বামুনের এই কথায় গঙ্গা জল থেকে মুখ বাড়িয়ে বল্লেন,—"বামুন—তোর বাড়ীতে যে বামুনের মেয়ে আছে সে আর কেউ নয় স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী। তোর ক্ষেতের কাপাস ফুল তুলে তোর বাড়ীতে বার বছর খাট্‌তে এসেছে। আজ বার বছর পূর্ণ হ'লো—নারায়ণ লক্ষ্মীকে নিতে এসেছেন। লক্ষ্মী তোর সঙ্গে

দেখা না করে যেতে পাচ্ছেন না। তাই এক পা রথে এক পা পথে দিয়ে তোর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। বামুন এই বেলা ছুটে যা।”

বামুন এই কথা শুনে তখনই বাম্‌নীকে নিয়ে বাড়ীর দিকে ছুট্‌লেন। বাড়ী এসে দেখেন সত্যিই লক্ষ্মী এক পা রথে এক পা পথে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। বামুন একেবারে গিয়ে তার পা জড়িয়ে পড়্‌লেন—বল্লেন,—“মা আমি তোমায় চিন্‌তে পারিনি—কত অযত্ন করেছি—তুমি আমার পাপ নিও না।”

লক্ষ্মী বামুনকে অভয় দিয়ে বল্লেন,—তুমি আমাকে চিন্‌তে পেরেছিলে—বাম্‌নী আমায় চিন্‌তে পারিনি তাই আমায় পাতের এঁটো কাটা ভাত খেতে দিত। সেগুলো আমি খাইনি, পাঁস গাদায় পুতে রেখেছি—সেগুলো তুলে এনো—সেগুলো মণি মুক্ত হয়ে আছে। আর মুক্তো বেঁচে যে টাকা পাবে—সে টাকাও আমি তোমাকে দিলুম। তোমার আর কোন দুঃখ কষ্ট থাক্‌বে না। লক্ষ্মী বল্লেন—

শঙ্খে আছি পদ্মে আছি আর আছি গদায়
পদ্মে আছি দ্বিজে আছি আর আছি রাজায়॥
নিরন্নকে অন্ন দিও রুক্ষ মাথায় তেল দিও,
ভক্তি থাকে চিরদিন যেন আমার পরে।
আজ থেকে অচলা হয়ে রইনু তোমার ঘরে॥

এই ব’লে লক্ষ্মীদেবী রথে গিয়ে চড়্‌লেন। এদিকে বাম্‌নী যেই শুন্‌তে পেলে তাদের ঘরে এতদিন যে বামুনের মেয়ে ছিল, সে সাক্ষাৎ লক্ষ্মী ঠাক্‌রুণ! অমনি বাম্‌নী ছুটে এসে লক্ষ্মীকে ধরলেন, বল্লেন—“তুমি বামুনকে ধন দিয়ে গেলে—আমাকে কিছু দিয়ে যাও।”

লক্ষ্মী বল্লেন,—"মেয়ে মানুষের আবার ধনের দরকার কি? স্বামীর ধনই স্ত্রীর ধন।"

বাম্‌নী কিন্তু সেকথা মান্‌লেন না, তিনি একই কথা বার বার লক্ষ্মীকে বল্‌তে লাগ্‌লেন। নারায়ণ লক্ষ্মীর পাশেই ব'সেছিলেন। বাম্‌নী লক্ষ্মীর প্রতি কেমন ব্যবহার করেছে তা জান্‌তে তাঁর আর কিছুই বাকি ছিল না। তিনি বামনীর কথায় বিরক্ত হয়ে বললেন,—"তোমার লক্ষ্মীর সিন্দুর-চুবড়ীতে লক্ষ্মী একটা হার রেখে এসেছে, সেইটা তুমি নাওগে, তাহ'লে আর তোমার ধনের অভাব থাক্‌বে না।"

বাম্‌নী হার নেবার জন্যে ছুটে গিয়ে সিন্দুর-চুবড়ীতে হাত দিলেন। যেমন হাত দেওয়া অমনি একটা কেউটে সাপ তার হাতে কাম্‌ড়ে দিলে। বাম্‌নী বিষের যন্ত্রণায় ছটফট করে সেইখানে পড়েই মরে গেল। তখন বামুন আবার হাহাকার করে করে কাঁদতে কাঁদতে লক্ষ্মীর কাছে ছুটে গেলেন। বামুনের কান্না দেখে লক্ষ্মীর দয়া হলো—তিনি বাম্‌নীকে বাঁচিয়ে দিলেন। লক্ষ্মীর কৃপায় বামুন বাম্‌নীকে নিয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না কর্ত্তে লাগ্‌লেন। সেই থেকে পৃথিবীতে চৈত্রমাসে লক্ষ্মীপূজার প্রচার হ'লো।"



জহর ব্রত।

প্রবল প্রতাপ দিল্লীর সম্রাট আল্লাদীন লোকমুখে শুনিলেন, মেবার-রাণা লক্ষণ সিংহের খুল্লতাত-পত্নী পদ্মিনীর রূপের তুলনা নাই। চন্দ্রের মত রূপ, পদ্মের মত বর্ণ, পদ্মিনী পৃথিবীর সেরা সুন্দরী! এমন রূপ দিল্লীশ্বর কখনও দেখেন নাই। আল্লাদীন বলিলেন—এরূপ দেখিতেই হইবে! পদ্মিনী হিন্দু ঘরের ঘরণী, পদ্মিনী রাজপুতের রাণী, কোন রকমেই বিজাতীয় পরপুরুষ তাঁহাকে দেখিতে পাইবে না—এ সকল বাধা বিপত্তি কি ভারতের অধীশ্বর প্রবলপরাক্রান্ত আল্লাদীন মানেন? তিনি ভারতের একছত্র অধিপতি আর পদ্মিনী একটা ক্ষুদ্র জনপদের একজন সামান্য সর্দ্দারের স্ত্রী!—মেবারে দূত ছুটিল। সম্রাটের দূত রাজার সভায় আসিয়া সম্রাটের ইচ্ছা জ্ঞাপন করিল।

শুনিয়া মেবারের বীরবৃন্দ জ্বলিয়া উঠিলেন।

দূত বিতাড়িত হইল।

এত বড় অপমান কি ভারত সম্রাট সহিতে পারেন? আল্লাদীনের সকল অঙ্গে অগ্নিবৃষ্টি হইল। কিন্তু আল্লাদীন মনের ভাব চাপিয়া বলিয়া পাঠাইলেন—আচ্ছা, তাঁহার সম্মুখে দাঁড় করাইতে রাজপুতের যদি এতই আপত্তি, মুকুরের গায় পদ্মিনীর চিত্র দেখিয়া তিনি ফিরিতে রাজী আছেন।

আরও বলিলেন—আর মূর্খ রাজপুত যদি এ-হেন প্রস্তাবেও অসম্মত হয় ত সেই মূর্খগুলাকে কিছু বিদ্যা শিক্ষা দিয়া আসিবার ইচ্ছা আছে।

রাজপুত বীরগণ বলিলেন—আমরা ম্লেচ্ছ নরপতির নিকট বিদ্যা শিক্ষা করিতে প্রস্তুত আছি, এ প্রস্তাবে সম্মত নহি।

কিন্তু পদ্মিনী! পদ্মিনী বাঁকিয়া বসিলেন। তাঁহার জন্য রক্তপাত হয়,



আতপ তাপে স্বর্ণকমল শুকাইয়া গেল।

Lakshmibilas Press.

তাঁহার জন্য দেশে বিশৃঙ্খলা আসে, শান্তি নষ্ট হয়—পদ্মিনীর পদ্মের মত কোমল প্রাণে তাহা সহিল না। পদ্মিনী বলিলেন—আমি মুকুরে দেখা দিব।

কাহারো কোন আপত্য টিকিল না; তর্কে সকলেই পরাজয় স্বীকার করিল।

রাজপুত, সম্রাটের দূতকে ডাকিয়া নতমুখে বলিল—সম্রাটকে আসিতে বলিও।

সভাগৃহে প্রকাণ্ড মুকুরে পদ্মিনীর ছায়া পড়িল। এক মুহূর্ত্তের জন্য! আকাশের গায়ে যেন বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল।

পুষ্করিণীর বক্ষে একটি পদ্ম ফুটিয়াছিল, চক্ষে তাহা দেখিয়া আল্লাদীনের পদ্মটিকে বক্ষে ধরিবার ইচ্ছা জন্মিল! কিন্তু সে-যে রাজপুত-সরোবর! সে-যে রাজবারার পদ্মিনী!

রাজপুতে মুসলমানে যুদ্ধ বাধিল। একদিকে ভারতবিজয়ী সাহান-সাহা পাৎসাহ আল্লাদীনের অগণিত সৈন্য, অপর দিকে মুষ্টিমেয় রাজপুত বীর।

তবুও লড়াই চলিল। রাজপুতের বাছা বাছা বীরগণ যুদ্ধে প্রাণ দিলেন; রাণার একাদশ পুত্র মরিল, রাণা মরিলেন—মেবার পরাজিত হইল।

আল্লাদীন যুদ্ধ জয় করিয়া মেবারের রাজান্তঃপুরের দিকে ছুটিলেন। পদ্মিনীকে চাই!

রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া সম্রাট দেখিলেন, ধূধূ করিয়া আগুন জ্বলিতেছে, রাজপুতবালারা সেই অগ্নি বেষ্টন করিয়া ঘুরিতেছেন। সকলের আগে, সোনার পদ্মিনী!

সম্রাট পদ্মিনীকে ধরিবার আশায় হাত বাড়াইলেন! কিন্তু হায়! দিগ্বিজয়ী সম্রাটের ইচ্ছা পূর্ণ হইল না। আতপ-তাপে স্বর্ণ কমল শুকাইয়া গেল।

পদ্মিনী চিতায় ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। পদ্মের মত রূপ, পদ্মের মত সৌরভ—সব আল্লাদীনের চক্ষের সম্মুখেই ভস্মীভূত হইয়া গেল।

রাজপুতরমণীগণ বিপদে পড়িলে চিতা জ্বালিয়া এমনি করিয়া **জহর ব্রত** উদযাপন করিতেন।

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার।

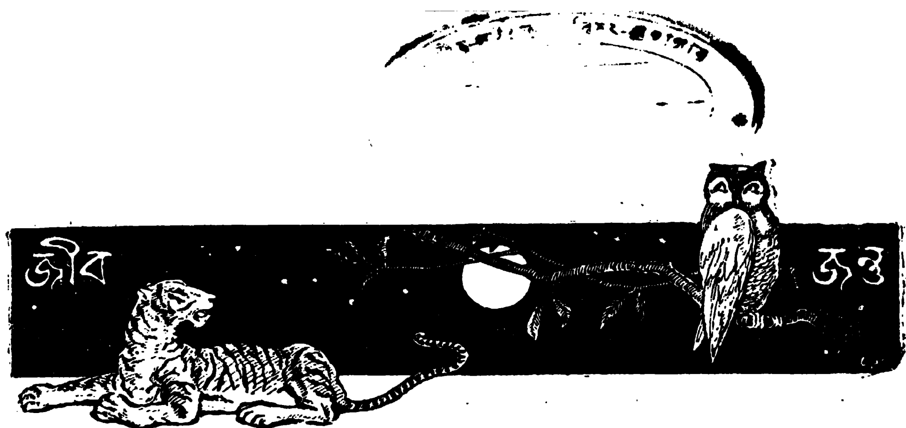
বাতাস।

(অনুদিত—Rosettee)

কে দেখেচে বাতাস কবে ?
তুমি আমি—কেহই নহে।
কিন্তু যবে পাতা গুলি কাঁপ্‌তে থাকে ধীরে—
বাতাস তখন বহে।

কে দেখেচে বাতাস কবে ?
আমি তুমি—কেহই নহে।
কিন্তু যবে গাছগুলো ঐ নোয়ায় তাদের মাথা—
বাতাস তখন বহে।

শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়।



কেনায়া পর্ব্বতে হস্তিযূথ।

পূর্ব্ব আফ্রিকার কেনায়া পর্ব্বতে এখন অতি বিচিত্র ঘটনা ঘট্‌ছে। কেনায়া পর্ব্বতের নাম বোধ হয় শুনেছ ; এ সেই কেনায়া যার নাম অনুসারে পূর্ব্ব আফ্রিকায় ইংরাজ উপনিবেশটারই নাম হয়েছে—"কেনায়া"।

এই গিরিবর নিজের মনোলোভা শোভা নিয়ে একাই দাঁড়িয়ে আছে। চার মাইল উচ্চশির তুলে, ভূধর যেন গগন চুম্বন করছে। কেনায়ার ওপর গভীর বনজঙ্গল ও বাঁশ ঝাড় ; গা'য়ে নিবিড় লতা-গুল্ম-উদ্ভিজ্জ। পাহাড়টী খুব খাড়া, জায়গায় জায়গায় এত খাড়া যে মানুষের দুরারোহ। ঐ সব জায়গায় উঠতে হলে পর্য্যটকদের পাহাড়ের গা'য়ে ঘাসের চাবড়া ধরে ধরে ছাড়া ওঠবারই যো নেই—তাও ওঠেন অতিকষ্টে।

শুনে হয় তো তোমরা অবিশ্বাসের হাসি হাসবে কিন্তু এটা সত্যি কথা যে আফ্রিকার বিশালবপু গোবদাগতি হাতীগুলো মানুষের চেয়ে শতগুণ অবলীলাক্রমে ঐ সরল-উন্নত পাহাড় বেয়ে উঠতে পারে এবং উঠে থাকে।

শীতের সময় পর্ব্বতের পাদদেশ হতে আড়াই মাইল ওপরে, মেঘেরও

ওপরে, যেখানে রাত্রিতে জল জমে বরফ হয়ে যায়, তত উর্দ্ধে, হাজার হাজার হস্তিনী সন্তান প্রসব করতে যায়। মাইলের পর মাইল, নিবিড় ঝোপ ঝাড়ের মধ্য দিয়ে তাদের গমনপথের দাগ দেখতে পাওয়া যায়। এরা দলকে দল এক-সঙ্গে বিচরণ করে, যেখানে মন চায়, সেখানেই যায়, দুরধিগম্য বলে এদের কাছে কোন স্থানই নেই।

আমেরিকার ভূতপূর্ব্ব এক রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট একবার আফ্রিকায় শিকারযাত্রা করেছিলেন; সেই অভিযানের সহযাত্রী ও প্রাণীশাস্ত্রজ্ঞ মার্কিণ এলডেন লোরিং বলেছেন—"হাতীরা এত খাড়া পাহাড়ে উঠতে পারে যে শিকারীর লতা-তৃণ-গুল্মের সাহায্যেও তাদের অনুসরণ করা শক্ত।"

পর্ব্বতের ওপরে অনেকানেক জলাভূমি আছে। হাতীরা সেগুলো পার হয়ে যাবার সময় পিছনে হাত খানেক করে গভীর বড় বড় পাদগর্ত্ত রেখে যায়, সেগুলো জলে ভরে গিয়ে কালে তৃণ সমাচ্ছন্ন হয়ে যায়,—পর্য্যটকেরা কিছুই না জেনে সেগুলোতে যেম্নি পা দেন আর অম্নি হুমড়ি খেয়ে পড়েন—এমন হোঁচট নাকি তাঁরা কেনায়াতে উঠলে নিয়তই খা'ন।

শিকারীরা এই সময়টায় পাহাড়ের ওপরে উঠে দূর থেকেই হাতীর সন্ধান পায়। কি করে বলতে পার? হস্তিপদতাড়িত পোকা মাকড় প্রভৃতি ধরে খেতে পাবে বলে বকের ঝাঁক হাতীর দলের সঙ্গে সঙ্গে ফেরে। কাজেই দূর থেকে শিকারীরা যেখানে দেখে বক উড়ছে, সেইখানেই বোঝে হাতী আছে। তবে হাতীদের কাছাকাছি এলে, ওদের পেটের বড় বড় শব্দ শিকারীদের কাণে যায়, তাই থেকে তারা বুঝতে পারে হাতী কাছাকাছিই আছে। খাবারদাবার পেটের ভেতর গিয়ে হজম হতে থাকে তখন ওদের পেট গুড়্ গুড়্ করে।

মানুষের গলায় লেশমাত্র আওয়াজ পেলেই হাতী বিপদ ভয়ে ভীত হয়ে

পড়ে ; তবে এদের ঘ্রাণশক্তি খুব প্রবল, তাই দূর থেকেও ওরা মানুষের গন্ধ ও আগমনবার্ত্তা পায়, ও পেয়ে সাবধান হয়। এই জন্যেই শিকারী করে কি, কোন বল্মীক বা উইটিবির ওপরে উঠে আগে তাকিয়ে দেখে হাতীর দল কোথায় আছে, তারপর দেখে সে হাতীরা হাওয়ার মুখেদাঁড়িয়ে নেই ত ? টিবির ওপরে উঠে যদি দেখে হাতীর শুঁড় নীচে নামান, তা' হলে শিকারী বোঝে হাতীরা তার অস্তিত্ব টের পায় নি। কিন্তু যদি দেখে হাতী ঊর্দ্ধে শুঁড় তুলে ঘোরাচ্ছে পাকাচ্ছে, তা' হলে শিকারী বোঝে হাতী হয় তার গন্ধ পেয়েছে, নয় তো মানুষ এসেছে বলে সন্দিগ্ধমনা হয়েছে।

পোষ-মাঘ মাসে পর্ব্বতের সর্ব্বত্র হস্তিনীদের বৎস সহ বেড়াতে দেখা যায়। বিপদ থেকে পালাবার সময় বাচ্ছাগুলো মা'এর সঙ্গে সমানে দৌড়তে পারে না, কাজেই মা'এরা তখন নিজের নিজের "মাণিক" কে শুঁড়ে করে বয়ে নিয়ে যায় ; মুখের দু পাশে যে দুটো বড় বড় দাঁত আছে, তাতে চাপিয়েও সময়ে সময়ে নিয়ে যায়। বৎসবহনের এক অপূর্ব্ব উপায় সন্দেহ নেই—কি বল ?

একবার প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট বন্দুকের গুলিতে এক হস্তিনীকে আহত করেন। আহত হয়েও হস্তিনী কিছু দূর গিয়ে তবে পড়েছিল। কাছে এসে তিনি দেখেন হস্তিনী হাঁটু গেড়ে পড়েছে ; আর তার পা'এর তলায় থেঁৎলে গেছে এক হস্তিশিশু। হস্তিনী যে পথ ধরে এসেছিল, সে পথটা তন্ন তন্ন করে দেখেও হস্তিশিশুর কোন পা'এর দাগ দেখা যায় নি ; কাজেই হাতী যে দাঁতে করেই ছানা বয়ে আনছিল, তার একটা ধ্রুব প্রমাণ পাওয়া গেছল ; শুঁড়ে করে আনলে শিশু পায়ের তলায় চাপা পড়ত না।

শ্রীধানি লঙ্কা।

রাখাল।

(১

একটী রাখাল দিন বসে
অশথ তলায় গান গাহে,
বড়ই ভাগ্যবন্ত সে
হয় না সে গান সাঙ্গ হে।
নাই ব্যথা তার স্ফূর্ত্তিতে
ফুটে পুলক মূর্ত্তিতে
সে রয় ধুলায় প্রাণ যে তাহার
আস্‌মানেরি চাঁদ চাহে।

(২)

বয় যে উজান গীত শুনে
কঙ্কাবতীর না’ খানি,
পরীর দলের নাচ জমে
গীতের সুধা বাখানি’,
স্বর্ণ পুরী ‘মীন নাথের’
অমনি গলে পায়না টের,
অহঙ্কারের নৃত্য থামায়
অমর পুরের ঝঞ্ঝা হে।

(৩)

গোধন তাহার ওই ঘরে
মুখ ডুবায়ে শ্যাম তৃণেই
নিত্য অভাব তার ঘরে
আনন্দ তার কমতি নেই।
তাহার বুকের এস্‌রাজে
কি এক অথাই সুর বাজে
সুর মিলাতে তার সে সুরে
ব্যাকুল আমার প্রাণ চাহে।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

ঢিল-পাট্‌কেল

যুদ্ধের সময়, এক বালক একটি অশ্বতরের পিঠে চাপিয়া সেনানিবাসে রসদ লইয়া যাইতেছিল। বালক যখন সেনানিবাসে পঁহুছিল, তখন একদল সেনা কুচ করিয়া বাহির হইতেছে। তাহাদের আগে আগে ব্যাণ্ডের দলও চলিয়াছিল। ইহাদের আসিতে দেখিয়া বালকটি অশ্বতর হইতে নামিয়া পড়িল—হাতে কিন্তু বল্গাটি ঢিলা করিয়া ধরিয়া রহিল।

কতকগুলি সৈনিক নিকটে দাঁড়াইয়াছিল। তাহারা পাড়াগেঁয়ে বালকটিকে লইয়া একটু রহস্য করিবার জন্য বলিল,—

"ওহে খোকা, বন্ধুটীকে অমন ক'রে আটকে রেখেছ কেন ?"

বালক কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া বলিল,—

"কি জানি, ও যদি গিয়ে সেনাদলে নাম লিখোয়!"

শ্রীধানি লঙ্কা।



জাভা-দ্বীপের বর ক'নে।

কুড়ানো ছেলের কাহিনী

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শীতকালটা আমরা পো-সহরে কাটাইলাম। আমাদের অভিনয় রোজই হইত; দর্শকও অনেক জুটিত। তাহাদের মধ্যে ছোট ছোট বালক-বালিকার সংখ্যাই বেশী। আমরা যা করিতাম তাহাতেই তারা খুসী হইত—বাড়ি ফিরিবার সময় তাহারা আমাদের মুঠা মুঠা মিষ্টি, নানাবিধ খাবার দিয়া যাইত।

শীত শেষ হইলেই আবার আমরা চলিতে লাগিলাম। এবার আমাদের যাত্রাই ফ্রান্সের রাজধানী প্যারী নগরীর দিকে। দীর্ঘ পথ, কখনো পাহাড়ের উপর দিয়া, কখনো নদীর ধার দিয়া, কখনো নিবিড় বনের ভিতর দিয়া আমরা চলিতে লাগিলাম। কত গ্রাম, কত লোকালয় আমরা অতিক্রম করিয়া আসিলাম—দূর হইতে পিছন ফিরিয়া তাহাদের গির্জ্জা ঘরের উচ্চ চূড়াগুলি মাত্র দেখিতে পাইতাম। একদিন সকালে সম্মুখে দূরে একটা সহরের মত দেখা গেল। ভিটেলিস্‌কে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, এটা টুলু-সহর। ভিটেলিস্ বলিলেন এখানে আমাদের কিছুদিন থাকিতে হইবে। সহরে ঢুকিয়া তিনি প্রথমেই সেইমত আয়োজনে ব্যস্ত হইলেন। একটি হোটেল ঠিক করিয়া তাহাতে জিনিষপত্র রাখিয়া আমাকে লইয়া তিনি একটি অভিনয় করিবার মত জায়গা খুঁজিতে বাহির হইলেন। সহরের বাহিরে প্রকাণ্ড ময়দান ছিল। সেখানে বড় বড় গাছেরও অভাব ছিল না। আমরা তাহাদেরই একটি ছায়া বাছিয়া লইলাম। কিন্তু প্রথমেই হাঙ্গাম বাধিল

পুলিশের সঙ্গে। সেখানে সে আমাদের অভিনয় করিতে দিবে না। ভিটেলিস্ বুঝিলেন, সে কিছু ঘুষ চায়। কিন্তু তিনি ঘুষ দেওয়ার লোক নন। তিনি স্পষ্টই পুলিশকে বলিলেন—তাঁহার কাজে কোনরূপ বে-আইনী হয় নাই—কাজেই তিনি তাহার আদেশ মানিতে বাধ্য নন! পুলিশ তাহাকে শাসাইয়া চলিয়া গেল। কিন্তু ভিটেলিস্ তাহাতে কিছুমাত্র ভীত হইলেন না।

পরদিন সকালেই আমরা দলবল লইয়া সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। অভিনয়ের জন্য পূর্ব্ব হইতেই আমরা একটি স্থান দড়ি দিয়া ঘিরিয়া রাখিয়াছিলাম। ভিটেলিস্ সেখানে জিনিষপত্র নামাইয়া অভিনয়ের জন্য প্রস্তুত হইলেন। অমনি পূর্ব্বদিনের সেই পাহারাওয়ালা হাতে লাঠি ও মাথায় লাল পাগড়ি পরিয়া সেখানে আসিয়া উপস্থিত। ভিটেলিসের দিকে চোখ ঘুরাইয়া বলিল—"তোমার কুকুরদের তুমি মুখ বাঁধ নাই কেন?"

ভিটেলিস্ অতিমাত্র বিস্ময়ের সহিত বলিলেন—"আমার কুকুরদের মুখ বাঁধিব?"

"হাঁ, জাননা, রাস্তায় কুকুরের মুখ খোলা বে-আইনী।"

ভিটেলিস্ বিদ্রূপের ভঙ্গিতে উত্তর করিলেন, "হুজুরের কথা মান্য করি, আমার খুবই ইচ্ছা কিন্তু (দর্শকদের দিকে তাকাইয়া) আপনারা সকলেই জানেন আমার এই 'কেপি' কত বড় ডাক্তার, তার কত খ্যাতি—মুখ বন্ধ করিলে সে চিকিৎসা করিবে কিরূপে?"

একথায় সকলেই খুব হাসিয়া উঠিল। ভিটেলিস্ উৎসাহ পাইয়া বলিতে লাগিলেন—"জানেন আর এই ডলসি ঠাকুরাণীকে দেখিতেছেন ইনি হচ্চেন নার্স! রোগীরা সহজে কি ঔষধ পথ্য খাইতে চায়! ডলসি ঠাকুরাণী কত

বুঝাইয়া তাদের ঔষধ পথ্য খাওয়ায়। তাহার মুখ বন্ধ করিলে রোগীদের অবস্থা কি হইবে? কে তাহাদের এত যত্নের সহিত ঔষধ পথ্য খাইতে বলিবে?

ভিটেলিসের এই বিদ্রূপবাক্যে খুসী হইয়া সকলে মিলিয়া পাহারাওয়ালাকে ঠাট্টাবিদ্রূপ করিতে লাগিল। পাহারাওয়ালা রাগে গর্‌গর্‌ করিতে করিতে বলিল, "কাল যদি তোমার কুকুরদের মুখ খোলা দেখিতে পাই তাহা হইলে তোমাকে ধরিয়া থানায় লইয়া যাইব।"

ভিটেলিস্‌ অতিমাত্র বিনয়ের সহিত লম্বা সেলাম করিয়া বলিলেন—"কাল যদি হুজুরের সাক্ষাৎ পাই তাহা হইলে অতিশয় আনন্দিত হইব।"

পরদিনও ভিটেলিস্‌ তাঁহার কুকুরগুলির মুখ বন্ধ করিলেন না। আমার কেমন ভয় হইতে লাগিল। তিনি আমাকে ভরসা দিয়া বলিলেন,—"তোমার কোন ভয় নাই। তুমি প্রথম কুকুর তিনটা ও জলিকে লইয়া অভিনয়ের জায়গায় যাইবে। আমি পরে যাইব, কাল পাহারাওয়ালাকে লইয়া বেশ একটু মজা করিতে হইবে।"

আমার মনে যথেষ্ট ভয় থাকিলেও ভিটেলিসের আদেশ অমান্য করিবার মত আমার শক্তি নাই। অভিনয়ের জায়গায় গিয়া দেখিলাম সেখানে আজ লোকের ভিড় আরও বেশী। তাহারা আজ শুধু অভিনয় দেখিতে নয়, পাহারাওয়ালার সঙ্গে ভিটেলিস্‌ কি মজা করে তাহা দেখিবার জন্য ও অনেক লোক আসিয়াছে।

একটু পরেই দূরে পাহারাওয়ালার লাল পাগড়ী দেখা গেল। জলি অমনি দুই হাতে কোমর চাপিয়া ধরিয়া বুক ফুলাইয়া বিচিত্র মুখভঙ্গিতে পায়চারী করিতে লাগিল। পাহারাওয়ালা আসিয়া পড়িয়াছে কিন্তু ভিটেলিস তখনও আসিলেন না। আমার কেবলি ভয় হইতে লাগিল আজ না জানি

কি হয়। এদিকে পাহারাওয়ালাকে দেখিয়া 'জলিরও' স্ফূর্ত্তি বাড়িয়া গেল। সে তাহার দিকে বিচিত্র ভঙ্গিতে কটাক্ষ করিতে লাগিল, নানারকম মুখভঙ্গিতে তাহাকে নকল করিতে লাগিল। আমি তাহাকে ধরিবার চেষ্টা করিলাম। সে আমার হাতে ধরা দিল না, এদিক ওদিকে দৌড়িয়া পালাইতে লাগিল। পাহারাওয়ালার দিকে তাকাইয়া দেখিলাম ক্রমশই তাহার মূর্ত্তি ভীষণতর হইয়া আসিতেছে। আমার কেবলি মনে হইতে লাগিল এই বুঝি কি ঘটে! আমি এদিক ওদিক তাকাইতে লাগিলাম কিন্তু ভিটেলিসের দেখা নাই। হঠাৎ আমার পিঠে দমাদম কিল ঘুষী আসিয়া পড়িল। আমি সেই আঘাত সামলাইতে না পারিয়া মাটিতে পড়িয়া অজ্ঞান হইয়া গেলাম, যখন আমি চোখ মেলিলাম তখন দেখি ভিটেলিস্ সজোরে পাহারাওয়ালার হাত চাপিয়া ধরিয়া রাখিয়াছে—তাহার দুই চোখ আগুনের মত লাল! ভিটেলিসের এমূর্ত্তি আমি কখনও দেখি নাই—এতদিন আমি তাঁহার সৌম্য প্রশান্ত মূর্ত্তিই দেখিয়া আসিয়াছি—আজ তাহাকে মূর্ত্তিমান জ্বলন্ত অগ্নির মত দেখাইতেছিল।

পাহারাওয়ালা এক হেঁচ্‌কায় হাত টানিয়া লইয়া ভিটেলিসের টুঁটী চাপিয়া ধরিয়া এক ঝটকা মারিল। ভিটেলিস্ সে ধাক্কায় মাটিতে পড়িয়া গেলেন। কিন্তু তখনি উঠিয়া সজোরে পাহারাওয়ালার হাতে এক ঘুষী মারিলেন। তখন দুজনের মধ্যে রীতিমত মারামারি বাধিয়া গেল। দুজনেই সমান বলশালী কিন্তু ভিটেলিসের বয়স হইয়াছে। কাজেই পাহারওয়ালার সঙ্গে তিনি শেষ পর্য্যন্ত লড়িয়া উঠিতে পারিলেন না,—তিনি শ্রান্ত হইয়া পড়িলে পাহারাওয়ালা তাঁহার হাত সজোরে চাপিয়া ধরিল—"চল, তোমাকে থানায় লইয়া যাইতেছি!"

ক্রমশঃ

শ্রীতেজেশচন্দ্র সেন।

লাড্ডুর গল্প।

একদিন একটা লোক কিছু লাড্ডু নিয়ে বাজারে বেচ্‌তে যাচ্ছিল। সে যেমন একটা নদীর পাড় দিয়ে নাম্‌তে যাবে অমনি একটী লাড্ডু তার সমুখ দিয়ে গড়াতে গড়াতে চলে গেল। লোকটা তখন ভারি আশ্চর্য্য হয়ে বলে উঠ্‌ল—"বাঃ তুই একাই যেতে প্রস্তুত তবে ত তুই বাজারের পথ চিনিস্ দেখচি। তা বেশ, তুই যা, আমি বাকীগুলোকেও তোর পিছুপিছু পাঠিয়ে দিচ্চি, আর আমি আস্তে আস্তে যাব'খন। এই বলে' সে ঝুড়ি থেকে বাকী লাড্ডু গুলো বের করে একে একে গড়িয়ে দিতে লাগল। কতক বা ঝোপের আড়ে, কতক বা বেড়ার ধারে, কতক বা নদীর জলে গিয়ে পড়্‌ল। তারপর সে চীৎকার করে বল্‌ল—"তোরা আমার সঙ্গে বাজারে দেখা করিস্।"—বলেই সোজাসুজি বাজারের দিকে চল্‌ল।

বাজারে গিয়ে এধার ওধার—চারধার খুঁজে বেড়াতে লাগল, কিন্তু লাড্ডুর আর দেখা পেল না। বাজারে কোন চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হয় আর অমনি জিজ্ঞাসা করে "হ্যাগা, তুমি কি আমার লাড্ডুগুলিকে বাজারে আসতে দেখেছ?"

তখন একজন আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা ক'রলে "কেমন ক'রে তারা আসবে?"

"কেন তারা নিজে! তারা ত বাজারের পথ বেশ চেনে। তাদের সঙ্গে যখন আমার ছাড়াছাড়ি হ'লো তখন তারা এত জোরে আসতে লাগ্‌ল যে আমার মনে হ'লো আমি পৌঁছুতে না পৌঁছুতে তারা বাজার ছাড়িয়ে অনেকদূর গিয়ে পড়বে। আমি ঠিক বল্‌তে পারি তারা এতক্ষণ 'পেঁড়োয়' গিয়ে উঠেছে।"

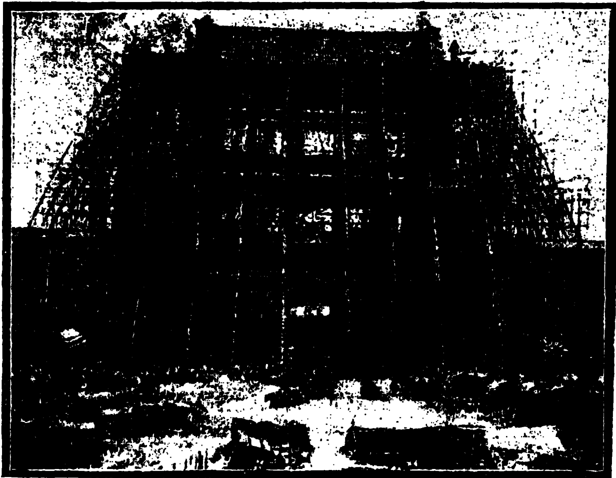
এই ব'লে সে তখনি 'পেঁড়ো' যাবার জন্য ষ্টেসনের দিকে ছুট্‌ল।

শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

তাজ্জব !

বাঁশের ফটক।

ছবিটা দেখে বল্‌তে পার জিনিষটা কি ? সম্ভবতঃ পার না। ওটা একটা চীনদেশের ফটক, বাঁশের তৈরী। কেবল বাঁশ, আর কিছু না—বাঁশ-



গুলাকে বাঁধবার জন্যে না দড়ী, না আটকাতে পেরেক, কিছুই নেই। ঐ বাঁশের ছাল ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে বাঁশগুলিকেই বাঁধা হইয়াছে। যে স্থানে এই বাঁশ ফটক স্থাপিত, আগে ঐ খানে একটি প্রকাণ্ড ফটক ছিল। ১৯০০ সালে সে'টি ইয়ুরোপীয় জাতির সঙ্গে যুদ্ধে ধ্বংস হয়—তখন হইতেই এইটির সৃষ্টি হইয়াছে।

———

ছেলেদের হিন্দুস্থান।

রামায়ণ।

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

রাম ও লক্ষণ, সুগ্রীব মিতা ও বীর হনুমান অজস্র সেনা সামন্ত লইয়া লঙ্কার দ্বারে হানা দিল—সীতা উদ্ধারের জন্য। রাজপ্রাসাদে বসিয়া রাবণ সে সংবাদ শুনিয়া শিহরিয়া উঠিল। অত—বড়-বীর রাবণ—ত্রিভুবন যাহার ভয়ে কম্পমান তাহার চিত্তও কি জানি কিসের আতঙ্কে উন্মনা হইয়া উঠিল।

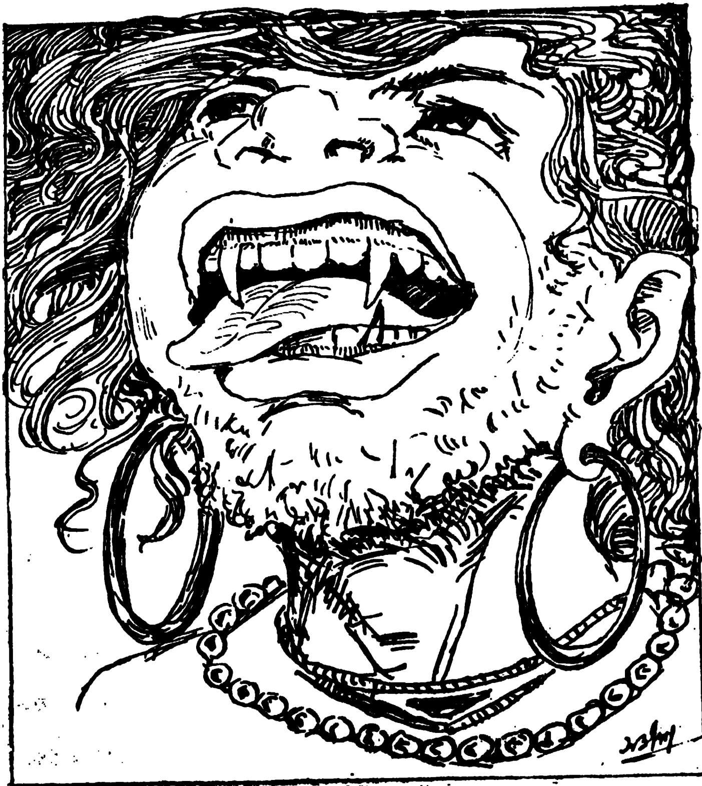
পরামর্শদাতাগণ বুঝাইল, দেবতাগন্ধর্ব্ব যাঁহার নামে ভয় পায় ক্ষুদ্র নর, বানর তাহার কি করিতে পারে? কথাগুলি রাবণের মনের মত হইয়াছিল। কিন্তু তথাপি তাহার মন এ কথাতে প্রবোধ মানিল না। হৃদয় বীণার কোন্ তারটি যেন ছিঁড়িয়া গিয়াছে—তাহাতে আর সে সুর বাজে না।

রাজার ভাই বিভীষণ, এই বিপদে সে সুপরামর্শই দিল, বলিল, পরস্ত্রী তিনি, তাঁহাকে ফিরাইয়া দিন। কিন্তু রাজ্যের লোভ ও পাপ আসিয়া রাজার সব সুবুদ্ধি নাশ করিয়া দিয়াছিল, রাজা ক্রোধে আত্মহারা হইয়া বিভীষণকে পদাঘাত করিল।

বিভীষণ ধীরে ধীরে উঠিল, একটিও কথা কহিল না, একটিও প্রতিবাদ করিল না। যেমন আসিয়াছিল তেমনি রাজসভা হইতে বাহির হইয়া গেল—বরাবর—রামচন্দ্রের নিকট, রামচন্দ্রের আশ্রয়ে।

রামচন্দ্র সব শুনিলেন, বুঝিলেন যুদ্ধ অনিবার্য্য। একদিকে রাক্ষসদের অগুন্তি সেনা, আর পৃথিবী বিজয়ী রাবণ তাহার সেনাপতি। অন্যদিকে নর বানরের ক্ষুদ্র বাহিনী রামচন্দ্রকে নেতা করিয়া যুদ্ধে আসিয়াছে, দুই দলে সমর বাঁধিল—সে এক ভীষণ যুদ্ধ। আর্য্য-কুমার রামচন্দ্র ও লক্ষণ, অদ্ভুত তাঁহাদের অস্ত্র শিক্ষা, অদ্ভুত তাঁহাদের শক্তি, সেই বিরাট অনার্য্যবাহিনীকে

তাঁহারা রাম শরে জর্জ্জরিত করিলেন; অনার্য্যরাজ রাবণ পরাজিত হইল। শক্রকুল নির্ম্মূল করিয়া যুদ্ধান্তে রামচন্দ্র জেতা অজেতাদের লইয়া বসিয়া আছেন, এই সময়ে বিভীষণ দুঃখিণী অশ্রুমতী সীতাদেবীকে সসম্মানে লইয়া আসিলেন —রামচন্দ্রের নিকট।



রাবণ মরিল।

অত লোকের মধ্যেও প্রভাত সূর্য্যের ন্যায় রামচন্দ্র সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। ধীরে ধীরে সীতাদেবী সেখানে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। কত দিনের অন্তরায়। কত দিনের অদর্শন! কে জানে উভয়ের মনের মধ্যে তখন কি প্রবল ঝটিকা বহিতেছিল, বাহিরে প্রকৃতি কিন্তু শব্দ হীন ও স্তব্ধ।

কিন্তু দুঃখিণী সীতাদেবীর দুঃখের দিন তখনও শেষ হয় নাই। শান্ত ও স্তব্ধ প্রকৃতি রামচন্দ্রের মুখ হইতে কঠোর আজ্ঞা বাহির হইয়া আসিল—সীতার অগ্নি পরীক্ষা হইবে।

সীতার চরিত্র যে নিষ্কলঙ্ক—রামচন্দ্রের অপেক্ষা আর কে ইহা ভাল জানে? কিন্তু তথাপি রামচন্দ্র তাঁহার অগ্নি পরীক্ষা আবশ্যক মনে করিলেন। রক্ষোরাজের বাড়ীতে সীতা এতদিন বন্দিনী ছিলেন—দশ জনে তাই সীতা সম্বন্ধে দশ কথা বলিতে পারে! সীতার নামে কলঙ্ক উঠিলে সূর্য্যবংশে কলঙ্কের লেপ পড়িবে। তিনি রাজকুমার, প্রজার ইচ্ছানুযায়ী কাজ করাই তাঁহার কর্ত্তব্য। তাই তিনি আদেশ করিলেন, সীতার অগ্নি পরীক্ষা হইবে।

তখনই অগ্নি প্রস্তুত করা হইল। সেই জ্বলন্ত অগ্নির মধ্যে সীতাদেবী প্রবেশ করিলেন। কিন্তু নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের দিব্য জ্যোতিঃ সীতাদেবীর সর্ব্বাঙ্গ হইতে বিস্ফুরিত হইতেছিল। অগ্নি সীতাকে স্পর্শ করিল না, স্বয়ং ধর্ম্ম সীতাকে রক্ষা করিলেন।

তাহার পর, চতুর্দ্দশ বৎসর পরে রাম, লক্ষ্মণ, ও সীতা অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিলেন। রামচন্দ্রের রাজত্বে প্রজারা মহা সুখে ছিল। লোকে এখনও কথায় বলে রাম রাজত্ব। রামচন্দ্র ও সীতাদেবীকে প্রজারা ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। কিন্তু জন্মদুঃখিনী সীতাদেবীর এত সুখ সহিল না। কুলোকে নানা কুকথা বলিতে লাগিল।

"সীতাদেবী অত দিন রাক্ষসের ঘরে ছিলেন ; তাঁহাকে আবার ঘরে আনা ভাল হয় নাই।" রামচন্দ্র গুপ্তচরের নিকট সব কথা শুনিলেন—শুনিয়া দুঃখে কষ্টে রোদন সম্বরণ করিতে পারিলেন না। যিনি প্রজার সুখের জন্য যথা-সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে প্রস্তুত তাঁহার নামে কি-না কলঙ্ক। তিনি লক্ষ্মণকে আজ্ঞা করিলেন—সীতাদেবীকে বনে রাখিয়া আসিতে।



মহর্ষি······উপস্থিত হইলেন।

পতিব্রতা সীতাদেবী বাল্মীকির আশ্রম সমীপে পড়িয়া আছেন, এই সময়ে মহর্ষি বাল্মীকি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সীতাদেবীর অশেষ দুঃখ ও দুর্গতির কথা বাল্মীকির অজানা ছিল না; তিনি দুঃখিনী রাজবধূকে আশ্রমে আশ্রয় দিলেন। গর্ভবতী অবস্থাতেই সীতাদেবী পরিত্যক্তা হইয়াছিলেন, আশ্রমেই তিনি লব ও কুশ নামে দুই যমক পুত্র প্রসব করিলেন। স্বয়ং বাল্মীকি হইলেন—তাহাদের শিক্ষা-গুরু।

বৃদ্ধ বয়সে রাজা রামচন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবেন স্থির করিলেন। দেশ বিদেশ হইতে বহুলোক নিমন্ত্রিত হইলেন। মহর্ষি বাল্মীকিও সে যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হইয়া আসিলেন। আর তাঁহার সঙ্গে আসিল—লব ও কুশ।

বাল্মীকি রামচন্দ্রের অদ্ভুত জীবন কথা লইয়া কাব্য রচনা করেন, এবং তাহাতে সুর যোজনা করিয়া লব কুশকে গাহিতে দিলেন। সুর লয় সংযোগে বীণা বাজাইয়া যখন রামায়ণ গান গাহিলেন তখন সভাস্থ সকল লোক মোহিত স্তম্ভিত হইয়া গেল; আর রামচন্দ্রের দুই চক্ষু বহিয়া অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িল। মহর্ষি বাল্মীকি তখন পিতাপুত্রের পরিচয় দিলেন, এতদিন পরে পিতা পুত্রের মিলন হইল।

পরিচয়ের পর সীতাদেবীও রাজসভায় আসিলেন। স্বয়ং মহর্ষি বাল্মীকি যথা সময়ে ঘোষণা করিলেন সীতাদেবী নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক। তথাপি তখনও রামচন্দ্র প্রজাদের মুখ চাহিয়া সীতাদেবীকে গ্রহণ করিতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। সীতাদেবীর উপর দিয়া অনেক বড় বড় ঝড় ঝাপ্টা বহিয়া গিয়াছে। অনেক দুঃখ, কষ্ট, অপমান তিনি সহিয়াছেন, কিন্তু আর পারিলেন না, সহিবার ক্ষমতা আর তাঁহার ছিল না, এই অপমানের ভারে তিনি একেবারে নুইয়া পড়িলেন—আর উঠিলেন না।

ভরত।

(ছড়া)

রাম গেলেন বনে ভরত ভাবে মনে
ফিরায়ে আনিবে তাঁরে ধরিয়া চরণে।
ভরত বনে পশি' নয়ন জলে ভাসি,
কহে রামে "এস দাদা, কেন হেথা বসি!"
পিতার সত্যে বাঁধা অটল রাম দাদা,
কন "ভাই ঘরে যাও, নাহি সাজে কাঁদা!"
ভরত কয় ফিরে সজল চোখে ধীরে
"দাও গো খড়ম তব নিব বহি শিরে;"
পূরাণ আশা তার ভরত আর বার
বলে "দাদা, অযোধ্যায় যাব নাত আর!"
'নন্দীগ্রাম' মাঝে রব সেবা-কাজে
সিংহাসনে খড়মে যে স্থাপি রাজসাজে!
ভরত হেন ভাই আমরা হতে চাই
তা'না হ'লে এ জাবনে কোন ফল নাই!

শ্রীজীবেন্দ্র কুমার দত্ত।

গোপালের রান্না।

রাজা রাজড়ারা প্রায়ই হতেন খুব খেয়ালী। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ও খুব খেয়ালী লোক ছিলেন।

মহারাজ সভায় বসিয়া কহিলেন—দেখ আজ বেড়াইয়া ফিরিবার সময় ঐ খিড়কীর পুকুরটার দিকে চাহিতেই আমার শীত করিতে লাগিল। একে এই ভীষণ শীত, তায় এঁদো পানা পুকুর, একেবারে সবুজ সবুজ ধোঁয়া উঠিতেছে; দেখিয়াই আমার শীত করিতে লাগিল।

মহারাজের আমলা-পারিষদ, বয়স্য-মোসায়েব যত ছিল সবাই সমস্বরে বলিয়া উঠিল, সে কথা আর বলিতে মহারাজ! আপনি মহারাজ বলিয়াই শুধু শীত করিয়াছে, আমরা হইলে একবারে জমিয়া যাইতাম।

আর কেহ বলিয়া উঠিল—ওটা কি পুকুর মহারাজ! ও একেবারে বরফের আড়ৎ!

মহারাজ বলিলেন—ঐ পুকুরটায় যদি কেহ সমস্ত রাত গা ডুবাইয়া বসিয়া থাকিতে পারে, আমি তাহাকে হাজার টাকা পুরস্কার দিই।

হাজার টাকার নামে অনেকেরই মনটা কেমন-কেমন করিয়া উঠিল, কিন্তু পুকুরটার কথা ভাবিয়া বুকের রক্ত জল হইয়া গেল। মানুষের অসাধ্য কর্ম্ম না হইলে তাঁহারা নিশ্চয়ই একবার চেষ্টা করিয়া দেখিতেন, আর টাকাটা ত বড় কম নয়। একটা নয়, দু'টো নয়, একশো নয়, দু'শো নয়, একে বারে—হা—জা—র—টা—কা।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র জিজ্ঞাসিলেন—বলি, পার কি ?

কেহই আর মাথা তুলিলেন না।

মহারাজ আজ্ঞা করিলেন, ঢোল বাজাইয়া প্রচার করিয়া দাও যে সমস্ত রাত ঐ পুকুরটায় ডুবিয়া থাকিতে পারিবে—হাজার টাকা পুরস্কার পাইবে।

অনেকেই সেদিন রাজসভা হইতে ফিরিবার পথে পুকুরটার পানা সরাইয়া জলে আঙ্গুল ডুবাইয়াই পলায়ন করিলেন।

কিছুদিন পরে এক ব্রাহ্মণ কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় আসিয়া কহিল—মহারাজ, আমি পুকুরটায় ডুবিয়া থাকিব।

তাহার এই অসমসাহসিক কথা শুনিয়া সভাশুদ্ধ লোকে হাঁ হাঁ করিয়া উঠিল, মহারাজ বলিলেন—ব্রাহ্মণ তুমি কি পুকুরটা দেখিয়াছ ?

ব্রাহ্মণ করযোড়ে বলিল—দেখিয়াছি, মহারাজ !

সকলেই ব্রাহ্মণকে বিরত করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু ব্রাহ্মণ স্থির, অচল ও অটল। বলিল—পারিব।

সন্ধ্যারাত্রে ব্রাহ্মণ আহারাদি শেষ করিয়া 'দূর্গা' নাম স্মরণ করিয়া জলে নামিল। একটা প্রহরী উজ্জ্বল আলোক হাতে করিয়া সারা রাত পাহারা দিতেছে—ব্রাহ্মণ গলা পর্য্যন্ত ডুবাইয়া বসিয়া আছে। রাজপ্রাসাদ মঞ্চে প্রহরে প্রহরে ঘড়ি বাজিতে লাগিল, তিন চারিবার পাহারা বদল হইল, ব্রাহ্মণ কিন্তু একটুও নড়িল না, চড়িল না, সমস্ত রাত একই ভাবে বসিয়া রহিল।

ভোর হইতেই সপারিষদ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র আসিয়া দাঁড়াইলেন। ব্রাহ্মণ জল ছাড়িয়া উঠিল। মহারাজ কোষাধ্যক্ষকে হুকুম দিলেন, ইহার পারিতোষিকটা দিয়া দাও।

কিন্তু পারিষদদের কাহারো কাহারো কেমন একটা অন্তর্দাহ উপস্থিত হইল।

এতটা টাকা বামুনটা লইয়া পালাইবে ? তাহারা ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসিল—কি রকম কি করিলে বাপু, বল ত শুনি ?

ব্রাহ্মণ কহিল—কি আর করিব বলুন ! সারারাত দুর্গা নাম করিয়াছি—আর পাহারাওলার হাতের আলোটির দিকে চাহিয়া কাটাইয়াছি।

পারিষদ জিজ্ঞাসিল—পাহারা কত দূরে ছিল ?

পাড়েই ছিল। একটা উজ্জ্বল আলো লইয়া ঘুরাইতেছিল।

পারিষদ বলিয়া উঠিল, তবেই হইয়াছে! মহারাজ, ব্রাহ্মণ জুয়াচোর। পাহারার আলোর দিকে চাহিয়া গরম হইয়া লইয়াছে।

সঙ্গে সঙ্গেই অন্য সকলে বলিয়া উঠিল—তাই ত আমরাও বলি, মহারাজ, ঐ এঁদো পুকুরটায় সারারাত কি কেহ ডুবিয়া থাকিতে পারে ? আলোটা না থাকিলে বুঝিতাম, কেমন থাকে ?

তখন সাব্যস্ত হইয়া গেল, ব্রাহ্মণ আলোর দিকে চাহিয়া উত্তাপ সঞ্চয় করিয়া লইয়াছে। ওটা জুয়াচোর, উহাকে গলাধাক্কা দিয়া বিদায় করা হোক।

যে কথা, সেই কাজ। ব্রাহ্মণ কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল। পথে সাক্ষাৎ গোপালের সঙ্গে। গোপাল নদীতে স্নান সারিয়া বেশ পরিবর্ত্তন করিতে গৃহে ফিরিতেছিল, এখনি আবার রাজসভায় যাইতে হইবে। বেলা ৯টায় দরবার।

গোপাল সব কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণকে বাড়ী লইয়া গেল। ব্রাহ্মণকে দাওয়ায় বসাইয়া গোপাল বাড়ীর পিছনের বাঁশঝাড় হইতে একটি ৩০ হাত লম্বা বাঁশ কাটিয়া আনিয়া তাহাতে চাট্টি চাল, ডাল ও জল দিয়া একটি হাঁড়ি বাঁধিয়া উঠানে পুঁতিয়া মাটীতে গর্ত্ত খুঁড়িয়া আগুণ জ্বালিয়া দিল। দিয়া, ব্রাহ্মণকে বলিল—তুমি এখন যাও ঠাকুর, বিকালে আসিয়া দেখা করিও। বোধ হয় বিকালেই তোমায় টাকাটা দেওয়াইতে পারিব।



"এতক্ষণে বোধহয় ফুটিতেছে।"

এদিকে ৯টা বাজিয়া গেল, মহারাজ সভামধ্যে গোপালকে না দেখিয়া সিপাহী পাঠাইয়া দিলেন। সিপাহী আসিয়া জানাইল, গোপাল ভাত চড়াইয়াছে, খাইয়া আসিবে, বলিল।

আবার ঘণ্টাখানেক পরে লোক আসিল, সে ফিরিয়া গিয়া এক কথাই নিবেদন করিল। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিলেন—আচ্ছা ভাত চড়াইয়াছে দেখিতেছি। চল ত হে, দেখা যাক্ ব্যাপারটা কি?

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে গৃহাঙ্গনে দেখিয়া গোপাল ভক্তিভরে প্রণাম করিল। মহারাজ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, চারবার ডাকিতে পাঠাইলাম — তোমার আর যাইবার সময় হইল না?

গোপাল সবিনয়ে কহিল—মহারাজ ভাত নামিলেই······

মহারাজ বলিলেন—কোথায় ভাত?

গোপাল ৩০হাত উচ্চে বাঁধা হাঁড়ী দেখাইয়া বলিল "এতক্ষণে বোধ হয় ফুটিতেছে।"

গোপাল উনানে কাঠ ঠেলিয়া দিল।

মহারাজ বলিলেন—তুমি এইখানে জ্বাল দিতেছ, ঐ খানে ভাত ফুটিবে? তোমার কি বুদ্ধি গোপাল! বাহবা!!

গোপাল বলিল, আমি কি এতই বোকা যে না জানিয়া ভাত চড়াইয়াছি, ফুটিবে বৈ কি মহারাজ! পুকুরের জলের মধ্যে ডুবিয়া যদি পাহারার আলোয় উত্তাপ সঞ্চয় করা যায়—আমার ঐ গন্‌গনে তেঁতুল কাষ্ঠের জ্বালে ঐ কটা চাল আর গরম হইবে না? নিশ্চয় হইবে—আপনি একটু অপেক্ষা করুন। এখনই ভাত নামাইয়া·········

কিন্তু আর বলিতে হইল না। মহারাজ নিজের ভুল বুঝিলেন।

বলিলেন—গোপাল, ব্রাহ্মণ কোথা?

গোপাল ব্রাহ্মণকে হাজির করিল। মহারাজ তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণকে সহস্র-মুদ্রা পুরস্কার দিলেন—ব্রাহ্মণ গোপালের বুদ্ধিতে অবাক হইয়া গেল। বি।

সরল বাঙ্গলা সাহিত্য

ডাক ও খনার বচন।

এই সকল বচন যে কতকালের, তাহা ঠিক বলা যায় না। বৌদ্ধধর্ম্ম যে সময় প্রবল ছিল, তখন ভক্তির উপর ততটা জোর দেওয়া হইত না, পূজা-আহ্নিক জপ, তপ এই সকলের ততটা ঘটা ছিল না। ব্রাহ্মণেরা যখন হিন্দুধর্ম্মকে নূতন ছাঁচে ঢলিয়া ফেলিলেন, তখন জপতপ লইয়া লোকেরা ব্যস্ত হইয়া পড়িল।

ডাক ও খনার বচনে জপতপের কথা বিশেষ দেখা যায় না। জীবে দয়া, মহোৎসব, পুকুর-কাটা এই সকল ছিল, বৌদ্ধ-যুগের প্রধান ধর্ম্ম।

ডাক ও খনার বচনে ঐ সকল কাজের উপরই বেশী জোর দেওয়া হইয়াছে—সুতরাং মনে হয় এই বচনগুলি হিন্দুধর্ম্মের নূতন রূপ গ্রহণ করিবার পূর্ব্বেকার রচনা,—যদিও ইহাদের ভাষার খুব একটা পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তথাপি মাঝে মাঝে এমন শক্ত পুরাণো ভাষার নমুনা পাওয়া যায় যে তাহার অর্থ ভাল করিয়া বোঝা যায় না। একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি ঃ—

"আদি অন্ত ভূজসি
ইষ্ট দেবে যেহ পূজসি
মরণের যদি ডর বাসশি
অসম্ভব কভু ন খায়সি।"

এই বচনগুলি কে রচনা করিয়াছিল তাহা ঠিক নির্ণয় করা শক্ত। আসাম-বাসীরা বলেন ডাক নামক এক ব্যক্তি ৫০০ খ্রীষ্টাব্দে লোহিডাঙ্গরা গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন, তিনিই "ডাকের বচন" রচনা করেন। বাঙ্গলা দেশের প্রবাদ এই যে বরাহ পণ্ডিতের পুত্র-বধু খণা "খণার বচন" লিখিয়া ছিলেন। এ সকল কথা প্রবাদ-কথা মাত্র, উহা সত্য বলিয়া মনে হয় না।

আমাদের ধারণা বাঙ্গলাদেশের কৃষকেরা, পাড়াগাঁয়ের জ্যোতিষীরা, এবং বুড় গিন্নিরা যে সকল ছড়া তৈরী করিয়া মুখে মুখে চালাইয়া আসিয়াছেন, তাহাই ডাক ও খনার বচন নামে দেশে প্রচলিত হইয়াছে। হয়ত পূর্ব্বোক্ত দুই জ্ঞানী ব্যক্তির কোনকালে দুচারটা ছড়া ছিল, তাহার আদত ভাষা কি ছিল, তাহাও জানিবার উপায় নাই। তাহার সঙ্গে যুগে যুগে গ্রামের শত শত ছড়ার সংযোগ হইয়া এখন মস্তবড় আকার ধারণ করিয়াছে।

এই সকল বচনে ছোট খাট কথায় অনেক জ্ঞানের কথা আছে,—

খণ্ড খণ্ড আকাশ, এলো থেলো বাতাস,
কি কর শ্বশুর বাঁধ আইল, বৃষ্টি হবে আজ কাইল।"

এখানে খনা তার শ্বশুর বরাহকে সম্বোধন করিয়া ছড়াটি বলিতেছেন। যখন বাতাস এদিক ওদিক সকল দিক হইতেই বহিতেছে—কোন একটা বিশেষ দিক হইতে আইসে নাই, যখন আকাশের মেঘ খণ্ড খণ্ড,—একটা বড় রকমের আকার ধরিয়া রহে নাই, তখন খনা ডাকিয়া বলিতেছেন "শ্বশুর মহাশয় ক্ষেতে আইল বাঁধুন, এইবার বৃষ্টি হইবে—জল ধরিয়া রাখিতে হইবে।"

"খনা ডেকে ব'লে যান, রোদে ধান ছায়ায় পান।"

যত রোদ বেশী পাইবে, ততই ধান বাড়িবে, আর যতই ছায়া বেশী হইবে, পান ততই গজাইবে।

"যদি বরে আগনে। রাজা নামেন মাগনে॥
যদি বরে পোউষে। কড়ি হয় তুষে॥
যদি বরে মাঘের শেষ। ধন্য রাজার পুণ্য দেশ॥
যদি বরে ফাগুনে চিনা কাওন হয় দ্বিগুণে।"

এত সংক্ষেপে এত সহজে এরূপ সত্য যাঁরা বলিতে পারিয়াছিলেন, তাঁরা অবশ্যই জ্ঞানী ছিলেন স্বীকার করিতে হইবে। আগণ মাসে বৃষ্টি হইলে ধান চালের অবস্থা এত খারাপ হয়—যে রাজাকেও খাজনা না পাইয়া ভিক্ষায় নামিতে হয়; পৌষে বৃষ্টি হইলে ধান একবারে নষ্ট হয়, তখন তুষেরও দাম হয়, মাঘের শেষে বৃষ্টি হইলে ফসল খুব বেশী হয়—ফাল্গুনের বৃষ্টিতে চিনা কাওন দ্বিগুণ হয়।

সংসার গৃহস্থালীর সকল দিক দিয়াই এইরূপ ছোট ছোট কথায় মস্ত মস্ত সত্য প্রচার করা হইয়াছে। বাড়ী করিবার সম্বন্ধে দুচারি কথা এইরূপ

উপদেশ আছে—যাহা লিখিতে যাইয়া এখনকার দিনে ইঞ্জিনিয়ারগণ বড় বড় বই তৈরী করিয়া ফেলিতেন—

"পূবে হাঁস পশ্চিমে বাঁশ
উত্তর ঘিরে দখিণ ছেড়ে
বাড়ী কর্‌গে ভেড়ের ভেড়ে।"

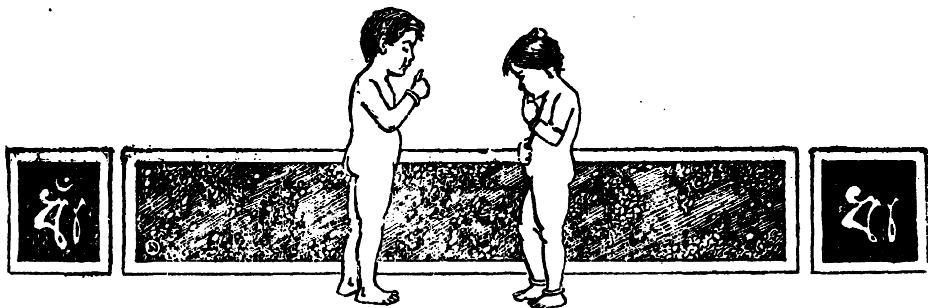
শেষের কথাটা গালাগালি, সেটা সেকালের দস্তুর,—এখন হইলে বলা হইত "ওরে বোকা শোন্, বল্‌ছি—" ভেড়ের ভেড়ে মানে এই। পূবে হাঁস অর্থ পূবদিকে পুকুর থাকিবে—সেখানে স্বচ্ছন্দে হাঁস জলের উপর বেড়াইয়া বেড়াইবে। পশ্চিম দিকে বাঁশের ঝাড়- সেটা গৃহস্থের সম্বলও বটে, এবং পশ্চিমের রোদটা খুব ভাল নয়, বাঁশবনে একটু বাধা পাবে—অথচ রোদটা একবারে বন্ধ করাও ঠিক নয়। উত্তরটাতে কিন্তু গাছ দিয়ে হউক, প্রাচীর দিয়ে হউক একবারে ঘিরিয়া ফেলাই ভাল--উত্তরে হাওয়া ভাল নয়। দক্ষিণটা খোলা রাখিতে হইবে।

এইরূপ শত শত বচন আছে। এক একটি ছোট ছড়া যেন এক একখানি ছোট শাস্ত্র। বাঙ্গলা পুরাণো কথায় লেখা হইয়াছে ব'লে অমান্য করিও না, সংস্কৃত কি ইংরেজীতে লেখা হইলেও ইহাদের মূল্য বাড়িত না।

ডাকের বচনে মানুষের চরিত্র সম্বন্ধে কথাই বেশী আছে, যথা—

ঘরে আখা বাইরে রাঁধে অল্প কেশ ফুলাইয়া বাঁধে,
পাণি ফেলিয়া পাণিকে যায়, পুরুষের দিকে আড় চোখে চায়
ঘন ঘন চাহে উলটি ঘাড়। ডাক কহে এ নারীতে ঘর উজাড়॥

ঘরে উনুন থাকিতেও যে বাহিরে রান্না করে,—মাথার চুল বেশ নাই, তবু তাহা খুব ফুলাইয়া দেখায়, জল ঘড়ায় আছে, সে জল ফেলিয়া দিয়া জল আনিবার ছলে পুকুরে যায়, আর ঘন ঘন বাইরের লোকের দিকে ঘাড় উল্টিয়া দেখিতে থাকে—এইরূপ স্ত্রী সংসার নষ্ট করে। ক্রমশঃ শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।



নূতন ধাঁধা।

(১) আমি দুটি কথা। প্রথমটা পাখী, দ্বিতীয়টা ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা আব্দার ধরে খায় আর দু'টি যোড়া দিলে 'আমার দেশে'র পাঠক পাঠিকা মেতে উঠে বাগানে বা বনে যায়। কথাটা আমি কি-গা?

(২) ১ ৯ ১ এর সঙ্গে এমন ভাবে একটি ২ যোড়া দিয়া কাগজে লিখিয়া দাও—যাহাতে ঐ সংখ্যাটি ২০র একটু কম হয়।—কুমারী মায়াময়ী মজুমদার।

(৩) ৪৫ (কতকগুলি সংখ্যার সমষ্টি করিয়া) হইতে এমন ভাবে ৪৫ (কতকগুলি সংখ্যার সমষ্টি করিয়া) বিয়োগ কাট, বিয়োগফলও যাহাতে ৪৫ হয়।

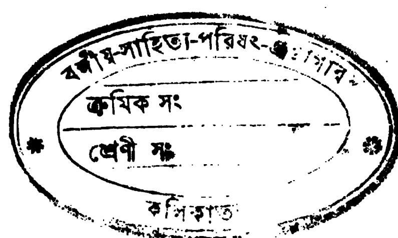
শ্রীরবীন্দ্রকুমার বসাক।

(৪) পা দুটী নাইকো মোর তবু চলি বেশ ;
চলার হয় না মোর দিন রাত্রি শেষ।
চলিতে চলিতে এক তিল থামি ;
চোখে দেয় কাটী পুরে দুষ্ট মোর স্বামী।
পাক দেয় তারপর সেই কাটী ধরি'
যন্ত্রণায় বুক ফাটে কেঁদে কেঁদে মরি।
আবার চলিতে থাকি নাহি পরিত্রাণ ;
স্কুলে আফিষে থাকি, থাকি সর্ব্বস্থান।
আমার পায়েতে আছে বড় বড় কাঁটা
জগতে হয়েছে তাই সার্থক হাঁটা।
সুবিধা পাইলে মোরে চুরী করে চোরে ;
বল দেখি নাম মোর দেখি ফস্ ক'রে।

শ্রীমতী প্রতিভাসুন্দরী।

এই মাসের ধাঁধার উত্তর ও উত্তর দাতাগণের নামের সঙ্গে গত মাসের (ফাল্গুনের) ধাঁধার উত্তর ও উত্তর দাতাগণের নাম আগামী মাসে বাহির হইবে।

প্রকাশক—শ্রীশিশিরকুমার মিত্র বি, এ। শিশির পাব্লিশিং হাউস, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।
প্রিণ্টার—শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। বিদ্যোদয় প্রেস, ৮।২ কাশী ঘোষ লেন, কলিকাতা।



ক্রমিক সং
শ্রেণী সং



ভারতবর্ষ।

Lakshmibilas Press.

আমার দেশ

২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা। বৈশাখ, ১৩২৯

বোকা!

(শিশুর রচনা)

(১)

টুনু তোমার মেয়ে বটে ওমা!
কিন্তু সে কিছুই যে বোঝেনা।

আমি যখন পাঠশালাতে যাই,
ও তখন কাগজ কলম নিয়ে;
কাগজেতে আঁচড় পাড়ে বসে,
আমার কথা মোটেই শোনে না,
টুনু তোমার মেয়ে বটে, ওমা!
কিন্তু সে কিছুই যে বোঝেনা।

(২)

বলি যদি টুনু পড় ক, খ,
সে কেবল, হেসেই ঢলে পড়ে ;
বলে—"বই ?" ভাবে বুঝি বইটা আমার
তার মত ছোট একটি খেলনা।
টুনু তোমার মেয়ে বটে ওমা !
কিন্তু সে কিছুই যে বোঝেনা।

(৩)

আমি যখন ট্রাই সিকেলে চড়ি
বলে দাদা ভুঁয়ে পলে দাবি ;
আমায় সে চড়তে দেখে কত,
দেখে তবুও শেখে না ;
টুনু তোমার মেয়ে বটে ও মা !
কিন্তু সে কিছুই যে বোঝেনা।

(৪)

ছুটির দিনে রোব্‌বারেতে যবে,
বসে আমি ঈশ্বরকে ডাকি,
বলে "দাদা আমায় খেলা নিবি"
কি! বোকা ! মা ! ঈশ্বর কি জানেনা!
টুনু তোমার মেয়ে বটে ও মা !
কিন্তু সে যে কিছুই জানেনা॥

শ্রীসন্তোষকুমার রায়।







লাউ চিংড়ী।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র নদীয়ার মহারাজ!

মহারাজ একদিন সভায় বসিয়া পারিষদদিগকে কহিলেন—শুনিতে পাই নদীয়ায় কৃপণ নাই, একি সত্য কথা?

একজন সভাসদ সগর্ব্বে কহিলেন—মহারাজ আপনার রাজ্যে অভাব যখন কাহারো নাই, তখন কৃপণও থাকা সম্ভব নহে।

এ কথা মহারাজ বিশ্বাস করিলেন না, বলিলেন—তোমরা ঠিক খবর রাখ না। আমি দু' একটি কৃপণের খবর রাখি, তার মধ্যে একটি আমার পিসিমা। তোমরা ত তাঁহাকে জান! আজ পর্য্যন্ত একটা অন্ধ আতুরও এক মুষ্ঠি চাল তাঁহার নিকট আদায় করিতে পারে নাই। হাতে অনেক টাকা আছে কিন্তু মহা কৃপণ।

রাজার পিসি, অন্য সকলেই মাথা নীচু করিয়া রহিল, কথা কহিল না। পিসিমা কৃপণের চূড়ান্ত বটে, কিন্তু তাঁহারা ত আর তাঁহার বিরুদ্ধে কথা বলিতে পারেন না। সেই সভায় গোপাল ভাঁড় হাজির ছিল। সে দাঁড়াইয়া উঠিয়া কহিল—মহারাজ পিসি কৃপণ বটে, তবে দয়া ধর্ম্ম যে একেবারেই নাই এমন কি কখনও হইতে পারে! একে পিসি, 'তায় আবার রাজ-রাজ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পিসি। এ কি হইতে পারে?

মহারাজ হাসিয়া বলিলেন—গোপাল, তুমি দেখি পিসিমাকে চেন না!

গোপাল কড়জোড়ে কহিল—চিনি বৈ কি মহারাজ! পিসিমাকে কালই একটা মস্ত লাউ দিয়া আসিলাম··

মহারাজ বলিলেন—দিয়া ত আসিলে, আনিতে কিছু পার কি? তা যদি পার গোপাল, তোমায় বাহাদুর বলিব। বুঝিব নাপিতের ছেলের কত বুদ্ধি, কত ধূর্ত্ত তুমি!

গোপাল প্রণাম করিতে মহারাজ আবার বলিলেন—পিসিমার কাছ হইতে তুমি যত টাকা আনিবে আমি তাহার চার গুণ তোমাকে পুরস্কার দিব।

গোপাল সাহ্লাদে চলিয়া গেল! তাহার আর সবুর সহে না। সে সোজা পিসিমার বাড়ী উপস্থিত হইয়া বলিল—পিসিমাগো, প্রণাম হই।

রাজা হ, গোপাল, রাজা হ! কি চমৎকার লাউ, গোপাল! এক চিল্‌তে কাল খেলুম, বাবা—

গোপাল সন্তুষ্ট মনে কহিল—ভাল হ'লেই ভাল পিসিমা। মহারাজ বলেন পিসিমার রান্নার হাত বড় মিঠে, লাউটাও কচি আছে, একদিন যদি—

কা'কে রে গোপাল? রাজা রাজড়াকে খাওয়াতে পারি এমন বরাত কি আমার বাবা!

গোপাল জিভ্ কাটিয়া বলিল—রাজা রাজড়ার কথা ভেবে ত আমার ঘুম হ'চ্ছে না, পিসিমা। আপনি খেতে ভাত পায় না, শঙ্করাকে ডাকে। আমার কথাই একদিন বল্‌ছি পিসিমা।

পিসিমা দেখিলেন, গোপাল অত বড একটা লাউ দিয়া গিয়াছে, তাহার ঘরের চালে নিশ্চয় আরও অনেক ফলিয়া আছে, পরে আরও পাঁচদিন কোন্ না দিবে?—এই ভাবিয়া বলিলেন—ওঃ—তুই! তা আজই দুপুর বেলা চাট্টি পেসাদ পাস্—বুঝলি গোপাল। আর দেখ্ বাবা, কাকেও বলিস্ নে। দেখছিস ত, বিধবা গরীব আমি—

গোপাল বলিল—পাগল হ'য়েছ পিসিমা! আবার কাকে বল্‌তে যাব!

গোপাল নিমন্ত্রণ লইয়া বাজারে চলিয়া গেল। নগদ তুই পয়সা খরচা করিয়া কুচা চিংড়ী মাছ খরিদ করিয়া, বাড়ী আসিয়া মাছ কটাকে ভাজিয়া কলা পাতে মুড়িয়া, কোঁচের খুঁটে বাঁধিয়া পিসিমার বাড়ী ঢুকিল। পিসিমা উঠানে পাতা পাতিয়া ভাত দিলেন, লাউঘণ্ট দিলেন, নটে শাকের চচ্চড়ী দিলেন।



কোঁচার খুঁটে বাঁধিয়া·· ঢুকিল।

পিসিমা ভাত দিয়া রান্নাঘরে কি আনিতে ঢুকিয়াছেন, গোপাল কোঁচার খুঁট খুলিয়া ভাজা চিংড়ীগুলি লাউঘণ্টে মিশাইয়া সপাসপ সপাসপ শব্দ করিয়া খাইতে লাগিল। পিসিমা একটু তুধ লইয়া ফিরিয়া আসিলেন, জিজ্ঞাসিলেন—আর কি দেব গোপাল?

গোপাল বলিল—পিসিমা,মহারাজ আমাদের মিথ্যা বলেন না। রান্না অতি পরিপাটি হয়েছে।

পিসিমা পুলকিত হইয়া কহিলেন—আর কি নিবি?

গোপাল মস্ত একটা গ্রাস মুখে পুরিয়া কহিল—একটু লাউচিংড়ী দাও পিসিমা!

পিসিমা আকাশ হইতে পড়িয়া কহিলেন—কি বল্‌ছিস্ গোপাল?

"লাউচিংড়ী,পিসিমা, বড় উত্তম হয়েছে।"

"লাউচিংড়ী কি রে মুখপোড়া! লাউঘণ্ট বল্।"

"না পিসিমা, এই যে এইটে গো—"

পিসিমার মাথায় বাজ ভাঙ্গিয়া পড়িল। গোপাল লাউঘণ্ট হইতে গোটা কত চিংড়ী বাছিয়া কহিল—এই যে পিসিমা! তা এটা বুঝি নিজের জন্যে রাঁধিয়াছ, বেশ হইয়াছে, পরিপাটি হইয়াছে আর একটু দাও।

পিসিমা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—ওকথা কি বলিতে আছে গোপাল? ব্রাহ্মণের বিধবা আমি, আমি কি মাছ খাই? তোর দুষ্টামী বুঝিয়াছি। যা করিয়াছিস্ করিয়াছিস,—কাহাকেও বলিস্ না।

গোপাল বলিল—শুধু মহারাজ যদি জিজ্ঞাসা করেন—

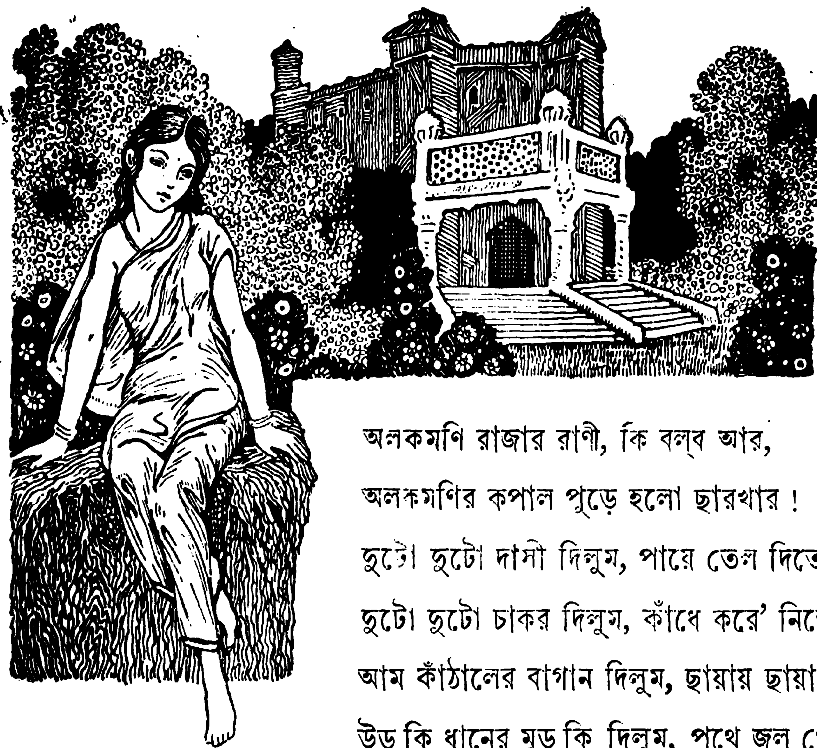
পিসিমা সসব্যস্তে কহিলেন—গোপাল পাঁচটা টাকা দিচ্ছি, চুপ কর।

গোপাল চোখ কপালে তুলিয়া কহিল—মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলে মিথ্যা কি করিয়া বলিব?

দশ, কুড়ি, পঞ্চাশ, শেষ একশ টাকা গণিয়া লইয়া গোপাল মহারাজের সম্মুখে উপস্থিত হইল। মহারাজ সন্তুষ্ট হইয়া গোপালকে চারশ টাকা পুরস্কার দিলেন।

পিসিমা তখন হইতে মাঝে মাঝে গোপালকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতে লাগিলেন। অবশ্য গোপাল লাউয়ের সময় লাউ, কুমড়ার সময় কুমড়া, মোচা ফলিলে মোচা উপঢৌকন দিয়া যাইত।

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার।



অলকমণি রাজার রাণী, কি বল্‌ব আর,
অলকমণির কপাল পুড়ে হলো ছারখার !
দুটো দুটো দাসী দিলুম, পায়ে তেল দিতে।
দুটো দুটো চাকর দিলুম, কাঁধে করে' নিতে।
আম কাঁঠালের বাগান দিলুম, ছায়ায় ছায়ায় যেতে।
উড়্‌কি ধানের মুড়্‌কি দিলুম, পথে জল খেতে।
রাজা গেল, রাজ্য গেল, গেল সমুদায় ;
বাতি দিতে রাজপুরীতে নাইক কেহ হায় !

বয়েস গোণাবে গো, বয়েস গোণাবে ?

১। খোকা, আমি তোমার বয়েস কত বলে দিতে পারি, খড়ি পেতে গুণে গেঁতে বলে দোব ; সুধু তাই নয় কোন মাসে তোমার জন্ম তাও বলে দিতে পারি। বিশ্বাস না হয় পরখ্ করে দেখ !

২। আচ্ছা, বল দেখি আমার বয়েস কত ?

১। রোসো, খোকা রোসো ; বলেছিই তো খড়ি পেতে বলব ; তোমার যে মাসে জন্ম সেই মাস সংখ্যাটা ধর-দেখি, মনে মনে ধর, অর্থাৎ যদি তোমার বোশেখ মাসে জন্ম হয় তবে এক ধর, যদি জৈষ্টি মাসে হয়, তবে দুই ধর, আষাঢ়ে তিন, এই ভাবে। আচ্ছা, ধরেছ ?

২। হুঁঃ। (খোকার জন্ম পৌষ মাসে।)

১। আচ্ছা, এইবার তাকে দুই দিয়ে গুণ কর। যা যা করতে বলি, সব মনে মনে কর, আমাকে বোলো না।

২। (৯×২=১৮) হুঁ।

১। তা'র সঙ্গে ৫ যোগ কর।

২। (১৮+৫=২৩) হুঁঃ।

১। তা'কে ৫০ দিয়ে গুণ কর।

২। (২৩×৫০=১১৫০) হুঁঃ।

১। বেশ, এইবারে তোমার যা বয়েস, তাই যোগ কর।

২। দাঁড়াও দেখি। (১১৫০ আর আমার বয়েস ১২, ১১৫০+১২=১১৬২) হুঁঃ।

১। এইবারে তাই থেকে ৩৬৫ বাদ দাও।

২। (১১৬২ — ৩৬৫ = ৭০৭) হুঁঃ।

১। ওর সঙ্গে ১১৫ যোগ কর।

২। (৭০৭ + ১১৫ = ৯১২) হয়েছে।

১। বল, কত হয়েছে ?

২। ৯১২

১। তা' হ'লে তোমার বয়েস ১২ ও পোষ মাসে তোমার জন্ম। ঠিক ?

২। হুঁঃ ঠিক।

১। দেখলে তো ?

বয়েস গোণাবে গো, বয়েস গোণাবে ?

১। তবে দেখ তোমাদের ছোট করে একটা কথা বলে দিচ্ছি। বয়েস যদি একশো বছরের বেশী হয়, তা' হ'লে এ গণনা—খাটবে না।

বয়েস যদি ১০এর কম হয়, তা' হ'লে অঙ্কে বয়স সংখ্যার আগে একটা শূন্য পাওয়া যাবে। সেটা বাদ দিয়ে বয়েস বলতে হয়। যথা, ধর—, কারুর বয়েস ৯ বছর ও জন্ম ফাগুন মাসে, তা' হ'লে শেষ সংখ্যা দাঁড়াবে ১১০৯। ১১টা হ'লো মাস সংখ্যা, ০টা বাদ, বয়েস সংখ্যা হ'লো ৯।

বয়েস গোণাবে গো, বয়েস গোণাবে ?

শ্রীধানি লঙ্কা।

শরণাগত রক্ষা।

বিতস্তা নদী তীরে উশীনর রাজা শিবিরাজ্যের অধিপতি। দেব দানব, যক্ষ, রক্ষ সকলেই সন্ত্রস্থ, এমনি শিবিরাজার প্রতাপ। ধর্ম্মে তাঁহার অচলা মতি, ধর্ম্ম-কার্য্য করিয়া যাগ যজ্ঞ করিয়া তিনি স্বর্গ, মর্ত্ত্য পাতালের লোককে খুসী করিয়াছেন। দেখিয়া শুনিয়া দেবরাজ ইন্দ্রের অত্যন্ত ভয় হইয়াছে।

অগ্নি ইন্দ্রের নিকট উশীনর রাজার যজ্ঞের ধুম ধামের কথা বলিতেছিলেন, শুনিয়া দেবরাজের আরও ভয় হইল—শিবিরাজা কোন দিন বা স্বর্গ রাজ্যটাই কাড়িয়া লইতে আসে!

দেবরাজ ইন্দ্র আর দেব হুতাশন পরামর্শ করিয়া শিবিরাজাকে পরীক্ষা করিতে চলিলেন। ইন্দ্র শ্যেন পক্ষী সাজিলেন আর অগ্নি হইলেন, কপোত! উভয়ে চলিলেন।

উশীনর রাজা যজ্ঞ করিতেছেন, ভয়ার্ত্ত কপোত তাঁহার সম্মুখে আসিয়া আর্ত্তস্বরে কহিল—রক্ষা করুন মহারাজ!

শ্যেনপক্ষীর আহার- কপোত! পশ্চাৎ পশ্চাৎ শ্যেন কপোতটিকে তাড়া করিয়া সভাস্থলে ঢুকিয়া পড়িয়া বলিল—মহারাজ আমার খাদ্য ত্যাগ করুন!

রাজা উশীনর জিজ্ঞাসিলেন—কে তোমার খাদ্য?

শ্যেন কহিল—সে কি মহারাজ, আপনি জানেন না, কপোতই আমাদের একমাত্র খাদ্য। ঐ কপোতটিকে ত্যাগ করুন, আমার অত্যন্ত ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছে।

রাজা প্রাণভয়ে ভীত, কম্পিত দেহ কপোতটির দিকে চাহিয়া, শ্যেনকে বলিলেন—তুমি অন্য কোন আহার প্রার্থনা কর। ইহার আশা ছাড়িয়া দাও।

এ আমার শরণ লইয়াছে। তুমি অন্য যে কোন জীবের মাংস চাও, আমি ব্যবস্থা করিতেছি।

শ্যেন ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল—মহারাজ কি জানেন না, কপোতই শ্যেনের একমাত্র খাদ্য?

রাজা উশীনর বলিলেন—তুমিও কি জান না এই কপোত যখন শিবিরাজার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে তখন সে দেবতারও অবধ্য!

কিন্তু আমি যে অভুক্ত, ক্ষুধার্ত্ত,মহারাজ!

প্রার্থনা কর। যাহা চাহিবে দিব।

শ্যেন অদ্ভুত যাচ্ঞা করিল। ঐ কপোতটির মাপে রাজা তাঁহার দেহের মাংস দিয়া তাহার ক্ষুন্নিবৃত্তি করুন!

রাজা বলিলেন—তথাস্তু।

তূলা দণ্ড আসিল, আর আসিল ছুরিকা! তুলাদণ্ডের একদিকে কপোতকে বসান হইল, অন্য দিকে রাজ-দেহের মাংস খণ্ড চাপান হইতে লাগিল।

মাপ সমান আর হয় না। রাজা যতই মাংস দেন, কপোতের ওজনের সমান হয় না। রাজা চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। যখন দেখিলেন, মাংস কাটিয়া কিছুতেই সমান সমান হইতেছে না, রাজা নিজে তুলা দণ্ডে উঠিয়া বসিলেন।

তখন দেবরাজ ইন্দ্র শ্যেন রূপ ত্যাগ করিয়া বলিলেন—রাজন্, যথেষ্ট হইয়াছে, তুমি ধার্ম্মিক শ্রেষ্ঠ! আশ্রিত রক্ষণে তোমার ত্যাগ অতুলনীয়।

বলিতে বলিতেই বিখণ্ডিত মাংস রাজ অঙ্গে ফিরিয়া গেল।

ইতিমধ্যে কপোত তাহার পূর্ব্বদেহ ফিরিয়া পাইয়াছিল।



তুলাদণ্ডের এক্‌দিকে কপোতকে বসান হইল, অন্যদিকে রাজ-দেহের............।

সম্মুখে দেবরাজ ইন্দ্র ও দেব হুতাশনকে দেখিয়া রাজা তাঁহাদের স্তব করিতে লাগিলেন।

শরণাগত ব্যক্তিকে রক্ষা করিতে ধার্ম্মিক জন স্বীয় দেহের মমতাও করেন না।






মাধব সেন।

বাদশা রাজদরবারে বসে বিচার করছেন; এমন সময় উজীর দৌড়ে এসে তাঁর পায়ের ওপর মাথা রেখে খুব কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল; বাদশা বল্লেন "উজীর কি হয়েছে—তুমি কাঁদ্‌ছ কেন—?" তখন উজীর বল্ল—খোদাবন্দ মাধব সেন আমাদের ছেড়ে স্বর্গের পথে চলে গেছে! উজীরের কথা শুনে বাদশার মুখ খানা কাল হয়ে গেল, তিনি তখনই দরবার ছেড়ে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে প্রাসাদে চলে গেলেন। সভার লোকেরা স্তম্ভিত হয়ে বসে রইল; যারা বাদশার একটু খোসামুদে ছিল তারা দেখা-দেখি চোখ মুছতে লাগ্‌ল।

বাদশাকে অমন কাঁদ্‌তে দেখে বেগমেরা সব শোক চিহ্ন ধারণ করলেন—তখনই নীল ও কাল পোষাকের ফরমাজ দোকানে গেল; দর্জ্জির দোকানে হুলস্থুল পড়ে গেল!

জানানা মহলে কান্নার শব্দে আর কান পাতা যায় না। কেউ বুক চাপড়াচ্ছে, কেউ মাথা খুঁড়ছে—সে এক মহা ব্যাপার আরম্ভ হয়ে গেল।

বড় বেগম সাহেবার প্রধানা বাঁদী ভাবল হঠাৎ এদের কে আত্মীয় মারা গেল যে চারদিকে এমন শোকের সাড়া পড়ে গেছে! সে দৌড়ে তার বেগম সাহেবার কাছে গিয়ে বল্ল—বাদশা বেগম কার মৃত্যুতে আপনাদের এত শোক

হয়েছে ? বেগম সাহেবা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বল্লেন, আহা জান না, মাধব সেন মারা গেছে ! বাঁদী জিজ্ঞাসা করল—হুজুর তিনি আপনাদের কে হ'ন ? বেগম বল্লেন—আমি জানি না কে হ'ন , বাদশা জানেন ! বাঁদী বাদশাকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, তিনি উত্তর দিতে না পেরে লজ্জিত হলেন ! এবং দরবারে গিয়ে উজীরকে ডেকে পাঠালেন, উজীর এসে বল্ল "খোদাতাল্লা আমি তো— জানিনা মাধব সেন কে ? কিন্তু কোতোয়াল জানে কেননা তাকে আমি কাঁদতে দেখেছি। বাদশা বল্লেন, ভারি বোকা তো ! কে মাধব সেন তার খবর না নিয়েই কাঁদ্‌তে আরম্ভ করলে ?

উজীর গিয়ে কোতোয়ালকে ধরল, কোতোয়াল ফ্যালফ্যাল করে উজীরের মুখের দিকে তাকিয়ে বল্ল, সাহেব আমি তো জানিনা ! জমাদার বড্ড কাঁদছিল তাই আমিও কেঁদে আপনার কাছে ছুটে গেছি ! তারা দুজনে ছুটল জমাদারের খোঁজে। পথেই তার সঙ্গে দেখা হ'ল,সে বল্ল—মাধব সেন কে তা তো জানি না আমার বিবি কাঁদ্‌ছিল তাকে কাঁদ্‌তে দেখে আমি কাঁদতে কাঁদতে কোতোয়ালের কাছে ছুটে বল্‌তে গিয়েছিলাম। উজীর সাহেব, আপনাকে কি আর বলব ? শাস্ত্রে লেখা আছে বিবি কাঁদ্‌লে মিয়ারও কাঁদ্‌তে হবে ! তাই আমি কেঁদেছি মাধব সেন কে তা জানি না।"তারা তিনজনে জমাদারের স্ত্রীর কাছে গেল। সে বল্ল, মাধব সেন কে তা কে জানে ? পুকুরে নাইতে গিয়েছিলুম দেখি ধোপা বৌ কাঁদ্‌ছে সে আবার আমার সখী যদিও সে জাতে ছোট কিন্তু আমরা এক গাঁয়ের মেয়ে,:তাকে শোক করতে দেখে আমিও কেঁদে মরে যাচ্ছি কিন্তু মাধব সেন কে তা তো জিজ্ঞাসাও করি নি ! ত তোমরা যখন এত পথ বেয়ে এসেছ তখন, যাই সখীর কাছ থেকে খোঁজ নিয়ে আসি ! সে গিয়ে দেখে ধোপাবৌ কপালে হাত দিয়ে মলিন মুখে বসে আছে রাশিকৃত কাপড় পাশে পড়ে রয়েছে !

সখীকে দেখে সে বস্‌তে বল্ল,এদিকে তারাও তিনজন জমাদার বৌয়ের সঙ্গে সঙ্গে এসে হাজির হয়েছে : তারা ধোপাবৌকে বল্ল হাঁ গা মাধব সেন কে ? ধোপাবৌ মাথা চাপড়ে আবার কান্না সুরু করে বল্‌তে লাগ্‌ল,"ওগো ! সে যে আমার ছেলের বাড়া, সে আমার ঘর অন্ধকার করে চলে গেছে, কে আর কাপড়ের গাঁট পিঠে করে ঘাটে নিয়ে যাবে। এক বছরের শুক্‌নো ঘাস জমিয়ে রেখেছি কে খাবে ? ওগো আমার যে সর্ব্বনাশ করে সে চলে গেছে গো।" উজীর তো হাঁ করে শুন্‌ছেন কিছুই ধরতে পাচ্ছেন না, শেষে ধোপাবৌকে বল্লেন, বাছা সে কে তা তে বলছ না ? ধোপা বৌ বল্ল, কে মাধব সেন তা আর জাননা ? আমার বাপের দেওয়া গাধাটার নাম মাধব সেন, সে যে আমার সব ছিল !

ধোপা বৌয়ের কথা শুনে তারা হাস্‌বে না কাঁদ্‌বে জানেনা যাহোক ভয়ে ভয়ে বাদশার কাছে গিয়ে সব বল্ল। বাদশা শুনে ভারি হাসতে লাগলেন,দরবার শুদ্ধ লোক হেসে গড়াগড়ি দিতে লাগল—বেগম মহলে হাসির হুল্লোর পড়ে গেল। হাসতে হাসতে সকলের পেট ফাটবার যোগাড় ! বড় বেগম সাহেবার বাঁদী সকলের মত কাঁদেও নি এবং এমন পেট ব্যথা করে হাসলও না ! আচ্ছা তোমরা বলত এর মধ্যে সব চেয়ে বোকা কে ? এবং বুদ্ধিমানই বা কে হল ? আমি বলি ঠিক কর। বড় মুস্কিল ; যে দেশের রাজা গাধা সে দেশেরই সবই গর্দ্দভ !!!

শ্রীপ্রণতা দেবী।

তাজ্জব !

পোষা-পাখী

পাখী ত তোমরাও পুষিয়াছ কিন্তু ঐ যে ভদ্রলোকটিকে দেখিতেছ, উহাঁর পাখী পোষার বিশেষত্বটি লক্ষ্য করিয়া দেখ দেখি !—কেমন মজার ! পাখীটা



ভদ্রলোকের মুখসংলগ্ন নলে ঠোঁট দিয়া খাবার খাইতেছে। রোজই খায়, যখন ক্ষুধা পায় তখনই গাছ হইতে উড়িয়া প্রভুর কাছে আসে, প্রভু সুমিষ্ট সিরাপ নলের মধ্যে পুরিয়া উহাকে খাইতে দেন। খাওয়া শেষ হইলে বনে উড়িয়া যায়।

———



এনষ্টিনের আবিষ্কার।

তোমরা বোধ হয় অধ্যাপক এলবার্ট এন্‌ষ্টিনের নাম শুনেছ! ইনি একজন জর্ম্মণ বৈজ্ঞানিক। ইনি এক নতুন তত্ত্ব আবিষ্কার করেছেন যাতে বিজ্ঞানজগতে হুলস্থূল পড়েছে ও বিপ্লব বেধে গেছে। এঁর আবিষ্কৃত তত্ত্বের সঙ্গে তোমাদের কিছু কিছু পরিচয় থাকা উচিৎ। বিষয়টী বড়ই জটিল ও দুরূহ, তথাপি যতদূর সম্ভব সহজ সরল ভাষায় এনষ্টিনের মূল কথা-তোমাদের দরবারে পেশ করছি।

একখানা পাটালি ভেঙ্গে রসনালোলুপ ছেলেপিলেদের মধ্যে ভাগ করে দাও, দেখবে একখানা টুকরা যদি আর একটুকরার চেয়ে বড় হয়ে থাকে, তো অমনি তারা নালিশ করবে—

"হুঁঃ—আমার চেয়ে ও একখানা বড় পেয়েছে!"

নিজেরটার সঙ্গে সম্বন্ধ খতিয়ে দেখ্‌লে সেটা বড় কিন্তু তৃতীয় একটার

সঙ্গে সম্বন্ধ খতিয়ে দেখলে হয় তো এই বড়টাই আবার ছোট। তবেই ছেলেটির নালিশের তাৎপর্য্য হচ্ছে এই যে, "আমার খানার সহিত সম্বন্ধে ওর খানা বড়—Relative to my piece, his larger."

কিন্তু আবার এটাও সত্যি যে, পাটালিখানার বাকিটার সহিত সম্বন্ধে ঐ "বড়" খানা "ছোট"। তা'হলেই দেখতে পাচ্ছ, অন্যান্য খণ্ডের আকারের সহিত সম্বন্ধ বিচার করে ছাড়া পাটালিখণ্ডগুলির আকার স্থির করবার কোন নির্দ্দিষ্ট মাপকাঠি নেই। নিরপেক্ষ "বড়" বা নিরপেক্ষ "ছোট" বলে কিছুই নেই—এ ওর সহিত সম্বন্ধে বা তুলনায় বড় বা ছোট। অতএব অন্যান্য আকারের সহিত কি সম্বন্ধ, তা' জানার ওপরেই আমাদের আকারজ্ঞান নির্ভর করে। ইহাকেই এনষ্টিন বৈজ্ঞানিকের ভাষায় বলেছেন,—আকারের আপেক্ষিকত্ব বা পরস্পরের সম্বন্ধের ওপর আমাদের আকারজ্ঞান নির্ভর করে—অর্থাৎ আকার আপেক্ষিক।

গতির বেলাতেও তাই। একজন লোক হয় তো খুব "দ্রুত" বেগে হাঁটছে ; কিন্তু পাঞ্জাব মেলের গতির তুলনায় লোকটির গতি "মন্দ"। আবার কামানের গোলার গতির তুলনায় মেলগাড়ীর গতি "মন্দ"। আলোর গতির তুলনায় আবার কামানগোলার গতি "মন্দ"। অতএব গতি ও আপেক্ষিক কোন নির্দ্দিষ্ট নিরিখ নয়।

এনষ্টিনের আর একটা মত হচ্ছে এই যে বিশ্বে সবই সচল ; কি জগৎমণ্ডলে কি তার বাইরে, কোন কিছুই নিশ্চল নয়। আমরা যে গ্রহে বাস করি সেটা তো একবার নিজের মেরুদণ্ডের ওপর আবর্ত্তিত হচ্ছে, আবার গোটাটা সূর্য্যের চারদিকে ঘুরছে। আমাদের সমগ্র সূর্য্যমণ্ডল আবার শূন্যের মধ্য দিয়ে ঘুরছে। কাজেই শূন্যে এমন বিন্দুমাত্র ও অচল স্থান নেই—যেখান থেকে আমরা—

অপরাপর জড়পদার্থের গতির স্বরূপ নিরীক্ষণ করতে পারি। সুতরাং যেখান-টাতেই দাঁড়িয়ে আমরা দেখি না কেন, সে স্থানটা নিজেই যখন সচল, তখন আমরা যে জিনিষটারই গতি দেখি, বাস্তবিকপক্ষে তখন যে সুধু সেই জিনিষটারই গতি দেখি তা নয়, আমাদের গতির সঙ্গে সেটারও গতি দেখি, অর্থাৎ আমাদের গতির সহিত সম্বন্ধে তার কি গতি তাই দেখি। এনষ্টিন বলেছেন ওর আপেক্ষিক গতি দেখি,—অতএব সকল গতিই আপেক্ষিক। আর চলনশীল জড়পদার্থের গতির হার অন্যান্য চলনশীল পদার্থের গতির হারের (speed) সহিত সম্বন্ধ বিশিষ্ট (relative)।

কথাটা আর ও একটু পরিষ্কার করে বলি। ধর তুমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছ তারই পাশ দিয়ে এক রেলগাড়ী যাচ্ছে। আমরা সচরাচর ভেবে থাকি দাঁড়িয়ে আমরা ট্রেণখানারই গতি দেখছি। এনষ্টিন বলছেন. "উঁহু. তা নয়। তুমি ধরে নিচ্ছ যে তুমি দাঁড়িয়ে আছ, নড়ছ বা চলছ না. কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তুমি যে জায়গাটায় দাঁড়িয়ে আছ সেটা নিশ্চল নয়, সেটাও চলছে। কাজেই তোমার দাঁড়িয়ে ট্রেনের গতি দেখাটা কি রকম জান? যেন তুমিও ছুটছ, গাড়ীও ছুটছে, আর তুমি ছুটতে ছুটতে ধাবমান গাড়ীর গতি নিরীক্ষণ করছ। এ রকম অবস্থায় তুমি কি দেখ! শুধুই কি রেলগাড়ীর গতি? না, তা নয়, তোমার গতির সহিত সম্বন্ধে রেলগাড়ীর কি গতি তাইই নিরীক্ষণ কর"। সকল গতির বেলাতেই তাই—কোন বস্তুর নিজের গতি আমরা দেখতে পাই না, আমাদের গতির সহিত সম্বন্ধে তার কি গতি তাই দেখি। আমাদের গতি অর্থাৎ আমরা যে স্থানটায় দাঁড়িয়ে আছি তার গতি।

এনষ্টিন আরও দেখিয়েছেন যে দুইটী চলন্ত জড়পিণ্ডে সময়ও বিভিন্ন। ধর

নং ১ ও নং ২ দুটো জড়পিণ্ড ছুটছে। এক নম্বরটীর গতির হার ক আর দোসরা নম্বরটির গতির হার খ। তা'হলে এই বিভিন্ন হারে চলন্ত পদার্থ দুটোতে সময় এক নয়! ১ নম্বরে এক সেকেণ্ড ও ২ নম্বরে এক সেকেণ্ড, সমান নয়, ভিন্ন। দুটোতেই সময়ের দৈর্ঘ্য একই বোধ হয় বটে, কেননা সবই অনুপাতে সমান কিন্তু অপেক্ষায় (relatively) ওরা ভিন্ন। তোমরা উচ্চাঙ্গের গণিত যখন পড়বে তখন ঐ কথাটি ভাল করে বুঝতে পারবে।

সবাইকার ধারণা ছিল চলন্ত পদার্থের গতির হার যাই হোক-না কেন, স্থান ও কাল সর্ব্বত্র সমান; এনষ্টিন বলেছেন কক্‌খনো না। স্থান (space) ও কাল নিরপেক্ষ দৃঢ়বদ্ধ নিরিখ নয়, fixed absolute standard নয়; স্থান ও কাল পরস্পরের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট মাত্র, এক নয়।

আবার স্থান ও কাল বলে দুটো জিনিষ আলাদা হয়ে নেই দুটোই একেরই অংশবিশেষ হয়ে আছে। সকল ঘটনাই হয় এখানে হচ্ছে না হয় ওখানে; দক্ষিণে না হয় বামে; উপরে না হয় নীচে; সামনে না হয় পিছনে; এখন না হয় তখন। কাজেই বুঝতে পারছ স্থান ও কাল কেউ কাউকে ছেড়ে নেই। স্থান বিনা গতি হতে পারে না; গতিতেও সময় লাগে।

এনষ্টিনের আর একটি মত এই যে চলৎ অবস্থায় সকল বস্তুই নিজের দৈর্ঘ্যের এক ভগ্নাংশ কমে যায়, যে মুখে গতি সেই মুখেই এই হ্রাস ঘটে থাকে। এক ফুট লম্বা কোন জিনিষ যদি অতি ভীষণ বেগে ছুটতে থাকে তা' হ'লে সেটা এক ফুটের চেয়ে কিছু কমে যাবেই। যেদিকে ফুট মাপা হয়েছে অর্থাৎ যে দিকে গতি, কমাটা সেই দিকেই হবে।

অতএব গতির হার অনুসারে জড় পদার্থের আকার বা পিণ্ড পরিবর্ত্তিত হয়। যদি একটী কামানের গোলা পূবদিকে দ্রুতবেগে ছোটে তা'হলে যে দিকে ওর

গতি সেই দিকে ওটা কিঞ্চিৎ চেপ্টা হয়ে যাবে। অতি ভীষণ বেগে ছুটলে প্রভূত পরিবর্ত্তন ঘটবে।

এনষ্টিন আলোকে বস্তুত্ব আরোপ করেছেন, বলেন, আলোক জড় পদার্থের মতনই স্থূল বস্তু, ও মাধ্যাকর্ষণ ক্রিয়ার অধীন। তিনি দেখিয়েছেন যে সূর্য্যের কাছ বরাবর দিয়ে যে সকল আলোকরশ্মি গতায়াত করে, তারা সূর্য্যের আকর্ষণ বশতঃ বাস্তবিকই সরল রেখা থেকে বিক্ষিপ্ত হয় অর্থাৎ ভেতর দিকে আকৃষ্ট হয়। এই থেকে এনষ্টিন্ বলেন যে আলোক পূরা সরলরেখায় না গিয়ে শূন্যের মধ্যে দিয়ে যাতায়াতে কিঞ্চিৎ বেঁকে যায়, যদি বেঁকে যায় তা' হ'লে পরিশেষে আলোক এক বক্ররেখায় পরিণত হয়ে যাত্রাবিন্দুতে ফিরে আসবে। এইরূপে আমরা এক বক্র শূন্য (curved space) ও সসীম অথচ অসীম বিশ্বের ধারণা করি।

শ্রীধানি লঙ্কা।



তাজ্জব !

মস্ত ফুল।



একটা কত বড় ফুল ফুটিয়াছে দেখিতেছ ! ইহার চেয়ে বড় ফুল কখনও দেখিয়াছ বলিয়া তোমার মনে হয় কি ? পার্শ্বের ছবিতে ফুলটিকে দেখিয়া খুব বড় বলিয়া হয় ত তোমার মনে হইতেছে না, কিন্তু ফুলটির পার্শ্বে ঐ যে লোকটি দাঁড়াইয়া আছে, তাহাকেই কত ছোট দেখাইতেছে দেখ-ত ! ইহা হইতেই বুঝিতে পারিবে, ফুলটি অসাধারণ ! এক ভদ্রলোক অনেক যত্নে, অনেক পরিশ্রমে তাঁহার বাগানে এটিকে ফুটাইতে পারিয়াছিলেন।

কুড়ানো ছেলের কাহিনী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

এই বলিয়া তাহাকে থানার দিকে টানিয়া লইয়া চলিল। তিনি বলিলেন, "ছাড়, আমি নিজেই যাইতেছি।" আমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "কুকুর তিনটা ও জলিকে লইয়া তুমি হোটেলে যাও। আমি তোমাকে থানায় গিয়া সংবাদ পাঠাইব।"

অভিনয় ভাঙ্গিয়া গেল। দর্শকেরা সকলে পুলিশকে গালাগালি দিতে দিতে বাড়ি চলিয়া গেল। অনেকে বলিল "যেমন পুলিশের সঙ্গে ঝগড়া করিতে গিয়াছিল এখন তার ফল ভোগ করুক্।"

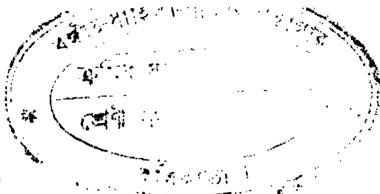
আমি আমার ছোট্ট দলটি লইয়া হোটেলে ফিরিয়া আসিলাম। কিন্তু ভিটেলিসের কি হয় জানিবার জন্য আমার মন ব্যাকুল হইয়া রহিল! তাঁহার যদি জেল হয়! তাঁহাকে ছাড়িয়া আমি কি করিয়া থাকিব! তখন যে তাঁহার সঙ্গে আমার মনিব ভৃত্যের সম্বন্ধ নয়! তিনি আমাকে পুত্রাধিক স্নেহ করেন! আমি যে তাঁহাকে পিতার মত ভালবাসি! তিনি আমাকে লেখাপড়া, গান বাজনা শিখাইয়াছেন তাঁহার স্নেহের পরিচয় এই ভ্রমণে কতবার কত রকমে আমি পাইয়াছি—একদিনও তিনি আমাকে ফেলিয়া আহার করেন নাই, রাত্রিতে আমি শয়ন করিলে তিনি শয়ন করিতেন, আমার সুখ সুবিধা আরামের, ভালর দিকে তাহার কি দৃষ্টিই না ছিল! এমন মনিবকে আমি হারাইব? আর আমি তাঁহার স্নেহ ভালবাসা পাইব না! ক্ষুধার সময় কে আমাকে খাইতে দিবে! রাত্রিতেই বা আমি কোথায় শয়ন করিব! হায়, আমার কি গতি হইবে?"

আমার সঙ্গে টাকা পয়সাও কিছু নাই। পকেটে কয়েক আনা পয়সা মাত্র। তাহাতে কয়দিন চলিবে! তারপর আমিই বা কি খাইব, কুকুরগুলি জলিকেই বা কি খাইতে দিব! তৃতীয় দিন খবর পাইলাম—শনিবার তাঁহার বিচার হইবে। আমি যেন বিচারের সময় আদালতে উপস্থিত থাকি। কুকুরগুলি ও জলির যেন কোন রকম অযত্ন না হয়।

শনিবার দিন আমি আদালতে গেলাম, প্রথমে অন্য আরও অনেকের বিচার হইল, সর্ব্বেশেষ ভিটেলিসের বিচার আরম্ভ হইল। ভিটেলিসের মূর্ত্তি তেমনি স্থির, স্তব্ধ প্রশান্ত, আমি আদলত ঘরের এক কোণে দাঁড়াইয়া ছিলাম আমাকে দেখিবার জন্য তিনি করুণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাইলেন।

পুলিশের সহিত ঝগড়া, কাজেই পুলিশেরই জিত হইল। সে ভিটেলিসের বিরুদ্ধে সত্যমিথ্যা অনেক·কথাই জানাইয়া বলিল, ২।৪ জন মিথ্যা সাক্ষীও সে হাজির করিল, ভিটেলিস্ একটি কথাও মিথ্যা বলিলেন না, বিচারক দুই পক্ষেরই কথা শুনিয়া ভিটেলিসের দুইমাসের কারাদণ্ডের আদেশ দিয়া সেদিনের মত বিচার শেষ করিলেন। দণ্ডাদেশ শ্রবণ করিয়া তিনি আমার দিকে তাকাইলেন—সে দৃষ্টিতে কি মায়া, কি করুণা! আমিও তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলাম—তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া, মনে হইল তিনি যেন কি বলিতে চান! কিন্তু তখনই একজন প্রহরী আসিয়া তাঁহার হাত ধরিল এবং এক মুহূর্ত্তের মধ্যে তাঁহাকে লইয়া ঘরের বাহির হইয়া গেল, প্রহরীরাও আমাকে ঘরের বাহিরে যাইতে বলিল। আমি ঘরের বাহিরে আসিলাম। কিন্তু কোথায় যাই? এখন আমার কি গতি হইবে? ক্রমশঃ

শ্রীতেজেশচন্দ্র সেন।









বোকারাম।

এক পল্লীগ্রামে এক বিধবার একটী ছেলে ছিল। ছেলেটির মন খুব সরল ছিল, আর তার গায়েও খুব শক্তি ছিল, অপর ছেলেদের মত ছেলেবেলা থেকেই সে কারো সঙ্গে চালাকি খাটাতে বা দুষ্টামি বুদ্ধি চালাতে শেখেনি। সে এতই সরল মনা ছিল যে তাকে বোকা বল্লেও চলে। তাই লোকে তাকে বোকারাম বলে ডাক্‌ত। তার মা একদিন বল্লে—বাবা, ঘরে খুব খাওয়ার কষ্ট, কিছুদিন চাকরী করে আয় না। মার আদেশ, আর কি সে ঘরে বসে থাক্‌তে পারে? চল্ল। চলে চলে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোকের বাড়ীতে চাকরের কাছে নিযুক্ত হ'ল। তাকে আর ভাল চাকরী কে দেবে বল? লেখাপড়াত শেখেনি! সাত বৎসর কাজ করার পর সে তার মনিবকে বল্লে যে সে অনেকদিন বাড়ী যায়নি; কিছুদিনের ছুটী পেলে সে একবার বাড়ী থেকে ঘুরে

আসবে। আর তার এক বছরের যে মাইনে সেটাও চাইলে। তার বুড়ো মনিবটা ও বেশ ভাল লোক ছিল। অপর লোক হলে তাকে হয়ত বোকা পেয়ে অমনি অমনিই তাড়িয়ে দিত। কিন্তু সেটা করা উচিত কি? তাতে অধর্ম্ম হয়, পাপ হয়, বুড়ো তা'জানত। তাই সে বোকারামকে ফাঁকি না দিয়ে তাকে তার সাত বছরের মাইনে—টাকার পরিবর্ত্তে প্রকাণ্ড একখানা রূপোর 'চাঙড়া' দিলে। বোকারাম সেটা একটা বস্তায় পূরে পিঠে ফেলে বেরিয়ে পড়্লে। কিছুদূর গিয়ে সে দেখ্তে পেলে একটা লোক একটা ঘোড়ায় চড়ে' সেদিক্‌পানে আস্‌ছে। লোকটা কাছে এলে বোকারাম বল্লে—ভারি সুন্দর ঘোড়াটীত! তার ঘোড়ায় চড়্বার সখ মনে মনে খুব জেগে উঠ্‌ল। বল্লে, ওহে, ঘোড়াটা আমায় দাও না, এই রূপোর 'চাঙ্‌ড়াটা' তোমায় দিচ্ছি। ঘোড় সওয়ার প্রথমে ভাব্‌লে সে বুঝি তাকে ঠাট্টা করছে! এত বড় একটা রূপোর 'চাঙ্‌ড়া,' যার দাম হয়ত তিন চার শো টাকা—একি একটা সামান্য ঘোড়ার বদলে কেউ দেয়! শেষে সে যখন বুঝলে যে ছোক্‌রাটা নিশ্চয়ই বোকা, তখন সে খুব এক গাল হেসে ঘোড়াটা তাকে দিয়ে রূপোর চাঙ্‌ড়াটা নিয়ে সটাং বাড়ী গিয়ে পোঁছল। বোকারাম তখন ঘোড়ায় উঠে ভারি স্ফুর্ত্তি কর্ত্তে কর্ত্তে চল্‌ল। কিছু দূর গিয়ে ঘোড়ার পিঠে দু'বার চাবুক্ দিতেই ঘোড়াটা এম্‌নি ভাবে ছুট্‌তে লাগ্‌ল যে বোকারাম বেগ সাম্‌লাতে না পেরে, ঘোড়ার পিঠ্ থেকে ঢুপ্ করে মাটীতে পড়ে গেল, ধুলো ঝেড়ে উঠে ভাব্‌লে—ঘোড়াটা ভারি দুষ্ট, একে দূর কর্‌তে হবে। কিছু দূর যেতে না যেতে দেখ্‌লে একটা রাখাল কতকগুলো গরু চরাচ্ছে। বোকারাম বল্লে—এই, ঘোড়াটা নিয়ে তোর গরুগুলো দিবি আমাকে? সে বল্লে—কেন? বোকারাম বল্লে—দুধ খাব। শুনে রাখালটা মনে মনে ভারি হাস্‌ল। কারণ সে দুটো বলদ

গরু। সে হাসি চেপে বল্লে—আচ্ছা, দাও ঘোড়া! বোকারাম গরু দুটী নিয়ে যেতে যেতে এক কসাইকে দেখ্‌তে পেলে—সে একটী শূওরের বাচ্ছা বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বোকারাম বল্লে—বাঃ, বাচ্ছাটিত বেশ! কসাই বল্লে—দাও না গরু দুটো আমাকে—এই বাচ্চাটি নাও। বোকারাম বল্লে—বাঃ, বাঃরে ছোক্‌রা—এযে বলদ গরু, এর্ দুধ হবে কি করে? বোকারাম বলে উঠ্‌ল—ওমা, তাই নাকি? আমায় ত রাখাল ব্যাটা আচ্ছা ঠকিয়েছে। তবে দাও দাও তোমার বাচ্ছাটি, গরু দুটা নিয়ে যাও। কিছু দূর যেতে যেতে বোকারাম দেখ্‌লে একটা লোক বেশ দুধের মত সাদা একটা হাঁস নিয়ে কোথায় যাচ্ছে। বোকারাম ডেকে বল্লে—হাঁসটা দিবিরে—তার বদলে এই শূওরের ছানাটা দিচ্ছি! তারপর বোকারাম হাঁসটি নিয়ে শূওরের ছানা তাকে দিয়ে যেতে লাগ্‌ল। কিছু দূর গিয়ে দেখ্‌লে রাস্তার ধারে একটা ঘরে একটা লোক জাঁতা পিঁস্‌ছে। বোকারাম বল্লে বেশ ময়দা হচ্ছেত। জাঁতাওলা ভাব্‌লে—বোকারামের হাতে যে হাঁসটি আছে, ওটা পুষ্‌তে পার্‌লে, ওর যে ডিম আর ছানা হবে তা বিক্রী করে বেশ দু'পয়সা পাওয়া যাবে। সে মনে মনে একটা ফন্দী এঁটে বোকারামকে বল্লে—দ্যাখ ভাই, তুমি যে হাঁসটি নিয়ে যাচ্ছ, ঐটি আমাদের দেশের রাজার যে হাঁসটি হারিয়েছে ঠিক তারই মত। রাজা সেই হাঁসটি খোজ করবার জন্যে চারদিকে কত চর পাঠিয়েছে। তারা তোমায় দেখ্‌তে পেলে ধরে নিয়ে যেয়ে কেটে ফেলবে। বোকারাম বল্লে—তাইত ভাই, কি করব। এ যে ভারি বিপদ্ দেখ্‌ছি কি করব তবে? জাঁতাওয়ালা বল্লে—এক কাজ কর। হাঁসটি আমাকে দিয়ে যাও, যা হয় আমারই হবে, আর তোমাকে আমি একটা জাঁতা দিচ্ছি সেইটি নিয়ে গিয়ে বাড়ীতে বসে রোজ ময়দা পিষো। তাই বিক্রী করে অনেক পয়সা পাবে, বড় লোক হয়ে যাবে। তোমার আর

কিছুরই অভাব থাক্‌বে না। বোকারাম বল্লে—বেশ, ধন্যবাদ! এমন ভালো কথা কেউ আমাকে বলেনি। জাঁতাওলার একটা জাঁতা ঘরের কোণে পড়েছিল। সেটা চালিয়ে খারাপ হয়ে গিছ্‌ল। এখন আর তাতে কাজ হয় না। সেইটে বোকারামকে দিয়ে, আর তার বদলে সে অমন ভালো একটা হাঁস নিল। যাই হোক্‌। বোকারাম জাঁতাটা কাধে নিয়ে যেতে যেতে তার ভারি তেষ্টা পেল। সে তখন একটা নদীর একবারে ধারের কাছে জাঁতাটি রেখে যেই জল খেতে নদীতে নাম্‌বে—অমনি তার হাঁটুর গুঁতো লেগে জাঁতাটা নদীর জলে ঝুপ করে পড়ে কোথায় তলিয়ে গেল। বোকারাম একবার তাকিয়ে দেখলে কিছুই বল্লে না! "জাঁতাটা এমনি বিষম ভারি ছিল যে টান্‌তে আমার প্রাণ বেরিয়ে যাবার যো হয়ে ছিল। তলিয়ে গেছে ভালই হয়েছে। এখন পথে হাঁট্‌তে আর কোন কষ্ট হবে না!" তারপরে সে হাওয়ার মতন হাল্‌কা আর খুব একটা খুসীমন নিয়ে বাড়ীতে তার মার কাছে গিয়ে পৌছল। মা ছেলের বুদ্ধির কথা শুনে অবাক্‌ হয়ে রইল।

শ্রীগোপেন্দ্র নাথ সরকার।



তাজ্জব !

চির জাগ্রত আগ্নেয় গিরি ।

এই আগ্নেয় গিরিটি চির-জ্বলন্ত । অগ্ন্যুৎপাতের সময়-অসময় নেই ; কাল ঋতু নেই— সারা বছর, সারা মাস, সারা দিন, সারা রাত ধোঁয়া উঠ্ছে ; আগুন বেরুচ্ছে ! একটা দেখবার মত জিনিষ নয় কি ?



রাজকন্যা ও কৈ-মাছ।

সেকালে ডাইনিরা ছিল বড় রাগী, কথায় কথায় তারা শাপ দিত। কতটুকু সামান্য কারণে যে তাদের রাগ হইত শুনিলে তোমরা অবাক হইয়া যাইবে।

এক রাজপুত্র ছোট একটি নদীর ধারে দাঁড়িয়ে তীর ছুঁড়িতেছিলেন। এক বুড়ী অঞ্জলি ভরিয়া জল পান করিতে ছিল, তীর পড়িল ত পড়িল একেবারে ঠিক তাহার সামনে। তীরটা খুব জোরে আসিয়া পড়িয়াছিল, আর সেখানকার জলও গভীর ছিল না, শর পড়িতেই জলটা ঘোলা হইয়া গেল। বুড়ী চাহিয়া দেখিল, এক রাজপুত্র। রাগিয়া বলিল—হাঁ। আমি জল খাইতেছি, তুমি জল ঘোলা করিয়া দিলে। থাক জলে মাছ হইয়া চিরকাল জল ঘোলা করিয়া বেড়াও।

রাজপুত্র কত মাপ চাহিলেন, কাঁদিতে কাঁদিতে কত কথাই বলিলেন, বুড়ীর রাগ কিন্তু গেল না। সে বলিল আমার শাপ ফিরিবে না।

রাজপুত্র তাহার পায়ে ধরিয়া বলিলেন—তবে কিরূপে আমি আবার মানুষ হইতে পারিব তাহার উপায় বলিয়া দাও।

বুড়ীর মন একটু নরম হইল। বলিল—যদি কখনও মানুষের উপকার করিতে পার, আর সেই মানুষ তোমার উপকারে সন্তুষ্ট হইয়া তোমাকে আদর করিয়া কোলে তুলিয়া লয়,—তবেই আবার তুমি মানুষ হইতে পারিবে। নতুবা কৈ মাছ হইয়া চিরদিনই তোমাকে এই জলে বাস করিতে হইবে।

বুড়ী চলিয়া গেল, আর রাজপুত্র অমন সোনার মত রং, হীরে মুক্তোর জামা কাপড় সব কোথায় গেল!—চটাং করিয়া এক লাফে কৈ মাছটা জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

কৈ মাছ জলে থাকে। থাকে ত থাকে। কতদিন কত বছর কত কাল কে জানে। না আসে নদীতে মানুষ, না হয় তার উদ্ধার। এমনি করিয়া কতকাল কাটিয়া গেল।

একদিন কৈ মাছটা ভুড় ভুড় করিতে করিতে ভাসিয়া উঠিয়া দেখিল, জলের ধারে দাঁড়াইয়া একটি মেয়ে কাঁদিতেছে। জলের দিকে চাহিয়াই সে কাঁদিতেছে। কৈ তখন ডাঙ্গায় উঠিয়া কাণে হাঁটিয়া হাঁটিয়া মেয়েটির পায়ের কাছে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসিল—তুমি কাঁদ কেন গা?

মেয়েটি সে দেশের রাজার মেয়ে; রাজার মেয়ে মানুষের মত গলা শুনিয়া চারিদিকে চাহিয়া মানুষ খুঁজিতে লাগিলেন, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না।

"তুমি কাঁদ কেন গা ?"

রাজকন্যা দেখিলেন—পায়ের কাছে একটা কৈ! সেই মাথা নাড়িয়া বলিতেছে—তুমি কাঁদ কেন গা ?—রাজকন্যার কান্না থামিল না।

কৈ বলিল—কি হইয়াছে আমায় বল না গা ?

রাজকন্যা বলিলেন—তোমায় বলিয়া কি হইবে বল ?

বলই না শুনি ?

রাজকন্যা হাতের দড়ীটা দেখাইয়া বলিতে লাগিলেন, আমি লাট্টু ঘুরাইতেছিলাম। আমার সোনার লাট্টুটা জলে পড়িয়া গিয়াছে।

তাই কাঁদিতেছ ?

কাঁদিব না ?

কৈ জিজ্ঞাসিল—আমি তুলিয়া আনিব ?

আননা গো। তাহা হইলে আমি একটি সোনার নোলক গড়াইয়া দিব,

আর তোমাকে আমার লাল-নীল মাছের চৌবাচ্ছায় রাখিব। আনিয়া দাও।

কৈ কাণে হাঁটিয়া জলে নামিয়া গেল। অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল, কৈ আর ফিরে না। রাজকন্যা অস্থির হইয়া পড়িতেছিলেন।

কৈ মাছের ত আর হাত পা থাকে না সে জলে ডুবিয়া লাট্টু কুড়াইয়া অমনি ছুটিয়া আসিবে। সে লাট্টুটা ডানা দিয়া ঠেলিয়া ঠেলিয়া কাণে হাঁটিয়া আসিতেছিল। একটু এদিক ওদিক হয় আবার লাট্টু গড়াইয়া যায়, আবার ধরিতে হয়। যাই হোক্ লাট্টু লইয়া কৈ দেখা দিল।

রাজকন্যা ছুটিয়া গিয়া লাট্টু লইলেন। কৈ-কে বলিলেন—তুমিও এস আমার সঙ্গে, আমার বাড়ী। তুমি ত হাঁটিতে পার?

কৈ বলিল—তা পারি। তবে বড্ড দেরী হয়।

রাজকন্যা দেখিলেন, সন্ধ্যার আর দেরী নাই, অথচ উপকার পাইয়াছেন, কৈ টাকে ফেলিয়া যাইতেও পারেন না। বলিলেন—তবে এস, আমি তোমাকে লইয়া যাই। দেখিও, কাঁটা মারিও না যেন।—বলিয়া রাজকন্যা লাট্টুটিকে কাপড়ে বাঁধিয়া কৈটিকে হাতে তুলিয়া লইয়া বলিলেন—এইখানে ছোট্ট সোনার নোলক ঝুলাইয়া দিব। রোজ আমি যখন খাবার দিতে আসিব, তুমি নোলকটি নাড়িয়া নাড়িয়া আসিবে—কেমন?

রাজকন্যা মাছিটিক মুখের অতি সন্নিকটে ধরিয়া বলিলেন—কেমন?

কিন্তু কৈটাকে আর হাতে রাখিতে পারিলেন না এমন ভারি ঠেকিল যে হাত হইতে ধপাস্ করিয়া সেটা মাটিতে পড়িয়া গেল।

রাজকন্যা সন্ধ্যার অন্ধকারে তাহাকে খুঁজিতেছেন, হঠাৎ কে বলিয়া উঠিল—চল রাজকন্যা!



"এস আমি তোমাকে লইয়া যাই।"

রাজকন্যা ত অবাক্। এ কে? এ কোথা হইতে আসিল।

এক পরম সুন্দর রাজপুত্র পাশে দাঁড়াইয়া বলিল, চল রাজকন্যা!

রাজকন্যা জিজ্ঞাসিলেন—আপনি কে?

তখন রাজপুত্র সব কথা বলিলেন। শুনিয়া রাজকন্যার খুব আনন্দ হইল। দু'জনে রাজবাড়ীতে আসিতে রাজকন্যার পিতা রাজা মহাশয় রাজপুত্রটির পিতার নাম শুনিয়া চিনিতে পারিলেন। এবং—

যেমন হইয়া থাকে, রাজপুত্রের সঙ্গে রাজকন্যাটির বিবাহ হইয়া গেল।

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার।

কে খায়?

সকালবেলায় খোকা মা'র সামনে বসিয়া লেখা পড়া করে। একদিন খোকা মা'কে জিজ্ঞাসিল,—মা, পৃথিবীটা গোলাকার ত? মা বলিলেন, কতবার বলব বাবু? পৃথিবীটা কমলা লেবুর মত! খোকা একটু পরে আবার জিজ্ঞাসিল, ঠিক কমলা লেবু? মা অন্যমনস্ক ভাবে সেলাই করিতে করিতে বলিলেন—হ্যাঁ! খোকা অনেকক্ষণ পরে কহিল—এত বড় কমলাটা কে খায় মা? ভগবান বুঝি!—মা সেলাই ফেলিয়া, খোকাকে স্নান করাইতে লইয়া গেলেন।

মাতৃহীন।

কোথায় রে তোর ব্যথা, খোকা কোথায় রে তোর ব্যথা
এমন করে কাঁদিস, থাকিস হয়ে আমল লতা
নয়ন মলিন জলেই ভাসে
অধর পুটে কাঁপন আসে,
বক্ষে করে জুড়াই নিজের বুকের ব্যাকুলতা।

(২)

কোথায় রে তোর ব্যথা, খোকা কেথায় রে তোর ব্যথা
না চেয়ে যে কহিস্ কাণে সৃষ্টিছাড়া কথা।
শুষ্ক ও মুখ সজল বেশী
শিথিল করে বুকের পেশী
ওই গোলাপী উৎসে ঝরে মর্ম্মকাতরতা।

(৩)

কোথায় রে তোর ব্যথা, খোকা কোথায় রে তোর ব্যথা
গিরিপুরের আদর কি চাস শ্মশান পুরে হেতা
চাস ফিরে সেই গভীর স্নেহ
কালীদহের কমল গৃহ
চাস বুঝি সেই সুধার সুধা বুকের কোমলতা।
কোথায় রে তোর ব্যথা, খোকা কোথায় রে তোর ব্যথা।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

হারাণো সম্পত্তি

"কাক পাহাড়" প্রাসাদের নিম্নে একটি ষোল সতেরো বছরের ছেলে ভগ্নপ্রায় প্রাসাদটির পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়াছিল। অপরাহ্নকাল, স্থান অতি নির্জ্জন, জনমানব শূন্য। শুধু ঐ প্রাসাদের উপরে অনেকগুলি কাক কলরব করিতেছে, আর অল্প দূরে ক্ষুদ্র নদীটি কুলকুল শব্দে বহিয়া চলিয়াছে। বালক অনেকক্ষণ একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া প্রাসাদের দিকেই যাইতেছিল, অন্যদিক হইতে বারো তেরো বছরের একটি মেয়ে তাহার সামনে আসিয়া বলিল—আমি কেমন সুন্দর একটি উট পাখীর পালক জোগাড় করিয়াছি! এইটি পরিয়া এখন হইতে রবিবারে রবিবারে গির্জ্জায় যাইব। সুন্দর নয় কি?

গি ডেভরেল তার ভাই, ক'বছরের বড়; বলিল—সুন্দর, ম্যাগি! উহা পরিয়া তোমাকে বড়ই সুন্দর দেখাইতেছে।

ভাইটির মুখের প্রশংসা শুনিয়া ম্যাগি নাচিয়া উঠিল! আনন্দিত মনে বলিল—চল না গি, নদীর ধারে একটু বসি গে। যাবে?

চল, বলিয়া গি বোন্‌টির হাত ধরিয়া চলিতে লাগিল। এক সময়ে ম্যাগি বলিল—ছাদের উপর দেখ গি, কাকগুলা কেমন রাজত্ব করিয়া বেড়াইতেছে।

গি আগেই দেখিয়াছে, এখন আর দেখিল না, মুখটি ম্লান করিয়া বলিল—উহারা অনেক দিন আছে, ম্যাগি। এত কাকের বাস বলিয়াই বোধ করি, বাড়ীটার নামই রাখা হইয়াছিল, "কাক পাহাড়!"—না ম্যাগি?

নদীটির তীরে যাইতে হইলে কতকগুলি উঁচু নীচু জায়গা ও গাছপালার ভিতর দিয়া যাইতে হয়, ম্যাগি তাহার টুপিটি খুলিয়া একটা গাছের ডালে

ঝুলাইয়া রাখিয়া নিঃশব্দে গি'র পিছনে চলিল। কিন্তু কথা কহিল না। সে জানিত এই প্রাসাদের কথা বলিতে বলিতে তাহার দাদা অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিত, এমন কি অনেকদিন সে কাঁদিয়াও ফেলিয়াছে।

তাহার কারণও ছিল। এই প্রাসাদ ও সংলগ্ন জমিদারী সব একদিন নাকি ইহাদেরই ছিল। সে দু'শ বছর আগেকার কথা। ইংলণ্ডের রাজা প্রথম চার্লসের রাজত্ব কালে গি'র পূর্ব্ব পুরুষ মার্মাডিক ডেভরেল এই প্রাসাদের অধিপতি ছিলেন। ক্রোমওয়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া তিনি মারা যান। মৃত্যুর আগে তিনি তাঁর সমস্ত সম্পত্তি একজন অমাত্যের হাতে দিয়া গিয়াছিলেন। তাঁর ছেলেটি ছিল তখন ফ্রান্সে। সে বড় হইয়া ফিরিয়া আসিয়া যখন ঐ অমাত্য এলরিনটনের কাছে ফিরিয়া চাহিল এলরিনটন কিন্তু দিতে রাজী হইল না। সে মার্মাডিকের লেখা কাগজ পত্র দেখাইল। লোকে সে সব কাগজ পত্র দেখিয়া বুঝিল যে মার্মাডিক সমস্ত সম্পত্তিই এলরিনটনকে দিয়া গেছেন। অবশ্য যখনকার লেখা সে সব দলিল, তখন রেজিলাণ্ড ডেভরেল জন্মান নাই। অনেকে ইহাও বুঝিল যে মরিবার আগে নিশ্চয়ই মার্মাডিক অন্য উইল করিয়াছিলেন, কিন্তু সে ত আর পাওয়া গেল না। কাজেই রেজিলাণ্ড বাপের বিষয় আশয় পাইলেন না ; তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার ছেলে এই "কাক প্রাসাদের" জমিদারের কাছেই একটা চাকরী লইল—সেই থেকে ডেভরেলরা এই চাকরীই করিয়া আসিতেছেন। গি'ও চাকরীতে নূতন ভর্ত্তি হইয়াছে।

ম্যাগি নদীর তীরে বসিয়া দেখিল, তাহার দাদা একদৃষ্টে সেই ভগ্ন প্রায় গৃহটির পানেই চাহিয়া আছে। ম্যাগি আবার নদীর জলে হাঁসের সাতার দেখিতে লাগিল।

এক সময়ে গি বলিয়া উঠিল, কি সুন্দর এই বাড়ী ম্যাগি ! একদিন আমাদেরই

ছিল। আর আজ! বলিতে বলিতে তাহার গলা ভারী হইয়া আসিল। চোখ দু'টি ছলছল করিতে লাগিল। সে ধরা গলায় বলিল—স্যার মার্মাডিক যে তাঁর ছেলের নামে একটা উইল করেছিলেন, তার সন্দেহ নেই। সেই উইল যদি আজ পাওয়া যেত, বোন ?

ম্যাগি চীৎকার করিয়া উঠিল—ও দাদা, দাদা-গো, আমার টুপির পালকটা যে কাকটা লইয়া গেল!

গি চাহিয়া দেখিল, একটা কাক চঞ্চুপুটে টুপির পালকটি লইয়া প্রাসাদ শীর্ষে একস্থানে বসিয়া পড়িল। ম্যাগি কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল—কি হ'বে গি ? আমার অমন নূতন জিনিষটা! ঐ দেখ ঐ গর্ত্তটায় ঢুকিতেছে!

গি বলিল—কেঁদো না ম্যাগি, আমি আনিয়া দিতেছি। বোধ হয় কাকটার বাসা আছে ঐ খানে, তাই পালক লইয়া ওখানে ঢুকিল।

ম্যাগি দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল, গি দেওয়াল ধরিয়া উঠিতে লাগিল। তাহার ভয়ও হইতেছে যদি হাত ফসকাইয়া দাদা পড়িয়া যায়, আবার পালকটির লোভও সে ছাড়িতে পারিতেছে না।

গি গর্ত্তটায় হাত দিতেই পালকটি পাইল। পাখীটার বাসায় আর কি আছে দেখিবার জন্যই আবার সে হাত বাড়াইয়াছিল। কতকগুলি শুষ্ক কাঠি কুটি আর একটা কি যেন হাতে ঠেকিয়া খস্ খস্ শব্দ হইল। সে টানিয়া দেখিল, একখানা ময়লা কাগজ। সে এক হাতে দেওয়াল ধরিয়া অন্য হাতে কাগজটি খুলিতেই দেখিল—সহি রহিয়াছে, মার্মাডিক ডেভরেল,—ব্যারণ, সে নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া তাহার কতকাংশ পড়িয়া কাগজখানা মুড়িতে মুড়িতে বলিল—ম্যাগি, এই তোমার পালক নাও, আর এটিও ধর, বোন্, তোমার পালকের চেয়ে ময়লা এই কাগজ খানা ঢের বেশী দামী।

সে নামিয়া আসিয়া বলিল—কি বল্‌ত ম্যাগি ?

ম্যাগী ছেলে মানুষ! বলিল—এটা কি দাদা ?

"স্যার মার্মাডিউকের শেষ উইল রে ম্যাগি !"

তখন ভাই বোনে একখানা পাথরের উপর বসিয়া সমস্তটা পড়িয়া ফেলিল। পড়া শেষ করিয়া বলিল—বোধ হয় কাকটাই কোন রকমে উইলখান চুরী করিয়া নিজের বাসাটির শোভা বাড়াইয়াছিল।

সেই উইলখানা সে উকীলের হাতে দিল। আদালতে সেখানাই শেষ ও আসল উইল বলিয়া প্রমাণ হইতে তাহারা "কাক প্রাসাদ" আর যা কিছু সব এলরিনটনদের কাছ হইতে ফিরিয়া পাইল।

ম্যাগি "কাক প্রাসাদে" ঢুকিয়া বলিল—ভাগ্যিস্ আমার পালক লইয়া কাকটা পালাইয়াছিল !

গি বলিল—তার চেয়েও 'ভাগ্যিস' কি জানিস্ ম্যাগি! ভাগ্যে কাক ঐ উইল লইয়া পালাইয়াছিল! মানুষে যদি লইত সে কি আর রাখিত, না আমরা আবার এই দু'শ বছরের হারাণো সম্পত্তি ফিরিয়া পাইতাম।

ম্যাগি বলিল—হ্যাঁ দাদা, তা বটে। বি।

বালিকাদের ব্রত।

বৈশাখ মাস।

হরির চরণ ব্রত।

অতি শৈশব হইতেই আমাদের দেশের মেয়েরা ব্রত উপবাস করিতে আরম্ভ করে। বালিকাদিগের প্রধান ব্রত "হরির চরণ"। এই ব্রত বৈশাখ মাসে করিতে হয়। চার বছর এই ব্রত করিবার নিয়ম। বৈশাখ মাসের প্রথম দিন হইতে শেষ দিন পর্য্যন্ত রোজ ভোরে উঠিয়া এই ব্রত করিতে হয়। এই ব্রত সাত বছরের মেয়ে হইতে দশ এগার বৎসরে মেয়েরাই করিয়া থাকে। ভোরে উঠিয়া কাপড় ছাড়িয়া হাত মুখ ধুইয়া শুদ্ধ হইয়া এই ব্রত করিতে হয়। একখানি পিতলের থালার উপর চন্দন দিয়া দুইটী হরির চরণ আঁকিতে হইবে। তাহার পর ডান হাতের দুইটী আঙ্গুল চরণ দু'টীর উপর রাখিয়া তিনবার এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয়।—

হরি হরি ব'শেখ মাস।
হরি বলেন পুণ্য মাস॥
কুঞ্জবতী পূজে পায়—সেজ বৌ কি চায়।
অক্ষয় বাপ মা চাই।
অমর স্বামী চাই॥
রাজার রাজা ভাই চাই।
রূপবতী ঝি চাই॥
সভা আলো জামাই চাই—ধর্ম্ম-রাজ পুত্র চাই
গুণবতী বৌ চাই॥

আলনায় কাপড় ঝলমল করে ঘরে ঘটীবাটী ঝক্‌মক্‌ করে।
গোয়ালে গরু মরায়ে ধান
মাথায় সিন্দুর টক্‌টক্‌ করে॥
স্বামী পুত্র কোলে করে—মরণ হয় যেন গঙ্গার জলে।
রেখ হরি পদ তলে॥

এই ব্রত করিলে হরি সন্তুষ্ট হন এবং বালিকাদের মনোমত বর প্রদান করেন।

শিব ঠাকুরের ব্রত।

শিব ঠাকুরের ব্রত বৈশাখ মাসের প্রথম দিন হইতে আরম্ভ করিতে হয়। এবং সমস্ত বৈশাখ মাস প্রতিদিন ভোরে উঠিয়া হাত মুখ ধুইয়া কাপড় কাচিয়া শুদ্ধ হইয়া এই ব্রত করিতে হইবে। এই ব্রত করিলে শিব ঠাকুর বালিকাদের উপর বিশেষ সন্তুষ্ট হন এবং তাহারা যাহা বর চায় তাহাই প্রদান করেন। ভোরে উঠিয়া গঙ্গার মাটী দিয়া একটী শিব ঠাকুর গড়িতে হইবে তাহার পর সেই ঠাকুরটী একখানি বেল পাতার উপর বসাইয়া ফুল বেল পাতা দিয়া এই মন্ত্র তিনবার বলিয়া শিবের পূজা করিতে হইবে।

শিল শিলেটন শিলে বাটন।
শিব আছেন ঘরে,
স্বর্গ থেকে মহাদেব বলেন-গোরী কি ব্রত করেন॥
আস নড়ে পাশ নড়ে পাশ সিংহাসন।
গৌরী দেবী ব্রত করেন শিব আরাধন॥

কান ফুল তুলতে গেলুম শুধু লতা পাতা।
শিব চরণে দেখাইলো শিবের মাথায় জটা॥
আকন্দ বিল্ব পত্র তোলা গঙ্গা জল।
এই পেয়ে তুষ্ট হ'লেন ভোলা মহেশ্বর॥

এই ব্রত আমাদের দেশের সকল বালিকাই করিয়া থাকে। এই ব্রত করিলে বিশেষ পুণ্য হয় ও শিবের মত স্বামী লাভ হয়।

কলা বৌ ব্রত।

এই ব্রত ও বৈশাখ মাসের প্রথম দিন হইতে আরম্ভ করিয়া সারা বৈশাখ মাসের প্রথম দিন ভোরে উঠিয়া শুদ্ধ হইয়া মাটিতে একটী কলা গাছ পুতিয়া ফুল নৈবেদ্য দিয়া প্রতিদিন ভোরের বেলা শুদ্ধ হইয়া এই মন্ত্র তিনবার বলিয়া পূজা করিতে হয়ঃ—

কলা গাছ পূজন—সোনার থালে ভোজন।
সোনার থালে ক্ষীরের লাড়ু আমার হাতে হয় যেন সোনার খাড়ু॥

কলা গাছ গণেশ ঠাকুরের বৌ। কলা বৈ ব্রত করিলে গণেশ ঠাকুর সন্তুষ্ট হন ও তাঁর কৃপায় হাতে সোনার খাড়ু হয়।

দশ পুতুলের ব্রত।

এই ব্রত ও বৈশাখ মাসে করিতে হয়। চারি বছর করিবার নিয়ম। বৈশাখ মাসের প্রতিদিন ভোরে উঠিয়া শুদ্ধ হইয়া মাটীতে দশটী পুতুল আঁকিয়া এই মন্ত্র তিনবার বলিয়া পূজা করিতে হয়ঃ—

মরিয়ে মনুষ্য হবো ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম লবো।
সীতার মতন সতী হবো রামের মতন পতি পাবো॥
লক্ষ্মণের মত দেওর পাবো—দশরথের মত শ্বশুর পাবো।
কৌশলার মত শাশুড়ী পাবো—কুন্তির মত পুত্র পাবো॥
দ্রৌপদীর মত রাঁধুনী হবো—দুর্গার মত স্বামী সোহাগী হবো।
দুর্ব্বোর মত লতিয়ে পড়বো—পৃথিবীর মত ধৈর্য্য ধর্ব্বো॥

এই ব্রত প্রত্যেক বালিকারই করা উচিত—এই ব্রত করিলে দশ ঠাকুর সন্তুষ্ট হন। তাঁদের কৃপায় বালিকা যাহা যাহা চায় তাহাই পাইয়া থাকে।

অশথ পাতার ব্রত।

এই ব্রতও বৈশাখ মাসে করিতে হয়। ভোরে উঠিয়া প্রতিদিন বৈশাখ মাসে তিনটি অশথ পাতা সংগ্রহ করিতে হইবে। একটী কচি একটী আধ পাকা ও একটী পাকা অশথ পাতা চাই। এই ব্রতও চারি বৎসর করিবার নিয়ম। ভোরে উঠিয়া পুকুরে গিয়া এক একটী পাতা মাথার উপর রাখিয়া তিনবার ডুব দিতে হইবে ও এই মন্ত্র তিনবার বলিতে হইবে ঃ—

ক'চিটী মাথায় দিলে—
কমল পুত্র কোলে হয়।
আধ্ পাকাটী মাথায় দিলে—
স্বামী পুত্র অমর হয়॥
পাকাটী মাথায় দিলে—
পাকা মাথায় সিন্দুর রয়॥

পুণ্যি পুকুর ব্রত।

বৈশাখ মাসে এই ব্রত করিতে হয়। চারি বছর করা নিয়ম। বৈশাখ মাসে প্রতিদিন ভোরে উঠিয়া একটী পুকুর খুঁড়িয়া তাহাতে একটী বেলের ডাল পুতিয়া সারা বৈশাখ মাস প্রতিদিন এই মন্ত্র বলিয়া ব্রত করিতে হয়ঃ—

পুণ্যি পুকুর পুষ্পমালা—কে পূজেরে ভোরের বেলা।
আমি সতী গুণবতী—ভায়ের বোন পুত্রবতী॥
হবে পুত্র মর্ব্বে না পৃথিবীতে ধর্ব্বে না।
সোয়ামীর কোলে পুত্র দোলে মরণ হয় যেন গঙ্গা জলে॥

সন্ধ্যামণির ব্রত।

এই ব্রত ও বৈশাখ মাসে করিতে হয়; চারি বৎসর করিবার নিয়ম। সারা বৈশাখ মাস প্রতিদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে আকাশের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া

থাকিতে হয়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না একটী তারা উঠে ততক্ষণ কথা কওয়া নিষেধ। একটী তারা উঠিবা মাত্র মাটীতে জলের আঁলপনা কাটিয়া এই মন্ত্র তিনবার বলিতে হয়ঃ—

এক তারা নারা পারা।
দুই তারা ভাই ভারা॥
তিন তারা কাঁটালের কোস।
চার তারা নাই দোস॥
তারা গো মা তারিণী।
স্ত্রী পুরুষের কাহিণী॥
সন্ধ্যা মনি করে যে।
সাত ভায়ের বোন সে॥
নিঃসন্তান লীলাবতী।
ভায়েয় বোন পুত্রবতী॥
মোটা ভাতে আর পুতে॥
জন্ম যায় যেন এয়োস্ত্রীতে॥

এই ব্রত যে বালিকা করে সে সাত ভায়ের বোন হয়। তাহার বৈধব্য ঘটে না। মোটা ভাতে সে পুত্র কন্যা লইয়া সুখে থাকে। আমাদের দেশের বালিকাদের এই ব্রত সকলেরই করা উচিত।

———

মৃতের জীবন দান।

জেরাসের গৃহে ক্রন্দনের রোল উঠিতেছে, জেরাসের একমাত্র কন্যার এইমাত্র মৃত্যু হইয়াছে। জেরাস অর্থবান ব্যক্তি, কন্যাটিকে বাঁচাইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুই হইল না। মেয়েটি ভুগিয়া ভুগিয়া, শেষে পিতামাতাকে, আত্মীয় স্বজনকে শোক সাগরে ফেলিয়া মহা প্রস্থান করিল।

জেরাস ঈশ্বরানুগৃহীত যীশুখৃষ্টকে প্রিয়তমা কন্যার রোগ সংবাদ দিয়াছিলেন। তাঁহার আশা ছিল, ঔষধে যদিই কিছু না হয়, ডাক্তারে কিছু না করিতে পারে, যীশুখৃষ্ট যদি আসেন, তাঁহার আগমনের পুণ্যেই মেয়েটি বাঁচিয়া যাইবে! কিন্তু যীশু আসিলেন না। সব আশা ব্যর্থ হইয়া গেল, যীশুর আগমন পথ চাহিয়া উৎকণ্ঠিত পিতা মাতা কতদিন, কত রাত্রি কাটাইলেন যীশু আসিলেন না। কন্যার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া কত ডাকা ডাকিলেন, চোখের জলে বুক ভিজাইলেন, সবই বিফল হইল, যীশুর দয়া হইল না। মেয়েটি প্রাণ ত্যাগ করিল।

কত না আশাই ছিল, কন্যার পিতামাতার! কত চির রুগ্ন তাঁহার দয়ার কণা পাইয়া নিরোগ হইয়াছে; কত অন্ধ যীশুর রূপের জ্যোতিঃতে দৃষ্টি ফিরিয়া পাইয়াছে; কত পক্ষঘাতগ্রস্থ যীশুর অঙ্গের বাতাসে সুস্থ হইয়া উঠিয়াছে, একবার, একবার যদি আসিতেন, একবার যদি চরণের ধূলি পড়িত! হায়! কিছুই হইল না।

কন্যার মৃত্যুর অল্পক্ষণ পরেই এক ব্যক্তি জেরাসের গৃহে আসিয়া সংবাদ দিল, খৃষ্ট নদী পার হইয়া এদিকেই আসিতেছেন!— শুনিয়া কন্যাহারা জনকজননীর শোকাবেগ বৃদ্ধি পাইল! এত বিলম্ব হইল প্রভুর! এতক্ষণে যে সব শেষ হইয়া গিয়াছে! আর কি দেখিতে আসিলে দয়াময়!



যীশুখৃষ্টের জ্যোতির্ম্ময় রূপে ঘর ভরিয়া গেল......মেয়েটি নয়ন মেলিয়া চাহিল।

যীশুর জ্যোতির্ম্ময়রূপে ঘর ভরিয়া গেল। যীশু মৃত কন্যার দিকে হাত বাড়াইলেন, তাহার নাম ধরিয়া আদর করিয়া ডাকিলেন,সে যেন ঘুমাইতেছিল, যেন স্বপ্নে কাহার মধুর মমতাময় আহ্বান শুনিয়া ঘুম তাহার ভাঙ্গিয়া গেল —যীশুর হাত ধরিয়া মেয়েটি উঠিয়া বসিল।

জেরাস খৃষ্টের পদতলে লুটাইয়া পড়িলেন।

স্বর্গীয় জীবেন্দ্রকুমার দত্ত

আমার দেশের পাঠক পাঠিকাকে একটি দুঃসংবাদ দিতে বাধ্য হইতেছি। "আমার দেশের" পাঠক-পাঠিকা সুকবি জীবেন্দ্রকুমারের সহিত সুপরিচিত ছিলেন। জীবেন্দ্রকুমার চিরজীবন সাহিত্য-সাধনা করিয়াছিলেন, বাংলা দেশের ছেলেমেয়েদের সুমিষ্ট কবিতা শুনাইতে কোন দিনই তাঁহার ক্লান্তি ছিল না। বৃদ্ধ বয়সেও "আমার দেশের" পাঠক পাঠিকাদের জন্য তাঁহার পরিশ্রমের অন্ত ছিল না। বহুদিন ধরিয়া তাঁহার কবিতা, ছড়া বাংলা দেশের মাসিক পত্রের বক্ষ শোভা করিতেছিল—বহুদিন পরেও তাঁহার কীর্ত্তি জাগিয়া থাকিবে। তবে দুঃখ এই তাঁহার রচিত নূতন কবিতা, ছড়া উপহার দিয়া আর তিনি ছেলেমেয়েদের মনোরঞ্জন করিবেন না। তাঁহার লেখনী চিরতরে নীরব হইয়াছে। জীবেন্দ্র কুমার ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। আমার দেশের পাঠক-পাঠিকা তাঁহাদের প্রিয় কবির আত্মার সুখ-শান্তির কামনা করিবেন।

কাজীর বিচার।

শশীবাবুর মৃত্যুর পর উইল খুলে দেখা গেল লেখা রয়েছে, "বন্ধুবর জগৎনারায়ণ যা' চান তা-ই- আমার ছেলেকে দিয়া বাদ বাকী সমস্ত নিজে লইবেন।"

বন্ধুবর জগৎনারায়ণ নিজের জন্য পাঁচ লাখ রাখিয়া পাঁচ হাজার টাকা শশীবাবুর ছেলেকে দিলেন।

ছেলে কাজীর কাছে গিয়া নালিশ করিল, বলিল, "কাজী সাহেব, আমার বাবার শেষ বয়সে ভীমরথী হইয়াছিল, তাঁর এই বন্ধুটী যা' বলেছেন, বাবাও উইলে তাই লিখে গেছেন, আপনি বিচার করে উইল নামঞ্জুর করুন।

কাজী বন্ধুকে ডাকিয়ে সুধালেন, "বাপু, তুমি কি পাঁচ লাখই চাও?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ জনাব।"

"তবে ওই পাঁচ লাখ ছেলেরই পাওনা, ওকে দাও।"

"এ কি রকম বিচার হ'ল কাজী সাহেব?"

"সূক্ষ্ম বিচার করেছি বাপু! উইলে বলেছে তুমি যা চাও তাই ছেলেকে দেবে। অতএব ঐ পাঁচ লাখই ছেলের পাওনা।"

(২)

ঠিক জব্দ।

রাত্রিকাল।

বাহিরে মহাঝড়, বজ্র কড়মড়, আকাশ করে হাহাকার।

এমন সময় এক পথিক ধর্ম্মশালার দ্বারে উপস্থিত। দ্বার ছিল ভিতর হইতে বন্ধ। দ্বারে করাঘাত করিতে দ্বারী ভিতর হইতে হাঁকিল,

"কে ?"

"বিপন্ন পথিক। শীঘ্র দ্বার খোল।"

"দ্বার ত খুলিব কিন্তু চাবীকাঠিটা যে কোথায় হারিয়ে ফেলেছি।"

"এ কি পরিহাস দ্বারি ?

"কি করব বলুন ?"

"উপায় ?"

"আপনারই হাতে। রূপার চাবী থাকে ত দিন, দরজা খুলে দি!"

এই দুর্য্যোগে আর কোথায় যাইবেন ? অশনি ঘন ঘন ঝন্ ঝন্ ধ্বনিতেছে অগত্যা একটি টাকা বাহির করিয়া দরজার ফাঁক দিয়া গলাইয়া দিলেন। দ্বারী দ্বার খুলিয়া দিল।

ভিতরে প্রবেশ করিয়া পান্থ বলিলেন, "বাপু, দয়া করে আমার বাক্সটী ভিতরে এনে দাও।"

রক্ষক চৌকাঠের বাহিরে পা দিবামাত্র পথিক ঝনাৎ করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া খিল লাগাইয়া দিলেন।

রক্ষক দ্বারে আঘাত করিয়া হাঁকিল—"দরজা খুলুন না মশাই।"

ভিতর হইতে পথিক জবাব দিল, "ভাই চাবী ত হারিয়ে ফেলেছি, তবে রূপার চাবী থাকে ত দাও, দ্বার খুলে দি।"

দ্বারী তখন কি করে, পথিকের টাকাটী উগ্‌রাইয়া তবে ঢুকিতে পাইল।

শ্রীধানী লঙ্কা।

ধাঁধা

নূতন ধাঁধা।

(১) এমন একটা জিনিষের নাম কর, যাহাকে দেখিতে ঠিক মেঘের মত, আবার সেই দু'অক্ষরের কথাটিকে উল্টাইয়া ফেলিলে সুগন্ধ, সুমিষ্ট এমন এ স্বাদু পদার্থ হইবে যাহা আবাল বৃদ্ধবণিতার অত্যন্ত প্রিয়।

(২) দু' অক্ষরে নাম মোর অমূল্য রতন, নরনারী সবে করে অশেষ যতন ;
এ হেন অমূল্য ধন তিক্ত হই তবে উল্টাইয়া তায় যদি খায় কেহ কবে।

(৩) তিন অক্ষরের এমন একটি কথা বল, যাহা দেখিতে সুন্দর, জলে যাহার বাস, আবার যে নিজেই জল এবং উল্টাইলে পাল্টাইলে যাহা পূর্ব্ববৎ থাকে, পরিবর্ত্তন হয় না।

কুমারী মায়াময়ী মজুমদার।

(৪) প্রাণী জগতের এমন একটি জীবের নাম কর যে মানুষের ক্ষতি করে সবার চেয়ে বেশী, আবার যাকে না হ'লে মানুষের চলে না, যে না থাক্‌লে পৃথিবীই একটা মস্ত বড় শ্মশান হ'য়ে পড়ত! সে জীব ক্ষতিও যেমন বেশী করে, উপকারও করে তেমনি সবার চেয়ে বেশী মানুষের সঙ্গে তার নিত্য কলহ অথচ তাকে না হলেও মানুষের চলে না। সে থাকে পৃথিবীর সর্ব্বত্র, সংখ্যায় অগুন্তি, শত কোটি নিত্য জন্মায়, শত কোটি নিত্য মরে, তুমি আমি দেখেও তাকে দেখ্‌তে পাই না, বুঝেও বুঝতে পারি না, বলত সে প্রাণীর নাম।

ফাল্গুন মাসের ধাঁধার উত্তর ঃ—

১। ধূমকেতু ; ২। কুম্ভকর্ণ ; ৩। "প" : ৪। পথ।

যাঁহারা ফাল্গুন মাসের ধাঁধাঁর উত্তর দিয়াছেন তাঁহাদের নাম নিম্নে দেওয়া হইল :—

কুমারী বারিবালা দেবী, বর্দ্ধমান; কুমারী হাসিরাণী মিত্র, কলিকাতা; হিমাংশুভূষণ গাঙ্গুলী, মেদিনীপুর; হেরম্বপ্রসাদ বড়ুয়া, গোয়ালপাড়া; সতিনাথ বন্দোপাধ্যায়, নামকুম; গোপীনাথ ঠাকুর, শক্তিপুর; সুধীন্দ্রকুমার বসাক, কলিকাতা; কুমারী বাসন্তী দেবী, শিলঙ্; বিনয়েন্দ্রনাথ দাস, পাবনা; ভবানী রায়, বগুড়া; কমলাবালা ঘোষ, কলিকাতা; শচীন্দ্র কুমার বসাক; কলিকাতা; মনোমোহিনী দেবী, উত্তরপাড়া।

চৈত্র মাসের ধাঁধাঁর উত্তর:—

(১)......... চড়ুই-ভাতি

(২)......... ১৯$\frac{১}{২}$

(৩)......... ৯,৮,৭,৬,৫,৪,৩,২,১ = ৪৫

১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ = ৪৫

৮,৬,৪,১,৯,৭,৫,৩,২ = ৪৫

(৪) ....ঘড়ি।

নীচে যঁহাদের নাম দেওয়া হইল তাঁহারা চারটী ধাঁধাঁরই নির্ভুল উত্তর দিয়াছেন:—

মনোরমা, টিটাগড; বীরেন্দ্রনাথ রায়, বেহালা; রাজকুমার মুখোপাধ্যায়, লক্ষ্ণৌ; সৌরীন্দ্রমোহন ঘোষ, পুরুলিয়া; অমূল্যচন্দ্র ঘোষ, মালয়ানগর; জীবন চক্রবর্ত্তী চটগ্রাম রমাচরণ সন্যাল, কালনা; ভবানী রায়, বগুড়া; নলিনীপ্রকাশ চট্টোপাধায়, লাহোর; বিনয়েন্দ্রনাথ দাস, পাবনা; কুমারী বাসন্তদেবী, শিলঙ; মঙ্গলচরণ গাঙ্গুলী, গোরখ্পুর! মন্নুলাল মেমোরিয়াল লাইব্রেরী, বহরমপুর; হরিপদ দত্ত শিলঙ; মোহাঃ নাসর আলি সিকদার, ধাইদা; শুধাংশু শোভন মিত্র, বাগবাজার; সুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বারাণসী; ব্রজেন্দ্রনাথ বসু জলপাইগুড়ী, রবীন্দ্রকুমার বসাক, কলিকাতা; রমণীমোহন পাইন, আলিপুর; নিবারণচন্দ্র ধর, হরিদাস গাঙ্গুলী, শিলঙ; কুমারী হেন রাণী ঘোষ কলিকাতা; সলিলকুমার মিত্র, কলিকাতা; বীরেন্দ্রনাথ রায়, বেহালা; কুমারী হাসিরাণী মিত্র, কলিকাতা।

যাঁহারা তিনটির উত্তর দিয়াছেন :—

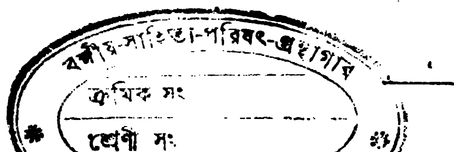
রেণুলা বসু, কলিকাতা ; ভবাণীশিবাণী চরণ বসু, খাগড়া ; মনোজমোহন রায় চৌধুরী খাগড়া ; করুণাময় দে ; মন্মথনাথ পাল, গোয়াড়ী ; কুশলচন্দ্র নিয়োগী, রেঙ্গুন ; অমিয় রায় ; অরবিন্দু দত্ত, সাহেবগঞ্জ ; চন্দ্রকান্ত দত্ত, নীলফামারী ; বেলা ঘোষ, দেওঘর ; শচীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, কলিকাতা ; সৌদামিনী বড়াল, গণেশতলা ; রামময় দাস, হালিমপুর ; কুমারী মীণারাণী সেন, বিহার ; ঋষি বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ ; হরিমোহন গুহ, বাগবাজার ; মাষ্টার সুধীন্দ্রনাথ রায়, বেহালা।

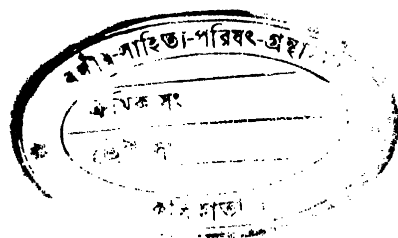
যাঁহারা দুইটী ধাঁধার উত্তর দিতে পারিয়াছেন :—

কুমারী কনকপ্রভা দাস গুপ্ত, শিলঙ ; প্রফুল্লকুমার বিশ্বাস, কৃষ্ণনগর ; নির্ম্মলচন্দ্র নিয়োগী বাগবাজার ; ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, কাটিগড়া কুল ; সিদ্ধেশ্বর সাহা, নেত্রকোনা ; সুধাংশু শেখর গুপ্ত, ওয়ারী ; রবীন্দ্রনাথ দত্ত, কলিকাতা ; বরেন্দ্রপ্রসাদ রায় কলিকাতা ; সুকুমার গুহ বগুড়া ; জ্ঞানশরণ রায়, পাবনা ; বলাইকৃষ্ণ গোল, হুগলী ; হবিব রহমণ মোল্লা, আলমডাঙ্গা, গোপীনাথঠাকুর, শক্তিপুর ; বিনয়েন্দ্র নারায়ণ সিংহ, কাউকুঠি ; সতিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নামকুম ; আব্দুল আজিজ, শ্রীহট্ট ; বাড়খণ্ড বাঁকুড়া লাইব্রেরী, সবঙ্গ ; নৃপেন্দ্রনারায়ণ রায়, ওয়ারী ; কুমারী বারিবালা দেবী, বর্দ্ধমান ; কুমারী বীণাপাণি দেবী, বর্দ্ধমান ; সুশীলামণি ঘোষ, চন্দননগর।

যাঁহারা কেবলমাত্র একটি ধাঁধার উত্তর দিয়াছেন !—

পরিমলবালা বসু, পাটনা ; সুব্রত সেন, রঘুনাথগঞ্জ ; নির্ম্মলকুমার ধর, মাগুড়া; বিভূতিভূষণ মিত্র, বর্দ্ধমান ; কুমারি অমিয়া সেন, জয়পুর (রাজপুতানা) ; কুমারী রাধারাণী দেবী, ভটপুর ; সুকুমার মিত্র, বারাণসী ; সাবিত্রীদেবী, বালিহার ; মাছুমা খাতুন, শ্রীহট্ট ; হেরম্ব প্রসাদ বড়ুয়া, গোয়ালপাড়া ; নিবারণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ব্রাহ্মণগা ; কুমারী পুষ্পলতা বসু, গিরিধি ; কাননচন্দ্র বসু ; সৌরিন্দ্রনাথ সরকার, মধুপুর।







শিশু সত্যগ্রাহী।

আমার দেশ

২য় বর্ষ, ৫ম সংখ্যা ।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯



খোকন সোণা চাঁদের কণা
এক রত্তি ছেলে ;
আর কিছু ধন চায় না খোকা
মা'র কোলটি পেলে ।

ছেলেদের হিন্দুস্থান।

মহাভারত।

কত দিনের কথা—আজ সে হস্তিনাপুরের নামটাও সে দেশ হইতে ধুইয়া মুছিয়া গিয়াছে। কিন্তু দিল্লীর নিকট হস্তিনাপুরেই এক সময় ভারতবর্ষের এক মস্ত বড় রাজা রাজত্ব করিতেন। সে রাজার নাম ছিল কুরু। মহাভারতে এই কুরুবংশীয়দের কথাই বলা হইয়াছে।

এই কুরুবংশীয়েরই এক রাজা শান্তনুর লোভ পড়িল এক ধীবর কন্যার উপর—তাহাকে বিবাহ করিতে। গঙ্গার গর্ভে শান্তনুর দেবব্রত নামে এক পুত্র ছিল। দেবব্রত যেমন ধীর, তেমনি বীর! পুত্র দেখিলেন, পিতা ভারী বিমর্ষ;—খানও না, দানও না—কেবল কি ভাবেন। অনুসন্ধান করিয়া তিনি ক্রমে সবই জানিলেন। তাহার পরই তিনি ধীবর রাজার নিকট যাইয়া পিতার জন্য তাঁহার কন্যা প্রার্থনা করিলেন। ধীবর রাজ বলিল—

যুবরাজ! এ সাম্রাজ্য ত ভবিষ্যতে তোমারই হইবে, তবে কি আমার কন্যা চিরকালই দাসী হইয়া থাকিবে?

পিতার দুঃখে দেবব্রতের প্রাণ ভরিয়া উঠিয়াছিল, দাস রাজের কথা শুনিয়া তখনই দেবব্রত অঙ্গীকার করিল—

“পিতার বিবাহ হেতু করি অঙ্গীকার;
আজি হৈতে রাজ্যে মম নাহি অধিকার।
তোমার কন্যার গর্ভে যে হবে কুমার।
হস্তিনা নগরে তার হবে রাজ্যভার॥”



"তোমার অগ্রেতে......আমি করি অঙ্গীকার।"

ধীবররাজ কিন্তু ইহাতেও তেমন সন্তুষ্ট হইল না, বলিল,

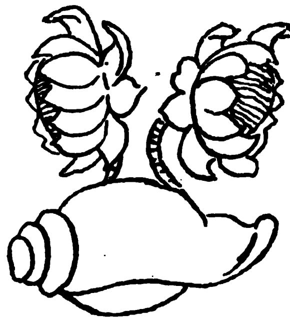
"কিন্তু তোমার পুত্রগণ যদি এ কথা না মানে?"

দেবব্রত পিতার মনস্তুষ্টি করিবার জন্য ধীবররাজের নিকট এইবার এক ভীষণ প্রতিজ্ঞা করিল,

"তোমার অগ্রেতে আমি করি অঙ্গীকার—
বিবাহ না করিব যে প্রতিজ্ঞা আমার।"

সেই দিন হইতে দেবব্রতের নাম হইল ভীষ্ম—সেই দিন হইতে লোকে কথায় বলে—ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা।

সত্যব্রত ভীষ্মদেব আর বিবাহ করিলেন না। শুধু তাই নয়, জীবন ভোর ধীবর কন্যা বিমাতা সত্যদেবীর সন্তান-সন্ততিগণকে সিংহাসনে বসাইয়া তিনি নিজে রাজ্য রক্ষা করিয়াছেন। একটা প্রকাণ্ড নিঃস্বার্থপরতা, এক অমানুষিক চরিত্রবল ভীষ্মের স্মৃতিকে আজিও অমর করিয়া রাখিয়াছে। ক্রমশঃ





ভীষ্ম।

স্বাস্থ্য চিত্রে ও গল্পে।

মুক্ত বায়ু।

(১)

এক দেশে এক রাজা ছিল—তাঁর নাম হাতীবাহন। রাজার রাজ্যটা ছিল যেমনি প্রকাণ্ড—রাজপুরীটাও ছিল তেমনি বিরাট—কত ঘর কত দোর তার কিছু ঠিক ঠিকানা নাই। রাজার সুশাসনে রাজ্যে সুখ আর ধরে না। রাজার সবই আছে—কেবল নাই শুধু একটী ছেলে। সেই জন্য রাজা রাণীর প্রাণে মোটেই সুখ ছিল না। রাজা দুঃখ জানাইতেন রাণীর কাছে ; আর রাণী দুঃখ জানাইতেন রাজার কাছে। এই ভাবে রাজার দিন যায়—রাজা রাণী রোজই ভাবেন—এইবার তাঁহাদের একটী ছেলে হইবে কিন্তু ছেলে আর হয় না। দিনের পর দিন মাসের পর মাস বছরের পর বছর যায় তবুও রাণীর আর ছেলে হয় না। এদিকে রাজার বয়স দিন দিন বাড়িয়া উঠিতেছে—একদিন সকালে রাজা আয়না দিয়া মুখ দেখিতে গিয়া দেখেন—তাঁহার কালো কালো বড় বড় দাড়ীগুলির ভিতর একটি দাড়ী সাদা হইয়া উঠিয়াছে। কি সর্ব্বনাশ! দাড়ী পাকিয়াছে—আর তো একদিনও সবুর করা যায় না। তখনই মন্ত্রীর ডাক পড়িল। মন্ত্রী আসিয়া হাজির। রাজা মহাশয় বলিলেন,—"মন্ত্রি—এখন উপায় কর। আমার কালো দাড়ী সাদা হইয়া উঠিয়াছে—আর ত আমি কিছুতেই সবুর করিতে পারি না। এখনই আমার একটী ছেলের ব্যবস্থা কর।"

রাজার এই অসম্ভব কথায় মন্ত্রী মহাশয়ও একেবারে চুপ, তিনি মাথায় হাত দিয়া বসিলেন। রাজার হুকুম অমান্য করিলে একেবারে গর্দ্দানা যাইবে! উপায় একটা না করিলেই নয়। মন্ত্রী এ পুঁথি ঘাটেন ও পুঁথি ঘাটেন কিন্তু উপায় আর খুঁজিয়া পান না। শেষটা ভাবিতে ভাবিতে মন্ত্রির বুদ্ধিভ্রংশ

হইবার উপক্রম হইল। উদোর বোঝা বুদোর ঘাড়ে চাপাইয়া দিবার জন্য মন্ত্রী মহাশয় তখনই রাজ্যের ভাল ভাল বামুন পণ্ডিতদের ডাকিয়া পাঠাইলেন। মন্ত্রী মহাশয়ের কথা শুনিয়া তাহারা টিকি নাড়িয়া পৈতা দেখাইয়া বলিল,—এই কথা! মন্ত্রী মহাশয় এর জন্য আর চিন্তা কি! এর উপায় ত আমাদের হাতেই আছে।”

বামুন পণ্ডিতরা তখনই উপায় করিতে বসিয়া গেলেন। রাজ বাড়ীর কাণ্ডই আলাদা। জালা জালা ঘি আসিল—গোটা গোটা কাঠ আসিল—ঝুড়ি ঝুড়ি ফল আসিল—বস্তা বস্তা চাউল আসিল। আয়োজন যা হইল—তা একটা বিরাট বটে। সকলেই বলিল—হুঁ—এ একটা উপায়ের মত উপায় বটে। হোমের আগুন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, বড় বড় পণ্ডিত বড় বড় মন্ত্র আওড়াইয়া আগুনে ঘি ঢালিতে লাগিল। সে হোম আর বন্ধ হয় না; একমাস গেল – দুইমাস গেল বছরের পর বছরও চলিয়া যায়, কিন্তু রাজার ছেলে হইল না। রাজা রাণীর দুঃখও ঘুচিল না।

পণ্ডিতেরা হোম করেন, যজ্ঞ করেন—রাজার ঘরের খবর রাখেন না।

সেদিন সকালে পণ্ডিতেরা আসিয়া সবে হোমের আগুন জ্বালিতে যাইতে ছিল—সেই সময় রাজার লোক আসিয়া ছুটিয়া সংবাদ দিল, ফুট ফুটে চেহারা, টুক টুকে রঙ, নধর চেহারা—রাজার ছেলে হইয়াছে।

বড়বড় পণ্ডিত বড় বড় টিকি নাড়িয়া নৈবেদ্য সাজাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। রাজার সম্মুখে বুক ফুলাইয়া বলিল, মহারাজ আমাদের এ হোম কি বিফল হয়।

রাজার আনন্দ দেখে কে? রাজা মুটো মুটো সোনার টাকা বামুন পণ্ডিতদের দান করিলেন। হাজার হাজার কাঙ্গালী ভোজন হইল; লক্ষ লক্ষ বামুন বিদায় পাইল; হাড়ী হাড়ী সন্দেশ বিলি হইল। সে এক বিরাট কাণ্ড!

রাজার ছেলে নাম তার নাড়ু গোপাল। দেখিতে ঠিক নাড়ু গোপাল—দিব্বি থলথলে চেহারা। দেখিতে দেখিতে নাড়ু গোপাল এক বছর দুই বছর করিয়া তিন বছরের হইল। বুড়ো বয়সের রাজা রাণীর ছেলে। ছেলের যত্ন দেখে কে? ছেলে দিন রাত দামী দামী পোষাক পরিয়া কেবল দাসী চাকরের কোলে কোলে ঘোরে। এক মিনিট ছেলে কোল হইতে নামে না। রাজা রাণী ছেলের জন্য সারা—এই বুঝি ছেলের অসুখ হইল—এই বুঝি ছেলের ঠাণ্ডা লাগিল। তাই পুতু পুতু করিয়া সর্ব্বদা ছেলেকে সাবধান রাখেন। কিন্তু রাখিলে কি হইবে—যত পুতু পুতু করে ছেলেও তত গলতে গলতে সলিতা হইয়া যাইতে লাগিল। আজ সর্দ্দি, কাল জ্বর এক দিনের জন্যও নাড়ু গোপাল সুস্থ নাই। রাজার ছেলে নাড়ু গোপাল সে ননি মাখন মিছরী খাইতেছে তবু তাহার রোগও যায় না, নাড়ু গোপালটির মত আর তাহার শরীরও হয় না। রাজা মন্ত্রীকে ডাকিয়া বলিলেন, "মন্ত্রি একি ব্যাপার! রামার ছেলে, শ্যামার ছেলে মোটা, আর আমার ছেলে কিনা গল্‌তে সল্‌তে হয়;—এ কি কাণ্ড!

মন্ত্রী রাজার সম্মুখে আসিয়া হাত জোড় করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল—বলিল—তাইতো মহারাজ, একি কাণ্ড! ঘোর কলি! ঘোর কলি!

কিন্তু কলির দোহাইতে রাজার মন সন্তুষ্ট হইল না।

রাজা একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিলেন, বলিলেন, তোমার মত অকর্ম্মণ্য মন্ত্রী আমি আর কোথায় ও দেখি নাই। আমি তোমার কোন কথা শুনিতে চাহি না। ডাক্তার ডাক বৈদ্য ডাক—হাকিম ডাক—যেমন করিয়া পার আমার ছেলেকে মোটা করিয়া দাও।"

রাজার হুকুম! তখনই ডাক্তার আসিল, বৈদ্য আসিল, হাকিম আসিল। শিশি শিশি—বোতল বোতল—জালা জালা ঔষধ ছেলের পেটে গেল। কিন্তু

ছেলে মোটা হয় না—প্যান প্যানে, ঘ্যান ঘ্যানের রোগও আর সারে না। রাজার মনের সুখ গেল—রাণীর চোখে জল ঝরিল—পাত্র মিত্র সভাসদগণ হায় হায় করিতে লাগিল কিন্তু রোগ যেমন ছিল তেমনই রহিল।

রাজা ভাবেন তাইত, রামা শ্যামার ছেলে মোটা হয়, আর আমার ছেলে হয় না—এ কি অদ্ভুত কথা, কেন এমন হয়?

রাজা মন্ত্রীকে হুকুম দিলেন "রাজ্যে যত মোটা ছেলের বাপ আছে তাদের সকলকে এখনি আমার সামনে হাজির কর।"

রাজার হুকুম পাইয়া মন্ত্রী কোটালকে হুকুম দিলেন। কোটাল লোকজন লইয়া রাজ্যের ছেলের বাপদের ধরিয়া আনিতে ছুটিল। যার ছেলে মোটা তার আর রক্ষা নাই। কোটাল তখনি তাহাদের ধরিয়া আনিয়া রাজার সম্মুখে হাজির করিল। মোটা ছেলের বাপেরা রাজার সম্মুখে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল,—"মহারাজ আমাদের কোন দোষ নাই, কোটাল আমাদের শুধু শুধু বাঁধিয়া আনিয়াছে!"

রাজা ধমক দিয়া বলিলেন,—"তোদের ছেলে মোটা?"

সকলেই হাত জোড় করিয়া বলিল—"হাঁ মহারাজ, তবে তেমন মোটা নহে।"

রাজা বলিলেন,—"এখনি যত মোটা ছেলে আছে তাদের এনে হাজির কর।" আবার কোটাল ছুটিল। যেখানে যত মোটা, ছেলে পাইল—তাদের আনিয়া হাজির করিল। তাহাদের ভিতর সব চাইতে যে ছেলেটি মোটা হৃষ্ট পুষ্ট রাজা সেই ছেলেটিকে দেখাইয়া বলিলেন,—"এই ছেলেটা কার?"

মোটা ছেলের বাপেদের ভিতর একজন বলিল, "আমার।"

রাজা বলিলেন, "এ ছেলে খায় কি!"

মোটা ছেলের বাপ বলিল, "মহারাজ—আমরা গরীব—আমরা আর ছেলেকে কি খাওয়াইব—ভাত আর ডাল খায়!"

ভাত আর ডাল খায়, নিশ্চয়ই সে চালের কোন গুণ আছে। ডাক সেই দোকানীকে যে এই মোটা ছেলের বাড়ীতে চাল দেয়। কোটাল আবার সেই দোকানীকে ধরিয়া আনিয়া হাজির করিল। রাজা বলিলেন—"তুই এই মোটা ছেলের বাপটাকে যে চাল দিস্ সেই চাল আমাকে দিবি।"

মোটা ছেলে যে চাল খায়—রাজার ছেলের সেই চাল খাইবার ব্যবস্থা হইল। কিন্তু তবু ও রাজার ছেলে মোটা হইল না। রাজা রাণীর দুঃখও ঘুচিল না। তখন রাজা আর কি করেন! কেবল গালে হাত দিয়া ভাবিতে লাগিলেন। সেই সময় রাজ সভায় এক সন্ন্যাসী আসিয়া বলিল, "মহারাজ আমি জানি কি করিলে আপনার ছেলে মোটা হয়।"

রাজা পাত্র মিত্র সভাসদ সকলেই বলিয়া উঠিল "কি? কি?"

সন্ন্যাসী বলিল,—"মহারাজ, ছেলেকে দিন রাত কোলে কোলে রাখিবেন না—ছেলেকে খেলা ধূলা করিতে দিন তাদের ইচ্ছামত বেড়াইতে, খাইতে দিন, খোলা গায়ে খোলা হাওয়া লাগুক, যা পাবে তাই খাবে, দেখিবেন ছেলে আপনিই মোটা হইবে। ঔষধ রাশি রাশি খাওয়াইলে ছেলে মোটা হইবে না। শীত গ্রীষ্ম—রৌদ্র বৃষ্টি দেহে সহ্য করাইতে হইবে। যাহাদের ছেলে শীত গ্রীষ্ম, রৌদ্র বৃষ্টির ভিতর দিয়া বাড়ে তাহাদের ছেলেই হৃষ্ট পুষ্ট, দেখিতে ভাল হয়। জল, বৃষ্টি, রৌদ্র, হাওয়া, এ সব ঈশ্বরের দান—এ সব ছেলেদের গায়ে না লাগিলে ছেলে মানুষ হয় না।

রাজা সন্ন্যাসীর কথা মত ছেলেকে রৌদ্র বৃষ্টি শীত গ্রীষ্ম সহ্য করাইতে আরম্ভ করিলেন।



যেখানে খোলা হাওয়া দেখে সেই খানেই ছুটিয়া যায়!

ছেলে বৃষ্টি দেখিলে আর পালায় না, রৌদ্র দেখিলে আর ভয় পায় না, যেখানে খোলা হাওয়া দেখে সেইখানেই ছুটিয়া যায়! হাড়ি হাড়ি, কাড়ি কাড়ি ঔষধ আর গিলিতে হয় না, যেমন সহ্য হয় ডাল, ভাত তরকারী খায়। দেখিতে দেখিতে ছেলের দিব্য শরীর হইল। হৃষ্ট পুষ্ট বলিষ্ঠ—দেখিলেই ভালবাসিতে ইচ্ছা হয়। রাজার স্ফুর্ত্তি দেখে কে? রাণীর মুখে হাসি আর ধরে না। পাত্র মিত্র, সভাসদ সকলের মুখেই হাসি।

রাজা দেখেন, রাণী দেখেন, পাত্র মিত্র দেখে—সকলেই ছেলে দেখে, কিন্তু কোলে আর কেউ করে না। রাজার নিষেধ—তাঁহার ছেলে খেলিবে, বেড়াইবে, পড়িবে, কিন্তু কোলে করিয়া আর তাহাকে কেউ আটক করিবে না। রাজার ছেলে হৃষ্ট পুষ্ট, হাড়ে মাংস বাড়িতে লাগিল!

এই কথাটি আসল জিনিস
জেনে রেখ সবে,
মোটা হবে বৃষ্টি বাতাস
সহ্য যত হবে।
বৃষ্টি বাতাস রৌদ্র আলো,
ভগবানের দান,
এতেই মানুষ বেঁচে থাকে
তাজা রাখে প্রাণ।

ব্যথা।

হয়নাক ঘুম রাত্রে আমার বক্ষে দারুণ ব্যথা,
আজ্‌কে আমার ঘুম পাড়ানি মাসী পিসী কোথা !
বিদেশেতে রোগ বিছানায় একলা আছি পড়ে,
যন্ত্রণাতে রাত কেটে যায় এপাশ ওপাশ করে।
রয়ে রয়ে চোক ফেটে মোর জল যে শুধু আসে
জননীর সে স্নেহের আঁখি জাগ্‌ছে না ত পাশে।
অর্দ্ধ রাতে চন্দ্র ফেলে ছিন্ন আলো ঘরে,
প্রাচীন সুধার একটী কণা নেইক তাহার করে।
রুক্ষ খর দীপের আলো জ্বলছে শুধু রাতে,
মায়ের হাতের সাঁজের বাতির মিষ্টতা কই তাতে !
শান্তি নাহি কেবল যখন তন্দ্রা আসে ভাই
গায়ে মায়ের শীতল করের পরশটুকু পাই।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।





শিল্প-কলা চিত্রে ও গল্পে।

শিল্পী !

শিল্পীর-তপস্যা, শিল্পীর সাধনা,—তাইতেই না সে তাহার মানস প্রতিমাটিকে আমাদের চোখের সামনে এমন জীবন্ত ফুটাইয়া তুলিতে পারিয়াছে। কতকাল ধরিয়া সে আরাধনা করিয়াছে. তাহার মনের ভাবটিকে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য, কত দিন ধরিয়া সে চেষ্টা করিয়াছে তাহার কল্পনার স্বরূপ মূর্ত্তি আঁকিয়া গড়িয়া তুলিতে—এক মনে এক প্রাণে শিল্পী সাধনা করিয়াছে, যোগী ঋষিরা যেমন করিয়া ঈশ্বরের সাধনা করেন তেমনি সাধনা। কিসের জন্য এ সাধনা? স্বার্থের জন্য নয়; ধন, মান, যশ—সে সবত শিল্পী চায় না,—শুধু কাজের আনন্দে শিল্পী কাজ করিয়া চলিয়াছে। যখন কাজ শেষ হইয়া গেল তখন সগর্ব্বেই শিল্পী নিজের কৃত কার্য্যের দিকে চাহিল। তাহার মানসপ্রতিমা সে আজ গড়িয়া তুলিয়াছে, শিল্পীর যত পরিশ্রম সব আজ

সার্থক হইয়াছে, তাহার পরিশ্রম, সাধনা, তপস্যা, আরাধনার পুরস্কার সে পাইয়াছে—ইহার চাইতে বড় পুরস্কার শিল্পী কোন দিনই চাহে নাই।

মানুষের কল্পনার অভাব নাই, কত কল্পনাই আমাদের মনে আসে—যায়। কিন্তু বাস্তব জীবনে সেই কল্পনাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে কয় জনে? কবি যে সে বাস্তব জীবনে কল্পনার মূর্ত্তি দিয়াছে সাহিত্যের মধ্য দিয়া, আর শিল্পী যে সে মুর্ত্তি দিয়াছে কল্পনার স্বরূপ প্রতিকৃতি আঁাকিয়া।

শিল্পীর রাজ্যটা কিন্তু অতি প্রকাণ্ড। কবি তাহার ভাবটিকে ফুটাইয়া তোলে ভাষার সাহায্যে। তাই কবির রাজ্য ভাষাকে ঘিরিয়া আছে। তাও আবার যে ভাষার মধ্য দিয়া কবি নিজের মনের ভাব প্রকাশ করিয়াছে—তাহার রাজ্য সেই ভাষাকে ছাড়াইয়া যাইতে পারে না। কিন্তু শিল্পীর রাজ্য জগৎ ছাড়িয়া। নিরক্ষর যে সেও শিল্পীর সৃষ্টির দিকে অবাক হইয়া তাকাইয়া থাকে। শিল্পীর ভাষা সবাই বোঝে।

কোন দিন এক শিল্পী স্বর্গের অমরাবতীর পরিকল্পনা করিতে করিতে এই মর্ত্ত্যেই অমরাবতীর একটি স্বরূপ মূর্ত্তি গড়িয়া তুলিতে লাগিয়া গেল। কত সাধনার পর শিল্পী সত্যই এই ধরাধামে তাহারই মনের মত একটি অমরাবতী গড়িয়া তুলিল। কল্পনায় যে সব সৌন্দর্য্যের সে আভাস পাইয়াছিল, তিলে তিলে হাতে তুলি ধরিয়া সেই সব সৌন্দর্য্য নিরস ইঁট পাথরের দেওয়ালের উপর সে ফুটাইয়া তুলিল। তাহার যত কিছু কবিত্ব ও সৌন্দর্য্যবোধ সব ঐ তুলির মুখে জীবন্ত হইয়া প্রাচীর গাত্রে এক নূতন বাস্তব জীবন পাইল। শিল্পীর তীর্থক্ষেত্র ইটালিতে সেই অসামান্য প্রতিভার সম্মুখে আজও জগতের শ্রেষ্ঠ মণীষিদের মস্তক নত হইয়া পড়ে। এই শিল্পীর সর্ব্বোচ্চ পুরস্কার।

———

শিল্প-কলা।

ইটালী—সে কোন দেশ? ইটালী শিল্পীদের তীর্থক্ষেত্র, ইটালী শিল্প-কলার জন্মভূমি। সমরক্ষেত্রে যে দেশ পৃথিবী জিতিয়াছিল, চারুশিল্পে সেই দেশই উৎকর্ষার শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল। দেশ বিদেশ হইতে শিল্পীরা আজিও ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত ইটালী পরিদর্শন করিতে যায়—ইটালিয়ন গুরুদের নিকট শেষ শিক্ষা না পাইলে তাহাদের মন কিছুতেই প্রবোধ মানে না।

ইটালীর অন্তর্গত ফ্লোরেন্স নগরে কয়েকজন শিল্পী নিজেদের মধ্যে একটি দল বাঁধিয়া ছবি আঁকিতে লাগিয়া গেল। ফ্লোরেন্স নগরের এই শিল্পীদের অঙ্কিত ছবিগুলির কয়েকটি বিশেষত্ব ছিল। ইঁহাদের ছবি দেখিলেই মনে হয় সেগুলি কল্পনারাজ্যের ছবি, কবির মনের যত কিছু কল্পনা সবই ঐ ছবিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ছবি দেখিলে প্রথমেই যা মনে হয় ভাবিয়া দেখিলে তাহার পর আরও অনেক অর্থ বাহির হয়। অথচ প্রত্যেকটি কল্পনা যুক্তি সঙ্গত—অকারণে হয় নাই। এত কল্পনাময় হইলেও ছবিগুলির চিত্রাঙ্কণ কিন্তু নিখুঁত, মানুষের হাত, পা, নাক, চোখ, মুখ ঠিক মানুষের মতই হয়, কোন কিছু বাস্তব পদার্থ আঁকিবার সময় কল্পনার প্রভাবে সেগুলিকে অবাস্তব দাড় করান হয় না। এই ছবিগুলির আর একটি বিশেষত্ব এ গুলির আধ্যাত্মিক ও ধর্ম্মভাব। ছবিগুলির মধ্যে এমন একটা উচ্চ মহান ভাব থাকে যাহাতে আমাদের মনের মধ্যে স্বতঃই এক সুন্দর, পবিত্র, ঈশ্বর ভাব জাগিয়া উঠে।

লিওনার্ডা ডি ভিন্সি, মাইকেল এঞ্জেলো, বটিসেলি প্রভৃতি অনেক জগত-বিখ্যাত শিল্পই এই দলে থাকিয়া ছবি আঁকিতেন। পাশ্চাত্য মনীষিরা এই শিল্পী দলের নাম দিয়াছেন **ফ্লোরেণ্টাইন স্কুল।**

এই দলের উপর কিছু কারিকুরি করিয়া আর একটি শিল্পী দল গঠিত হয়। রেখাঙ্কনে পারদর্শিতা এই শিল্পী-দল তেমন দেখাইতে পারে নাই বটে, কিন্তু তুলির দ্বারা ইহারা চিত্রের উপর রঙ ফুটাইয়া তুলিত অদ্ভুত রকমের। এই দলের প্রধান উল্লেখ যোগ্য ব্যক্তি হইল র‍্যাফেল। এই দলের নাম **রোমান স্কুল।**

ফ্লোরেন্টাইন দল হইতেই আর একটি শিল্পী দল বাহির হয়—নাম তার **ভিনিসিয়ান স্কুল।** টিসিয়ন, টিনটরেটো প্রভৃতি জগতবিখ্যাত চিত্রকর ছিল এই দলের নেতা। এই দলের বিশেষত্বই হইল ইহারা বাস্তবকেই ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিত, কল্পনার বড় একটা ধার ধারিত না। ফ্লোরেন্টাইন স্কুলের আঁকা মাতৃমূর্ত্তি দেখিয়া মনে ধর্ম্মভাব জাগিয়া উঠে, সেই পুরাণের মাতা ভগবতীর কথা মনে হয়, কিন্তু ভিনিসিয়ন স্কুলের মাতৃমূর্ত্তিকে আমাদের সেই ঘর সংসারের স্নেহময়ী মায়ের মূর্ত্তিটির কথা বারবার মনে করাইয়া দেয়। ভিনিসিয়ন স্কুলের দেবদেবীর মূর্ত্তির মধ্যেও ফুটিয়া উঠে আমাদের বাস্তব জীবনের সুখ, দুঃখ, হাসি। তাহার মধ্যে দেব কিম্বা আধ্যাত্মিক ভাব বড় একটা দেখা যায় না। রেখাঙ্কনে ইহারা ফ্লোরেন্টাইনদের মত পারদর্শী না হইলেও, রঙ ফলাইতে ইহারা অদ্ভুত ক্ষমতা দেখাইয়াছিল। তেমন রঙের জৌলস আজ পর্য্যন্ত কোন শিল্পী চিত্রের উপর ফুটাইতে পারে নাই।

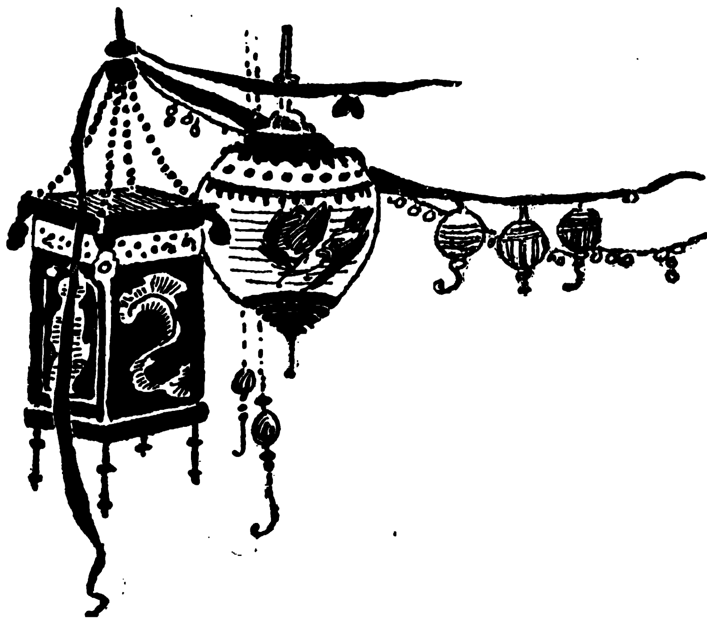
কালে এই ভিনিসিয়ন স্কুল হইতে **স্পেনিস ও ডাচ্ স্কুল** নামে আর দুই শিল্পীদল জাগিয়া উঠে। ইহাদের বিশেষত্ব হইল এই যে, ইহারা কল্পনার রাজ্য হইতে পুরাপুরি ছুটি লইয়া একেবারে বাস্তব রাজ্যে আসিয়া পড়িল। তাই ইহাদের ছবিতে ভিনিসিয়নদের মত চোখ ঝলসান রঙের জেল্লা রহিল না, রহিল যাহা তাহা একদম স্বাভাবিক। কিন্তু একটু কল্পনা, একটু কবিত্ব না

থাকার জন্য ভিনিসিয়নদের ছবির নিকট এই ছবিগুলি নিতান্তই নিষ্প্রভ হইয়া পড়ে। ভ্যাস্কুইজ প্রভৃতি বিশ্ব-শিল্পী এই দলের নেতা।

এই সকল বিশ্ব বিখ্যাত দল ছাড়া আরও ছোট খাট অনেক শিল্পীদল আছে, যাহারা ইহাদেরই কোনটা ছাড়িয়া, কোনটা লইয়া নিজেদের দলের একটা স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিতে চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু শিল্পী জগতের জগত বিখ্যাত দলগুলির নামের উল্লেখই আজ করিলাম—ইহার বেশী নাম করিলে হয়ত তোমরা মনে রাখিতে পারিবে না।

শিল্পীদের মোটামুটি কতকগুলি দলের কথা ত তোমাদের বলিলাম, কিন্তু তোমরা তাই বলিয়া মনে করিও না বিশ্ব-শিল্পীদের কোন ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য ছিল না; তা মোটেই নয়। অনেক সময় এই সব বিশ্ব-শিল্পীদের কোন একটা দলের মধ্যে আনিয়া ফেলা বড়ই শক্ত হইয়া দাঁড়ায়। ইহারা স্থান, কাল, পাত্রের বাহিরে। এই সকল বিশ্ব-শিল্পীদের প্রত্যেকেরই চিত্রাঙ্কনের একটা সম্পূর্ণ নিজস্ব ধারা আছে, যাহা তাহার দলের লোকের কথা ত দূরে থাকুক, জগতের আর কোন চিত্রকরের নিকটও অননুকরণীয়। র‍্যাফেল, টিসিয়ন্ মাইকেল এঞ্জেলো, লিওনার্ডো ডি ভিন্সি প্রভৃতি জগতবিখ্যাত শিল্পীদের যে কোন দলের বাহিরে ও মধ্যে দুইই বলা যায়! সর্ব্বতোমুখী প্রতিভাকে ঘিরিয়া রাখিতে পারে এমন কোন সঙ্কীর্ণ গণ্ডী কিম্বা দল থাকিতেই পারে না।





র‍্যাফেল।

জগত বিখ্যাত চিত্রকর র‍্যাফেলের নাম হয়ত তোমরা অনেকেই শুনিয়াছ। অনেকের মতে র‍্যাফেলের মত চিত্রকর পৃথিবীতে আর জন্মায় নাই।

র‍্যাফেলের পিতাও ছিলেন একজন চিত্রকর। র‍্যাফেলের বয়স যখন ১২ বৎসর তখন তিনি চিত্র বিদ্যা শিখিবার জন্য র‍াফেলকে এক শিক্ষকের নিকট পাঠান। কিন্তু কিছুকালের মধ্যেই র‍্যাফেল শিক্ষকের যাহা কিছু বিদ্যা সব শিখিয়া ফেলিল। শিক্ষকের কিন্তু ইহাতে হইল ভীষণ রাগ। কি! এত বড় আস্পর্দ্ধা! ছাত্র হইয়া গুরুকে ছাপাইয়া উঠে। এমন ছাত্রকেও মানুষ

পোষে! শিক্ষক দিল র‍্যাফেলকে তাড়াইয়া;—ছাত্র আর কি করে, মনের দুঃখে আর এক শিক্ষকের নিকট গেল। কিন্তু র‍্যাফেলের এমনই অদৃষ্ট, সেখানেও কিছুকালের মধ্যেই সে গুরুরও সব বিদ্যা সে হজম করিয়া ফেলিল! র‍্যাফেলের অনুকরণ করিবার ক্ষমতা ছিল অদ্ভুত রকমের তাই সে চটাপট তাহার শিক্ষকদের যাহা কিছু বিদ্যা সব শিখিয়া ফেলিল। এমনও শুনা যায়, তাহার শিক্ষকের অনুকরণে সে সময় সে এমন সব ছবি আঁকিয়াছিল যাহা তাহার কি তাহার শিক্ষকের বুঝা সত্যই বড় কঠিন।

এই সময়ে তাহার জীবনের একটা মস্ত বড় পরিবর্ত্তনের পালা আসিল। তাহার বয়স তখন কুড়ি বৎসর, সেই সময়ে একটি চিত্র প্রদর্শনী হয়। চিত্র প্রদর্শনীতে র‍্যাফেল যাইয়া দেখে মস্ত মস্ত সব ছবি টাঙ্গান। দেখিয়াই তার প্রাণ মন নাচিয়া উঠিল। এতদিন সে কি সব ছাই ভস্ম আঁকিয়াছে। সে কি আর ছবি! এমন না হইলে আঁকা!

সেই ছবি গুলি ছিল বিশ্ব বিখ্যাত চিত্রকর মাইকেল এঞ্জেলো ও লিওনার্ডো ডি ভিন্সির। র‍্যাফেলের, নিজের জীবনের উপর ধিক্কার হইল। ঐ ছবি যদি সে আঁকিতে পারে তবেই জীবন সার্থক নতুবা আর সে হাতে তুলি ধরিবে না। র‍্যাফেল দেখিল তাহার শিক্ষকের এমন বিদ্যা নাই যে তাহাকে আর শিখাইতে পারে। তখন সে নিজেই সাধনা আরম্ভ করিয়া দিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি র‍্যাফেলের অনুকরণ করিবার ক্ষমতা ছিল অদ্ভুত রকমের। র‍্যাফেল সে যুগের শ্রেষ্ঠ চিত্র শিল্পীদের ছবি নকল করিতে আরম্ভ করিল। র‍্যাফেলের প্রতিভা ছিল সর্ব্বতোমুখী, তাই অতি অল্প কালের মধ্যেই শ্রেষ্ঠ চিত্র শিল্পীদের সমস্ত বিদ্যা সে করায়ত্ত করিয়া ফেলিল।

এই সময়ে তাহার ছবির খ্যাতি দেশের চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। শিল্পী মহলে র‍্যাফেলের তখন বেশ নাম হইয়াছে।

সে সময়ে খ্রীষ্টানদের পোপই ছিল একমাত্র ধর্ম্মগুরু। রাজার অপেক্ষা লোকে তখন পোপকে বেশী ভয় ও শ্রদ্ধা করিত। এই পোপদের সে সময় এক অদ্ভুত খেয়াল ছিল। ইটালীতে যত সব ভাল ভাল শিল্পী জন্মাইত, বলে, ছলে, অর্থের লোভ দেখাইয়া, যে প্রকারে হউক পোপ তাহাদের দ্বারা তাহার বাড়ীর দেওয়ালের উপর ছবি আঁকাইয়া লইত। পোপ ছিল খ্রীষ্টানদের ধর্ম্মগুরু, কাজেই অনেকটা ধর্ম্মের ভয়ে, অনেকটা পার্থিব ভয়ে শিল্পীদের রাজি হইতে হইত। র‍্যাফেলের সুনাম শুনিয়া পোপ র‍্যাফেলকে ডাকিয়া পাঠাইলেন তাহার নিজের বাড়ীর দেওয়ালে ছবি আঁকাইবার জন্য।

র‍্যাফেল এক মনে কাজ করিতে লাগিল। ইতি পূর্ব্বেই শিল্প জগতে র‍্যাফেলের নাম সবাই শুনিয়াছিল, কিন্তু কেহই আশা করিতে পারে নাই, এত সহজে এত শীঘ্র র‍্যাফেল সবাইকে ছাড়াইয়া যাইবে। তাহার অঙ্কিত ছবি দেখিয়া সকলে বিস্ময়ে অবাক হইয়া রহিল। চতুর্ব্বিংশতি বৎসর বয়সে আঁকা তাহার ছবিগুলি চিত্রজগতে এখনও শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে,—সে গুলির চাইতে ভাল ছবি আজ পর্য্যন্ত কোন চিত্রকর আঁকিতে পারে নাই।

র‍্যাফেলের অঙ্কিত মাতৃমূর্ত্তির কথা কে না শুনিয়াছে? সন্তান কোলে করিলে মাতার মুখে যে স্বর্গের সুষমা ফুটিয়া উঠে, মাতার মনে প্রাণে যে বিভিন্ন ভাবের উদয় হয় তাহাই অনেকগুলি ছবি আঁকিয়া র‍্যাফেল ফুটাইয়া তুলিয়াছিল। এমন সুন্দর ছবি আজ পর্য্যন্ত আর কেহ আঁকিতে পারে নাই, আর সব ছবি বাদ দিলেও এই মাতৃ মূর্ত্তিগুলিই র‍্যাফেলের নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে।

মাইকেল এঞ্জেলো

র‍্যাফেলের সমসাময়িক আর একজন তেমনই শ্রেষ্ঠ শিল্পী—নাম তার মাইকেল এঞ্জেলো। মাইকেলের পিতার শিল্প বিদ্যার উপর কেমন একটা স্বাভাবিক বিতৃষ্ণা ছিল। কিন্তু হইলে কি হয়, মাইকেলের আবার তেমনি শিল্পকলার উপর ঝোঁক। ফলে পুত্রেরই জয় হইল, পিতা তাহাকে শিল্প বিদ্যা শিখিবার জন্য এক শিক্ষকের নিকট পাঠাইলেন।

মাইকেল তখন নিতান্ত বালক, কিন্তু সেই বয়সেই তাহার প্রতিভা দেখিয়া সকলে অবাক হইয়া গিয়াছিল। একদিন মাইকেল কোন এক বিখ্যাত শিল্পী কর্ত্তৃক খোদিত এক ফন দেখিয়া সেইরূপ আর একটি ফন পাথরে খোদাই করিতেছিল। ফন হইল একটি কাল্পনিক জন্তু বিশেষ—অতি কদাকার। সেই ফনটিও ছিল খুবই বিশ্রী—তাতে আবার সেই বিশ্রী চেহারার উপর সে হাসিতেছিল, কাজেই ফনটা এক বীভৎস রসের সৃষ্টি করিয়াছিল। সেই ফনের মালিক উপহাস করিয়া মাইকেলকে বলিল, "ওরূপভাবে দেখিয়া নকলত সবাই করিতে পারে, ফনটি যা আছে তার উপর কিছু কারিকুরি করিতে পার ত বুঝি।" মাইকেল কোন কথা না বলিয়া ফনের সামনের দুইটি দাঁতের উপর সজোরে হাতুড়ীর এক বাড়ি—! দেখিতে দেখিতে ফনের সামনের দাঁত দুইটা খসিয়া পড়িল। গৃহকর্ত্তা, "কর কি—কর কি।" বলিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু মাইকেল তাহাকে থামাইয়া স্থির ধীর স্বরে বলিল, "ফোগলা দাতের হাসি আরও বীভৎস দেখাইতেছে—দেখুন।"

আর একটি ঘটনা বলি। কিছুদিন কাটিয়া গিয়াছে—মাইকেল তখন যুবক, ভাস্কর বলিয়া তাহার নামও একটু হইয়াছে—সেই সময়কার কথা। মিউনিসি-

পালিটির বাগানে একটা প্রকাণ্ড পাথরের চাঁই অনেক দিন ধরিয়া পড়িয়াছিল ; সেই পাথরটা যে কি কাজে আসিবে তাহা কেহই স্থির করিতে পারিতেছিল না। ঐ পাথরটার উপর মাইকেলের লোভ কিন্তু প্রথম হইতেই পড়িয়াছিল। যাহার সঙ্গে দেখা হইত তাহাকেই সে বলিত, "এই পাথরটার মধ্যে একটা মূর্ত্তি লুকাইয়া আছে—খুঁদিয়া সেটাকে বাহির করিতে পারিলেই হয়।" মাইকেলের এই কথা শুনিয়া তাহার বন্ধুরা গম্ভীর ভাবে রায় দিত—"পাগল!"

সেই প্রকাণ্ড পাথরের চাঁইটা মিউনিসিপালিটির নিকট হইতে খুব অল্প মূল্যেই মাইকেল এঞ্জেলো কিনিয়া লইল। তাহার পর সেই পাথরের চারি পাশে এক মাচা বাঁধিয়া চারদিক ঘিরিয়া টুক টাক করিয়া সে পাথর কাটিতে লাগিয়া গেল। যেদিন সে চারিদিকের আবরণ খুলিয়া ফেলিল সেদিন সকলে অবাক হইয়া দেখিল—সেই পাথরটার পরিবর্ত্তে একটা প্রকাণ্ড ডেভিডের মূর্ত্তি সেখানে রহিয়াছে। তাহাও যেমন তেমন খোদাই নহে। ডেভিডের সেই প্রতিমূর্ত্তিতে, অত অল্প বয়সেও, মাইকেল এঞ্জেলো তাহার সব কৃতীত্ব দেখাইয়াছিল। ডেভিডের সেই প্রতিমূর্ত্তিটি এমনই জীবন্ত হইয়াছিল যে অনেক সময় তাহাকে রক্ত মাংসের মানুষ বলিয়াই ভ্রম হয়। সমস্ত মূর্ত্তিটি নিখুঁত ভাবে আঁকা। শিরা উপশিরা গুলি পর্য্যন্ত যেটির যেমন ফুলিয়া উচু হইবার কথা সেটি ঠিক তেমনি ফুলিয়া উচু হইয়া আছে। মূর্ত্তিটির দিকে চাহিলে মনে হয় তাহার বক্ষের স্পন্দনও বুঝি দেখা যাইতেছে।

এই একটি প্রস্তর মূর্ত্তি কাটিয়াই মাইকেল নিরস্ত হয় নাই, অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আরও কয়েকটি মূর্ত্তি কাটিয়া ভাস্কর বিদ্যায় সে অদ্ভুত পারদর্শিতা দেখাইয়াছিল। তাহার এতগুলি মূর্ত্তির মধ্যেও একটি মূর্ত্তির নাম না করিয়া আমরা থাকিতে পারিলাম না—সেটি হইল "মাতৃ ক্রোড়ে যীশুখৃষ্ট।"

ভাস্কর বিদ্যায় মাইকেল এঞ্জেলোর অসামান্য প্রতিভার পরিচয় পাইয়া পোপ তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। পোপের মাথায় মতলব গেল—তাহার যেখানে কবর হইবে তাহার উপর মাইকেল এঞ্জেলোকে দিয়া এমন একটা মন্দির করাইতে হইবে যাহা তাহার নাম চির-কাল অমর করিয়া রাখিবে। মাইকেল এঞ্জেলো রাজি হইল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সে কাজ আরম্ভ না হইতেই পোপের মৃত্যু হইল। পরে যিনি পোপ হইলেন তিনি আর সে কাজে হাত দিতে রাজি হইলেন না। কিন্তু অহা বলিয়া তাহার মতলবের কিছু অপ্রাচুর্য্য ছিল না। নূতন পোপ বলিলেন, "বেশ, আমার এই গির্জ্জা ঘরটার ভিতরে মাইকেল ছবি আঁকুক!"

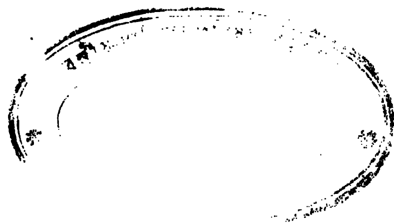
মাইকেল প্রস্তরমূর্ত্তি আঁকিতেই খুব পটু ছিল, এখন ছবি আঁকিতে হইবে শুনিয়া একটু ক্ষুন্ন হইল, কিন্তু কোন কাজে পিছপাও হইবার ছেলে মাইকেল এঞ্জেলো নয়। মাইকেল কাজ করিতে সম্মত হইল। কিন্তু আর এক গোল বাঁধিল। মাইকেল বলিল, "আমি আমার নিজের মতে যেমন ইচ্ছা কাজ করিব! পোপের কোন কথা সে সম্বন্ধে খাটিবে না।" পোপ তাহাতেই রাজি হইলেন। মাইকেল এঞ্জেলো আবার বলিল, "আর এক সর্ত্ত আছে, আমি যত দিন কাজ করিব, আমি কি করিতেছি না করিতেছি কেহই দেখিতে পাইবে না—পোপ নিজেও না।" পোপ আর কি করে, সে সর্ত্তেও তাহাকে রাজি হইতে হইল।

কাজ চলিতে লাগিল। মাইকেলের হিংসা না করে এমন লোক সে যুগে কমই ছিল। সেই হিংসুকের দল যাইয়া পোপকে বলিল, "মাইকেল আবার কি ছবি আঁকিবে! সে ত পাথর কাটিত—ছবি আঁকিতে শিখিল কবে? ছাই ভস্ম কি আঁকে কেউকে দেখায় না—মনে হয় গীর্জ্জাঘর সবটাই নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে।" পোপ অধীর হইয়া উঠিল। একদিন তিনি ধীরে ধীরে

মাইকেল যেখানে কাজ করিতেছিল সেখানে যাইয়া উপস্থিত। মাইকেল কোন কথা না বলিয়া উপর হইতে হাতুড়িটা পোপের মাথা লক্ষ্য করিয়া ফেলিয়া দিল। ভাগ্যিস, সে হাতুড়ী পোপের মাথায় লাগে নাই, লাগিলে ত পোপ সেইখানেই ভবলীলা সাঙ্গ করিতেন। পোপের কিছু বলিবারও উপায় ছিল না, তিনি নিজেই চোরের মত আসিয়াছিলেন। হাতুড়ীই মারুক, আর যাই করুক, মাইকেল এঞ্জেলোর ছবি দেখিয়া পোপ সব ভুলিয়া গেলেন। একদিকে র‍্যাফেলের, আর একদিকে মাইকেল এঞ্জেলোর ছবি, পোপ ভাবিয়া পাইল না কোনটা ফেলিয়া কোনটা দেখিবে।

তাহার পর মাইকেল এঞ্জেলো সেণ্ট পিটার্স কেথিড্রেল তৈরীর ভার লইতে স্বীকার করে। কিন্তু এক সর্ত্তে,—সে এই কার্য্য ধর্ম্মমন্দিরের কার্য্য বলিয়াই করিবে, অর্থের জন্য নয়। সুতরাং সে কার্য্যের জন্য পোপের নিকট হইতে সে কোন টাকা লইবে না। পোপ রাজি হইল। মাইকেল কিছু কাজ করিতেই তাহার কাজ দেখিয়া পোপ এতই সন্তুষ্ট হইলেন যে মাইকেলকে কিছু টাকা পাঠাইয়া দিবার লোভ তিনি কিছুতেই সম্বরণ করিতে পারিলেন না মাইকেল এঞ্জেলো এক কথার মানুষ। কথার খেলাপ দেখিয়া সে ভীষণ চটিয়া ঘোড়ায় চড়িয়া প্রস্থান করিল। পোপ দেখে বিপদ—তখন অনেক সাধ্য সাধনা করিয়া, তার পর তাকে ফিরাইয়া আনে।

মাইকেল এঞ্জেলো একাধারে কবি, ইঞ্জিনিয়ার ও শিল্পী ছিল। যুদ্ধের সময় তাহার মত সেনাপতি, কিম্বা ইঞ্জিনিয়ার খুব কমই দেখা যাইত। এই সব কার্য্যে তাহার হুনিয়ারী বুদ্ধি স্মরণ করিয়া নেপোলিয়ন পর্য্যন্ত বিস্ময়ে অবাক হইয়াছিলেন। মাইকেল এঞ্জেলো কবি। মাইকেল এঞ্জেলো শিল্পী—ভাস্কর্য্যে মাইকেল এঞ্জেলো অদ্বিতীয়। তাহার প্রতিভা ছিল সর্ব্বতোমুখী।



চিত্র

র‍্যাফেল

ও

মাইকেল এঞ্জেলো



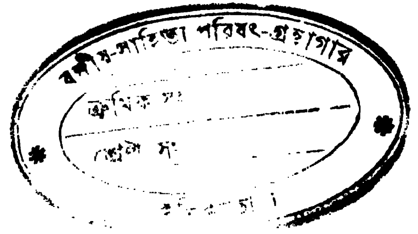
ম্যাডোনা

এই যে ছবিখানি, এখানির দিকে চাহিয়া দেখিলেই মাতৃত্ব যে কি জিনিষ তা বেশ বুঝিতে পারা যায়! তোমরা লক্ষ্য করিয়া দেখ, মার চোখ দুটিতে কি স্নেহ, কি ভালবাসা, এবং মনে মনে কি প্রশান্ত একটা আভাস।—যেন দুনিয়াটাকে ইহারা ভুলিয়া গিয়াছে—যেন ইহারা আর কিছু চায় না, চায় কেবল ছেলেটি তার মাকে, আর মা তার ছেলেটিকে। আর একটা জিনিষ লক্ষ্য করিয়া দেখো—শিল্পী কি চমৎকার কৌশলে একটি মাত্র ছোট্ট ইঙ্গিতের ভিতর দিয়া একটা ভাবকে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। শিল্পী ছবির সামনেই চেয়ারের একটা হাতল দিয়া মা এবং ছেলেটিকে বেড়া দিয়া আটকাইয়া রাখিয়াছেন। এই সামান্য একটি হাতল আঁকিয়া শিল্পী আমাদের দেখাইতে চাহিয়াছেন এই দুটি মা ও ছেলে কি করিয়া এই প্রকাণ্ড পৃথিবীকে দূরে ঠেলিয়া ফেলিয়া একটুখানি জায়গার ভিতর আপনাদের প্রাণের স্নেহ মমতার আদান প্রদানটুকু নীরবে সম্পন্ন করিতেছে।

এইরূপ আরও কয়েকটি মাতৃমূর্ত্তি র‍্যাফেল আঁকিয়াছেন। এই ছবিটি তাহাদেরই মধ্যে একখানি। ছেলে কোলে করিলে মা যে কিরূপ আত্মহারা হয়, তাহার মুখে কি যে স্বর্গীয় ভাব ফুটিয়া উঠে তাহাই শিল্পী দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।

—র‍্যাফেল—





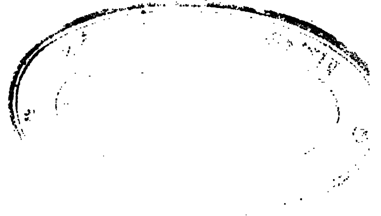
ভগবৎপ্রেম

এই যে মেয়েটি ইহার প্রাণে ভগবৎপ্রেম জাগিয়া উঠিয়াছে। মেয়েটি যেন প্রেমের পুলকে একেবারে আত্মহারা হইয়া গিয়াছে—নিজের আবেগকে সে যেন আর বুকে চাপিয়া রাখিতে পারিতেছে না। তাই তার চোখ ছুটিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে—কি একটা অব্যক্ত পুলক, মনে হয় যেন একটা অসীম আবেগে কোন এক অদৃশ্য পুরুষের চরণোদ্দেশে স্বর্গের দিকে উন্মুখ হইয়া চলিয়া যাইতে চায়। পৃথিবীর সব অসার জিনিষের মোহ কাটাইয়া মেয়েটির চোখ ছুটি যেন এক অপরূপ সৌন্দর্য্যে বিভোর হইয়া রহিয়াছে ;—সে যেন আর এ পৃথিবীর মানুষ নয়। আমাদের বাংলার অমর কবি দাশরথি ছুটি লাইনে এই ভাবটি ফুটাইয়া বলিয়াছেন।

"কোন স্বপনের পাছু—আঁখি পাখী ধায়।"

—র‍্যাফেল—





'কর্ত্তব্য' ও 'পার্থিব সুখ স্বচ্ছন্দতা'

এই ছবিখানি র‍্যাফেলের ১৬ বৎসর বয়সের আঁকা। ছবিখানি কলা হিসাবে খুব উচ্চশ্রেণীর না হইলেও খুব ছেলেবেলার আঁকা বলিয়াই তোমাদের নিকট ধরিতেছি।

একজন যোদ্ধা শ্রান্ত ক্লান্ত দেহে অবসন্ন শরীরে ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। ঘুমের ঘোরে তিনি স্বপ্ন দেখিতেছেন—দুটি মেয়ে যেন তাহার দুইদিকে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন হইতেছেন পার্থিব সুখ স্বচ্ছন্দতা, আর একজন হইতেছেন কর্ত্তব্য। সুখ স্বচ্ছন্দতা একদিক হইতে লোভ দেখাইয়া বলিতেছেন, কেন মিথ্যা যুদ্ধ বিগ্রহ করিয়া কষ্ট পাইতেছ, তার চাইতে আমার আরাধনা কর—দুনিয়ায় বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিতে পারিবে—দিব্যি থাকিবে, কোন দুঃখ কষ্ট তোমার গায়ে আঁচড় কাটিতে পারিবে না। ওদিক হইতে আবার কর্ত্তব্য বলিতেছে ; "খবরদার, ওর কথা শুনিও না—সুখ স্বচ্ছন্দতা কিছুই নয়—ও কেবল দুদিনের মোহ মাত্র। ও সব অলীক জিনিষের লোভে কর্ত্তব্যকে ভুলিও না। কর্ত্তব্যই হইতেছে জীবনের সব চাইতে সেরা জিনিষ।

—র‍্যাফেল—

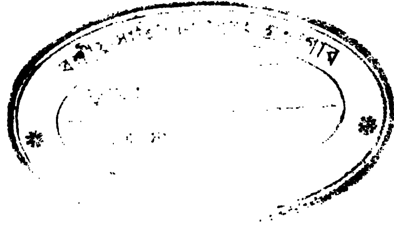


চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি গ্রহ জ্যোতিষ্কের সৃষ্টি

এই ছবিটি আঁকিয়া শিল্পী আমাদের চোখের সামনে এক বিরাট ব্যাপারের অবতারণা করিতে চাহিয়াছেন। ভগবান চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি গ্রহ নক্ষত্রগুলিকে সৃষ্টি করিয়া নিজ নিজ কর্ত্তব্যে নামিয়া যাইবার জন্য আদেশ করিতেছেন—ইহাই হইতেছে ছবিখানির বিষয় বস্তু। একটা ছবি দেখিতে হইলে প্রথমেই দেখিতে হয় যে, যে রসটাকে শিল্পী ফুটাইতে চাহিয়াছেন, ছবিটার দিকে একবার মাত্র চাহিয়াই সমস্ত জড়াইয়া সেই রসটা দর্শকের মনে জাগিয়া উঠে কি না। ছবিখানি দেখিয়া প্রথমেই আমাদের মনে আসে একটা ঝড়ের ভাব। চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি মহাতেজস্কর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গ্রহগুলি যেদিন প্রথম প্রাণবন্ত হইয়া উঠিয়া চারিদিকে উল্কার মত ছুটিয়া যাইতে আরম্ভ করিল সেদিনকার সেই মুহূর্ত্তটা যে কি ভয়ঙ্কর একটী প্রলয়ঙ্করী আবর্ত্তন বিবর্ত্তনের মাঝখান দিয়া আপনাকে ফুটাইয়া তুলিয়াছিল—সেই বিরাট এবং ভয়ঙ্কর গতি-টাকে শিল্পী সমস্ত ছবিটার ভিতর দিয়া আমাদের সামনে ধরিয়াছেন। সমস্ত ছবিখানায় তার প্রত্যেকটা মূর্ত্তি এবং আবহাওয়ার ভিতর দিয়া এমন একটা রস ফুটিয়া উঠিয়াছে যে চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি গ্রহ জোতিষ্কের মতই ভয়ানক এবং গতি-শীল। সমস্ত ছবিটাই যেন একটা বিরাট এবং প্রকাণ্ড কিছুর সম্ভাবনাকে ইঙ্গিত করিতেছে।

—মাইকেল এঞ্জেলো—





ভবিষ্যদ্বক্তা ইজাকেল

যীশুখৃষ্টের জন্মগ্রহণের কিছু পূর্ব্বে গুটিকতক ভবিষ্যর্দ্দশী মহাপুরুষ তাঁর আগমন বার্ত্তা জানিতে পারিয়াছিলেন। এই যে বৃদ্ধ লোকটি ইহাঁর নাম হইতেছে ইজাকেল—ইনি সেই সব মহাপুরুষদের মধ্যে একজন। ছবিখানির ভিতর দিয়া শিল্পী দেখাইতে চাহিয়াছেন এই মহাপুরুষটি যীশুখৃষ্টের অবতীর্ণ হইবার দৃশ্য চোখের সামনে দেখিতে পাইয়া, আনন্দ-বিস্ময়ে কি ভয়ানক অভিভূত হইয়া পড়িয়াছেন। বৃদ্ধ যেন নিজের মনের আবেগকে আর ধরিয়া রাখিতে পারিতেছেন না।

—মাইকেল এঞ্জেলো—

ধর্ম্মের ষাঁড়

(১)

প্রাণ গোবিন্দ লোকটা ভালো,
ঢাকা জেলায় বাড়ী ;
গাল ভরা তার ছিলরে ভাই,
এক হাত লম্বা দাড়ী।

(২)

ঘন কালো সেই দাড়ীতে,
বুক ছিল তার ছেয়ে ;
হাঁ করে সেই বিরাট দাড়ী,
দেখ্‌তো সবাই চেয়ে।

(৩)

জমিদারের সেরেস্তাতে সে,
ক'র্তো তশীল দারী ;
বল্‌তো সবাই প্রাণ গোবিন্দ,
ধূর্ত্ত চালাক ভারী।

(৪)

চালাক ব'লে প্রাণ গোবিন্দের,
প্রায়ই মাঝে মাঝে ;
কল্‌কাতাতে যেতে হ'তো,
জমিদারীর কাজে।

(৫)

দৈব ক্রমে প্রাণ গোবিন্দ,
আশ্বিনের শেষে ;
একবার সে হাজির হ'লো,
কল্‌কাতায় এসে।

(৬)

সে দিন ছিল কালী পূজো,
কালী ঘাটের ধুম ;
ছেলেরা সব ভুঁই পট্‌কা,
ফাটায় দড়াম্‌ দুম্‌।

(৭)

চিন্তা করে প্রাণ গোবিন্দ,
দেখ্‌লে মনে মনে ;
কালী দর্শন করা উচিত,
আজকে শুভক্ষণে।

(৮)

গাম্‌ছা কাঁধে বার হ'লো সে,
উঠ্‌লো ট্রামে গিয়ে ;
কালী ঘাটে রওনা হ'লো,
পাঁচটী টাকা নিয়ে।

(৯)

মন্দিরে সে ঢুকে দেখে,
বেজায় কোলাহল,
যাত্রী নিয়ে নাচ্ছে যেন,
পাণ্ডাদের দল।

(১০)

ভীড়ের ঠেলায় প্রাণ গোবিন্দ,
এগোয় ধীরে ধীরে ;
দেখ্‌তে দেখ্‌তে পাণ্ডারা সব ;
ফেল্লে তাকে ঘিরে।

(১১)

কেউ বা দেয় ফোঁটা তাকে,
কেউ বা পরায় মালা ;
সবাই বলে পয়সা দাও,
একি ভীষণ জ্বালা।



"কেউ বা দেয় ফোঁটা তাকে কেউ বা পরায় মালা।"

(১২)

হাঁপিয়ে ওঠে প্রাণটুকু তার,
যায় গো বসে নাড়ী ;
গাঁদা ফুলের মালাতে তার,
ঢেকে গেল দাড়ী।

(১৩)

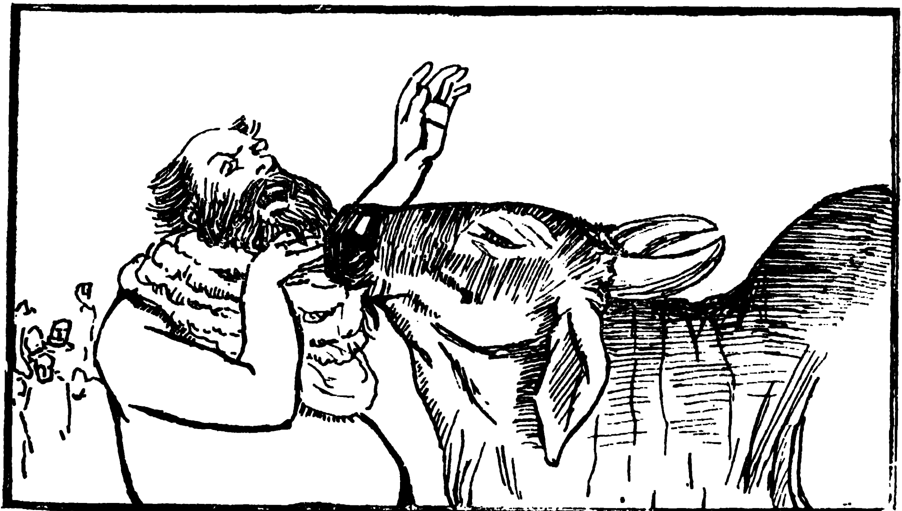
যে কটি তার টাকা ছিল,
সবাই নিলে কেড়ে ;
ভীড় থেকে সে বেরুতে চায়
হাত পা মাথা নেড়ে।

(১৪)

টেনেটুনে ভীড় থেকে সে,
যেমনি হ'লো বার ;
হাঁ করে এক প্রকাণ্ড ষাঁড়,
ধল্লে মালা তার।

(১৫)

মালার সঙ্গে লম্বা দাড়ী,
ঢুকলো ষাঁড়ের মুখে ;
সর্ব্ব শরীর শিউরে উঠে,
দুর দুড়ুনী বুকে।



"মালার সঙ্গে লম্বা দাড়ী ঢুকলো ষাঁড়ের মুখে।"

(১৬)

দু'হাতেতে প্রাণ গোবিন্দ,
দাড়ী গুলো ধ'রে ;
চেঁচিয়ে ওঠে ও বাপরে,
গেছি গেছি করে।

(১৭)

নধর অধর ধর্ম্মের ষাঁড়,
ভ্রূক্ষেপ নেই তায় !
কাণ্ড দেখে অবাক সবাই,
ষাঁড় তাড়াতে যায়।

(১৮)

ধর্ম্মের ষাঁড় ধার্ম্মিক অতি,
ধর্ম্মে ভরা প্রাণ ;
মালার সঙ্গে দাড়ী গুনোয়,
দিচ্ছে কেবল টান।

(১৯)

প্রাণের দায়ে প্রাণ গোবিন্দ,
লাগায় টানাটানি ;
ঝর্ ঝর্ ঝর্ দু'নয়নে,
ঝরে কেবল পানি।

(২০)

অনেক কষ্টে ছাড়ান পেলে,
ছিড়ে খুঁড়ে দাড়ী ;
কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে প্রাণ গোবিন্দ,
চল্‌লো ফিরে বাড়ী।

(২১)

রাস্তার লোকে হাত তালি দেয়,
তোলে হাসির ঢেউ
পৃথিবীতে পরের দুঃখ,
বোঝে নাকো কেউ।

শ্রীযতীন্দ্র নাথ পাল।

প্রতিশোধ।

ভোঁঃ, ভোঁঃ—

এক খরা সাহেব মোটর হাঁকাইয়া চলিয়াছে।

ভোঁঃ, ভোঁঃ—

ভারি স্ফুর্ত্তি হইয়াছে কি-না, বোঁ বোঁ করিয়া মোটর হাঁকাইয়া চলিয়াছে আর ঘন ঘন শিঙা বাজাইতেছে।

ভোঁঃ, ভোঁঃ, ভোঁঃ—

"প্রভাতটা আজ কি মিষ্টই লা'গ্'ছে। গাড়ীখানাও চ'ল্‌ছে যেন হাওয়া—কি আরাম, কি আরাম!"

যাইতে যাইতে খরা এক ছারপোকা-পল্লীর ভিতর আসিয়া পড়িল। কতকগুলি ছার রাস্তা দিয়া ভিড় করিয়া চলিয়াছিল, তাহারা পড়বি তো পড়্, পড়িল একেবারে মোটরখানার সামনে।

ভোঁঃ, ভোঁঃ, ভোঁ ওঁঃ, ভোঁঃ ওঁ ওঁ—

আর ভোঁঃ, তাহারা এত্তে নিড়বিড়ের দল, তা'য় ভোঁএর চোট—গেল আরও ঘাবড়াইয়া। এই চা-পা—

"এইও, হাটো,—এই-এইও, ছারপোকাকা বাচ্ছা কাঁহাকা!"

একটা ছার চাপা পড়িতে পড়িতে বাঁচিয়া গেল। পৈতৃক প্রাণটা লইয়া উর্দ্ধশ্বাসে পলায়মান সেই ছারের প্রতি দাঁত মুখ খিঁচাইয়া খরা ক্রুদ্ধস্বরে কহিল, "ব্যাটা, কাণমে শুনতে পাতা নেই, এত চেঁচাতা হ্যায়?"

ভোঁঃ, ভোঁঃ, ভোঁঃ—

"বাপ, আচ্ছা পল্লীর ভেতর এসে পড়েছিলাম! ভোঁ ওঁ!"

চেঁচামেচিতে খরা-সাহেবের—মাথা গরম হইয়া উঠিয়াছিল, মুখ-চোখ লাল হইয়া, হাতে ঘুঁষি পাকাইয়া উঠিয়াছিল।

রুমালে মুখ মুছিতে মুছিতে, খরা-মশায়—

ফটাস!

"ওই রে যাঃ! puncture হয়ে গেল বুঝি; ভ্যালা জ্বালাতন দে'খ্‌ছি। দু'-চার শ' মাইল্ পথ, যে, নির্ব্বিঘ্নে যা'ব, তাতেও বিধি বাদ সা'ধে।"

যা'ক, কি আর করেন, নামিয়া পড়িলেন। নামিয়া দেখেন, টায়ার বদলাইতে হইবে।

তাই তো, সেও তো অনেক হাঙ্গামা। সেই ভোর বেলা বাহির হইয়াছে, এতখানি পথ মোটর হাঁকাইয়া ব্যায়ামও বেশ হইয়াছে, খরার বেশ ক্ষুধার উদ্রেক হইতেছিল, ভাবিল, "বাবা আগে কিছু খেয়ে নি. তার পর, টায়ার বদলানো যাবে।"

নির্জ্জন ছায়াসুশীতল এক গাছতলায় বাগাইয়া বসিয়া খরা মোটর হইতে খাবার আনিয়া খাইতে সুরু করিয়া দিল। প্রায় সবই খাওয়া হইয়া গিয়াছে। একটা বোতলে করিয়া দুধ আনিয়াছিল সেটায় তখনও হাত পড়ে নাই, এমন সময়ে খরার আলিস্যি বোধ হইতে লাগিল। গাছের গুঁড়িতে একটু হেলান দিয়া বসিতে না বসিতে চোখ দুইটাও আস্তে আস্তে বুজিয়া আসিল। ক'এক মিনিটে খরা ঘোরতর নাসিকা গর্জ্জন সুরু করিয়া দিল।

পাশেই ছিল এক ছারপোকার ক্ষেত। খরার সেই উৎকট নাসিকা-গর্জ্জনের আওয়াজে ক্ষুদ্রপ্রাণ ছারের পিলে চমকাইয়া গেল। সে ভাবিল, "তাইতো, ব্যাপার কি বাবা?" ভয়ে ভয়ে একটা আইলের উপর উঠিয়া দেখে, এক খরা বেজায় নাক ডাকাইতেছে, আশপাশে উচ্ছিষ্ট পড়িয়া। "ওঃ,

একটা খরা, তাই ভাল—(বুকে হাত দিয়া) বাপ, ধড়ে যেন প্রাণ এল, নাক-ডাকানো বটে !”

খড়ের এক নলে করিয়া ছার তখন খেতে জল দিতেছিল। সে করিল কি, একটা উঁচু আইলের উপর দাঁড়াইয়া নলটা আগাইয়া নিঃশব্দে বোতলের মুখে লাগাইয়া দিল। তাহার পর, নীচে নামিয়া, চোঁ চোঁ করিয়া টান, আর হাসি !

দুধের প্রায় তিনভাগের দুভাগ টানিয়া মারিয়া দিয়াছে, এমন সময়ে, ছারপোকার দুর্ভাগ্যবশতঃ,—খরার ঘুম গেল ভাঙিয়া। চোক্ মেলিয়াই খরা দেখে, কে নল বসাইয়া তাহার দুধ টানিয়া ফুরাইয়া দিতেছে। দেখিয়া—রাগে তাহার সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া গেল।

চট্ করিয়া মোটর সিরিঞ্জটা আনিয়া, নলটা টপ করিয়া সিরিঞ্জে লাগাইয়া দিয়া, এই পাম্প তো সেই পাম্প, জোরে জোরে পাম্প, তাড়াতাড়ি পাম্প, খরা ঘন ঘন পাম্প করিতে লাগিল। পাম্পের চোটে পেটে হাওয়া ঢুকিয়া, ছারের ত পেট ফুলিয়া উঠিল। খরা প্রাণপণে পাম্প করিতে লাগিল, পেট এইবারে ফুলিয়া ঢোল হইয়া উঠিল, আরও পাম্প, ছারপোকার শরীর এইবার গোল হইয়া আসিতে লাগিল ; আরও, আরও, উঃ বেটার পেটটা কি জালা নাকি ? আ—র—ও, ছার—এখন একেবারে ম্যাচের ফুটবল হইয়া উঠিল, জোরে জোরে পাম্প, পা – ম—

ফুট, ফটাস ! ছার—ফাটিয়া—একেবারে চৌচির হইয়া গেল।

পা ফাঁক করিয়া অঙ্গুষ্ঠ হেলাইয়া খরা তখন হাঃ—হাঃ—করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল; “কেমন জব্দ ? হুঁঃ হুঁ, হুঁ, আর খাবে আমার দুধ ?

শ্রীধানি লঙ্কা







সভা পণ্ডিত।

[১]

নদীয়ার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের তুল্য দানশীল, গুণগ্রাহী নরপতি সে কালে বঙ্গদেশে আর ছিল না। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের খ্যাতি ভারতময়। দেশ-বিদেশ হইতে মহারাজের সভায় কত লোক আসিত। পণ্ডিত, মূর্খ, ধনী, গুণী চাটুকার—রাজসভায় সকলেই আসে। মহারাজ সকলকেই তুষ্ট করেন, দাতা কৃষ্ণচন্দ্রের সভা হইতে রিক্তহস্তে কাহাকেও ফিরিতে হয় না।

একবার এক মস্ত পণ্ডিত আসিলেন। মস্তকে বৃহৎ শিখা, সর্ব্বাঙ্গে তিলক ছাপ, কপাল জুড়িয়া রক্তচন্দন লেপা। পণ্ডিত তর্কে রাজসভার সমস্ত পণ্ডিতকে পরাস্ত করিলেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র পণ্ডিতের বিদ্যাবত্তায় মোহিত হইয়া তাঁহাকে সভা পণ্ডিত পদে বরণ কবিয়া মাসোহারা, বাসাবাড়ী সমস্ত নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন।

এই পণ্ডিতটি কে, কোথায় উহার নিবাস, জাতি বর্ণ কেহই কিছু জানিত না। পণ্ডিত না পণ্ডিত। অমনি থাকেন।

সভায় আসিয়া তর্ক করেন নির্ভুল; শ্লোক আওড়ান বিশুদ্ধ! অন্য পণ্ডিতগণ কেহই আর মাথা তুলিতে পারেন না। তাঁহাদের মুখ শুখাইল, কিন্তু কেহই কোন উপায় খুঁজিয়া পাইলেন না—যাহাতে তাঁহার প্রতিপত্তি খর্ব্ব করিতে পারেন।

[২]

গোপাল ভাঁড়ের বুদ্ধির তুলনা নাই। মহারাজের অন্য সভাসদগণ গোপালের কাছে হাজির হইলেন। গোপাল সব কথা শুনিয়া বলিল, দেখ, লোকটা বাঙ্গালী নয় বলিয়াই আমার মনে হয়। তবে ও-যে কি তাহাও আমি ঠিক বলিতে পারিতেছি না, কিন্তু ওর চেহারা দেখিয়া ওকে আমার কিছুতেই বাঙ্গালী বলিয়া মনে হয় না। আমার মনে হয় লোকটা নিজের জাতি গোপন করিয়া আছে।

এ কথা শুনিয়া সকলেই হর্ষান্বিত হইয়া উঠিল। বলিল—গোপাল তুমি আমাদের একটা গতি কর। কোনও উপায়ে লোকটাকে বিদায় কর।

গোপাল সম্মত হইল।

[৩]

একদিন রাত্রে রাজসভা হইতে সেই সভাপণ্ডিতটি গৃহাভিমুখে চলিয়াছেন—পথ অন্ধকার, জনমানবশূন্য, ব্রাহ্মণ লাঠি গাছি ঠকিতে ঠুকিতে চলিয়াছেন,

মধ্য পথে হঠাৎ একটা লোক কোন দিক হইতে আসিয়া পড়বি ত পড়—একেবারে ব্রাহ্মণেরই ঘাড়ে।

সঁড়া অন্ধা—বলিতে বলিতে ব্রাহ্মণ কলাগাছের মত ধড়াস্ করিয়া পড়িলেন।

গোপাল তাড়াতাড়ি ব্রাহ্মণকে তুলিয়া বলিল—পণ্ডিত মহাশয়—আপনি! আহা-হা, বড় লাগিয়াছে কি?

পণ্ডিত মহাশয় কথা কহিতে পারিলেন না; গোপাল আবার বলিল আপনাদের দেশে কিরূপ ব্যবস্থা জানি না, এখানে—বাংলা দেশে পথ চলিতে হইলে রাত্রে আলো লইয়া বাহির হইতে হয়। এই দেখুন না মহাশয়, আমার আলোটি বাতাসে নিবিয়া গেল—বলিয়া গোপাল ভাঁড় একটা ভাঙ্গা লণ্ঠন তুলিয়া দেখাইল। দেখাইয়া বলিল—এখানেই যখন থাকিতে হইবে এখানকার আইন কানুন মানিয়া চলাই ত উচিৎ! জানেনই ত উড়িষ্যায় আর বাংলায় তফাৎ অনেক! আহা মহাশয়, একটু পদ ধূলি দিন, বিদায় হই।

সভাপণ্ডিত মহাশয় অন্ধকারে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার মুখ দিয়া হঠাৎ 'সঁড়া অন্ধা' কথাটা বাহির হইয়া পড়ায়, গোপাল যে তাঁহাকে 'উড়ে' বলিয়া জানিতে পারিয়াছে, ইহা বুঝিয়াই মনটি বড়ই বিষণ্ণ হইয়া গেল।

রাত্রি শেষে সভাপণ্ডিতকে কেহ আর নদীয়ায় দেখিতে পাইল না। পূর্ব্বের পণ্ডিতগণ গোপালকে কিঞ্চিৎ পারিতোষিক দিয়া দিলেন।

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার।






কৃপণের ধন।

মাণিকলাল্ কৃপণ। জীবনে সে অনেক টাকা রোজগার করিয়াছে। কিন্তু এখনও টাকার মোহ তাহার কাটে নাই। লক্ষ লক্ষ টাকা তাহার সুদে খাটে। গ্রামে এত বড় ধনী আর কেহ নাই। জীবনে সে একটি পয়সা কাউকে দান করে নাই। কিন্তু ছলে, বলে, কৌশলে সে যদি একটি পয়সাও অন্যায় করিয়া কাহারও নিকট হইতে লইতে পারে—তবে তাহাতে সে সন্তুষ্ট ছাড়া অসন্তুষ্ট হয় না—এমনই তাহার স্বভাব।

সেদিন প্রাতঃকালে সুদের টাকা লইয়া মাণিকলাল বাড়ী ফিরিতেছিল। অতি সাবধানী সে—পাছে নোটের তাড়া দেখিয়া কাহারও কুমতলব যায়—সেই জন্য জামার ভিতরে তখনি নোটের তাড়াটি রাখিয়া দিল—যেন তাহার কাছে এক পয়সাও নাই—এমনি ভাব। বাড়ী পঁহুছিবার আগে মাণিকলাল একবারও জামার পকেটে হাত দেয় নাই—ভয় পাছে কেউ দেখে। বাড়ী পঁহুছিয়া নোটের তাড়া বাহির করিতে যাইয়া দেখে—সর্ব্বনাশ! নোটের তাড়া নাই—হয়ত বা রাস্তায় কোথাও পড়িয়া যাইয়া থাকিবে।

তিন দিন তিন রাত্রি মাণিকলাল খায় না, দায় না, দিবারাত্র হা টাকা

করিয়া বুক চাপড়ায়। নগদ পাচশত টাকা! একটি পয়সা হারাইলে যে ভাবিয়া আকুল হয়, এত বড় শোক সে কি করিয়া সহ্য করিবে? কাঁদিয়া, কাঁদিয়া, বুক চাপড়াইয়া—তিন দিন পরে মাণিকলাল এক অদ্ভুত জীব হইয়া দাঁড়াইল। মাণিকলালকে দেখিয়া আর চেনা যায় না—যেন কতদিন রোগে ভুগিয়াছে।

তিনদিন পরে মাণিকলাল থানায় যাইয়া উপস্থিত। বরাবর পুলিস সাহেবের নিকট যাইয়া বলিল—

"সাহেব, আমার সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে। পাঁচশত টাকা, নগদ পাঁচশ' টাকা—বাড়ী ফিরিবার সময় পথে কোথাও পড়িয়া গিয়াছে। সে টাকা আমার চাই—লোক লাগান, তদন্ত করুন—যত খরচ লাগে আমি দিব—সে টাকা আমার চাই—পুরস্কার ঘোষণা করিয়া দিন—চল্লিশ টাকা—নগদ চল্লিশ টাকা পুরাপুরি পুরস্কার দিব—যে টাকাটা পাইয়া ফিরাইয়া দিবে।"

দারোগাবাবু পুরস্কার ঘোষণা করিয়া দিলেন। মাণিকলাল আশা পথে চাহিয়া ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল।

সে গ্রামে থাকিত, এক বুড়ী। বুড়ী রোজ সকালে ঘাটে বসিয়া সন্ধ্যা আহ্নিক করে, তারপর বেলা হইলে বাড়ী ফেরে। সেদিন গঙ্গা স্নান করিয়া সে বাড়ী ফিরিতেছিল, পথে দেখে একটা নোটের তাড়া পড়িয়া। দেখিয়াই বুড়ী চমকিয়া উঠিল। ভগবানের আবার এ কি লীলা! বুড়ী কি ভাবিয়া নোটের তাড়াটা তুলিয়া লইল।

বুড়ী বড় দুঃখী—ভিক্ষা করিয়া খায়, অনেকদিন উপবাসে কাটিয়া যায়; দিনরাত্রি সে ভগবানকে ডাকে। "দয়াল প্রভু, এ কি আমার দুর্গতি

আমার পাপের শাস্তি কি এখনও শেষ হয় নাই।” বুড়ীর দুঃখের দিনও শেষ হয় না, ডাকাও ফুরায় না।

বুড়ী ভাবিল হয়ত ভগবানই তাহার দুঃখে দয়া পরবশ হইয়া এই টাকা তাহার নিকট পাঠাইয়াছেন। কিন্তু তখনই মনের ভিতর হইতে কে বলিয়া উঠিল, “না—না—ও ভাবনা নিতান্তই স্বার্থ পরের মত—পরের জিনিস—পরের জিনিস লইলে চুরী করা হয়—আমি যাহার জিনিস তাহাকেই ফিরাইয়া দিব।”

তিনদিন তিন রাত্রি বুড়ীরও ঘুম হয় নাই। একদিকে টাকার লোভ, আর একদিকে ধর্ম্মের ভয়! শেষটা ধর্ম্মেরই জয় হইল। বুড়ী নোটের তাড়া লইয়া থানায় জমা দিল—যার টাকা তাকে ফিরাইয়া দিতে।

পুলিস সাহেব বুড়ীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এতদিন সে টাকার থলি কেন ফিরাইয়া দেয় নাই। বুড়ী কাঁদিতে কাঁদিতে সব কথা বলিল—বড় গরীব সে, তাই কত লোভ হইয়াছিল তাহার এই টাকার উপর, শেষটা সে ধর্ম্মের ভয়ে টাকা ফিরাইয়া দিতে আসিয়াছে—এই সব। সব শুনিয়া বুড়ীর প্রতি পুলিশ সাহেবের বড় দয়া হইল।

সাহেব তখনই মাণিকলালকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। মাণিকলাল আসিতেই পুলিশ সাহেব বলিলেন—

এই আপনার টাকার থলি—এই বৃদ্ধা আনিয়াছে। বুড়ী বড়ই গরীব, টাকার প্রতি তাহার লোভ হওয়া কিছুই বিচিত্র নয়, কিন্তু তাহার ধর্ম্মে মতি আছে, তাই সবটাই সে ফিরাইয়া দিয়াছে।

মাণিকলাল লোলুপদৃষ্টিতে নোটের তাড়াটার দিকে চাহিল, তাহার পর নোট কয়খানি গণিল। গুণিয়া দেখিয়া নোটের তাড়াটী কোঁচার খোঁটের

সঙ্গে বাঁধিল। তাহার পর বৃদ্ধার আপাদ মস্তক একবার ত্বরিতগতিতে চাহিয়াই সহসা দ্রুত ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইবার উপক্রম করিল।

পুলিশ সাহেব বিস্মিত দৃষ্টিতে মাণিকলালের এই সব কাণ্ড কারখানা নির্ব্বাক হইয়া দেখিতেছিলেন। শেষটা আকুল বিস্ময়ে যেন চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"কিন্তু বুড়ীর পুরস্কারের টাকা" ?

সহসা সম্মুখে কাল সর্প দেখিলে মানুষে যেমন শিহরিয়া উঠে, মাণিকলালও সেইরূপ শিহরিয়া উঠিল, ত্রস্তে সে আবার সেই স্থানে বসিল, কি ভাবিয়া আবার নোটের তাড়াটা লইয়া খানিকক্ষণ নাড়াচাড়া করিল, তাহার পর বলিল,

"আমার সাড়ে পাঁচ শত টাকার নোট ছিল, আছে দেখিতেছি পাঁচ শত, বুড়ী নিশ্চয়ই ৫০৲ টাকা আত্মসাৎ করিয়াছে।"

তাহার পর একটু ঘৃণার স্বরে বলিল,

"পুরস্কারের টাকার চাইতে বেশী সে আগেই লইয়াছে—আবার পুরস্কারের দাবী করে ?"

বুড়ী এই কথা শুনিয়া যেন আকাশ হইতে পড়িল। সে নিজেকে একটু সামলাইয়া লইয়া বলিয়া উঠিল,

"সাহেব, দোহাই আপনার, আপনি একথা বিশ্বাস করিবেন না—কেন আমি পরের পঞ্চাশ টাকা না বলিয়া লইতে যাইব ? তাহাতে কি ধর্ম্ম থাকে, তাহাতে কি ঈশ্বর রাগ করিবেন না ? আর যদি লইবই তবে সবটাই কেন লইলাম না, পাপ যখন সমানই তবে কেন কতক লইয়া ঈশ্বরের নিকট অপরাধী হইতে যাইব ?—হা ঈশ্বর,—"

মাণিকলাল এতক্ষণ খালি অবজ্ঞার হাসি হাসিতেছিল, বুড়ীর কথা

শেষ না হইতেই সে যেন ঘৃণাভরেই উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং অস্পষ্ট স্বরে কি একটা কথা বলিয়াই আবার ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল।

পুলিশ সাহেবের মুখ চোখ লাল হইয়া উঠিয়াছিল, তীব্র স্বরে তিনি হাঁক ছাড়িলেন,—

"তাড়ায় আপনার—কত টাকার নোট আপনার ছিল ?"

"সাড়ে পাঁচ শত টাকার।"

"আগে তবে আপনি পাঁচ শত টাকা বলিয়াছিলেন কেন ?

মানিকলাল একটু থতমত হইয়া বলিল,

"ভূলে মশাই, ভুলে"

"অদ্ভুত ভুল ! আচ্ছা বেশ, আপনি ভাবিয়া চিন্তিয়াই বলুন, এখন ত আর ভুল হইতেছে না—আপনার ঐ সাড়ে পাঁচশ টাকাই হারাইয়া গিয়াছিল।"

"হ্যাঁ—সাড়ে পাঁচ শত টাকাই আমার হারাইয়া গিয়াছিল।" এই বলিয়া মাণিকলাল নোটের তোড়াটি বাহির করিয়া আর একবার গণিয়া লইল। তাহার পর বলিল—

"কিন্তু ইহাতে আছে মোটে পঞ্চাশখানি নোট--দশ টাকা"···

পুলিশ সাহেব ক্ষিপ্র গতিতে নোটের তাড়াটি মাণিকলালের হাত হইতে কাড়িয়া লইলেন, তাহার পর গম্ভীর স্বরে বলিলেন,

"বুড়ীর কথা মিথ্যা নয়, আপনার কথাও আমি অবিশ্বাস করিতে পারি না। তাই—আমার মনে হয়, এ নোটের তোড়া আপনার নয়—অন্যের। বুড়ী, তোমার মত ধার্ম্মিকা আমি অল্পই দেখিয়াছি—এই লও তাহার পুরস্কার—"

এই বলিয়া পুলিশ সাহেব সেই পাঁচশত টাকার নোট বৃদ্ধার হাতে তুলিয়া দিলেন—দিয়া বলিলেন,

"এ টাকার মালিক কে আপাততঃ স্থির হইল না হয়ত হইবেও না, তবে যদি ভবিষ্যতে এই টাকার মালিক কেহ স্থির হয় তাহা হইলে আমি নিজের তহবিল হইতে ঐ পাঁচশত টাকা দিয়া দিব, আর যদি মালিক কেহ স্থির না হয়, তবে সরকারের পক্ষ হইতে তোমার সততার জন্য এই টাকা তোমাকে



"আচ্ছা, আচ্ছা,···পুরস্কারের টাকা দিব·

পুরস্কার দেওয়া হইল।—যাও বুড়ী, সব টাকা তোমার—আশীর্ব্বাদ করি—তুমি যেন এইরূপ ধর্ম্মপথেই চিরকাল থাকিতে পার।"

বুড়ী ঈশ্বরের নাম করিতে করিতে ঘর হইতে বাহির হইবার উপক্রম করিল।

মাণিকলাল এতক্ষণ বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া নির্ব্বাক ভাবে বসিয়া ছিল। বুড়ী টাকা লইয়া চলিয়া যায়—দেখিয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল—

"আচ্ছা, আচ্ছা, আমি পুরস্কারের টাকা দিব, চল্লিশ টাকা লইয়া বাকি টাকা রাখিয়া যাউক।"

পুলিশ সাহেব হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলেন,

"সে আর হয় না বাপু, পরের টাকা আপনাকে আমি কেমন করিয়া দিব?—ঐ সাড়ে পাঁচশত টাকা যদি পাওয়া যায় তবে নিশ্চয়ই আমি নিয়া আপনাকে ডাকিয়া দিব—আপনাকে আর তখন পুরস্কার দিতে হইবে না।"

এই বলিয়া পুলিশ সাহেব হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।





জ্যৈষ্ঠ মাস

জয়মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত কথা

(জয়দেব ও জয়াবতী)

জ্যৈষ্ঠ মাস—গুমোট গরম পড়েছে। মা জয়মঙ্গলচণ্ডী পদ্মাকে ডেকে বল্লেন,—"পদ্মা—সব দেবদেবীর পৃথিবীতে পূজোর প্রচার হ'লো—আমার এখনও হ'লো না কেন ? যা এখনি গিয়ে পৃথিবীতে যাতে আমার পূজো প্রচার হয় তার ব্যবস্থা করগে যা। আমি হলুম মা জয়মঙ্গলচণ্ডী—আমার পূজো যদি পৃথিবীতে প্রচার না হয় তাহ'লে মানুষের আর দুঃখের শেষ থাকবে না।"

পদ্মা মা জয়মঙ্গলচণ্ডীর আদেশ পেয়ে তখনি এক বুড়ি হয়ে পৃথিবীতে গিয়ে উপস্থিত হ'লো। পদ্মা পৃথিবীতে গিয়ে এ দেশ সে দেশ ঘুরে এক সওদাগরের বাড়ীতে এসে উপস্থিত হ'লো। সেই সওদাগরের নাম বাসবদত্ত। সওদাগরের সাতটী মেয়ে কিন্তু ছেলে একটীও নেই। পদ্মা তার বাড়ীতে গিয়ে বল্লে,—"মা অনেকদিন কিছু খাইনি—যদি দয়া করে এক মুটো খেতে দাও।"

বাসবদত্তের স্ত্রী তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলো,—বল্লে,—"এস বাছা বসো—আমি তোমার খাবার জোগাড় করে দিচ্ছি।"

এখন আসলে হয়েছে কি, পদ্মা তো সওদাগরের বাড়ী খেতে আসে নি—মা জয়মঙ্গলচণ্ডীর যাতে পূজোর প্রচার হয় তারই ব্যবস্থা কর্ত্তে এসেছে,—সওদাগরের বৌ বেরিয়ে এলে, সে জিজ্ঞাসা কল্লে,—"হ্যাঁ মা তোমার ছেলে মেয়ে ক'টী ?"

সওদাগরের স্ত্রী দুঃখ করে বল্লে,—"বাছা আমার সাতটী মেয়ে, ছেলে একটীও নেই।"

পদ্মা সওদাগরের বাড়ীর উঠানের মাঝখানে এসে বসে ছিল,—তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বল্লে,—"মা আমি ছেলে আঁটকুড়ীর দেওয়া কোন জিনিষ ছুঁইনে। তোমার বাড়ীতে আমার খাওয়া হবে না—দেখিগে অন্য কোথায়ও যদি এক মুঠো পাই।"

পদ্মা এই বলে সওদাগরের বাড়ী থেকে চলে যাবার জন্যে যেমন পা বাড়িয়েছে অমনি বাসবদত্তের স্ত্রী এসে তার পা জড়িয়ে ধরে বল্লে,—"মা আমার ছেলে হয়নি বলে আমার বাড়ীতে খাবে না—ভগবান আমায় ছেলে দেননি—এতে আমার অপরাধ কি ? না মা আমার বাড়ীতে তোমায় কিছু খেয়ে যেতেই হবে।"

পদ্মা আঁচলে বেঁধে একটী বেল নিয়ে এসেছিল—সেইটী খুলে সওদাগরের স্ত্রীর হাতে দিয়ে বল্লে,—"বাছা দুঃখ কর্‌রোনা—এই বেলটী ধর। এই বেলটী খেলে তোমার ছেলে হবে—সেই ছেলেটীর নাম রেখ জয়দেব। সেই ছেলের দৌলতে তোমার সমস্ত দুঃখ কষ্ট ঘুচে যাবে। তোমার ছেলে হ'লে তখন একদিন এসে তোমার বাড়ীতে খেয়ে যাব।"

পদ্মা এই বলে সওদাগরের বাড়ী থেকে চলে এলো। তার পর পাঁচ বছর কেটে গেছে—আবার জ্যৈষ্ঠ মাস এসেছে—মা জয় মঙ্গলচণ্ডী পদ্মাকে ডেকে বল্লেন,—"পদ্মা কই এখন পৃথিবীতে আমার পূজোর প্রচার হ'লো না কেন? যাও শিগ্‌গির যাতে আমার পূজোর ব্যবস্থা হয় তাই করগে।"

আবার পদ্মা বুড়ি সেজে পৃথিবীতে এলেন। আবার এক সওদাগরের বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সওদাগরের বাড়ীতে গিয়ে বল্লেন,—"মা আমাকে দুটী ভিক্ষে দাও।"

সেই সওদাগরের নাম কেশবদত্ত। কেশবদত্তের স্ত্রী ভিক্ষে দিতে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলো। পদ্মা তাকে জিজ্ঞাসা কল্লে,—"বাছা তোমার ছেলে মেয়ে কটী?"

কেশবদত্তের স্ত্রী দুঃখ করে বল্লে,—"মা আমার ছেলে সাতটী কিন্তু মেয়ে একটীও নেই।

পদ্মা ঘাড় নেড়ে বল্লে,—"তাহ'লে বাছা আমি তো তোমার ভিক্ষে নিতে পারিনি। ছেলে আঁট্‌কুড়ীর আমি ছায়া মাড়াইনে; আর মেয়ে আট্‌কুড়ীর আমি ভিক্ষে নিইনে। যাও বাছা ঘরে যাও—আমি অন্য বাড়ী দেখিগে।"

কেশবদত্তের স্ত্রী অমনি পদ্মার পা জড়িয়ে ধল্লে,—পদ্মা তাকেও একটী বেল দিয়ে বলে গেল,—এই বেলটী খেলে তোমার একটী মেয়ে হ'বে। সেই মেয়ের নাম রেখ জয়াবতী। সেই মেয়ে তোমার কুল উজ্জ্বল কর্ব্বে। তাকে জয়মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত কর্ত্তে বলো—তাহ'লে তার কোন দুঃখ থাক্‌বে না। মা জয়মঙ্গলচণ্ডী তাকে সব বিপদ আপদ থেকে রক্ষা কর্ব্বেন।"

এই বলে পদ্মা সেখান থেকে চলে এলো, বাসবদত্তের ছেলে হ'লো—কেশবদত্তের মেয়ে হ'লো। বছর বছর তারা বড় হ'য়ে উঠ্‌লো। বাসবদত্ত

তার ছেলের নাম রাখ্‌লে জয়দেব ; আর কেশবদত্ত তার মেয়ের নাম রাখলে জয়াবতী। কেশবদত্তের স্ত্রী পদ্মা যেমন যেমন বলে গেছ্‌লো তেমনি তেমনি বলে মেয়েকে জয়মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত করাতে শেখালে। জয়াবতী প্রতি বছর জ্যৈষ্ঠ মাসে মঙ্গলবার জয়মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত কর্ত্তে লাগ্‌লো। কিছুদিন পরে যখন জয়দেব আর জয়াবতীর বিয়ের সময় হ'লো—তখন জয়মঙ্গলচণ্ডীর কৃপায় তাদের দু'জনের বিয়ে হ'লো। জয়দেব জয়াবতীকে বিয়ে করে সাত রাজার ধন নিয়ে বাড়ী চল্লেন। একদিন যান—দু'দিন যান—হঠাৎ জয়াবতীর মনে পড়্‌লো আজ জ্যৈষ্ঠ মাসের মঙ্গলবার, আজ মা জয়মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত কর্ত্তে হবে। জয়াবতী জয়দেবকে কিছু না বলে ব্রত কল্লে,—তার পর আপন মনে বিড়্‌ বিড়্‌ করে কথা বল্‌তে লাগ্‌লো। জয়দেব পাশেই বসে ছিল,—সে জিজ্ঞাসা কল্লে,—"জয়াবতি বিড়্‌ বিড়্‌ করে ও কি বল্‌ছ? আমাকে মন্ত্র পড়ে গুণ গান কচ্ছো নাকি?"

জয়াবতী স্বামীর কথার উত্তরে বল্লে,—"আজ জ্যৈষ্ঠী মাসের মঙ্গলবার—তাই জয়মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত করছি—তারই কথা বল্‌ছি।"

জয়দেব জিজ্ঞাসা কল্লে,—"এ ব্রত কল্লে কি হয়?"

জয়াবতী বল্লে,—"এ ব্রত কল্লে,—

হারালে জিনিষ হারায় না—স্বামী পুত্তুর মরে না।
জলে দিলে ডোবে না—আগুনে দিলে পোড়ে না॥
পাকা মাথায় সিঁদূর পরে—মা জয়মঙ্গলচণ্ডীর বরে॥

জয়াবতীর কথায় জয়দেব খুব খানিকক্ষণ হেসে নিলে—তার একথা একেবারেই বিশ্বাস হ'লো না ; সে মনে মনে স্থির কল্লে,—এর পরীক্ষা নিতে হবে। জয়দেব জয়াবতীকে আর কোন কথা বল্লে না। সে যেমন মন্ত্র বল্‌ছিল

তেমনি বল্‌তে লাগ্‌লো। কিছু দূর এসে জয়দেব জয়াবতীকে বল্লে,—"জয়াবতি—এই যায়গাটায় বড় ডাকাতের ভয়। তোমার গায়ের গয়নাগুলো খুলে দাও, আমি লুকিয়ে রেখে দিই।"

জয়াবতী গায়ের গয়নাগুলো খুলে জয়দেবের হাতে দিলে। জয়দেব সেগুলো একটা পুঁট্‌লী করে বেঁধে নদীর জলে ফেলে দিলে। বল্লে,—এখন তোমার জয়মঙ্গলচণ্ডী তোমার গায়ের গয়নাগুলো ফিরিয়ে দিক দিকি? তুমি তো বলেছ এ ব্রত কল্লে,—হারালে জিনিষ হারায় না।"

জয়াবতী কোন কথা বল্লে না—সে কেবল ভক্তিভরে মা জয়মঙ্গলচণ্ডীকে নমস্কার কল্লে। জয়দেব বৌ নিয়ে বাড়ী উঠ্‌লো,—বাসবদত্তের স্ত্রী বৌ বরণ করে ঘরে তুল্‌লেন। বৌএর গায়ে একখানি গয়না নাই দেখে—সকলেই বৌএর বাপ মায়ের বড় নিন্দে কর্ত্তে লাগ্‌লো। জয়াবতী কোন কথা না বলে চুপ করে রইলো। তার পর দিন, বৌভাত—বাসবদত্তের বাড়ী ঘটা, ধুম। হাজার হাজার লোক খাবে—উঠোনে বড় বড় মাছ এসে পড়েছে—তার ভেতর একটা প্রকাণ্ড বোয়াল মাছ ছিল—সেই মাছটা যেমন কাটা হয়েছে অমনি তার পেটের ভেতর থেকে জয়াবতীর সমস্ত গয়নাগুলো বেরিয়ে পড়লো। চারিদিকে হৈ হৈ পড়ে গেল—এ গয়না কার। তখন জয়দেব তার মাকে সকল কথা বলে বল্লে—এ গয়না জয়াবতীর—সেই নদীর জলে ফেলে দিয়েছিল। সকলেই বল্‌তে লাগ্‌লো জয়মঙ্গলচণ্ডীর কৃপায় তার হারান গয়নাগুলো ফিরে পেলে। কিন্তু জয়দেবের তবুও বিশ্বাস হ'লো না—সে আরও পরীক্ষা কর্ব্বে বলে মনে স্থির করে রাখ্‌লে।

শ্বশুর বাড়ী এসে জয়াবতী প্রতি জ্যৈষ্ঠ মাসে মা জয়মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত করে, কথা শোনে। চণ্ডীর কৃপায় তার কোন কষ্ট নেই। শ্বশুরের এক গুণ ছিল



সমস্ত গয়নাগুলো বেরিয়ে পড়লো।

দশ গুণ হয়েছে। সকলেই বলে বাসবদত্তের বৌয়ের আয় পয় ভাল। বৌ ঘরে আসবার পর থেকে বাসবদত্তের সংসার উথলে উঠেছে। এই ভাবে

আর বছর কতক কাট্‌বার পর জয়াবতীর একটী ছেলে হ'লো। ছেলেটীর বয়স যখন দশ মাস—তখন জয়দেবের একদিন মনে পড়্‌লো,—যে জয়াবতী তাকে বলেছে যে, সে যে ব্রত করে তাতে স্বামী পুত্তুর জলে ডোবে না—আগুণে পোড়ে না। ছেলে সত্যি পোড়ে কি না তার একবার পরীক্ষা কর্ত্তে হবে। জয়দেব ছেলেটীকে নিয়ে—ইটের পাঁজার ভেতর পুরে রেখে এলো,—আজই তো পাঁজায় আগুণ দেবে, তাইতেই বোঝা যাবে, ছেলে পোড়ে কি না। জয়দেব যা ভেবেছিল—হ'লোও তাই। যাদের ইটের পাঁজা তারা পাঁজায় আগুণ দিতে এলো—কিন্তু তারা কত রকম ভাবে চেষ্টা কল্লে—আগুণ আর কিছুতেই ধরে না। আগুণ ধরে না কেন—দেখবার জন্যে তখন তারা পাঁজার এদিক ওদিক দেখ্‌তে লাগ্‌ল—দেখ্‌তে দেখ্‌তে দেখে—পাঁজার ভেতর একটী ছেলে শুয়ে খেলা কচ্ছে। সবাই তখন তাড়াতাড়ি ছেলেটীকে বার করে আন্‌লে—কার ছেলে খোঁজ পড়ে গেল। কারুর আর জান্‌তে বাকি রইল না, এটী জয়াবতীর ছেলে। জয়দেব একেবারে অবাক হয়ে গেল। আর তার অবিশ্বাস রইল না। সকলেই জয় মঙ্গলচণ্ডীর ব্রতের ক্ষমতা দেখে ধন্য ধন্য কর্ত্তে লাগ্‌ল। সেই থেকে জয় মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত পৃথিবীতে প্রচার হয়ে পড়লো। ঘরে ঘরে সকলেই মা জয় মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত কর্ত্তে লাগল। জয়াবতী জয়দেব সুখে সচ্ছন্দে সংসার ধর্ম্ম করে। সওদাগর ও তার স্ত্রী বৌ বেটাকে সংসার বুঝিয়ে দিয়ে পুষ্পক রথে করে স্বর্গে চ'লে গেল।

জয় মা মঙ্গলচণ্ডী জয় জয় জয়।
হাতের নোয়া হাতে যেন হয় মাগো ক্ষয়॥

শ্রীযতীন্দ্রনাথ পাল।

বিজ্ঞানের চুট্‌কী।

অসিদ্ধ চাউল।

বাংলা দেশের ছেলেমেয়ে তোমরা—আজ যদি তোমাদের কাছে আমি ভাত রাঁধা সম্বন্ধে কোনও লেক্‌চার ঝাড়িতে যাই, তাহা হইলে তোমরা যে আমার এ বেয়াদবী সহজে মাপ করিবে না তাহা আমি বেশ বুঝিতেছি—তাই বেশী কথা লিখিতে ভয় হইতেছে। কিন্তু মা ভৈঃ! আমি পুরাণো কথা বেশী বলিব না;—সুতরাং চটিও না।

গন্‌গনে আগুনের জ্বালে উনুনের উপর ভাতের হাঁড়িটীতে জল আর কাঁচা চাউল দিয়া চড়াইয়া দিলে যে কেমন করিয়া ঘণ্টাখানেক বাদে ফুটফুটে ভাতের আবির্ভাব হয় সে তো তোমরা জন্মাবধিই দেখিয়া আসিতেছ; কিন্তু এমন স্থানের কথা কি তোমরা কখনও শুনিয়াছ যেখানে উনুনে আগুন ধরাইয়া চাল চড়াইয়া দেওয়া হইলে গন্‌গনে আগুনের জ্বালে হাঁড়ির জল টগবগ করিয়া ফুটিতে লাগিল—তাহার পর এক ঘণ্টা দুই ঘণ্টা করিয়া সমস্ত দিন গেল। কিন্তু ভাত হইবার নামটী নাই--চাউলগুলি আগে যেমন ছিল তখনও তেমনি পড়িয়া রহিল ?

কি বলিলে ?—এমন স্থান থাকিতে পারে না ? না, তা নয়। এমন স্থান সত্যই আছে। কোথায়, জিজ্ঞাসা করিতেছ ? তোমরাই বল না কোথায়! পারিলে না;—আচ্ছা তবে আমিই বলিতেছি।

তোমরা নিশ্চয়ই হিমালয় পর্ব্বতের নাম শুনিয়াছ। সেই হিমালয়ের চূড়ায় ভাত রাঁধিতে গেলে এই অবস্থাই হয়। শুধু হিমালয় কেন, খুব উঁচু যে কোন পাহাড়ের চূড়ার সম্বন্ধেই এ কথা খাটে।

মনে কর, তুমি রাত্রে বিছানায় শুইয়া ঘুমাইতেছ। এখন তুমি কিনা ভারী লক্ষ্মী ছেলে ;—তাই কৈলাস পর্ব্বতের চূড়ায় বসিয়া মহাদেব তাঁর ভৃত্য নন্দী আর ভৃঙ্গীকে হুকুম করিলেন যে তাহারা যেন তখনই তোমাদের বাড়ীতে হাজির হয়। আর সেখান হইতে যেন তোমাকে, তোমার মাকে, বাবাকে আর তোমার ছোট ভাই বোন সবাইকে একেবারে সশরীরে শিবলোকে (অর্থাৎ কৈলাস পর্ব্বতের চূড়ায়) লইয়া আইসে।

মহাদেবের হুকুম পাইয়া নন্দী আর ভৃঙ্গী তোমাদের বাড়ীতে আসিয়া দেখিল, তোমরা সবাই ঘুমাইতেছ। তাহারা তখন তোমাদের কাহাকেও না জাগাইয়া একেবারে তোমাদের বাড়ী শুদ্ধ কাঁধে করিয়া কৈলাস পর্ব্বতের চূড়ায় যাইয়া নামাইয়া দিল। তোমরা ঘুমের ঘোরে কিছুই টের পাইলে না।

তার পরদিন সকালে উঠিয়া নূতন জায়গা দেখিয়া তোমরা তো অবাক্। এখন তোমার তো তখন খুবই ক্ষুধার জোর। তোমার মা তো যাইয়া সাত তাড়াতাড়ি ভাত চড়াইলেন,—তোমার খাবার জন্য। কিন্তু ভাত আর হয় না—যতই জ্বাল দেন—চাল আর কিছুতেই সিদ্ধ হয় না। তোমার মার সমস্ত দিনের পরিশ্রমই সার হইল—সমস্ত দিন তোমাদের কারুরই কিছু খাওয়া হ'ল না—তুমি তো সারাদিন কেঁদে ককিয়ে সারা হলে। কি ?—তুমি কাঁদবে না ? বটে আর কি !—তেমনই শান্ত ছেলে কিনা তুমি !

যাহোক, সমস্ত দিনের পর তোমার কান্নার শব্দ মহাদেবের কানে যেয়ে পৌঁছুলো। এখন মহাদেব কিনা তোমায় খুব ভালবাসেন--তাই তিনি খানিকটা অমৃত পাঠিয়ে দিয়ে তোমাদের ক্ষুধা মিঠালেন। কিন্তু পাছে রোজ তোমাদের অমৃতের ভাগ দিতে হয়, সেই ভয়ে মহাদেব কল্লেন কি—না,—রাত্রে যেই তোমরা সব ঘুমিয়েছ, অমনি নন্দী ভৃঙ্গীকে বল্লেন, "য়া, এদের এখনি পৃথিবীতে

রেখে আয় ;—আর এরপর মাঝে মাঝে দেখে আস্‌বি, এরা ভাত রাঁধবার কোন ব্যবস্থা কর্ত্তে পেরেছে কিনা।—যদি কোন দিন পারে তবে সেইদিন আবার সবাইকে সশরীরে শিবলোকে নিয়ে আস্‌বি ; নইলে খবরদার!—বুঝলি ?”

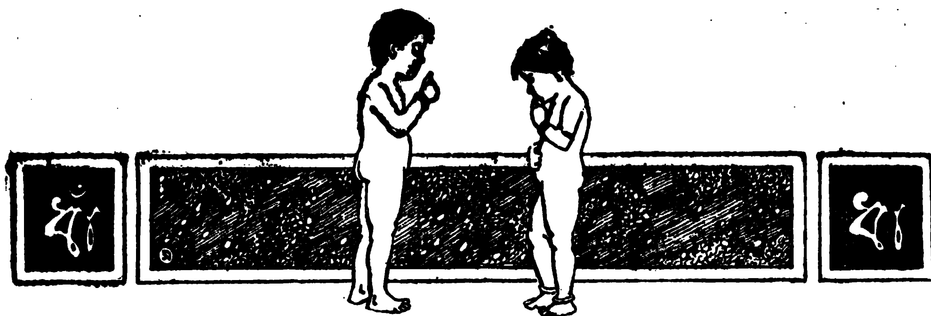
তার পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখ যে তোমরা যেখানে ছিলে সেইখানেই আছ—আর তুমি মনে করলে যে রাত্রে বুঝি একটা স্বপ্ন দেখেছ।

এই ভাত রান্নার গল্পটা নিশ্চয়ই তোমার নিকট খুব আজগুবী মনে হইল। কিন্তু সত্য সত্যই সেই হিমালয়ের চূড়ার উপর, এক ঘণ্টা দুই ঘণ্টা কেন—সারা জীবন ধরিয়া প্রতীক্ষা করিলেও তোমার মা সেই কয়টী চাউল সিদ্ধ করিয়া ভাত রাঁধিতে পারিতেন না।

তুমি জিজ্ঞাসা করিবে কেমন করিয়া ইহা সম্ভব ? আমি বলিব বড় হইয়া বিজ্ঞান পাঠ কর, তখন ইহা জলের মত সহজে বুঝিবে। এখন শুধু এইটুকু বলিয়া রাখি যে, খুব উঁচু জায়গায় হাওয়ার চাপ খুব কম ;—আর হাওয়ার চাপ কম হইলে, ফুটন্ত জল খুব বেশী গরম হয় না। তাই খুব উঁচু জায়গায় ফুটন্ত জলও যেমন খুব গরম হয় না,—সেই ঠাণ্ডা জলে চাউলও তেমনি সিদ্ধ হয় না।

এতো গেল বিজ্ঞানের কথা। এখন ভাবনার কথা হইতেছে এই যে, কৈলাস পর্ব্বতের উপর নন্দী ভৃঙ্গী কেমন করিয়া ভাত রাঁধে! সে বিষয়ে তোমরা কেউ আমাদিগকে কোন সন্ধান দিতে পার ?

শ্রীকালীপ্রসাদ ঘোষ।



নূতন ধাঁধা।

১। জিনিষটার ইংরেজী যে নাম, বাংলাতেও আমরা তাই বলি। প্রায় মানেও এক। তবে ইংরেজীতে যখন বলা হয় তখন সে জিনিষটা ভীষণ, ভয়ে বুক দুড় দুড় করে; আর বাংলায় যখন, তখন একটা কচি ছেলেও তা'কে ধরতে পারে; ঘরে ঘরে থাকে, পথ দেখায়, অন্ধকারেই তার কাজ, অথচ সে অন্ধকার নয়, বরং অন্ধকারের গলা টিপে মারে।

২। এমন একটা তিন অক্ষরের জিনিষের নাম কর, যাহাকে প্রায়ই সর্ব্বত্র দেখা যায়; মাঠে ঘাটে, পথে তার বাস। যার প্রথমাক্ষর ত্যাগ করিলে রমণীর অঙ্গভূষণ হয় আর মধ্যাক্ষর ত্যাগে জল বুঝায়। জিনিষটার আরও এক নাম আছে সে'টিও তিন অক্ষরের।

—"পুষ্প"

৩। এমন একটা কথা বল—দুই অক্ষরের—যাহার মানে দুইটী। একটা ভীষণ, একটা দ্বিপদ। আবার কথাটাকে উল্টাইলে একটা সুন্দর ফুল হয়।

শ্রীমতী সাবিত্রী দেবী।

ধাঁধার উত্তর।

১। ধূম। ২। মণি ৩। নলিন ৪। জীবাণু।

যাঁহারা বৈশাখ মাসের চারিটি ধাঁধার উত্তর দিয়াছেন, তাঁহাদের নাম :—

শ্রীমতী ইন্দিরা দত্ত, ঢাকা ; অমিয় সিন্ধু রায়; পাটনা ; ছাত্রবৃন্দ, বীনাপাণি লাইব্রেরী, শিলঙ ; রবীন্দ্রকুমার বসাক, কলিকাতা ; কুমারী হাসিরাণী মিত্র, কলিকাতা ; জ্ঞানশরণ রায়, পাবনা ; বিভূতিভূষণ মিত্র, বর্দ্ধমান ; রবীন্দ্রনাথ দত্ত, কলিকাতা ; জীবন চক্রবর্ত্তী, চট্টগ্রাম।

যাঁহারা তিনটির উত্তর দিয়াছেন :—

কুমারী হেনারাণী ঘোষ, কলিকাতা ; বীরেন্দ্রনাথ রায়, বেহালা ; কুমারী পুষ্পলতা বসু, গিরিধি ; সুধীন্দ্রনাথ রায়, বেহালা ; সন্তোষকুমার রায়, সিদ্ধান্ত বাঘমারা ; কুমারী মীনারাণী সেন, বিহার ; অজীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গৌহাটি ; চন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায়, সুরিয়া ; সীতালাল, সীতামারী ; সুশীলামণি ঘোষ, মধুচন্দ্রকুটীর, চন্দননগর ; সুধীন্দ্রকুমার বসাক, কলিকাতা ; মনোময়, টিটাগোড় ; শৌরিন্দ্রনাথ সরকার, মধুপুর ; বিনয়েন্দ্র নারায়ণ সিংহ, ভাগলপুর ; সিদ্ধেশ্বর সাহা, নেত্রকোনা ; বেলা ঘোষ, দেওঘর ; সুধাংশুশেখর গুপ্ত; ওয়ারী ;

যাঁহারা দুইটি ধাঁধার উত্তর দিতে পারিয়াছেন :—

চম্পাবতী সেন ; বাউলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কালনা ; সুব্রত সেন, রঘুনাথগঞ্জ ; কাননচন্দ্র বসু; ভবানীপুর ; সলিলচন্দ্র সেন, সাতক্ষীরা ; গোপীমোহন ঠাকুর, শক্তিপুর ; নলিনীপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়, লাহোর ; সৌরীন্দ্রমোহন ঘোষ, পুরুলিয়া ; শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়, ইন্দোর ; কুমারী কল্যাণী দেবী, খুলনা ; সুধীরচন্দ্র সেন, কলিকাতা ; সাবিত্রী দেবী, বলিহার ; শান্তিদাস সিংহ, কলিকাতা ; বিধুভূষণ পাল, সিরাজগঞ্জ ; শচীন্দ্রকুমার বসাক, কলিকাতা ;

যাঁহারা কেবলমাত্র একটি ধাঁধার উত্তর দিতে পারিয়াছেন :—

কুমারী কনকলতা সেন, কলিকাতা ; খগেন্দ্র নারায়ণ ঘোষ, হাওড়া ; মোহাঃ লসের আলি সিকদার, ধাইদা ; প্রফুল্লকুমার বিশ্বাস, গোয়াড়ী ; অমলচন্দ্র সেন, কলিকাতা।

খদ্দরের পোষাক।

(এক মিনিটের গল্প।)

এক বড়লোক আত্মীয়ের বাড়ী নিমন্ত্রণ, দরজায় গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে, বাড়ীর সব ছেলেমেয়ে সেজে গুজে ফিট্ ফাট্ হ'য়ে দাঁড়িয়ে, কেবল নিতুর দেখা নেই। নিতুর দুই দাদা, আর ছোট বোন্ মিনি বলাবলি করছে, সে কক্‌খনো যাবে না। জামা নেই, কাপড় নেই, এমন ধারা চাদর নেই, সে যাবে না, কোথায় পালিয়েছে। এমন সময় নিতু এসে হাজির! তার ভাই বোনেরা বল্লে—তুই বুঝি যাবি নে, নিতু? আর যাবিই বা কি করে' বল্! তোর ত শুধু খদ্দর—মদ্দর! সে পরে' কি আর কেউ নেমন্তন্ন যায়?

নিতু একটু খানি হেসে বল্লে—বটে! আচ্ছা, তোরা দাঁড়া, আমি আস্‌ছি।—তার বগলে একটা কাগজে মোড়া পুঁট্‌লী। সেইটার ফিতা খুলতে খুলতে নিতাই ঘরে ঢুকে গেল। ক মিনিট পরে নিতু যখন বাইরে এসে দাঁড়াল, তখন সবাই অবাক্! এ কি! নিতু এমন কাপড়, এমন জামা, এমন চাদর পেলে কোথায়?

নিতুর বড় ভাই ঠাট্টা করে বল্লে—কেমন? খদ্দর ছাড়তে হয়েছে ত?

নিতু গম্ভীর ভাবে মাথা নেড়ে বল্লে—ছাড়ব কেন মশাই? এ-টা কি—খদ্দর যে!—"খদ্দর?"

হ্যাঁ গো! কমলালয়ের তৈরী! এই যে কাজ দেখছ—এও দিশী সূতার খদ্দরের উপরে তোলা! কাপড়, জামা, চাদর—সব!

নিতুর মা বল্লেন, তাইত নিতু! তোকেই যে সবারচেয়ে ভালো দেখাচ্ছে বাবা!

নিতুর দাদা বল্লে—মা, তোমরা একটু দাঁড়াও। আমি এখনি আস্‌ছি। আজ থেকে আমিও এ সিল্ক টিল্ক পরব না, স্বদেশী যখন এমন জিনিষ পাওয়া যায়………নিতু **কমলালয়** কোথা রে?

ঐ যে দাদা, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটের নীচে! মস্ত বড় প্লাকার্ড টাঙ্গানো।

নিতুর দাদা গাড়ী চড়িয়া সেই দিকে চলিয়া গেল।

জড়োয়া।

(গল্প)

প্রীতিবালার ভাবনার অন্ত নেই! হঠাৎ তাঁর মেয়েটির বিবাহ স্থির! স্বামী বিদেশ হইতে যেদিন পৌঁছিবেন, পরদিনই সুমন্তির বিবাহ। তিনি টাকা কড়ি পাঠাইয়াছেন, প্রীতি যেন দেবরটিকে সঙ্গে লইয়া জড়োয়া গহনা টহনা পছন্দ করে কিনে ফেলেন! তিনি ত বলিয়া খালাস, প্রীতির যে সাহস হয় না, দেবরটি ছেলেমানুষ, আর তিনি স্ত্রীলোক!—প্রীতি জানালার ধারে বসিয়া গালে হাত দিয়ে ভাবিতেছেন।

দেবর সুবিনয় ঘরে ঢুকিয়া বলিল—হ'য়েছে বৌ-দি হ'য়েছে! সব দেখে শুনে এসেছি—গাড়ী ডেকে এনেছি—চল। **ঠাকুরলাল হীরালালের** দোকানে সব পাবে! আর কি বল্‌ব বৌ-দি, কি সুন্দর কাজ! কত বড় বড় লোকের মেয়েরা যে এসে সব কিনে নিয়ে যাচ্ছেন—কি বলব! প্রথম প্রথম যখন কিছুই জানতুম না তখন হারে মুক্ত কিনতে যেয়ে কত যে ঠকিয়েছে—কিন্তু এরা আমাকে একটি পয়সাও ঠকায়নি—তাই না তাদের দোকান এত বড় হয়েছে—তাই না কলকাতার সকলের মুখে মুখে এদের কথা।

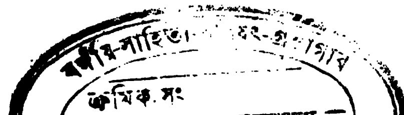
প্রীতির একটা মস্ত দুর্ভাবনা কাটিয়া গেল। তিনি তখনই ১২ নং লালবাজার ষ্ট্রীটে উপস্থিত হইয়া সমস্ত কিনিয়া ফেলিলেন।

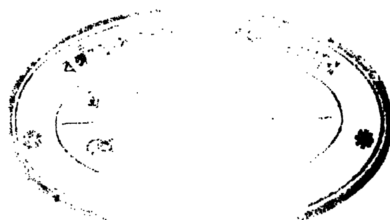
প্রীতির স্বামী আসিয়া, শুনিয়া বলিলেন—আমি ভেবেই সারা, তোমরা কতদূর কি করলে! দেখে ভারি খুসী হ'য়েছি, কিন্তু!

বলিয়া সকলের অসাক্ষাতে প্রীতির গণ্ডে 'খুসীর চিহ্ন' পরিয়ে দিলেন।

প্রকাশক—শ্রীশিশিরকুমার মিত্র বি, এ।
শিশিরপাব্লিশিং হাউস, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

প্রিন্টার—শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।
বিদ্যোদয় প্রেস, ৮।২ কাশী ঘোষ লেন, কলিকাতা







তুলসীতলায়।

Lakshmibilas Press.



২য় বর্ষ,৬ষ্ঠ সংখ্যা।

আষাঢ়, ১৩২৯।

তুলসীতলায়

সাঁঝের বেলায় তুলসী তলায় দাঁড়িয়ে পল্লি রাণী।
ভক্তি ভরে প্রণাম করে দুলিয়ে আঁচল খানি॥
সাড়ী পরা পুণ্যে ভরা দুল্‌ছে দেহলতা;
আপন মনে তুলসী সনে কইছে প্রাণের কথা॥
আনন মাখা লজ্জা আঁকা বাঙ্গালা দেশের বধূ
আগাগোড়া মিষ্টি যে তার হৃদয় ভরা মধু॥



বিজ্ঞানের চুটকী

(২)

সিরাপ ও এসেন্স।

ভরা গরমের সময় যখন রৌদ্রের কড়া ঝাঁজে পৃথিবী কাঠ ফাটার ন্যায় ফাটিতে থাকে—বাতাস আগুনের হলকার ন্যায় মনে হয়, ঘরের মধ্যে বসিয়াও প্রাণ গরমে আই ঢাই করিতে থাকে ;—সেই সময় তো তোমরা বোতল বোতল সিরাপের শ্রাদ্ধ করিতে থাক। আর তাহাও কি এক রকম?—কোনটা বা লিমন সিরাপ (নেবুর মতন খাইতে আস্বাদ); কোনটা বা রোজ সিরাপ (গোলাপের মত গন্ধ) কলার সিরাপ আরও যে কত রকম আছে তার সব নামও জানি না।

কিন্তু তোমরা কি বলিতে পার, এই সব সিরাপের এমন সব গন্ধই বা হইল কি প্রকারে? আর সেগুলি অমন মিষ্টই বা হইল কেমন করিয়া?

কি বলিলে?—চিনি গুলিয়া মিষ্টি করিয়াছে! আর গোলাপ জল মিশাইয়া রোজ্ সিরাপ করিয়াছে, লেবু বা কলার আরক মিশাইতে লিমন্, বা কলার সিরাপ হইয়াছে?

এককালে তাই হইত বটে; কিন্তু এখন আর সে প্রকারে সিরাপ তৈয়ারী হয় না—এখন যাহা হইতে ইহা তৈয়ার হয় তাহার নাম—আলকাৎরা।

কি? ভারি আশ্চর্য্য হইলে যে!

শুধু সিরাপ নয়;—নানা রকমের রং প্রভৃতি আরও অনেক জিনিষ এই আলকাৎরা হইতে তৈয়ার হয়।

এই যে এসেন্স,—যাহা বাবুরা সুগন্ধের জন্য যতটা না হোক বাবুয়ানীর জন্য সর্ব্বাঙ্গে মাখেন;—রুমালে, জামায়, এমন কি গোঁফ জোড়াটা পর্য্যন্ত বাদ যায় না—সেই এসেন্সের জন্মও ঐ আলকাৎরা হইতে।

কেমন করিয়া? সে কথা বড় হইয়া বিজ্ঞান পড়িলেই তোমরা জানিতে পারিবে।

শ্রীকালীপ্রসাদ ঘোষ।

———

শিবপূজা

শিব শিব শিব শিব ঠাকুর কৈলাসেতে বাস।
অন্নপূর্ণা গৌরীরূপে থাকেন যাঁহার পাশ ॥
জটা দোলে সাপ দোলে কপালেতে চাঁদ।
যে তোমারে ভাবে ঠাকুর পোরাও তারি সাধ ॥
বিল্বদলে তুষ্ট তুমি ভোলা মহেশ্বর।
স্বামী পুত্র অমর কর সোণার কর ঘর ॥



শিবপূজা।

Lakshmibilas Press.



শিল্পকলা চিত্রে ও গল্পে ঃ

টিসিয়ন

সম্রাট পঞ্চম চার্লসের মত অহঙ্কারী লোক সে সময় খুব কমই ছিল। সম্রাট সে দিন সভাসদ পরিবেষ্টিত হইয়া বসিয়া আছেন। রাজ্যের যাঁহারা প্রধান সকলেই সেখানে উপস্থিত ছিল। সকলেই সম্রাটের গুণগান করিত। সম্রাট যদি বারেকের তরেও কাহারও দিকে কৃপাদৃষ্টি করিতেন তখনই সে যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইত—এমনি তাহাদের মনের অবস্থা।

ধীরে ধীরে সেই সভায় আসিলেন, একজন চিত্রকর। না ছিল তাঁহার পিতার অতুল ঐশ্বর্য্য, না ছিল তাঁহার নিজের যুদ্ধ বিগ্রহ করিবার ক্ষমতা, চিরকালটাই তিনি তুলি ও রঙ লইয়া কাটাইয়া দিয়াছেন। হোমরা চোমরা বিজ্ঞলোকেরা তাঁহার দিকে একটা তাচ্ছিল্যের দৃষ্টি লইয়া চাহিল। কোথাকার কে একজন চিত্রকর আসিয়াছে—এত বড় রাজসভায়!

চিত্রকর কাহারও দিকে ফিরিয়াও তাকাইল না—সম্রাট যেখানে উচ্চ সিংহাসনে বসিয়াছিলেন বরাবর সেইখানে যাইয়া হাজির। সম্রাট সসম্ভ্রমে সিংহাসন ছাড়িয়া উঠিলেন, পাত্র মিত্র, সভাসদগণ সকলকে উপেক্ষা করিয়া সেই সামান্য চিত্রকরকে রাজরাজেশ্বর সম্রাট যে সম্মান—যেরূপ খাতির করিলেন তাহাতে ঈর্ষায় পারিষদগণের মুখ চোখ যেন ফাটিয়া পড়িতে লাগিল।

সম্রাটের সহিত কথা কহিতে কহিতে চিত্রকরের পেন্সিলটি মাটিতে পড়িয়া গেল। সভাসদেরা কিন্তু সেদিকে দৃকপাতও করিল না। কেনই বা করিবে? একজন সামান্য চিত্রকর বইত নয়। কিন্তু সকলেই আশ্চার্য্য হইয়া গেল যখন রাজরাজেশ্বর সম্রাট স্বয়ং সেই পেন্সিলটি তুলিয়া চিত্রকরের হাতে দিলেন। সভাস্থ লোক অবাক হইয়া সম্রাটের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

সম্রাট তাঁহার পারিষদগণের এই ঈর্ষা ও দ্বেষের ভাব যে লক্ষ্য না করিয়াছিলেন তাহা নহে। একদিন তিনি সভাস্থ লোককে ডাকিয়া বলিলেন—"দেখুন, আমার সভায় সম্ভ্রান্ত লোকের কিছুমাত্র অভাব নাই, কিন্তু টিসিয়ন আমার সভায় মাত্র একজনই আছেন।"

ইনিই জগৎবিখ্যাত চিত্রকর টিসিয়ান।

সেদিন স্পেনের রাজপ্রাসাদে আগুন লাগিয়া গিয়াছিল। কত অগণিত মণি, মাণিক্য, ধন, দৌলত সে প্রাসাদে ছিল—সব পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। কিন্তু রাজার মন তাহাতে এতটুকু বিচলিত হইল না। তিনি সব চিন্তা ছাড়িয়া আগে বলিয়া উঠিলেন, "টিসিয়নের ভেনাস চিত্রখানিও কি গিয়াছে ?" যখন জানিলেন সেই চিত্রখানি কোন প্রকারে বাঁচিয়া গিয়াছে তখন রাজা আনন্দে আত্মহারা হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "তাহা হইলে আর আমার কোন দুঃখ নাই।"

বিদ্যার এমনই গৌরব।

জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিত্রকর কে ? কেহ বলেন র‍্যাফেল, কেহ বলেন টিসিয়ান। উভয়েই অতুলনীয়, উভয়েই শ্রেষ্ঠ। তবে ছবিতে রঙ ফলাইতে টিসিয়ান অদ্বিতীয় ছিলেন—এমনটি আর কেহ পারিত না। ছোট বড় কত চিত্রকর ছবিতে রঙ ফলাইতে চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু তাঁহাদের রঙ ক্রমশঃ ফ্যাকাসে হইয়া গিয়াছে। টিসিয়ানের ছবির বিশেষত্বই এই—যত দিন যায় তাঁহার ছবির রঙের জৌলস যেন তত ফুটিয়া উঠে। রঙের একটি আঁচড়ও তিনি খেয়ালের বশে দিতেন না—প্রত্যেকটিরই যুক্তি ও অর্থ অতি সাধারণ লোকের নিকটও স্পষ্ট হইয়া উঠে। এই জন্যই লোকে বলে টিসিয়ানের মত রঙ ফলাইতে আজ পর্য্যন্ত কেহ পারেন নাই। তিনি একজন জগতের শ্রেষ্ঠ চিত্রকর।

চিত্র

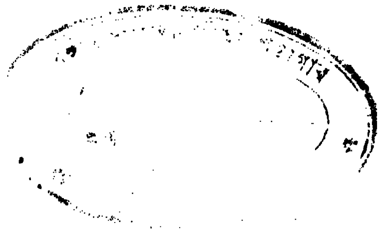
ও

চিত্র পরিচয়

ভিসিয়ান।



টিসিয়ান সামনে আয়না ধরিয়া নিজের ছবি নিজে আঁকিয়াছেন

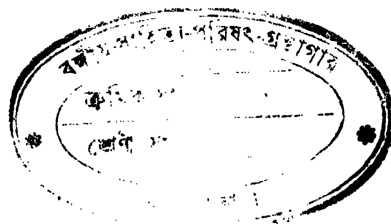


জন-দি ব্যাপটিষ্ট একজন সাধু প্রকৃতির লোক—তখনকার দিনে জেরুজেলাম নগরে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিয়া বেড়াইতেন। জেরুজেলামের রাজা ছিল তখন হেরড। এই হেরডের সভায় একদিন একটা বিরাট ভোজ উপলক্ষে হেরড স্যালম নাম্নী এক নর্ত্তকীকে তার সভায় নাচিবার জন্যে আদেশ দিলেন। স্যালম সেদিন এমনি চমৎকার নাচিল যে সভাসুদ্ধ লোক ত একেবারে অবাক। রাজা ত মহাখুসী, তিনি স্যালমকে ডাকিয়া বলিলেন, "তুমি যা চাইবে তাই দেবো—তোমার নাচে আমি ভারী খুসী হইয়াছি। স্যালম তার মাকে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি চাইবো মা?" এই স্যালমের মা ছিলেন জনের একজন প্রধান শত্রু। তাই মা বলিলেন, "জনের ছিন্নমুণ্ড চাই।"

রাজা যা একবার মুখ থেকে খসিয়েছেন তার ত আর নড়চড় হবার জো নেই। কাজেই জন বেচারার মুণ্ডটি শুধু শুধু নিছক কাটা গেল। এই যে ছবিখানি এ হইতেছে সেই সময়কার, যখন জনের মুণ্ড আনিয়া স্যালমের হাতে দেওয়া হইয়াছে। দেখ চিত্রকর কি চমৎকার করিয়া স্যালমের মনের ভাবটি মুখে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। সে জনের মুণ্ড চাহিয়াছিল বটে কিন্তু যখন সেই মুণ্ড আসিয়া তার হাতে পড়িল তখন সে ভাল করিয়া তার দিকে তাকাইতেই পারিল না—হাজার হোক্ পাপ কাজের জন্যে যে ভীরুতা স্বভাবতঃ মানুষের মনে আসে তা থেকে রেহাই কি কেউ পেতে পারে?—সে যে আসবেই।

এই মেয়েটি মনে মনে জানিত জন কত বড় ধাম্মিক মহাপুরুষ। তাই পশুভাব যাইয়া ক্ষণেকের তরে তাহার মন শ্রদ্ধায় ভরপুর হইয়া উঠিয়াছিল। স্যালমের মুখ চোখে ঠিক সেই ভাবটিই ফুটিয়া উঠিয়াছে।

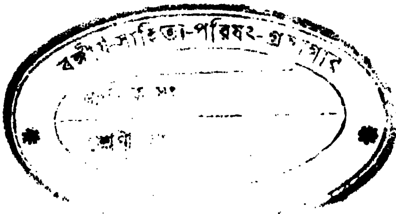
যে জনের ছিন্নমুণ্ড লইয়া আসিয়াছিল সে ত এই দৃশ্য দেখিয়া অবাক্।



র‍্যাফেল যেমন মার মূর্ত্তি আঁকিয়া অমর হইয়া গিয়াছেন, টিসিয়নও তেমনি ভাল কয়েকখানি মাতৃমূর্ত্তি আঁকিয়াছেন। ছেলে কোলে করিলে মার সারা অঙ্গে, চোখে, মুখে কি সুন্দর স্বর্গীয় মহান্ ভাব ফুটিয়া উঠে শিল্পী ছবিখানিতে তাহাই দেখাইয়াছেন।

এই ছবিখানিতে যিশু এবং যিশুমাতা-মেরীর চেহারা দেওয়া হইয়াছে। দেখ, চিত্রকর কি চমৎকার মেরীর মুখখানি আঁকিয়াছেন। ছেলেকে বুকের কাছে ধরিতে যিশুমাতার চোখ দুটিতে কেমন পবিত্র ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে ;— মা যেন সন্তান স্নেহে বিভোর হইয়া গিয়াছেন।





এই ছবিখানিতে দেখান হইয়াছে কি নিষ্ঠুর ভাবেই তখনকার দিনের লোকেরা যিশুকে নির্য্যাতন করিতেছে। যাহারা নির্য্যাতন করিতেছিল তাহাদের চোখে মুখে পশুভাব জাগিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু যিশুর মুখ তেমনি শান্ত, স্থির। তাঁহার দেহের কষ্ট যে না হইতেছিল তা নয়, সে কষ্টের ভাব তাহার মুখে চোখে ফুটিয়া উঠিয়াছিল—কিন্তু সে কষ্ট তাহার সঙ্কল্পকে বিচলিত করিতে পারে নাই। তাঁহার মুখে সেই দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ভাব। আর যে ভাবটি ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা হইল গভীর অনুকম্পা—যিশু যেন তাহার নির্য্যাতন-কারীদের বলিতেছেন, "আমাকে যত ইচ্ছা মার, আমার তাহাতে দুঃখ নাই—কিন্তু ঈশ্বর তোমাদের দয়া করুন।"





কি নিদারুণ শোকের ছবি এখানি একবার দেখ। যিশুকে কবরস্থ করিবার সময়কার নীরব এবং করুণ সুরটি কি চমৎকার করিয়াই ফোটান হয়েছে। কোন চাঞ্চল্য নেই—চেঁচামেচি নেই—সবই যেন গম্ভীর, সংযত! মহাপুরুষের মৃত্যু শোক আনে বটে কিন্তু সে শোকে চাঞ্চল্য থাকে না—চেঁচামেচি থাকে না—হা হুতাস থাকে না। যাহারা কবর দিতে আসিয়াছে তাহাদের মুখের ভাব—কি প্রশান্ত, কি করুণ, পবিত্র।



লেডি ম্যাগডেলিন ছিলেন যিশুখৃষ্টের একজন সেরা ভক্ত। খৃষ্টের মহাপ্রস্থানের পর লেডি ম্যাগডেলিন একদিন গুরুদেবের গোরের কাছে আসিয়া দেখেন গুরুদেবের গোর খালি পড়িয়া রহিয়াছে, শবের কোন চিহ্ন নাই। ম্যাগডেলিন ভাবিলেন, নিশ্চয়ই শত্রু পক্ষের কোন লোক এই কাজ করিয়াছে। শোকে, দুঃখে, নিরাশায় একেবারে অভিভূত হইয়া ম্যাগডেলিন গোরস্থানের বাগান হইতে যখন ফিরিতেছেন সেই সময় হঠাৎ এক স্বর্গীয় মুর্ত্তি আসিয়া তাঁর সামনে দাঁড়াইয়া বলিয়া উঠিল, "ম্যাগডেলিন কেঁদো না, দেখছ না এই যে আমি তোমার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে।" ম্যাগডেলিন আনন্দে আত্মহারা হইয়া সেই মুর্ত্তির পা জড়াইয়া ধরিবার জন্য আকুল হইয়া হাত বাড়াইতে ছিলেন,—মূর্ত্তি অমৃতময় কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "ছুঁয়ো না আমাকে ম্যাগডেলিন! আজও আমি আমার পিতার সঙ্গে মিলিত হ'তে পারি নি। তুমি যাও ম্যাগডেলিন, ভায়েদের এই কথা বল-গে যে আমি তোমার আমার পিতার কাছে যাচ্ছি। আমার ঈশ্বরের, তোমার ঈশ্বরের কাছে যাচ্ছি!" এই ছবিখানিতে ঠিক সেই সময়কার ঘটনাটি ফোটান হইয়াছে।

Engraved & Printed by—Lakshmibilas Color Studio.

গৌরচন্দ্র

বড় লোকের ছেলে গৌর গাড়ী ঘোড়া চড়ে,
চক্‌চকে তার বইগুলি সব, স্কুলেতে পড়ে।
লম্বা লম্বা কথা মুখে ভারি তেজ তার ;
কাজে কথায় সবার বড় মানে নাকো হার।

কথায় কথায় বলে গৌর আমি ভারি রোকা
একটী কথায় মাষ্টারদের বানিয়ে দিই বোকা।
সমপাঠী সবাই বলে এ কথাটা খাঁটি,
মাষ্টারদের সাধ্যি নেই লাগায় তাকে চাঁটি।

এইভাবেতে গৌরচন্দ্র স্কুলেতে যায়,
চিম্‌টী কাটে ঠেলা মারে সাম্‌নে যাকে পায়।
সেভেন ক্লাসে পড়ে অনু ভারি লক্ষ্মী ছেলে,
পিছন থেকে একদিন গৌর দিলে তাকে ঠেলে।

ঠেলা খেয়ে পড়লো অনু বেরুলো চোখে জল,
চারিদিকেতে ছেলেরা সব হাসে খল্ খল্।
দৈবক্রমে হেডমাষ্টার দেখেন উপর থেকে,
বেহারাকে বলেন—আন্ গৌরকে ডেকে।

বেহারার মুখে খবর পেয়ে বুক টিপটিপ করে,
কাঁপতে কাঁপতে গৌরচন্দ্র ঢুকলো আফিস ঘরে।
রেগে মেগে হেডমাষ্টার ছিলেন হয়ে লাল,
যেমনি গৌর ঘরে ঢোকে অমনি ছোটান গাল।



ভ্যাঁ করে' গৌরচন্দ্র—

বলেন পাজি হতচ্ছাড়া কান ছুটি না ধরে,
সঙ্গে সঙ্গে বেতের বাড়ী লাগান আচ্ছা ক'রে।
ভ্যাঁ করে গৌরচন্দ্র ধরলে বিকট স্থর,
হেডমাষ্টার বলেন ছুঁচো এখনি হ' দূর।

পড়লো ঘণ্টা ক্লাসে গেল মাষ্টারের দল।
আফিস থেকে বেরুলো গৌর মুখে চোখে জল
সঙ্গীরা সব দূরে ছিল কাছে ঘেঁসে যায়,
হেডমাষ্টার কি বল্লেন জানতে সবাই চায়।

গৌর বলে কি বলবো আমি সোজা নয়,
আমায় দেখে হেডমাষ্টার ভয়ে জুজু হয়।
পড়বো না আর এ স্কুলে বলে দিলুম সাফ,
হেডমাষ্টার বল্লে, বাবা এবার কর মাপ।

ছেড় নাকো স্কুল বাবা ধর্‌ছি তোমার পায়,
তুমি আমার লক্ষ্মী সোণা হাত বুলুবো গায়।
সঙ্গীরা সব বলে বাবা গৌর সোজা নয়,
যার ভয়েতে হেডমাষ্টার জুজু হয়ে রয়।



ছেড় নাকো স্কুল বাবা…

মিথ্যা নিয়ে নিজের বড়াই কত্তে যে জন চায়,
সংসারেতে সবাই যেন ঘৃণা করে তায় ॥

শ্রীযতীন্দ্রনাথ পাল।

রঙ্গ-রস।

পিতা (সক্রোধে) তোর যদি কিছুমাত্র বুদ্ধি থাকে! একটা জিনিষও কি বোঝবার ক্ষমতা ভগবান তোরে দেন-নি! আমরাও ত বাপু ছেলেবেলায় লেখাপড়া করেছি, এমন হাজার হাজার কথা জিজ্ঞেস্ ত কই করি নি।

পুত্র (সবিনয়ে) আজ্ঞে তা যদি কর্ত্তেন, আজ আমি সব কথারই জবাব পেতাম।

* * * * *

বন্ধু। তুমি বহি লিখে পয়সা রোজগার করছ বটে—কিন্তু তোমার বহি সাহিত্যে বেঁচে থাকবে বলে মনে হয় না।

গ্রন্থকার। হ'তে পারে। কিন্তু কথা হচ্ছে বেঁচে থাকা কার বেশী দরকার? আমার না আমার গ্রন্থের—তাই বল ত দেখি?

* * * * *

উকীল জিজ্ঞাসা করলেন মক্কেলকে—তুমি প্রতিবাদীকে হিসাব দেখিয়েছিলে?

মক্কেল বলিল—আজ্ঞে হাঁ।

উকীল জিজ্ঞাসিলেন—তারা কি বল্লে?

মক্কেল (দুঃখের সহিত) বল্লে—জাহান্নমে যাও।

উকীল। (হাসিয়া) তুমি তখন কি কর্‌লে?

মক্কেল (গম্ভীর ভাবে) আজ্ঞে তা'দের কথাই মান্য করলুম; আপনার কাছে এলুম।



সঙ্কট মঙ্গলবারের ব্রতকথা।

(বার মেসে)

(আষাঢ় মাস)

(বামনীর ছেলে)

এক দেশে এক বামনী ছিল, তার ছিল একটি ছেলে। বামনী অনেক দুঃখ কষ্ট করে তাঁর ছেলেটাকে মানুষ করেছিলেন। ছেলেটা বড় হলে বামনী ছেলের বিয়ে দিয়ে বৌ ঘরে আন্‌লেন। বৌটা যেমন গুণবতী, তেমনি রূপবতী। বৌটাকে ঘরে এনে বামনীর আর আনন্দ ধরে না; বৌটাকে সাজিয়ে পরিয়ে কিছুতেই আর তিনি তৃপ্তি পান না। এইভাবে বৌ-ব্যাটা নিয়ে বামনী মনের সুখে দিন কাটান। একদিন বামনীর ব্যাটা এসে বল্লে,—"মা— আমার আর এমন করে ঘরে বসে থাকা উচিত নয়। আমার এখন বয়স হয়েছে—একটা কাজ কর্ম্ম করা উচিত।

বামনী মনে ভাব্‌লেন—ছেলে যা বল্‌ছে কথা মিছে নয়। ছেলে সমর্থ হয়েছে—দু'দিন বাদে ছেলে পিলে হবে। পুরুষ ছেলে বসে থাক্‌বেই বা কেন? একটা কাজ কর্ম্ম করাই ভাল। ছেলের কথা শুনে বামনী বল্লেন

সেতো ভাল বাছা। ঘরে বৌ এনেছ—দু'দিন বাদে ছেলে পিলে হবে তুমি যা হয় একটী কাজ কর্ম্ম কর।"

বামনীর ব্যাটা মার আদেশ পেয়ে একটী কাজ কর্ম্মের চেষ্টা কর্ত্তে লাগ্‌ল। কিছুদিন চেষ্টার পরে এক সওদাগরের বাড়ীতে তার কাজ হ'লো। বামনী ছেলের কাজ হয়েছে শুনে ভারি সন্তুষ্ট হলেন। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই যখন বামনী শুন্‌লেন,—সওদাগর বাণিজ্য কর্ত্তে বিদেশ যাবেন, তাঁর ছেলেকে তাঁর সঙ্গে যেতে হবে—তখন তাঁর ভারি কষ্ট হ'লো। কিন্তু পুরুষ ছেলে তাকে তো ঘরে বসে থাক্‌তে বল্‌তে পারেন না। কাজেই ব্যাটাকে যাবার অনুমতি দিতে হ'লো। একটা ভাল দিন্ দেখে সওদাগর বানিজ্যে বের হলেন,—বামনীর ব্যাটাও মার পায়ের ধূলো মাথায় নিয়ে সওদাগরের সঙ্গে চলে গেলেন।

তারপর বছরের পর বছর চলে যেতে লাগ্‌ল। বামনীর ছেলের আর দেখা নেই। বামনী ছেলের জন্যে ভেবে ভেবে সারা হলেন—এখানে যান, সেখানে যান, সওদাগরের বাড়ীতে যান কিন্তু ছেলের কোনই খবর পান না। যাকে জিজ্ঞাসা করেন, সেই বলে—তোর ছেলে মারা গেছে—নইলে নিশ্চয়ই এতদিন ফিরে আস্‌তো। বামনী মনের দুঃখ মনে চেপে—আঁচলে চোখের জল মুছে দিন রাত ভগবান্‌কে ডাকেন আর বলেন, "হে ঠাকুর আমার ছেলেটীকে ফিরিয়ে এনে দাও।" এমনি করে আর পাঁচ বছর কেটে গেল। সেই সময় বামনীর এক প্রতিবাসিনী বামনীকে বল্লে,—"বামনি, তুই এক কাজ কর। তোর বৌকে দিয়ে সঙ্কট মঙ্গলবারের ব্রত করা। তাহ'লে মা ষষ্ঠীর আশীর্ব্বাদে নিশ্চয়ই তোর ছেলে বাড়ী ফিরে আস্‌বে।"

বামনী এই কথায় হাতে একেবারে স্বর্গ পেলেন। বল্লেন,—"মা সে ব্রত কেমন করে কর্ত্তে হয় তাতো আমি জানি না। সে ব্রত কেমন করে কর্ত্তে হয়

আমাকে বলে দাও—আমি অবিশ্যি সেই ব্রত আমার বৌকে দিয়ে করাব। মা চণ্ডীর আশীর্ব্বাদে সবই হয়—নিশ্চয়ই আমার ছেলে ফিরে আস্‌বে।”

সেই প্রতিবেশিনী বামনী সঙ্কট মঙ্গলবারের ব্রত কেমন কর্ত্তে হয় সমস্ত বলে দিয়ে বল্লে,—“কিন্তু ব্রত তো একলা হয় না। একটী সধবা মেয়ের সঙ্গে কর্ত্তে হয়। তা আমার বৌএর একটীও তো ছেলে পিলে হ’লো না। আমি ভাব্‌ছি তাকেও এই ব্রত করাবো। তা না হয় তারা দু’জনে মিলে এই ব্রত করুক।”

বামনী তখনই তাতে সম্মত হ’লেন ও বামনীর বৌ আর সেই প্রতিবেশিনীর বৌ দু’জন মিলে সঙ্কট মঙ্গলবারের ব্রত কর্ত্তে লাগ্‌লেন। প্রথম মঙ্গলবার গেল—দ্বিতীয় মঙ্গলবার গেল, তৃতীয় মঙ্গলবার গেল। শেষ মঙ্গলবার তাঁরা পায়ের ভিতর হাত চালিয়ে কুট্‌নো কুট্‌লেন—বাটনা বাট্‌লেন—রান্না কল্লেন। তারপর পূজো শেষ করে যখন তাঁরা পায়ের ভিতর হাত গলিয়ে খেতে বসেছেন সেই সময় বামনী ছুটে এসে খবর দিলেন,—তাঁর ছেলে এক নৌকা ধন নিয়ে বাড়ী ফিরে এসেছেন। এই কথা শুনে বৌ তাড়াতাড়ি খাওয়া ফেলে উঠে পড়্‌লেন। ব্রতের শেষ কিছুই পালন করা হ’লো না। সেই সময় এক গয়লার মেয়ে তাঁদের ব্রত দেখ্‌তে এসেছিল। বামনীর বৌ খাওয়া ফেলে উঠে চলে যাওয়ায় সেই প্রতিবেশিনীর বৌ সেই গয়লার মেয়েটীকে বল্লেন,—“ভাত তরকারী সবই পড়ে আছে—তুমি বাছা খেয়ে নাও।”

গয়লার মেয়ে সেইগুলি খেয়ে এঁটো পরিষ্কার করে—এঁটো পাতা পুকুরে ভাসিয়ে দিয়ে এলো। ওদিকে বামনীর ব্যাটা বাড়ী এসে আর বৌএর দিকে ফিরেও চাইলে না। সেই গয়লার মেয়ের জন্যে একেবারে পাগল হয়ে গেল। ব্যাটার এই আচরণে বামনী মাথামুড় খুঁড়্‌তে লাগ্‌লেন। আর বৌএর চোখের জল সার হ’লো। এইভাবে কিছুদিন যায় সেই সময় একদিন সেই প্রতিবেশিনীর



তাঁর ছেলে এক নৌকা ধন নিয়ে বাড়ী এসেছেন।

সঙ্গে আবার একদিন বামনীর দেখা হ'লো। বামনী কেঁদে কেটে ছেলের আচরণের কথা সবই তার কাছে বল্লেন। প্রতিবেশিনী সব কথা শুনে বল্লেন,—"বামনি তুই ভাবিস্‌নে—মা চণ্ডীর কোপেই তোর ছেলের এমন হাল হয়েছে। তোর বৌ ব্রত শেষ না করে উঠে পড়েছিল তাই মা চণ্ডী রাগ করেছেন। তুই আবার তোর বৌকে দিয়ে সঙ্কট মঙ্গলবারের ব্রত করা—তোর ছেলে ভাল হ'য়ে যাবে। এ ব্রত যে কোন মাসে চার মঙ্গলবার কল্লেই হ'লো।"

সেই প্রতিবেশিনীর কথায় বামনী আবার তাঁর বৌকে দিয়ে সঙ্কট মঙ্গলবারের ব্রত করাতে লাগলেন। প্রথম মঙ্গলবার গেল—দ্বিতীয় মঙ্গলবার গেল—তৃতীয় মঙ্গলবার গেল—শেষ মঙ্গলবার বৌ ব্রত শেষ করে এঁটো পাতা পুকুরে ভাসাতে গেলেন। পাতা পুকুরে ভাসাতে গিয়ে নিজের মনেই বল্‌তে লাগ্‌লেন—

ঘরে ফিরে স্বামী আমার,
দেখ্‌লে নাকো চেয়ে—
গয়লার মেয়ের ফিরল বরাত,
পাতের ভাত খেয়ে॥

এখন সেই সময় বামনীর ছেলে সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিল। এই কথাগুলো যেমন তার কাণে গেল অমনি তার মনটা কেমন চঞ্চল হয়ে উঠ্‌লো। সঙ্গে সঙ্গে তার পাগ্‌লামো সেরে গেল। সে বাড়ী এসে সেই দিন তার স্ত্রীর হাত ধরে বল্লে,—"আমার বড় দোষ হয়ে গেছে। আমি তোমায় অনেক কষ্ট দিয়েছি। সত্যিই আমি তোমায় চিন্‌তে পারিনি।" তারপর থেকে বামনী মা মঙ্গলচণ্ডীর কৃপায় বৌ-ব্যাটা নিয়ে সুখে ঘর সংসার কর্ত্তে লাগ্‌লেন। বামনীর নাতি নাত্‌নি হ'লো; কোন সাধ আর অপূর্ণ রইল না, সুখে সমস্ত সংসার দিন দিন উত্‌লে উঠ্‌লে লাগ্‌ল। মা মঙ্গলচণ্ডীর কৃপায় বামনীর সুখ দেখে ঘরে ঘরে সবাই

মঙ্গলচণ্ডী ব্রত কর্ত্তে লাগ্‌লো। সেই থেকে পৃথিবীতে মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত প্রচার হ'লো।

কল্লে সঙ্কট মঙ্গলবার—বিপদ আপদ কাটে তার।
মঙ্গলচণ্ডীর আশীর্ব্বাদে, থাকে সে দুধে ভাতে॥

তিন ভাই।

রাজার দুই ছেলে, দু'জনেই রাজার খুব প্রিয়। বড় রাজকুমারের নাম মহিংসাসকুমার, ছোট রাজকুমারের নাম ছিল—চন্দ্রকুমার। তিন চার বৎসরের ছোট বড় কিন্তু দু'টিতে একেবারে গলায় গলায় ভাব, যেন একটি বোঁটায় দু'টি ফুল, একটি বড়, অন্যটি ছোট!

রাজকুমার দু'টিই যখন বালক তখন রাণীর হইল মৃত্যু! মা হারা ছেলেদের মুখ চাহিয়া, কর্ত্রীহীন গৃহস্থালীর কথা ভাবিয়া রাজা আবার বিবাহ করিলেন। অল্পদিন পরে রাজকুমারদের আর একটি সুন্দর ভাই হইল, রাজা তাহার নাম রাখিলেন, সূর্য্যকুমার! সূর্য্যকুমারের রূপ আর ধরে না, অঙ্গের লাবণ্যে রাজবাড়ী ভরিয়া গেল, যে দেখিল সেই বলিল—নূতন রাণীর ছেলের রূপের তুলনা নাই!

রাজার আনন্দ আর ধরে না। রাজা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া রাণীকে বলিলেন—রাণি! বড় খুসী হইয়াছি, বর চাও, যাহা চাহিবে—দিব।

ছোট রাণী বলিলেন—মহারাজ সন্তুষ্ট হইয়াছেন—ইহার অধিক পুরস্কার আর কি আছে বলুন!

রাজা কিন্তু এতই খুসী হইয়াছেন যে একটা কিছুই না দিলেই নয়, বলিলেন—না রাণি! একটা কিছু চাও।

মহিষী আর কি করেন! বলিলেন—মহারাজ! এতই যদি আপনার আগ্রহ, যখন প্রয়োজন হইবে—চাহিব!

বেশ, রাণি, বেশ!—সেই কথাই রহিল।

দিন কাটে! মহারাজ যত বৃদ্ধ হইতেছেন, জ্যেষ্ঠ রাজকুমার মহিংসাসকুমার ততই যুবক হইতেছেন, অন্য দুই রাজকুমারও সঙ্গে সঙ্গেই বাড়িতেছে।

রাণী একদিন বলিলেন—মহারাজ! আপনি একদিন দাসীর প্রতি প্রসন্ন হইয়া একটি বর দিতে চাহিয়াছিলেন। আজ যদি আমি বর প্রার্থনা করি—দিবেন কি?

কেন দিব না রাণি! নিশ্চয়ই দিব।

তখন রাণী—অযোধ্যার রাজা দশরথের রাণী কৈকেয়ীর মত ধীরে ধীরে বলিলেন—মহারাজ! সূর্য্যকুমারকে রাজত্ব দান করুন।

শুনিয়া রাজার মাথা ঘুরিয়া গেল! এ কি সর্ব্বনেশে কথা! তাঁহার সর্ব্বগুণের আধার জ্যেষ্ঠপুত্র বর্ত্তমানে সর্ব্ব কনিষ্ঠকে তিনি রাজ্য দেন কিরূপে! অথচ তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ! প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা মহাপাপ!

রাজা অনেক বুঝাইলেন, রাণী কিন্তু বুঝিলেন না। রোজই রাজাকে ঐ এক কথা লইয়া জ্বালাতন করিতে লাগিলেন।

দেখিয়া শুনিয়া রাজার বড় ভয় লাগিয়া গেল। রাণী পাছে তাঁহার সতীন পুত্রদের প্রতি হিংসায় তাহাদের কোনরূপ অনিষ্ট করিয়া বসেন, এই হইল রাজার ভয়। রাজা জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম রাজকুমারকে ডাকিয়া সকল কথা বলিলেন। বলিয়া বলিলেন—আমি বড়ই ভয় পাইয়াছি। সেই জন্যই বাপ হইয়া তোমাদের বনবাসে পাঠাইতেছি। তোমরা কোন বনে গোপনে বাস করিতে থাক, আমার মৃত্যুসংবাদ পাইলে রাজধানীতে ফিরিয়া রাজ্যগ্রহণ করিও। মহিংসাসকে

বলিলেন—তুমি বড়, ন্যায়তঃ রাজ্যে তোমারই অধিকার, প্রজারা তোমাকেই রাজা করিবে।

রাজকুমার দু'টি পিতার চরণে প্রণাম করিয়া বনবাসে চলিল। সূর্য্যকুমার রাজবাড়ীর উদ্যানে খেলা করিতেছিল, দাদারা কোথায় যাইতেছে জিজ্ঞাসা করিল।

মহিংসাস তাহাকে আদর করিল, কত মিষ্ট কথা বলিল, বাড়ী যাইতে বলিল, কিন্তু সে তাহার বড় দাদাকে এতই ভালোবাসিত যে কিছুতেই বাড়ী যাইতে রাজী হইল না।

তখন মহিংসাস বলিলেন—ভাই আমরা বনে যাইতেছি। সেখানে অনেক কষ্ট, তুমি দুধের ছেলে, সেখানে তোমার যাইতে নাই।

সূর্য্যকুমার বলিল—তবে মেজ দাদা কেন যান? মেজ দাদাও ত আমারই মত ছেলে মানুষ!...দাদা, আমি তোমার সঙ্গে যাবই।

মহিংসাস যখন কিছুতেই তাহাকে নিরস্ত করিতে পারিলেন না, তখন তাহাকে সঙ্গেই লইলেন।

তিন ভাই বনে থাকেন।

একদিন হইল কি! বড় তৃষ্ণা পাইয়াছে, মহিংসাস সূর্য্যকে ডাকিয়া সরোবর হইতে স্নান করিয়া পদ্মপত্রে খানিক জল আনিতে বলিলেন।

সূর্য্য দাদার সেবা করিতে সদাই তৎপর; অদূরে জলাশয় দেখিয়া সেই দিকেই চলিলেন। এখন,

সেই জলে একটা রাক্ষস থাকিত! ধর্ম্মজ্ঞান-শূন্য যে ব্যক্তি জলে নামিত, রাক্ষস তাহাকেই ভোজন করিয়া ফেলিত। সূর্য্য জলে নামিতেই রাক্ষস জিজ্ঞাসা করিল—বাপু! দেবধর্ম্ম কাহাকে বলে—জান?



"জানি গো জানি···চন্দ্রসূর্য্যকে লোকে দেবতা বলে"···

সূর্য্যকুমার বলিলেন—জানি গো জানি! পৃথিবীতে চন্দ্র সূর্য্যকে লোকে দেবতা বলে; তাঁহাদেরই......

মুখের কথা শেষ হইবার আগেই রাক্ষস সূর্য্যকুমারকে জড়াইয়া ধরিল ও অগাধ জলে নিজের বাসায় লইয়া গিয়া বন্ধ করিয়া রাখিল, ক্ষুধার সময় জলযোগ করিবে।

সূর্য্যকুমারের দেরী দেখিয়া মহিংসাস চন্দ্রকুমারকে জল আনিতে পাঠাইলেন। চন্দ্রকুমার সেই জলাশয়েই নামিয়া পদ্মপত্র ছিঁড়িয়া জল তুলিতে যাইবেন, রাক্ষস তাঁহার সম্মুখীন হইয়া কহিল—বাপু! এ সরোবর আমার। আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়া কেহই জল লইতে পারিবে না। আমি যাহা জিজ্ঞাসা করি—আগে তুমি তাহার উত্তর দাও।

চন্দ্রকুমার বলিলেন—কি তোমার প্রশ্ন—শীঘ্র বল। আমার জ্যেষ্ঠ পিপাসার্ত্ত হইয়া আমার অপেক্ষা করিতেছেন।

বল—দেবধর্ম্ম কি?

চন্দ্রকুমার ঠিক উত্তর দিতে পারিলেন না; রাক্ষস তাঁহাকে টানিয়া অতল জলে চলিয়া গেল।

মহিংসাস চিন্তিত হইয়া পড়িলেন; দু'টি ভাইই যে আসে না! কোন বিপদ টিপদ হইল না ত! তিনি সরোবরের দিকে চলিতে লাগিলেন।

তীরে দাঁড়াইয়া দেখিলেন, জল পর্য্যন্ত দু'টী ভায়েরই পায়ের চিহ্ন পড়িয়াছে, তাহারা যে জলে নামিয়াছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই এবং তাহারা যে আর উঠে নাই তাহাও নিশ্চয়। তাহা হইলে তাহাদের ফিরিবার পদ-চিহ্ন থাকিত।

তবেই ত!

মহিংসাস ভাবিলেন, নিশ্চয়ই জলে রাক্ষস আছে, সেই তাঁহার ভাই দু'টির

অনিষ্ট করিয়াছে। মহিংসাস তখন তীর ধনুক লইয়া জলের অতি সন্নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

এদিকে রাক্ষসটার লোভ ক্রমশঃই বাড়িয়া যাইতেছিল, কিন্তু যতক্ষণ না মহিংসাস জলে নামেন, ততক্ষণ সে ত কিছু করিতে পারে না, কারণ উদক রাক্ষসেরা স্থলে একেবারেই ক্ষমতা হীন। রাক্ষস তখন মহিংসাসকে ভুলাইয়া জলে নামাইতে, বন-চরের বেশ ধরিয়া ডাঙ্গায় আসিয়া বলিল—মহাশয় দেখি অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত, পিপাসায় আপনার কণ্ঠ শুষ্ক বোধ হইতেছে। সম্মুখে অত মৃণাল থাকিতে, অমন নির্ম্মল কাক-চক্ষুর মত জল থাকিতে কেন না কষ্ট দূর করিতেছেন ?

মহিংসাসকুমার লোকটাকে দেখিয়াই বনচর-বেশী রাক্ষস বলিয়া চিনিতে পারিয়াছিলেন। বলিলেন—তুমি কি রাক্ষস ?

রাক্ষস তখন আর অস্বীকার করিল না, বলিল—হাঁ, এ পুষ্করিণী আমার।

তোমার ?

হাঁ।

তুমিই কি আমার ভাই দু'টিকে আটকাইয়া রাখিয়াছ ?

রাখিয়াছি। তাহাদের আমি খাইব। এ সরোবরে যে মানুষ নামিবে, সেই আমার ভক্ষ্য !

যে নামিবে তাহাকেই তুমি খাইবে ?

হাঁ—তাহাকেই খাইব, তবে যে দেবধর্ম্ম জানে, তাহাকে কিছু বলি, এমন ক্ষমতা আমার নাই।

মহিংসাস বলিলেন—আচ্ছা আমি যদি দেবধর্ম্ম কি, তোমাকে বুঝাইতে পারি তবে আমার ভায়েদের ছাড়িয়া দিবে কি ?

বেশ, বুঝাইয়া দাও, যদি তোমার কথায় সন্তুষ্ট হই, তবে তোমার একটি ভাইকে ছাড়িব।

আচ্ছা—তাই। কিন্তু আমি অত্যন্ত পিপাসিত; আগে আমাকে স্নান করিয়া একটু জল পান করিতে দাও।

রাক্ষস মহিংসাসকে স্নান করিবার জল তুলিয়া দিল, স্বহস্তে মৃণাল ভাঙ্গিয়া আনিয়া, খাইতে বলিল। মহিংসাস মৃণাল ও জল খাইয়া সুস্থ হইয়া বলিলেন—এই বার বল তোমার প্রশ্ন কি ?

দেবধর্ম্ম কাহাকে বলে ?

সত্যে প্রীতি আছে যার প্রশান্ত হৃদয়
নির্ম্মল অন্তরে যেবা ধর্ম্মরত রয়,
কলুষ কামনা যে জন কভু নাহি করে,—
একান্ত সে দেবধর্ম্মা—বলে লোকে তারে।

রাক্ষস সন্তুষ্ট হইয়া বলিল—বল তোমার কোন্ ভাইকে আনিব ?

মহিংসাস বলিলেন—আমার কনিষ্ঠ ভাই সূর্য্যকুমারকে আনিয়া দাও।

রাক্ষস আশ্চর্য্য হইয়া গেল, বলিল—সে না তোমার বৈমাত্র ভাই ?

হাঁ। সেই জন্যই ত তাকে আগেই চাই। সে আমার বিমাতার একটি ছেলে; আর আমার মায়ের আমরা দুই ছেলে, একজন গেলেও একজন থাকিবে। শুধু তাই নয়। সূর্য্য যদি তোমার হাতে মরে, লোকে কি বলিবে জান ? বলিবে—আমিই—তাহাকে মারিয়াছি, এমন কাজ আমি করিতে পারিব না। তুমি আমার কনিষ্ঠ ভাইটিকে আনিয়া দাও।

রাজকুমারের কথা শুনিয়া রাক্ষস বড়ই সন্তুষ্ট হইল। সে তাঁহার উভয় ভ্রাতাকে আনিয়া দিয়া বলিল—আপনি মহাজ্ঞানী পুরুষ! এজন্মে বড় কষ্ট, অশেষ

দুঃখভোগ করিতেছি, যাহাতে রাক্ষসজন্ম হইতে পরিত্রাণ হয়,—তাহা করুন; আমাকে সদুপদেশ দিন।

রাজপুত্র বলিলেন—তুমি হিংসাবৃত্তি ত্যাগ কর। তাহা হইলেই তুমি রাক্ষস জন্ম হইতে পরিত্রাণ পাইবে।

তিন ভ্রাতায় আবার বনে ফিরিলেন।

থাকেন—থাকেন।

একদিন রাজার মৃত্যু সংবাদ আসিল। রাজধানীতে ফিরিয়া মহিংসাস রাজ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া, চন্দ্রকুমারকে রাজ প্রতিনিধি ও সূর্য্যকুমারকে সেনাপতি করিলেন।

বিমাতা আর কি করিবেন? একটু একটু ফোঁস ফোঁস করিলেন, কিন্তু সূর্য্যকুমার যে দাদা বলিতে অজ্ঞান! *

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার।

---

* "জাতকের গল্প" হইতে।

ভ্রম।

মিছেই রে তোর ডেকে মরা
চাতক ওরে মুখটি তুলে,
তৃষ্ণা মোটেই মিট্‌বে না তোর,
মরবি শুধু বুকটি জ্বলে ॥

তুষার সাদা মেঘের পিছে,
মরিস্ শুধু ঘুরেই মিছে,
বাড়বে শুধু কম্‌বে নাক
তৃষার জ্বালা প্রতিই পলে ॥

শুভ্র দেখে ভাবিস্ বুঝি,
ওটাই তবে জলে ভরা ;
শিখীই ভাল নাচ্‌তে জানে
এই নিয়মে চল্‌ছে ধরা ॥

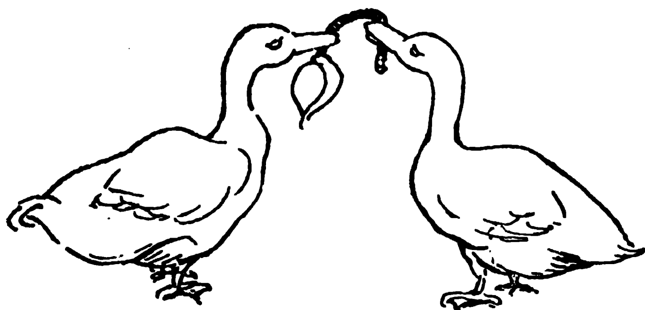
মধুর গাহে পিকই যেরে,
সেটা ভুলে গেছিস্ কিরে,

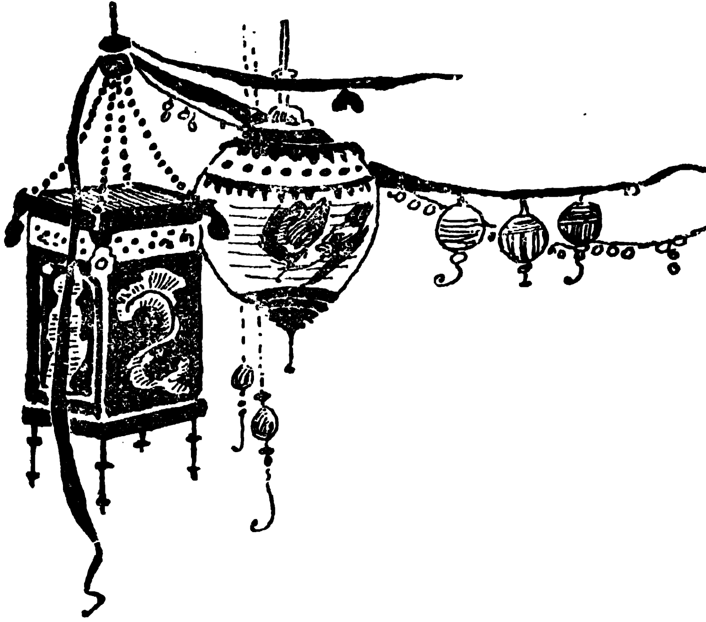
মধুর অত পলাশ যেরে
নয়ক মোটেই সুবাস ভরা ॥

ওইযে দূরে পিছনে তোর
গভীর মেঘে ডাকৃছে তোরে !
যা’ ওর কাছে—পার্‌বে শুধু
মিটাতে তোর তৃষ্ণা ও’রে ॥

অমন কালো ওরই আলো,
কর্‌ছে ধরা কেমন আলো,
দেখে শুনেও চক্ষুরে তোর
ফুট্‌বে না রে চাতক কিরে ॥

শ্রীবিকাশচন্দ্র মল্লিক ।





আয়রল্যাণ্ড

আয়রল্যাণ্ডের উপকূলে একটি ইংরাজ নব যুবককে দেখিয়া আইরিশরা দূর দূর করিয়া তাড়া করিল, বলিল—তোমায় আমরা এখানে থাকিতে দিব না, তুমি ইংরাজ !

যুবক বলিল—আমি ক্রীশ্চান।

আইরিশরা বলিল—ওসব কথা শুনিতে চাহি না। ইংরাজরা আমাদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছে, ইংরাজকে আমরা কিছুতেই আমাদের দেশে ঢুকিতে দিব না!

যুবক বলিল—তুমি আইরিশ, আমি ইংরাজ—একথা কেন ভাই ? তুমি ক্রীশ্চান, আমি ক্রীশ্চান,—ইহাই ত আসল কথা। আমরা এক ধর্ম্মী, এক ঈশ্বরের সন্তান, পরস্পরে আমরা ত ভাই—তবে কেন ভাই আমাকে তোমরা থাকিতে দিবে না ?



"এই দেখ ভাই, একই গাছের একই ডাল হইতে তিনটি পাতা—"

যুবক একটা সামরক গাছের শিষ ছিঁড়িয়া বলিল—এই দেখ ভাই, একই গাছের একই ডাল হইতে তিনটি পাতা বাহির হইয়াছে, আমরাও একই পিতার সন্তান, ভিন্ন ভিন্ন দেশে বাস করিলেও আমরাও ত একই বৃক্ষের

একই ডাল হইতে উদ্গত হইয়াছি। এই যে তিনটি পাতা উঠিয়াছে, কৈ ভাই ইহাদের মধ্যে ত কেহ কাহাকেও বিদ্বেষ করিতেছে না, সমান হইয়া জন্মিয়াছে, একই বাতাসে নাচিতেছে, একই বৃষ্টিতে স্নান করিতেছে, একই রৌদ্র কিরণে হাসিতেছে, কৈ উহারা ত হিংসা করিতেছে না, দ্বেষ করিতেছে না, তবে আমরাই বা কেন ভেদ ভেদ করিয়া মরিব ?

আইরিশদের মন গলিল, আর আপত্তি করিল না। যুবক আয়রল্যাণ্ডে ধর্ম্মপ্রচার করিতে লাগিলেন। আয়রল্যাণ্ডে ধর্ম্মের বাণ ডাকিল,—হিংসা দ্বেষ ভুলিয়া আয়রল্যাণ্ডবাসীরা যুবকের সঙ্গে ধর্ম্মকার্য্যে যোগ দিল। আয়রল্যাণ্ডে মারামারি কাটাকাটি থামিয়া গেল, শান্তির রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল। সে এক নূতন ধর্ম্ম-রবির স্নিগ্ধ কিরণ সম্পাতে আয়রল্যাণ্ড নবীন জীবন ধারণ করিল। এই যুবকই সেণ্টপ্যাট্রিক নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। আজ পর্য্যন্ত 'সামরক' গাছের পাতা আয়রল্যাণ্ডে জাতীয় চিহ্ন হইয়া আছে।

সেণ্টপ্যাটরিকের শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া ধর্ম্মযাজকগণ নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে ধর্ম্মপ্রচারে ছুটিলেন, দেশে দেশে ধর্ম্মবিদ্যালয় বসিল, বালক-বালিকাদের জন্য শিক্ষামন্দির নির্ম্মিত হইল—অনেককালের পর আয়রল্যাণ্ড নূতন হইয়া জগতে দেখা দিল।

যে সময় আয়রল্যাণ্ড ধর্ম্মে ও শিক্ষায় উন্নতির উচ্চ শিখরে উঠিয়াছিল ইয়োরোপের অন্যান্য জাতিরা তখন বর্ব্বর অশিক্ষিতই ছিল। আয়রল্যাণ্ডের শিক্ষাবিস্তারের খবর মুখে মুখে ইয়োরোপের চতুর্দ্দিকে পৌছিতেই দেশবিদেশ হইতে দলে দলে যুবকগণ আয়রল্যাণ্ডে ছুটিয়া আসিল। শিক্ষা শেষ করিয়া আবার তাহারা প্রচারে বহির্গত হইল। কিন্তু এই ধর্ম্মের যুগেও সে দেশের লোক সুখে ও শান্তিতে থাকিতে পাইত না। দেশের যিনি প্রধান রাজা,

তিনি ছিলেন দুর্ব্বল, আর ছোট খাট রাজারা রাজকার্য্য ছাড়িয়া ঝগড়া বিবাদেই কাল কাটাইতেন। একতা কাহাকে বলে তাঁহারা তাহা জানিতেন না।

অষ্টাদশ শতাব্দীর কথা। তারপর আয়রল্যাণ্ডের উপর দিয়া অনেক ঝড় বহিয়া গেল। যাহারই সৈন্যবল অর্থবল ছিল সেই অধিকার স্থাপন করিতে আসিল, আবার তাহার চেয়ে কোন ক্ষমতাশালী জাতি আসিয়া তাহাদের তাড়াইয়া নিজের আধিপত্য বসাইল। এইরূপে শেষে ইংলণ্ডের রাজারাও আয়রল্যাণ্ডের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিলেন। ডারমণ্ড নামে এক নরপতি ইংলণ্ডের রাজার সাহায্য লইয়া আয়রল্যাণ্ডে নিজের প্রভুত্ব ঘোষণা করিলেন। ইংলণ্ডের সিংহাসনে তখন দ্বিতীয় হেন্‌রী—তিনি তাঁহার অধীনস্থ আর্ল পেম্‌ব্রোককে ডারমণ্ডের সঙ্গে পাঠাইয়াছিলেন। আইরিশগণ বারবার পরাজিত হইয়া বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইল। কিন্তু ডারমণ্ড আয়রল্যাণ্ডের রাজা হইয়াও দ্বিতীয় হেন্‌রীর অধীন হইয়া রহিলেন। ইংরেজের আইন-কানুন, ইংরেজের রীতিনীতি বেশীর ভাগ লোকেই মানিতে বাধ্য হইল, কেবল পুরাতন আইরিশ দু'চারজন সর্দ্দার নিজেদের পুরাতন ব্রেহন আইন বজায় রাখিলেন। তখনকার ইংরাজ কিন্তু ইহা সহ্য করিতে পারিলেন না। তাঁহারা একটা কড়া আইন জারি করিয়া দিলেন যে, এই দুই জাতির মধ্যে বিবাহ হওয়া আইন-সিদ্ধ নহে এবং আইরিশ পোষাক পরিচ্ছদ কোন আয়রল্যাণ্ডবাসী ইংরাজ পরিলে সাজা পাইবে! কিন্তু এ আইন বিশেষ ফলপ্রদ হয় নাই, কারণ ইতিপূর্ব্বেই অধিকাংশ ইংরাজ আইরিশ পোষাক পরিচ্ছদ গ্রহণ করিয়াছিল।

কিন্তু এ দিন স্থায়ী হইল না, সপ্তম হেনরী আয়রল্যাণ্ডে নিজের প্রভুত্ববলে ইংরাজ রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিলেন। পরাধীন আয়রল্যাণ্ড ইংরেজের জয় গান

গাহিতে বাধ্য হইল, ইংরেজের আইন কানুন মানিল, ক্রমে ক্রমে তাহারাও "ইংরেজ" হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু আসিল না কেন—তাহা এইবার বলিব।

ইংরেজরা বণিকের জাত। ব্যবসা দ্বারাই তাহারা উন্নতি লাভ করিয়াছে। ইংরেজের এই যে পৃথিবী ব্যাপী সাম্রাজ্য দেখিতে পাও, ব্যবসার উন্নতিকল্পেই তাহারা এ সব রাখিয়াছে। ইংরেজ আয়রল্যাণ্ডকে চাষের ভার দিয়া আপন মনে ব্যবসা করিতে লাগিল। তাহাদের হুকুম আয়রল্যাণ্ডকে বিনা ওজর আপত্তিতে মানিতেই হইবে। আয়রল্যাণ্ডের লোক চাষ করিয়া ইংরেজের কর্ম্মক্লান্ত হাতে অন্নের গ্রাস তুলিয়া দিল—ইংরেজ কাজও করিল, সময় মত খাইতে পাইয়া প্রাণেও বাঁচিয়া গেল—কিন্তু আয়রল্যাণ্ড মর মর হইল। চাষে ফসল জন্মে, তাহাতে তাহাদের নিজেদেরই পেট ভরে না। কিন্তু ব্যবসায় ও বাণিজ্য ইংরেজদের হাতে, তাই আয়রল্যাণ্ডের লোক নিজেরা অর্দ্ধ ভুক্ত থাকিয়াও মুখের গ্রাস ইংরেজদের হাতে তুলিয়া দিতে বাধ্য হইত। এবং সারা বছর খাটুনির ফলে ক্ষেত হইতে যে শস্য তাহারা সংগ্রহ করিয়াছিল-- তাহার বিনিমায় ইংরেজদের নিকট হইতে তাহারা পাইল, হয়ত দুই চারিটি সৌখিন জিনিস।

অনাহারে ও অন্য কাজকর্ম্মের অভাবে আয়রল্যাণ্ডের অবস্থা ক্রমশঃ শোচনীয় হইয়া উঠিতেছিল। অবস্থাটি তোমরাই একবার ভাবিয়া দেখ দেখি কি ভীষণ! ধর একটা জাতি যদি খাটিয়া খুটিয়া তাহাদের শস্য খাদ্যের কতকাংশ অন্য কোন দেশের ব্যবহারের জন্য তুলিয়া দিতে বাধ্য হয় বল দেখি তাহাদের কি দশা হয়? তাহাদের ক্ষুধায় আহার নাই; দেহে সামর্থ্য নাই—ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া অকালমৃত্যু যমদণ্ড লইয়া অগ্রসর হইয়া আসিতেছে—সে কি ভীষণ দশা, ভাবিয়া দেখ দেখি! আয়রল্যাণ্ডের সেই দশা হইয়াছিল। সমস্ত বছর

প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়া আইরিশগণ আয়রল্যাণ্ডের ক্ষেত্রে ফসল উৎপন্ন করিল—তাহা তাহাদের রাজার জাতিরা কতক বা লইয়া গেলেন; কতক বা বিক্রয় করিলেন, আর আইরিশগণ বাঁচিয়া মরিয়া রহিল।

একটা জাতিকে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে তাহাকে নানা প্রকার কাজ করিতে হয়। চাষ বাস ছাড়া আয়রল্যাণ্ডের নিজস্ব দুই চারিটা ব্যবসায় ছিল। তাহার মধ্যে খুব লাভের ব্যবসা ছিল—মেষের ব্যবসা;—ভেড়া ও ভেড়ার লোম বিক্রয় করা। ইংরেজদের কেমন একটা ধারণা বরাবর রহিয়া গিয়াছে, ব্যবসা করাটা তাহাদেরই একচেটিয়া কাজ, তাহাদের অধিকৃত পরাধীন দেশগুলি তাহাদেরই ব্যবসায়ের সুবিধার জন্য তাহারা কেবল কাচামাল সরবরাহ করিবে। তাই ইংরাজরা যখন দেখিল আইরিশরা মেষের ব্যবসা করিয়া বেশ দু'পয়সা রোজগার করিতেছে, তখনই তাহাদের এক আইন করিয়া আইরিশদের ঐ ব্যবসার পথ বন্ধ করিয়া দিল। আইরিশদের তখন একমাত্র সম্বল হইল কৃষিকাজ, কিন্তু আয়রল্যাণ্ডের মত ছোট দেশে কৃষিকাজ করিয়া সব লোকের জীবন ধারণ করা কোনক্রমেই সম্ভব নয়। আয়রল্যাণ্ডের অধিকাংশ জমিই অনুর্ব্বরা—সারা বছর তাহাতে কোন প্রকার ফসল হয় না। যদি তাহার সমস্ত জমিতেও ফসল হইত, তাহা হইলেও আইরিশদের দুই বেলা দুই মুঠা পেট ভরিয়া খাইতে কুলাইত না।

আয়রল্যাণ্ডের কৃষি কাজ ছাড়া আর কোন কাজই ছিল না। পাঁচ রকম ব্যবসা বাণিজ্য থাকিলেই দেশের উন্নতি হয়, কেবলমাত্র চাষের দ্বারা তাহা হওয়া সম্ভব নহে। চাষের কাজে মানুষকে অনেক সময়ে ভগবানের মুখ চাহিয়া থাকিতে সময় হয়। সময় মত সুবৃষ্টি, রৌদ্র না হইলে সমস্ত ফসলই নষ্ট হইয়া যায়। আয়রল্যাণ্ডের ঠিক তাহাই হইল। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা

দিল। অন্নাভাবে মড়ক মহামারী সহস্র সহস্র দুর্ব্বল আইরিশগণকে যমালয়ে টানিয়া লইয়া গেল। অনেক দুঃখ কষ্ট সহিয়া আয়রল্যাণ্ডের অধিবাসীদের প্রাণটুকু ধুক্ ধুক্ করিতেছিল—তাও গেল।

এই দুর্ভিক্ষের পর ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বছর আয়রল্যাণ্ডের কথা পৃথিবীর লোকে শুনিতেই পাইল না। ইহা হইতেই তোমরা বুঝিতে পারিবে, সেই জাতিটা মরিয়াই ছিল। পঁয়ত্রিশ বছরের পর আয়রল্যাণ্ডের নাম শুনা গেল—পারনেল নামে একটি লোকের নেতৃত্বে আইরিশগণ মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল। পারনেল অত্যাচারী জমিদারদের খাজনা বন্ধ করিলেন; এবং প্রজা স্বত্বকে দৃঢ় করিবার চেষ্টায় সমস্ত চাষীকে একত্র করিয়া ফেলিলেন। পারনেলের মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সমগ্র আইরিশজাতি তাঁহাকে নেতা বলিয়া মান্য করিয়াছিল। আয়রল্যাণ্ড নিজের প্রাণ, জাতি ও সমাজ রক্ষার জন্য বিদ্রোহ করিল। এই বিদ্রোহ করিয়া তাহারা শুধু বিদেশী রাজাদের এই বুঝাইতে চাহিল যে এদেশের জমি আমাদের, আমাদেরই থাকিবে, এ দেশ আমাদের, আমাদেরই থাকিবে। ইহারই ফলে ইংরেজকেও অনেকটা নরম হইতে হইল। তখন হইতেই আয়রল্যাণ্ড নূতন জীবন লাভ করিল। তাহারা গৃহ-শিল্পে উন্নতি করিতে লাগিল। আয়রল্যাণ্ড স্বাধীন ব্যবসা করিতে লাগিল, আয়রল্যাণ্ড নিজের মন্ত্রীসভা গড়িয়া ইংরেজের রাজকার্য্যে সহায়তা করিতে লাগিল।

কিন্তু ইহাতেও তাহারা সন্তুষ্ট নহে, পরাধীনতার শেষ রশ্মিটুকুও তাহারা রাখিতে চাহে না। ১৯১৬ সালে শিন্ ফিন্ সমাজ গঠিত হইয়াছে, তাহারা আয়রল্যাণ্ডের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিতেছে। অনেক দিনের যুদ্ধ—মারামারি কাটি কাটির পর ইংরেজ আয়রল্যাণ্ডকে ইংরেজদের অধীনে স্বাধীন রাজ্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

কিন্তু এখনও দেশে শান্তি আসে নাই—আয়রল্যাণ্ডের সব লোকেরা এখনও এ দান গ্রহণ করে নাই—তাহারা বলে দেশ তাহাদেরই; ইংরাজরা দান করিবার কে? তাহাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা চাই।

মনে হয় আয়রল্যাণ্ডে আবার সুখের দিন আসিবে। এতদিন যে জাতি নিজেদের শক্তি সামর্থ্য ফুটাইয়া তুলিবার অবকাশ পায় নাই, আজ সেই জাতিই সম্মুখ হইতে সমস্ত বাধা বিঘ্ন সরাইয়া দিয়াছে—নব উদ্যমে নূতন ভাবে আজ সে জাতি নিজেদের গড়িয়া তুলিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছে। জগত এ দৃশ্য বিস্মিত স্তম্ভিত হইয়া দেখিবে।

দিব্য-পরীক্ষা।

পঞ্চতন্ত্রের "ধর্ম্মবুদ্ধি পাপবুদ্ধি কথা" বোধ হয় তোমাদের সকলেরই জানা আছে। তোমাদের বোধ হয় ইহাও মনে থাকিতে পারে যে ঐ গল্পের এক স্থানে পাপবুদ্ধির মুখ দিয়া এই শ্লোকটি বলান হইয়াছে ঃ—

বিবাদে অন্বিষ্যতে পত্রং পত্রাভাবে তু সাক্ষিনঃ।
সাক্ষ্যভাবাৎ ততো দিব্যং প্রবদন্তি মণীষিণঃ॥

এই শ্লোক হইতে বেশ বুঝা যায় পূর্ব্বকালে আমাদের দেশে বাদী প্রতিবাদীর বিরোধে প্রথমে দেখা হইত কোন দলিল পত্র প্রভৃতি লেখ্য প্রমাণ আছে কি না, তাহার পর, দেখা হইত কোন সাক্ষী সাবুদ আছে কি না, এই দুইটীর কোনটিই না থাকিলে দিব্য পরীক্ষার দ্বারা দোষী নির্দ্দোষী সাব্যস্ত করিবার ব্যবহার ছিল। আমাদের দেশে দিব্য ছিল নয় রকমের, তাহার মধ্যে একটি ছিল জল-দিব্য।

আমাদের দেশ হইতে বহুকাল এ ব্যবহার উঠিয়া গিয়াছে—এক সময়ে যে ছিল তাহার নজীর স্বরূপ মনুসংহিতাতেই আজ পর্য্যন্ত লিপিবদ্ধ হইয়া আছে।

কিন্তু—একটা কিন্তু ইহাতেও আছে।

শ্যামদেশের উপরে চীনের যে ভাগটা ফরাসীদের অধিকারভুক্ত সেই ফরাসী ইণ্ডো চায়নায় এক প্রদেশ আছে তাহার নাম লিয়স। সেখানে আজও সলিলদিব্যের দ্বারা বিচার নিষ্পত্তি হইয়া থাকে। সেখানকার এক স্থানের ঘটনার কথা তোমাদের আজ বলিতেছি।

সেখানে সম্প্রতি এক ভৃত্যকে লইয়া দুইজন নাগরিকের বচসা বাঁধিয়াছিল। দুইজনেই বলে এ আমার চাকর। বিচারকদের কাছে মকদ্দমা হইল কিন্তু তাঁহারা কোনই রায় প্রকাশ করিতে পারিলেন না। শেষে বলিলেন—সলিল দিব্যের দ্বারা বিচার হইবে। অর্থাৎ বাদী প্রতিবাদী উভয়কেই জলে ডুব দিতে হইবে এবং যে ব্যক্তি অধিকক্ষণ জলের মধ্যে ডুব দিয়া থাকিতে পারিবে, ভৃত্যের মালিক সে-ই ধার্য্য হইবে।

নির্দ্দিষ্ট দিনে, হাজারে হাজারে দর্শকবৃন্দ আসিয়া নদীর উভয় তীরে সারি দিয়া দাঁড়াইল। ভিড়ের মাঝে দাঁড়াইয়া সেই দুইজন নাগরিক।

সময় যাইতে লাগিল, কিন্তু তাঁহাদের—না কাপড় চোপড় ছাড়িবার, না ডুব মারিবার কোন চেষ্টা চরিত্র, কিছুরই লক্ষণ দেখা গেল না। খাণিকক্ষণ বাদে টের পাওয়া গেল, ডুব দেওয়াটা বরাতে হইবে। বাদী প্রতিবাদী উভয়েই এক এক জন লোক ভাড়া করিয়াছেন—তাহারাই স্ব স্ব মনিবের নির্দ্দোষিতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিবে।

এমন সময়ে জনতার মধ্যে একটু সাড়া পড়িয়া গেল। যে দুইজন লোক ডুব দিবে তাহারা ফুলের অর্ঘ্য লইয়া আসিয়া বিচারপতি ও তাঁহার পরামর্শ-

দাতাদের সম্মুখে ধরিয়া দিল। উভয়ই তাহার পর শপথ করিল যে তাহারা নিজ নিজ পক্ষের ন্যায্যতায় বিশ্বাস করে।

দুইজনেই একবারে জলে নামিল। প্রত্যেকের কটিতে দড়ি বাঁধা, দড়ির এক প্রান্ত অপর একটি লোক ধরিয়া আছে। উদ্দেশ্য স্রোতের মুখে পড়িয়া যাহাতে তাহারা ভাসিয়া না যায়। দু'জনার প্রত্যেকেরই মাথায় ফুল ও গলায় পাতার মালা পরা—জল দেবতার কাছে নাকি ইহাই উহাদের নির্ব্বাক্ অনুগ্রহ প্রার্থনা।

রুদ্ধশ্বাস নিস্তব্ধতার মধ্যে এই দুইটী লোক আদেশবাণীর অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর, একসঙ্গে ছলাৎ করিয়া ডুব দিয়া অদৃশ্য হইল।

এক ব্যক্তি ঘড়ি বাহির করিয়া ধরিলেন। ষাট সেকেণ্ড কাটিয়া গেল কিন্তু নিমজ্জিতদের কাহারও কোনই চিহ্ন নাই। দেড় মিনিট—! দুই মিনিট! আরও কএক সেকেণ্ড তাহার পরে জলের উপর কাল গোলমত কি একটা ভাসিয়া উঠিতে দেখা গেল—দর্শকমণ্ডলী মহা চীৎকার করিয়া উঠিল। উটী পরাজয়মান ডুবারীর মস্তক—ঠিক দুই মিনিট পনেরো সেকেণ্ড ধরিয়া সে জলের মধ্যে ডুব দিয়াছিল।

যে ব্যক্তি দড়ি ধরিয়াছিল সে তখন দ্বিতীয় লোকটিকে জল হইতে উঠিয়া আসিতে সঙ্কেত করিল; কিন্তু তাহার কাছ হইতে কোন সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না। সকলে চেঁচাইয়া উঠিল হয়ত এ ব্যক্তি মরিয়া গিয়াছে। অবশেষে খানিকক্ষণ টানাটানির পর, সে ব্যক্তিও জল হইতে উঠিল—সে যে একেবারে বে-দম হইয়া পড়িয়াছিল তাহা তাহাকে দেখিয়াই বুঝা যাইতেছিল, তবুও সে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীর চেয়ে কএক সেকেণ্ড বেশী ডুবিয়া থাকিয়াছিল; জিৎ তাহারই হইল। মকদ্দমার ও এইখানে ফরসাল্লা হইল। শ্রীধানি লঙ্কা।






কৃষ্ণ-প্রাপ্তি।

এক সময়ে গোপালের বড় অর্থ কষ্ট হইয়াছিল। নদীয়ার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় গোপাল নিয়মিত বেতন পাইত, তার উপর নানা ছুতায়, নানা ফিকির ফন্দী করিয়া গোপাল বেশ কিছু রোজগার করিত কিন্তু লোকটি ছিল এমন "উড়োনচণ্ডে" যে কখনো একটি পয়সাও তাহার হাতে থাকিত না। এমন কি, অত বড় নদীয়ার মহারাজের সভাসদ গোপালচন্দ্রের বাড়ীতে কখনও কখনও রান্নাঘরের শিকায় টাঙানো হাঁড়ী নীচেই নামিত না ; বেবাক্ উপোস চলিত।

গোপাল দেখিল, হাঁড়ী চড়ে না ; বাচ্ছাকাচ্ছাগুলো ক্ষুধার জ্বালায় চ্যাঁ ভ্যাঁ করিতেছে ; বিড়াল ক'টা রান্নাঘরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঝগড়া করিয়া মরিতেছে ; পোষা কুকুরটা লেজে মুখে এক করিয়া তাল পাকাইয়া পড়িয়া আছে—আর গোপালের গৃহিণী বাড়ীর মধ্যে এই সব কাণ্ড দেখিয়া, ঝালা পালা হইয়া পুকুর পাড়ে গিয়া বসিয়াছেন! গোপাল তামাক খাওয়া শেষ করিয়া উঠিলেন। উঠিয়াই কাচ্ছাবাচ্ছাগুলির কাহারো গালে, কাহারো পিঠে কিল চড় ঘুঁসি কসাইয়া দিলেন ; বিড়ালগুলিকে তাড়া করিতে তাহারা গৃহের পিছনে গিয়া

ফোঁস ফোঁস করিতে লাগিল; মার খাইয়া কুকুরটা কেঁউ কেঁউ করিয়া উঠিল। গোপাল শ্রান্ত হইয়া বসিয়া পড়িলেন।

একটু পরেই গোপালের মাথায় বুদ্ধি খেলিল। গোপাল বড় ছেলেকে ডাকিয়া কি-সব উপদেশ দিয়া, রাজসভায় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট পাঠাইলেন।

গোপালের ছেলে, শুধু গায়ে, শুধু পায়ে, শুষ্ক মুখে রাজসভায় আসিয়া দাঁড়াইতেই মহারাজ বলিলেন—কি হে, তোমার বাবা আসিল না কেন—আজ?

ছেলে কাঁদ কাঁদ বলিল—মহারাজ, গত রাত্রে বাবার আমার কৃষ্ণপ্রাপ্তি হইয়াছে। শুনিয়া মহারাজের মনটি বিষণ্ণ হইয়া গেল; সভাসদদের মধ্যে অনেকেও গোপালকে ভালোবাসিতেন, তাঁহারা সকলেই দুঃখ করিতে লাগিলেন। সেদিন আর রাজকার্য্য হইল না—মহারাজ গোপালের শোকে তখনই সভা ভাঙ্গিয়া দিলেন। অন্তঃপুর গমন কালে কোষাধ্যক্ষকে হুকুম দিলেন—এক মাসের হবিষ্য আদি করিবার সমস্ত খরচ বাবদ গোপালের ছেলেকে শ'দুই টাকা দিয়া দাও।

গোপাল-পুত্র দুইশত টাকা লইয়া বাড়ী ফিরিল। তাহার জননী আবার রান্নাঘরে ঢুকিলেন; শিকা হইতে হাঁড়ি নামিল; ঝগড়া ছাড়িয়া মার্জ্জার কুল আবার রান্নাঘরের আশে পাশে গোঁফ ফুলাইয়া বসিল; গৃহ পালিত কুকুরটি আবার চন্‌মনে হইয়া উঠিল; কাচ্ছাবাচ্ছারা খাবার ও দুধ পাইয়া আবার ঘুমাইয়া পড়িল।

গোপাল ভাঁড় জাতিতে নাপিত,—এক মাস কাটিয়া আসিল। গোপালের ছেলে আবার একদিন রাজসভায় হাজির। মহারাজ বলিলেন—শ্রাদ্ধের সময় হইয়া আসিয়াছে? ও-হে খাজাঞ্চি, গোপালের ছেলেকে শ' পাঁচেক টাকা দাও।

গোপালের পুত্র টাকা পাইয়া হৃষ্টচিত্তে ফিরিয়া আসিল। দিন দুই চার

খুব পোলাও, কালিয়া, কোর্ম্মা—কাবাব চলিল। দিন আষ্টেক পরে গোপাল একদিন প্রভাতে পট্টবস্ত্র পরিয়া, গায়ে চাদর জড়াইয়া রাজসভায় উপস্থিত।

রাজসভায় তখন মহা-তর্ক চলিতেছিল। বড় বড় সভাপণ্ডিতগণ মুণ্ডিত মস্তকে তরমুজের বোঁটার মত টিকি দোলাইয়া হুহু করিয়া শ্লোক আওড়াইতেছিল; নৈয়ায়িকগণ ন্যায়ের তর্ক করিতে করিতে হাতাহাতির উপক্রম করিতেছিল, ঠিক এই সময়ে থামের পাশ দিয়া গোপালের মূর্ত্তি দেখা গেল। সভাপণ্ডিত মহাশয়দের শ্লোকগুলি গলার মধ্যেই বসিয়া আড়ষ্ট হইয়া গেল, নৈয়ায়িকদের লড়াই বন্ধ হইয়া গেল, সকলে সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল, মহারাজ, প্রেতাত্মা, গোপালের প্রেতাত্মা!

মহারাজ ও গোপালকে জীবন্ত ও চলিতে দেখিয়া সিংহাসনে বসিয়া ঠক্ ঠক্ করিতে কাঁপিতে লাগিলেন।

আর যাঁহারা হাঁ করিয়া তর্ক-বিচার শুনিতেছিলেন—তাঁহাদের দাঁতকপাটি লাগিয়া গেল, যেন সব ম্যালেরিয়া জ্বর হইয়াছে—সব ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

গোপাল মনে মনে হাসিল, সবিনয়ে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে প্রণাম করিয়া কহিল—ভয় নাই মহারাজ, আমি! আমি গোপাল!

তখনও অনেকের ভয় দূর হয় নাই, অনেকেই তখনও কাঁপিতেছিলেন, গোপাল তাহা দেখিতে পাইয়া বলিল, কাহারও ভয় নাই, আমি সেই পুরাণো গোপাল! গোপাল ভাঁড়!

পুরাণো গোপাল ভাঁড় শুনিয়া কাঁপুনি অনেকটা কমিল।

মহারাজ বলিলেন—তোমার ছেলে যে "বাবা মরিয়াছেন" বলিয়া······

গোপাল বলিল—সে কি মহারাজ! কাহার ছেলে ও কথা বলিল?

কেন, তোমার ছেলে! সে যে ঐ বলিয়া অনেক টাকা লইয়া গেল!

সভাসদগণ 'জুয়াচোর' 'জুয়াচোর' শব্দে সভা কাঁপাইয়া তুলিলেন। গোপাল সেদিকে ভ্রুক্ষেপও করিল না। বলিল—সে কি বলিয়াছে মহারাজ?

মহারাজ রক্তচক্ষে কহিলেন—তোমার ছেলে বলিল—আমার বাবার কৃষ্ণপ্রাপ্তি হইয়াছে,……

গোপাল হাসিল, বলিল—ওঃ—এই কথা! সে সত্য কথা বলিয়াছে মহারাজ! এই যে আমার কৃষ্ণপ্রাপ্তি হইয়াছে!—বলিয়া গোপাল মহাভক্তিভরে চক্ষু মুদিয়া বলিল—মহারাজ আমি ধন্য হইয়াছি, আমার মনুষ্যজন্ম উদ্ধার হইয়াছে—এই দেখুন ব্রজের শ্রীকৃষ্ণকে আমি পাইয়াছি।

গোপাল উত্তরীয় খুলিয়া কৃষ্ণমূর্ত্তি বাহির করিয়া দেখাইল।

"মহারাজ, আমার ছেলে মিথ্যা বলে নাই, এই দেখুন, সত্য-সত্যই আমার কৃষ্ণপ্রাপ্তি হইয়াছে।"

মহারাজা হাসিয়া উঠিলেন। তখন গোপাল টাকা আদায় করিবার মতলবটাও খুলিয়া বলিল।

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার।





সরল বাঙ্গালা সাহিত্য

গীতি-কথা।

মেয়েদের শিক্ষার জন্য বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রাধান্যের যুগে কতকগুলি গল্প রচিত হইয়াছিল। বুড় মেয়েলোকেরা এই সকল গল্প জানিত, এই গল্পগুলি সে আমলে মুখে মুখে চলিয়া আসিয়াছিল—ইহা লিখিত হইত না। সাধারণতঃ নাপিতের মেয়েরা ভদ্র ঘরে, রাজ-রাজড়ার ঘরে এই সকল গল্প শুনাইয়া পয়সা রোজগার করিত।

এই গল্পগুলির কতকগুলির নাম গীতি-কথা। গীতি-কথাগুলিই সকলের অপেক্ষা

বেশী পুরাণা। গীতি কথার মাঝে মাঝে গান আছে। গল্পগুলি কি ভাষা কি ভাব—সমস্ত দিক্ দিয়াই খুব অপূর্ব্ব। পুষ্পমালা, রত্নমালা, কাঞ্চনমালা, মালঞ্চমালা প্রভৃতি গল্পগুলি এই গীতি-কথার অন্তর্গত। ইহার প্রত্যেকটি গল্প, এক একটি মণির ন্যায়,—মণিমালার মধ্যে যেমন কৌস্তুভ, এই গীতি কথার মধ্যে তেমনই মালঞ্চমালার গল্প।

বহু তপস্যা করিয়া চন্দ্রপুরের রাজা এক পুত্র লাভ করেন, তাহার নাম রাখা হইল চন্দ্রমাণিক। বিধাতাপুরুষ তার কপালে লিখিয়া গেলেন, তার আয়ু মাত্র ১২ দিন। কিন্তু দেবতারা বলিলেন, যদি ঠিক ১২ বছরের কোন মেয়ের সঙ্গে আঁতুড় ঘরে কুমারের বিয়ে দেওয়া হয়; তবে তার জীবন রক্ষা হইতে পারে।

সেই দিনই ঠিক বার বৎসর পূর্ণ হইয়াছে এমন আর কোন রাজার মেয়ে পাওয়া গেল না। রাজার কোটালের কন্যার নাম মালঞ্চমালা, তার বয়স ১২ বছর। অগত্যা রাজা কোটালের মেয়ের সঙ্গেই দুধের শিশু চন্দ্রমাণিকের বিয়ে দিতে সম্মত হইলেন। কিন্তু কোটালের কন্যা বুঝিল— ছোট লোকের মেয়ে বলিয়া হয়ত রাজা তাকে ঘৃণা করিতে পারেন, তার বাপমাকে অপমান করিতে পারেন, সুতরাং মালঞ্চ বিয়ের আগে কতকগুলি সর্ত্ত বলিয়া পাঠাইলেন—রাজারাণী তাহার হাতে ভাত খাইবেন, রাজবাড়ী হইতে অধিবাসের গন্ধ দ্রব্য যথা দস্তুর পাঠান হইবে, আর রাজা রাজপুত্রকে শ্বশুর বাড়ী যাইতে দিবেন, এবং যদি ১২ দিনের মধ্যে শিশু মারা পড়ে, তবে মৃতদেহটি তাকে দিবেন। রাজা ভারি বিরক্ত হইয়া এই সকল সর্ত্ত কতকটা স্বীকার করিলেন এবং ঘৃণার সহিত যেমন তেমন করিয়া চন্দ্রমাণিকের সঙ্গে মালঞ্চমালার একটা সাত পাক দেওয়াইলেন। সাত দিনের শিশু-কুমার মালঞ্চের কোলে মাথা

রাখিয়া মরিয়া গেল। রাজা বলিলেন, "এই মালঞ্চ ডাইনি"। রাজা যে সকল সর্ত্ত কতকটা স্বীকার করিয়াছিলেন, মালঞ্চ তাহাই মনে করাইয়া দিলেন। রাজা রাগিয়া গিয়া হুকুম দিয়া মালঞ্চের হাত কাটিলেন, নাক কাটিলেন, চোখ উপড়াইলেন এবং শেষে মরা চন্দ্রমাণিকের চিতার মধ্যে মালঞ্চকে ফেলিয়া দিলেন। ঝড় বৃষ্টি হইতে লাগিল, অশ্বরাজ ঘোড়া পাগল হইয়া যাকে পায়, তাকে মারিতে লাগিল। রাজা লোকজন সহ চিতার উপর শিশুর মড়া ও মালঞ্চকে ফেলিয়া আসিয়া রাজধানীর কপাট বন্ধ করিলেন।

কিরূপে অসীম স্নেহ ও তপস্যার বলে মালঞ্চ সমস্ত কষ্ট মাথায় লইয়া শিশু স্বামীকে বাঁচাইয়াছিলেন, কিরূপে চন্দ্রমাণিক বাঘের দুধ খাইয়া মানুষ হইল, স্বামীকে দেখিবার অত্যন্ত ইচ্ছা হইতে কিরূপে মালঞ্চ চক্ষু ফিরিয়া পাইলেন, তাঁহাকে সেবা করিবার একান্ত ইচ্ছা হইতে আবার দুখানি কোমল হাত লাভ করিলেন,—শিশু স্বামীর আধ আধ মিষ্ট কথা শুনিবার লোভে কাণের শক্তি ফিরিয়া পাইলেন,—তার পর ভিন্ন রাজ্যে যাইয়া কিরূপে এক মালিনীর সাহায্যে চন্দ্রমাণিককে লেখা পড়া শিখাইলেন, পাছে শিশু তাকে 'মা' বলিয়া ডাকিয়া ফেলে—এই আশঙ্কায় নিজকে আড়ালে রাখিয়া কি ভাবে তিনি শিশু স্বামীর দিনরাত্র সেবা করিয়াছিলেন—তার বিবরণ পড়িলে প্রতি পাতা চক্ষের জলে ভিজিয়া যাইবে। স্বামী বড় হইয়া দুধবরণ রাজার মেয়ে কাঞ্চীকে বিয়া করিলেন, মালঞ্চের শ্বশুর তাহাকে কুকুর বেড়ালের মত রাজপুরী হইতে তাড়াইয়া দিলেন, তবুও গোপনে কাঞ্চী ও চন্দ্রমাণিকের বাসরঘরে চুপে চুপে ঢুকিয়া মালঞ্চ মৃদুস্বরে এই গানটি গাইতেন—

"সুখে থাইকো, সুখে থাইকো রে রাজপুত্র,
সুখে থাইকো রে রাজ কন্যা।

যদি সতীর মুখের কথা সুপ্রভাতে ফলেরে,
বাসরের বাতি যেন সাত পুরুষে নেহালেরে।
রাজ ছত্র যেন চৌদ্দপুরুষের মাথায় ছত্র ধরে।
জল থল বন বৃক্ষ সজাগ হয়ে থেকোরে।
চোখের পাতা পড়তে যেন উঠেরে আইসো।
রাজমন্দিরের চূড়া যেন অজয় হইয়া থেকোরে
চন্দ্র সূর্য্য যেনরে সুমঙ্গলে হাসে।
আমার শ্বশুরের ঘর,
আমার সোয়ামীর পীড়ি, অক্ষয় করে রেখো তুমি পরমেশ্বর।
রাজ কন্যার আয়ত যেন হাতে পায়ে ক্ষয়েরে।
তুমি আমায় দেও এই বর।
চৌদ্দ ভরা পূর্ণ কর আমার শ্বশুরের সংসার
ওরে আমি জল মাটি হয়ে থাকিমোরে, আমি ভঞ্জিমো কত সুখ।
ওরে আমি পশুপক্ষী হয়ে থাকিমোরে আমি ভুঞ্জিমোরে কত সুখ॥"

তারপর শ্বশুর তাকে কষ্টের শেষ দিয়া, একদিন সত্যসত্যই অনুতপ্ত হইলেন, তখন মালঞ্চ নিরাশ্রয়ভাবে জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন, শ্বশুর জীবনে তাহাকে প্রথমদিন মিষ্টকথা বলিলেন, রাজপুরীতে ফিরিয়া আনিবার জন্য তাহাকে অনুরোধ করিলেন—মালঞ্চ বলিল—

আমার ঘর আমার বাড়ী, আজ যে তুমি আমারে ডাকিলা—
শ্বশুর মহারাজগো ডাকিলা মা বলিয়া॥
আমি স্বর্গ পাইলাম গো এই গহন বনে,
তোমার পায়ের ধূলোর ঘর বাঁধিয়া থাকিব এইখানে॥

মালঞ্চের অভ্যর্থনার জন্য বিপুল আয়োজন হইল, কিন্তু মালঞ্চ সুখভোগের জন্য শ্বশুর বাড়ী আইসেন নাই, তিনি দেহকে অতি তুচ্ছ মনে করিতেন, তিনি কাঞ্চীকেই পাটরাণী করিলেন, কিন্তু রাজ্যের লোক তাকে করিল ঠাকুরাণী।

কাঞ্চনমালার গল্পে দুষ্ট মালিনীর চেষ্টায় সদাগরের পুত্র কাঞ্চনের মুখ দেখেন নাই। কাঞ্চনমালা স্বামীর স্নেহবঞ্চিত হইয়া কষ্টের শেষ পাইয়াছিলেন। স্বামী—পাছে কাঞ্চনের মুখ দেখিতে হয়, এই ভয়ে চোখে কাপড় বাঁধিয়া থাকিতেন। কাঞ্চন এত সুন্দরী হইয়া তার সৌন্দর্য্য স্বামীকে দেখাইতে পারিলেন না, এত ঐশ্বর্য্যের মধ্যে থাকিয়া ও ছেঁড়া কাপড় পরিয়া কষ্টে কুঁড়ে ঘরে কাল যাপন করিতে লাগিলেন, অথচ সর্ব্বদা তাড়িত হইয়া, স্বামী সঙ্গ সুখ হইতে বঞ্চিত হইয়াও স্বামীর মঙ্গল কামনায়—তাঁহার জাহাজের পেছনে পেছনে ছোট্ট একটা ভাঙ্গা ডিঙ্গায় যাইয়া তাঁহাকে সমস্ত বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন।

অবশেষে তিনি আর সহ্য করিতে পারিলেন না। শকুন্তলা দুষ্মন্তের হাতে যে অপমান সহিয়াছিলেন, কাঞ্চনমালা স্বামীর হাতে তদপেক্ষা শতগুণ অপমান ও অত্যাচার সহ্য করিয়াছিলেন। অবশেষে একদিন তিনি মা স্বরস্বতীকে ডাকিয়া দুঃখ জানাইলেন, কাঞ্চন পরিরাজের কন্যা,—তাঁহার পিতার অতুল ঐশ্বর্য্য” এত কষ্ট সহিতেছিলেন, প্রাণপাত করিতেছিলেন, স্বামীর ভালবাসার জন্য। কিন্তু প্রতিদানে যখন স্বামী একদিনও তাঁহার মুখখানির দিকে চাহিয়া ও একবার খেখিলেন না, বছরের পর বছর ঘুরিয়া চলিল; আর সহিতে না পারিয়া সরস্বতীকে ডাকিয়া বলিলেন, “মা আমাকে লইয়া যাও, আমি আর পারি না।” সরস্বতী লইয়া যাইতে আসিলেন, কিন্তু কাঞ্চন চোখের জল লুকাইয়া মুছিতে লাগিলেন, এত কষ্ট যিনি দিয়াছেন, এত শক্রুতা যিনি সাধিয়াছেন,—তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইতে তবু তো পা' চলে না। সরস্বতী

বলিলেন "মা এস, দেরী কচ্ছ কেন ?" কাঞ্চন শেষ বার স্বামীর মুখ লুকাইয়া দেখিতেছিলেন, আর চোখ জলে ভরিয়া আসিতেছিল তিনি বলিলেন "মা একটু দেরি কর, আমি গয়না পরিতেছি।" আবার দেরী হইতে লাগিল; স্বামীকে ছাড়িয়া যাইতে পা' বাধিতে লাগিল; সরস্বতী আবার তাগিদ দিতে লাগিলেন, অশ্রুগদগদ কণ্ঠে মালঞ্চ বলিলেন—মা আর একটু দেরী কর, আমি চুল বাঁধিতেছি।"

তারপর তখন স্বামীকে দেখিতে দেখিতে ছবির মত আকাশের পথে তিনি চলিয়া যান, তখন এই জীবনে সর্ব্বপ্রথম স্বামীর চক্ষে আর তাঁর চক্ষে—চারি চক্ষের মিলন হইল; কাঞ্চন যে এত সুন্দরী তাতো সদাগর জানিতেন না, ডাইনী মালিনী তাঁকে মিথ্যা কথা বলিয়াছিল, এখন কাঞ্চনের দুটি পদ্ম-পলাশ চক্ষু ও সেই দুই চক্ষের স্নেহময় দৃষ্টির ফুলবাণ তাঁর বুকে আসিয়া বিঁধিল। স্বামী তাঁর বিরহে পাগল হইলেন, তার পর কত যে কষ্ট—কত যে বিপদ, পার হইয়া সদাগর আর বার কাঞ্চনকে পাইয়াছিলেন তাহা বলিবার নহে। স্ত্রী স্বামীকে বিবাহের পাদপীঠে বসিয়া পান নাই, স্বামী স্ত্রীকে পুরোহিতের মুখো-শোনা মন্ত্র পড়িয়া পান নাই, উভয়ে উভয়কে তপস্যা করিয়া পাইয়াছিলেন; উভয়ে উভয়ের জন্য পাগল হইয়া পাইয়াছিলেন, মনের একান্ত ভালবাসার দ্বারা পাইয়াছিলেন।

গীতি কথার গল্পগুলি এইরূপ সুন্দর—এককালে ইহা হিন্দু মুসলমান—সকলেই শৈশবে শুনিতেন, বোধ হয় পৃথিবীর কোন সাহিত্যে বাঙ্গলা গীতি-কথার মতন এরূপ উচ্চাঙ্গের কাব্য-কথা নাই।

ইহাদের লেখক কে তাহা জানি না; কিন্তু এই মধুর স্নেহ-রসময়, সংযত, সরল কবিত্ব-পূর্ণ কথাগুলি বাঙ্গালী মেয়েদের মনের কথা যেন আঁকিয়া

দেখাইতেছে। আমাদের বিশ্বাস এইগুলি মেয়েদেরই রচনা, এই গল্পগুলির কথায় কথায় ছড়া কাটাকাটি, ঠিক মেয়েলি ভঙ্গীতে ; এগুলি পড়িতে পড়িতে মনে হয় যেন কথার সাথে সাথে চোখের জল, চুরীর ঠুন ঠুন, প্রাণ সমর্পণ—এবং কোমল হাতের সেবা, চোখের সামনে পাওয়া যাইতেছে।

শঙ্খমালার গল্পে যখন বহু বৎসরের অদর্শনের পর সদাগর তাঁহার স্ত্রীর হাতের রান্না খাইলেন, তখন তাহার মনের ভাবটি কি সুন্দর করিয়াই না বলা হইয়াছে! স্ত্রী যে রান্না করিয়াছেন, সদাগর তা জানিতেন না, স্ত্রী যে পরিবেশন করিতেছেন, তাহা পর্য্যন্ত তাঁহার অজ্ঞাত, রান্না খাইয়া সদাগরের চোক্ষের জল আসিল, তাঁহার মন তাঁহাকে যেন কহিয়া দিল—

"যে রাঁধন খেয়েছি আমি বার বছর আগে,
আজ কেন জিভে আমার সেই রাঁধন লাগে।"

সে স্বাদ কি ভুলিবার ?

তার পর হঠাৎ শঙ্খমালার কপাল হইতে ঘোম্‌টাটি বায়ুবেগে সরিয়া গেল, সদাগর বলিয়া উঠিলেন,

"সেই কপালে সেইটিপ
সাধুর ভিটার সোণার দীপ।"

তখন সখীরা হাসিয়া উঠিল! মিলনের কি সুন্দর ছবি।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।



খোকা।

ওরে আমার সোণার খোকা,
আয়রে ওরে আয় ;
সাত রাজার ধন সোণার মাণিক,
বাজিয়ে নূপুর পায়।
দেখ্‌লে প'রে মুখখানি তোর,
প্রাণ যে ওঠে ভ'রে,
পারি নাকো চোখের আড়াল,
কর্ত্তে আমি তোরে।
'তুলু' 'তুলু' বলে ডাক্‌লে পরে,
অমনি আসিস্‌ ছুটে ;
হৃদয় আমার কল্লি আলো,
ফুলের মতন ফুটে।
স্বর্গ থেকে নেমে এলি,
প্রেম জগতের আলো ;
স্নেহের হরষ পরশ মণি,
স্বরগ সুধা ঢালো !

—কাকিমা—

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

মাত্র একচল্লিশ বছর বয়সে কবি সত্যেন্দ্রনাথ মারা গেলেন। রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে, আজকাল, শুধু বাংলা দেশে নয়, সারা ভারতবর্ষে তাঁর মত শক্তিশালী কবি নাই। তাঁর মৃত্যুতে দেশের কত ক্ষতি হল তা আজ তোমরা বুঝতে পারবে না। বড় হয়ে যখন বাংলা ভাষা ভালো কোরে শিখবে তখন দেখতে পাবে তিনি এই অল্প সময়ের মধ্যে বাংলা সাহিত্যে কত অমূল্য রত্ন রেখে গেছেন। আজ কেবল তাঁর সম্বন্ধে সংক্ষেপে দু'চার কথা বলবো।

বাংলা গদ্যের গৌরবস্থল অক্ষয়কুমার দত্তের নাম তোমরা শুনেছ বোধ করি। তাঁর রচিত 'চারুপাঠ' বাংলার লক্ষ লক্ষ ছেলেমেয়ে পড়েছে। সত্যেন্দ্রনাথ অক্ষয়কুমারের পৌত্র ছিলেন। কলিকাতার উপকণ্ঠে বেলঘরিয়ার নিকটবর্ত্তী নিমতা গ্রামে মামার বাড়ীতে ১৮৮২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সত্যেন্দ্রনাথের জন্ম হয়।

সত্যেন্দ্রনাথের ডাক নাম ছিল 'বোদাই'। শৈশবে সহপাঠীদের কাছে তিনি ঐ নামেই পরিচিত ছিলেন। কলিকাতার দর্জ্জিপাড়ায় ৪৬ নং মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীটে পৈত্রিক ভবনে সত্যেন্দ্রনাথ মানুষ হন এবং সেই বাড়ীতেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। গ্রে ষ্ট্রীট ও চিৎপুর রোড যেখানে মিশেছে সেইখানে একটি স্কুলে সত্যেন্দ্রনাথ শৈশবে পড়তেন। সে স্কুল এখন আর নাই। তৃতীয় শ্রেণী থেকে সত্যেন্দ্রনাথ কলিকাতা সিমলার সেণ্ট্রাল কলেজিয়েট স্কুলে পড়েন, এবং সেখান থেকেই এণ্ট্রান্স্ পরীক্ষা পাশ করেন। তারপর তিনি জেনারেল এসেমব্লিস ইনষ্টিটিউসনে (এখন স্কটিশ চার্চেস কলেজ) বি-এ পর্য্যন্ত পড়েন।

ছেলেবেলা থেকেই তিনি শান্ত ধীর ও চিন্তাশীল। তাঁর বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা



স্বর্গীয় কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

অসাধারণ ছিল। তাঁর বেশ মিষ্ট গলা ছিল, স্কুলে পড়বার সময় অনেক সময় অবকাশকালে তিনি ক্লাশে বোসে গান গাইতেন।

নয় বৎসর বয়সে তিনি কবিতা রচনা আরম্ভ করেন। তাঁর সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত দীর্ঘ কবিতার নাম 'সবিতা'। উহা ১৩০৫ সালে রচিত। কবির বয়স তখন মাত্র ষোল বৎসর। এখন ঐ কবিতাটি সত্যেন্দ্রনাথের 'হোমশিখা' নামক কাব্যগ্রন্থে স্থান পেয়েছে। তারপর তাঁর 'সন্ধিক্ষণ' নামক কবিতা পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয় (১৩১২)।

কবিজীবনের আরম্ভে সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর পিসতুতো ভাই প্রকাশ মিত্রের কাছে যথেষ্ট উৎসাহ পেয়েছিলেন। তিনিই প্রথমে সত্যেন্দ্রের মনে সাহিত্য রসবোধ জাগিয়ে তোলেন। পরে তাঁর সাহিত্যসেবী মাতুল শ্রীযুক্ত কালিনাথ মিত্রও সত্যেন্দ্রকে সাহায্য করেছিলেন। তবে সত্যেন্দ্রের প্রতিভা জন্মগত। পাঠে তাঁহার অদ্ভুত অনুরাগ ছিল। তিনি একাধারে পণ্ডিত ও কবি ছিলেন। ইংরেজি ও বাংলা ভাষা ছাড়া তিনি ফরাসী, সংস্কৃত ও আরবী ভাষা শিখেছিলেন। লেখাপড়া ছাড়া জীবনে আর কোনো বিষয়ে তাঁর তেমন অনুরাগ ছিলনা। তিনি অনেক টাকা খরচ কোরে বিশ্বের বহু শ্রেষ্ঠ কবি সাহিত্যিক ও পণ্ডিতের রচনা সংগ্রহ করেছিলেন। তিনি সকল বিষয়েই অধ্যয়ণ করতে ভালো বাসতেন। তাঁর পাঠাগারে আলমারিতে স্তরে স্তরে সাজানো ভালো ভালো বই দেখে চোখ জুড়িয়ে যেত। তেমন লাইব্রেরী আমাদের দেশে খুব অল্পই আছে।

সত্যেন্দ্রনাথ খাঁটি বাঙালি ছিলেন। শিশুকাল থেকেই তিনি দেশভক্ত। তাঁর কবিতার মধ্যে আগাগোড়া বাংলার প্রতি ভারতের প্রতি তাঁর গভীর ভালবাসা ও অটল ভক্তি আগুনের শিখার মত দীপ্ত উজ্জ্বল হয়ে আছে। ষোল বৎসর বয়সে কবির প্রথম প্রকাশিত কবিতা 'সবিতা'য় পড়ি—

ভারত,—ভারত-মাতা, জননী আমার,
আজি কেন তোমার সন্তান—
অলস, অবশ হেন—প্রাণহীন সম ?
হারায়েছে সে পূর্ব্ব সম্মান।
কোথা সে উৎসাহ, বল,—
লঙ্ঘিল যে বিন্ধ্যাচল,
কোথা আজি—কোথা আজি, হায়,
সে প্রতিভা, জ্ঞান-প্রভা, বিশ্ব মুগ্ধ যায়।

তারপর প্রকাশিত 'সন্ধিক্ষণে'ও সেই সুর শুনতে পাই—

অর্থের সম্বন্ধ হতে কত উচ্চতর
মনুষ্যত্ব—দেশহিত ব্রত ;
স্বার্থ সাথে স্বদেশের বিরোধ যেথায়
স্বদেশেরি পায়ে হও নত।
এ কথা না ভুলে রও—
'তুমি শুধু তুমি নও—
দশের মাঝারে একজন ;
দেশের—দশের শুভে কল্যাণ আপন।'

তাঁর এগারো বছর বয়সে লেখা 'স্বর্গাদপি গরীয়সী' নামক কবিতায় আছে—

অসুরে ঘিরেছে, হায়, কল্প-তরুবরে,
দেবতার কামধেনু দানবে দুহি'ছে!

আজি হ'তে অন্বেষি' ফিরিব ঘরে, ঘরে,
কোথা ইন্দ্র ?—ব'লে দেগো, কাঁদিসনে মিছে।

সে যে তোর অস্থি দিয়ে গ'ড়ে দিবে অসি ;
অয়ি বঙ্গ ! অয়ি স্বর্গ ! অয়ি গরীয়সি !

বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের সময় সত্যেন্দ্রনাথের কয়েকটি গান লোকের মুখে মুখে শোনা যেত। যেমন—

তুই যে রে ভাই সেই বাঙালি !
ধনপতির লক্ষপতির বংশ কেন আজ কাঙালি ?
দিন থাকিতে দিন কিনে নে,
আপন পন্থা নে রে চিনে,
স্থানহারা মানহারা হ'য়ে থাকবি কি রে চিরকালই ?

অথবা—

মাতৃমন্ত্র অন্তরে রাখি,
স্বদেশের ধূলি মস্তকে মাখি,
নব আনন্দে উজ্জ্বল আঁখি—
গাহ "বন্দে মাতরম্"।
গাহ শস্য শ্যামল মাঠে,
গাহ গঞ্জে, বন্দরে, হাটে,
অন্দরে, পথে, নৌকায় রথে—
গাহ "বন্দে মাতরম্"।

দেশকে তিনি এত ভালোবাসতেন, ভক্তি করতেন বটে, কিন্তু দেশের অন্যায়

বা অবিচার তিনি কখনো সমর্থন করতেন না। তিনি অসত্য অন্যায় ও অবিচারের শত্রু ছিলেন, তা সে দেশেরই হোক বা বিদেশেরই হোক।

ছোটদের জন্য তিনি কত চমৎকার কবিতা রচনা করতে পারতেন তা তাঁর 'ইঁদুরের মোকর্দ্দমা' থেকে বেশ বোঝা যায়। এই কবিতাটি শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের শিশুপাঠ্য বই 'ঝুমঝুমি'তে আছে। তা থেকে একটুখানি তুলে দিচ্ছি—

দল বেঁধে তারা দিনেও ডাকাতি করে,
মাচার উপরে বেড়ায় ভঁাড়ার ঘরে ;
করে বাঁশবাজী! চ'ড়ে বসে কড়িকাঠে,
যা পায় সমুখে 'কুটুর কুটুর' কাটে!
উভ পায়ে তারা বসিতেও বেশ পটু,
পুঁথি লয়ে যেন পড়ে ব্রাহ্মণ বটু!
মন্দিরে রাতে ঠাকুরের নাক কাটে!
নিরিবিলি বসি রংটুকু সব চাটে!
সরা উলটায়ে হাঁড়ীর ভিতরে ঢুকে,
ভাত চুরি ক'রে পলায় গো এঁটোমুখে!

*　　*　　*

নূতন বধূর ইয়ারিং চুরি ক'রে,
বিনা প্রয়োজনে নিয়ে যায় নিজ ঘরে!
চুরি করে তার চিরুণি চুলের দড়ি,
বধূ ঘরে ঢুকে দেখে সব ছড়াছড়ি!

পায়না নোলোক, চাকরাণী হয় দুখী,
বাবুদের হাতে চাকরেরা খায় ঘুঁষি!
রাত্রে খোকার দুধের বাটীতে নায়,
ঝিনুক বাজায় কিচিমিচি গান গায়!

সত্যেন্দ্রনাথ জগতের বিভিন্ন ভাষার অনেক শ্রেষ্ঠ কবিতা ও নাটক বাংলায় অনুবাদ কোরে রেখে গেছেন। সে অনুবাদ এত সুন্দর যে পড়লে অনুবাদ বলেই মনে হয় না। সেগুলি তাঁর 'তীর্থ-সলিল', 'তীর্থরেণু', 'মণি-মঞ্জুষা' ও 'রঙ্গমল্লী' নামক বইয়ে আছে।

সবশুদ্ধ তেরখানি বই তিনি রেখে গেছেন। তা ছাড়া তাঁর লেখা অনেক কবিতা নানা মাসিক পত্রের পাতায় ছড়ানো আছে। সেগুলি এখনো সংগ্রহ করা হয়নি। তাঁর ভাষা কত সুন্দর, তিনি কত নতুন ছন্দ সৃষ্টি করেছিলেন, কত নতুন শব্দ তাঁর লেখায় তিনি ব্যবহার করেছেন, এ সব কথা, বাংলাভাষার চর্চ্চা করলে একদিন তোমরা বুঝবে।

বাংলার ছেলেদের তিনি যে কত ভালোবাসতেন, তাদের উপর তাঁর কত আশা ছিল তা তাঁর 'ছেলের দল' পড়লে বোঝা যায়। আমরা একটুখানি তুলে দিচ্ছি—

হল্লা ক'রে ছুটির পরে ওই যে যারা যাচ্ছে পথে,
হাল্কা হাসি হাসছে কেবল,—ভাসছে যেন আল্‌গা স্রোতে,
কেউবা শিষ্ট, কেউবা চপল, কেউ বা উগ্র, কেউ বা মিঠে ;
ওই আমাদের ছেলেরা সব, ভারনা যা' সে ওদের পিঠে।

ওই আমাদের চোখের মণি, ওই আমাদের বুকের বল,
ওই আমাদের অমর প্রদীপ, ওই আমাদের আশার স্থল,
ওই আমাদের নিখাদ সোনা, ওই আমাদের পূণ্যফল,
আদর্শে যে সত্য মানে—সে ওই মোদের ছেলের দল।

সত্যেন্দ্রনাথ উত্তর ভারতের নানা স্থানে ভ্রমণ কোরে হিন্দু মুসলমানের প্রাচীন কীর্ত্তি দেখেছিলেন। তাঁর বড় সাধ ছিল একবার যবদ্বীপে গিয়ে ভারতের শিল্পীর অক্ষয় কীর্ত্তি 'বোরোবুদর' দেখে আসেন: সে সাধ তাঁর পূর্ণ হয়নি।

কয়েক বছর থেকে তাঁর চোখ খারাপ হওয়ায় ডাক্তারেরা তাঁকে পড়াশুনা করতে বারণ করেছিলেন। মাত্র ক'বছর আগে তিনি হেদুয়ায় সাঁতার শেখেন এবং তখন থেকে তিনি ঐ সাঁতার ক্লাবের একজন প্রকৃত হিতৈষী হন। প্রতিদিন সকালসন্ধ্যায় তাঁকে সাঁতার ক্লাবের তাঁবুতে বোসে থাকতে ছাখা যেত। ছোট বড় সকলের সঙ্গেই তিনি বন্ধুভাবে মিশতেন। সাঁতার ক্লাবের ছেলেরা তাঁর ভারি ভক্ত ছিল।

তোমরা যদি তাঁর দেশভক্তি, তাঁর পাণ্ডিত্য, তাঁর প্রতিভা, তাঁর সত্যনিষ্ঠার অধিকারী হতে পার তাহলে তোমরাও ধন্য হবে, বাংলা দেশকেও ধন্য করতে পারবে। তোমাদের উপর সত্যেন্দ্রনাথ অনেক আশা রাখতেন, সে আশা ব্যর্থ কোরোনা।

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

নূতন ধাঁধা।

১। তিন অক্ষরে নাম মোর, মনুষ্য রতন
ছেলে-মেয়ের মা'র কাছে অশেষ যতন ;
দূত আমি হই নিজে, বহে যাই বারতা,
আদ্যাক্ষর করে ত্যাগ—খেতে ভাল লাগে তা।
শেষাক্ষর ছেড়ে দিলে জলে ভরে যাই—
কাসির সে খক্ খক্—মধ্যাক্ষর ছাড় যদি ভাই।

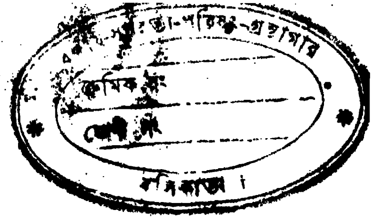
শ্রীরবীন্দ্রকুমার বসাক।



২। ও ভাই—ঐ দেখ যেন একটা সং,
রঙ মাখে নি, সং সাজে নি, তবু কত ঢং।
তিন অক্ষরে নামটা তার শুন্‌লে ঘেন্না হয়,
শেষাক্ষর দিলে বাদ—নারী শ্রেষ্ঠা হয় ;
ধরে বুকে, দেয় সে চুমু, আদর কত করে,
মাঝেরটি দিলে বাদ গুদম ঘরে পোরে
আর প্রথম অক্ষর ছাড় যদি ভাদ্দর মাসে ভাই,
দেখ্‌তে তুমি পাবে তারে—করবে খাই খাই।
সেটাই আবার পিঠে পড়ে, থাকে গানের সাথে,
বল্‌তে যদি পারো বুঝি—বুদ্ধি আছে মাথে।

শ্রীবিজনপ্রভা দেবী।

ধাঁধার উত্তর (জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়ের) যাঁহারা উত্তর দিয়াছেন ও দিবেন, আগামী মাসে তাঁহাদের নাম বাহির হইবে।



আমার দেশ

র্ষ, ৭ম সংখ্যা । শ্রাবণ, ১৩২৯ ।

বর্ষা ।

বর্ষা আসিল পথে
কাদা প্যাঁচ প্যাঁচ
সর্দ্দি লাগিয়া সবে
হাঁচে ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ ।
চালায় কুকুরগুলো
কাঁপে ঠক ঠক্
পুকুরেতে ব্যাঙগুলো
ডাকে মক্‌মক্ ।

উঠানে জমিয়া জল
করে বজ্ বজ
খেলতে না পেয়ে ভজা
করে গজ্ গজ্ ।
ভরে’ গেল ডাঙা ডোবা
খাল বিল ঝিল
কই মাছ অই যায়
করে কিল বিল ।

হেঁসেলে জ্বলেনা চুলো
ভিজে কাঠ মুঠ
নিভে যায় দুইবার
করে ফাট ফুট।
খোলা খাটে মাতামাতি
করে দুপ দাপ
চিকুর হানিলে ঘরে
সবে চুপ চাপ।
মেঘ ডাকে বাজ হাঁকে
কড় কড় কড়
খুকী উঠে আঁৎকিয়ে
ধর ধর ধর।
মা ছুটে আসিয়া বলে
"ষাট ষাট ষাট"
খোকা বলে আধ আধ
তাট তাট তাট।
কোথা হতে বাঁদরেরা
করে উপ আপ
আপথে আছাড় খায়
কারা ধুপ ধাপ।
জল পড়ে ঝম ঝম
ঝুপ ঝুপ ঝুপ
খোকারা খিঁচুড়ী খায়
ক'র' সুপ সুপ।

শ্রীকালিদাস রায়।

নেকড়ে।

পৃথিবীময়ই প্রায় নেকড়ের বসবাস, তবে উত্তর এসিয়া ও ইওরোপে এই শ্রেণীর জীবটীর প্রচণ্ড প্রতাপ। তার সঙ্গে তুলনা করি এমন নেকড়ে আমাদের দেশে নাই, অথচ এখানেই তাকে একেবারে বাঘের কোটায় চড়িয়ে আমরা বাঘের সম্মান করি,—বস্তুতঃ সে শিয়াল কুকুরেরই জাত। কাজে কাজেই স্বভাবটাও ঐ ধরণের বনে জঙ্গলে, পাহাড় পর্ব্বতে, তারা দলবেঁধে বাসা করে সেইখানে সারা দিনের বেলাটা ঘুমিয়ে কাটিয়ে রাত্রে শিকারের চেষ্টায় বার হয়। ভোগা দিয়ে ফন্দি করে খেতে এরা বড় মজবুত, তাই সাহসের চেয়ে চালাকীর কসরতটাই বেশী হতে থাকে।

শীতের গোড়াগুড়ি উত্তর এশিয়া ও ইওরোপ বাসী নেকড়েদের চরিত্রের ইতিহাস একটু একটু করে বদলাতে স্থুরু হয়। রাত্রে খাবার তেমন ভাল মেলে না, তাই দিনের বেলায় ঐ চেষ্টা বেষ্টা একটু খোঁজা খুঁজি করতে হয়। তখন মেষ পাল হতে ভেড়ার ছানা চুরি হতে থাকে; কুকুর অত সাবধানী রক্ষক হয়েও তা টের পায় না। বাড়ী ফেরবার পথে মেষ পালক দেখে একটী ছানা কম পড়চে। তারপর কণ কণে শীত পড়বার সঙ্গে সঙ্গে অনবরত বরফ পড়ে পড়ে যতদূর দেখা যায় সব শাদা হয়ে উঠে। রাখাল আর গরু চরাতে বেরোয় না, মেষ পালক তার ভেড়ার দল খোঁয়াড়ে বন্ধ করে রেখে দেয়। তখন ত মহা মুস্কিল! পেটের জ্বালায় পচা ফল মূল, মরা ইঁদুর খেতে থাকে—শেষে তাও ফুরিয়ে গেল। এক বিরাট বরফের মরুভূমি ভিন্ন কিছুই আর নজরে পড়ে না। ক্ষিদের জ্বালায় তাদের চালাকী ভাঁড়ামী সব গোলমাল হয়ে যায়। ভয় কেটে যায়, মরিয়া হয়ে তারা চারিদিক ছুটোছুটি করতে থাকে। যে দিকে দেখে, একেবারে সেই ধু ধু করচে অগাধ মাঠ বিকট বিজন। তার

উপর দিয়া নিশীথ রাতে পথ ভ্রষ্ট হয়ে, ছেলে বুড়ো রুগ্ন অবশ এমন হাজার হাজার নেকড়ে ক্রোশ ক্রোশ ছুটে চলেচেই-বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই।

তাদের গা ভরা রোঁয়া জড়াজড়ি করে ধুলোয় ও হিমে শক্ত হয়ে, থোলো থোলো ঝুলচে, পাঁজরার হাড় জির জির করচে ;—টেরা টেরা চোখ, ধক ধক করে জ্বলচে, পলক নাই, ঘুম নাই। সবার চেয়ে বিষাদময় তাদের হাঁ-করা মুখ তার ভিতর দিয়ে ফেনায় ভরা লম্বা জীভটা আগুনের শিখার মতন লক লক করতে থাকে। এই সময়টা এরা বড়ই কাণ্ডজ্ঞানহীন হয়ে পড়ে। গ্রামের লোকদের অত্যন্ত সাবধানে থাকতে হয়, বিশেষতঃ ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের বড়ই নজরে নজরে রাখা চাই। রাতে লোকচলাচল বন্ধ থাকে, সন্ধ্যার পর থেকে, গোয়াল, খোঁয়াড়, আস্তাবল, ঘর সবের দরজা আঁটা থাকে, তবুও এই সব বন্ধ দরজার আশে পাশে, স্তূপাকার বরফের উপর থুক থুকে থাবার দাগ সকালে উঠে প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায়। এরা অসমসাহসের এমনিই কতকগুলি বড় বড় নজির রেখে গেছে যা সত্যই বিস্ময়কর। ১৪৫০ খৃঃ শীতকালে ফরাসীদেশের রাজধানী প্যারী নগরে যখন একদল নেকড়ে এসে হাজির হলো, তার ঠেলা সামলাতে সহরবাসীদের অনেক নাকাল হতে হয়েছিল। ১৪৯৪ খৃঃ শেষাশেষি অল্পস পর্ব্বতমালার সংলগ্ন সমতল ভূমিতে এমন দলে দলে নেকড়ে এসে পড়লো যে দস্তুরমত সৈন্য সামন্ত দিয়ে তাদের তাড়াতে হয়। আর সেদিনও ত রুমেনিয়া দেশে এই গেল শীতকালে ঘরে ঘরে ঢুকে ঘুমন্ত ছেলে মেয়েদের তাদের মা বাপের চোখের সামনে টুকরো টুকরো করে ফেলেছিল। রুষের অন্তঃপাতী সাইবেরিয়া দেশের ত কথাই নাই—সাইবেরিয়া বরফের দেশ বল্লেই হয়। গাড়ীর চাকা বরফে গেঁথে যায় বলে সেখানে চাকা শূন্য গাড়ীর প্রচলন। তাকে 'শ্লেজ্' বলে, তুটো ঘোড়ায় টানে। রাত ভিতে

এই 'শ্লেজে' করে যাওয়ার মতন বিপদ আর কিছুই নাই। একবার নেকড়ের খব্বরে পড়লেই যাত্রীদের দফা শেষ। যত জোরেই ঘোড়াছুটি ছুটুক আর যত দূরেই নেকড়ের দল থাকুক—অল্পসময়ের মধ্যে এই ব্যবধান সংকীর্ণ হয়ে আসে। অনাহারী মৃতকল্প এই জানোয়ার গুলো কি করেই যে এত জোর জোটে তা আশ্চর্য্যের কথা। যখন খুব কাছা কাছি হয়ে আসে—কালো রাত্রের অন্ধকারে ধূসর বর্ণের রাঙ্গা মূর্ত্তি গুলি চোখের উপর ছম ছম করতে থাকে—তখন যাত্রীরা সসব্যস্ত হয়ে একটা ঘোড়াকে খুলে দিয়ে—আরেকটার সাহায্যে পালাবার আয়োজন করে। অবিলম্বেই সেই পরিত্যক্ত ঘোড়াটাকে টুকরো টুকরো করে ফেলে বটে কিন্তু তাতে ঐ দলের শতাংশের একাংশের পেট ভরে না; অথচ চোখের উপর দিয়ে বড় আর একটা শিকার পালায়, তাই যারা পিছিয়ে পড়েছিল কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে যেমন ছুটে আসছিল তেমনি ছুটতে থাকে। এখন যাত্রীদের প্রাণবাঁচান দায়—তারা যদি মাথা ঠিক রাখতে পারে, না—হয় বন্দুক করে গোটা কতককে মেরে ফেলে। নয় নিজেরাই মরে তারপরই মহাসমারোহ ভোজের দ্বিতীয় পুংক্তি বসে। রক্তাক্ত কখানা হাড় আর তারি আশে-পাশে জামার ছেঁড়া ছেঁড়া টুকরা ছাড়া আর কোন চিহ্নই থাকে না।

ক্ষিদের চোটে যে কেবল মানুষের ভয় কাটিয়ে উঠে দল বেঁধে তাদের শিকার করবার জন্য ওৎ পেতে থাকে সেইটেই একমাত্র বিস্ময়কর বস্তু নয়। তাদের চরিত্রের আর একটু আভাস দিয়ে, তাদের কথা শেষ করব। মনে করো পাশা পাশি দুটা নেকড়ে ছুটে চলেচে—গুলিখেয়ে একটা মরে গেল। অপরটী তখনই ঐ মৃতদেহটা একটু দূরে টেনে নিয়ে গিয়ে ক্ষতস্থান থেকে রক্ত খেতে থাকে। এই ঘটনাটা খুব বেশী সাধারণ বলে তাদের স্বভাবের মধ্যেই গণ্য হয়ে গেছে।

শ্রীজ্যোতিশচন্দ্র সিংহ।

উদ্ভিদের খাদ্য।

আজ তোমাদের গাছের খাদ্য সম্বন্ধে দু'একটী কথা বলিব। এটা নিশ্চয়ই তোমাদের জানা আছে যে মানুষ, গরু, ঘোড়ার ন্যায় গাছেরও প্রাণ আছে, প্রাণীরা যেমন খাদ্য না হইলে বাঁচে না, গাছেরও তেমনি খাদ্য না হইলে চলে না। গাছের খাদ্য মাটির সঙ্গে থাকে, শিকড় দ্বারা গাছ জমি হইতে খাদ্য টানিয়া লয়। সেইজন্য যে জমিতে গাছের খাদ্য প্রচুর পরিমাণে থাকে সেই জমিতে গাছ খুব সতেজ—ফলবান হয়; সেই জমিকেই উর্ব্বর বলে। বিজ্ঞানের বলে তোমরা কত অসম্ভবকে সম্ভবে পরিণত হইতে দেখিতেছ সেই বিজ্ঞানের বলেই, যে জমিতে গাছের খাদ্য প্রচুর পরিমাণে না থাকে, সেখানে গাছের খাদ্য যোগান দেওয়া হয়। জমিতে সার দেওয়ার নামই খাদ্য যোগান দেওয়া। এই সার কিরূপে এবং কি কি উপাদানে প্রস্তুত হয় তাহারই দু'একটী কথা তোমাদের বলিতেছি। সাধারণতঃ শুষ্ক গোবরকেই তোমরা জমির সার বলিয়া জান। তাছাড়া খইল ও জমির উত্তম সার, তেড়ীর সরিষার, চিনাবাদামের খইলই সাররূপে ব্যবহৃত হয়। এতদ্ভিন্ন সার অনেক রকম আছে এবং প্রত্যহ নূতন নূতন রকম প্রস্তুত প্রণালী উদ্ভাবিত হইতেছে। এই সার প্রস্তুত প্রণালী কোনও জর্ম্মন কোম্পানী দ্বারা এদেশে প্রথম প্রচলিত হয়। কিন্তু এখনও ইহা ভারতে সম্যক রূপে প্রচলিত হয় নাই। মাত্র ইংরাজ চা-ব্যবসায়ীগণ ইহার আবশ্যকতা বুঝিয়া ইহা ব্যবহার করিয়া আশাতীত ফসল উৎপন্ন করাইতেছে। গত মহাযুদ্ধের সময় ভারত হইতে সমস্ত জর্ম্মণ কোম্পানী উঠিয়া গেলে কয়েকটী ইংরাজ কোম্পানী এই ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছেন। বাঙ্গালীও এ বিষয় অভিজ্ঞ হইয়াছেন। যাহা হউক আশা করা যায় শীঘ্রই

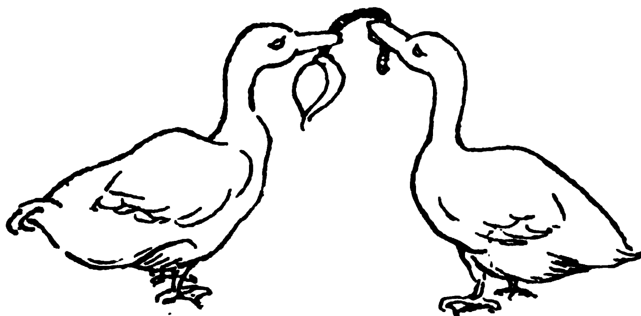
ইহার আবশ্যকতা আমাদের আশিক্ষিত চাষীগণ পর্য্যন্ত বুঝিতে পারিবে এবং ভারতের জমির উর্ব্বরতা শক্তি দিন দিন বৃদ্ধি পাইবে।

সাধারণতঃ পচা জিনিষ হইতেই সার প্রস্তুত হয়। যে সমস্ত জিনিষ দ্বারা সার তৈয়ারি হয় তাহাদের কয়েকটীর নাম করিতেছি। ইহাদের সঙ্গে রাসায়নিক সার মিশ্রিত করিয়া এক এক প্রকার (mixture) মিশ্রিত সার প্রস্তুত করিবার বিষয় অন্য তোমাদের বলিব। এর কতকগুলি সাধারণ মৃত জীব জন্তুর দেহ হইতে উৎপন্ন হয় সেই জন্য ইহাদের Animal products বা প্রাণীজ সার বলে। মৃত জীব জন্তুর হাড় শিং সিদ্ধ করিয়া চূর্ণ করা হয়। এই সিদ্ধ হাড়চুর্ণ হইতে অতি উত্তম সার প্রস্তুত হয়। ইহাতে Nitrogen এবং Phosphate আছে। গরু মহিষ প্রভৃতির ক্ষুর, শিং সিদ্ধ করিয়া চূর্ণ করা হয়—তাহাতে ও উত্তম সার প্রস্তুত হয়, ইহাতে হাড় চূর্ণ অপেক্ষা বেশীভাগ Nitrogen আছে; সে কারণ উঁহা অপেক্ষা দামী জিনিষ। মৃত জীবজন্তুর মাংসটা সিদ্ধ করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া গুঁড়া করিয়া লইলে তাহা দ্বারা অতি উত্তম সার প্রস্তুত হয়। মৃত দেহের চামড়ার উপর হইতে চাঁচিয়া যে মাংসটা ফেলা হয় সেটা arsenic কিংবা চূন দ্বারা জরাইয়া রৌদ্রে শুকাইয়া একপ্রকার সার হয়। জীব জন্তুর নাড়ী ভূঁড়ি রৌদ্রে শুকাইয়া তাহা দ্বারাও একপ্রকার সার তৈয়ারি হয়। সর্ব্বশেষে, জীব জন্তুর রক্ত—ইহা সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম সার; ইহা জ্বাল দিয়া জলাংশ বাদ দিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া গুঁড়া করিয়া একরূপ সার প্রস্তুত হয় ইহাতে প্রায় শতকরা ১২ভাগ Nitrogen থাকে। এমন কি তোমরা পাঁঠা খাও তাহার চামড়া দিয়া ঢাক ঢোল তৈয়ারি হয় তাহাই জান কিন্তু যে গুলি অসাবধানবশত কাটা হয় তাহার চামড়াগুলি ছোট হইয়া গেলে তাহার দ্বারা ঢাক্ ঢোল তৈয়ারি হয় না—সে গুলি কি

মনে কর ফেলিয়া দেওয়া হয়? না—সেগুলি টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া একরূপ সার তৈয়ারি হয়। গরু মহিষের চামড়া দিয়া জুতা তৈয়ারি হয় তোমরা জান কিন্তু জুতা তৈয়ারি করিবার সময় চামড়ার যে সকল ছাঁট কাট বাদ দেয় সেই সমস্ত কুঁচো চামড়া (scrabs) দিয়াও সার তৈয়ারি হয়। তোমরা ছেঁড়া জুতা যাহা রাস্তায় ফেলিয়া দাও সেগুলিও আগুনে ঝলসাইয়া তাহা দ্বারা একপ্রকার সার তৈয়ারি হয়। অতএব দেখিতেছ পৃথীবীতে কোনও জিনিষই ফেলা যায় না। জীব জন্তুর মৃতদেহ দিয়া যত প্রকারের সার তৈরী হয় তাহা অদ্য তোমাদের বলিলাম; পরের বার রাসয়নিক দ্রব্য সংমিশ্রনে যত প্রকার সার হয় তাহা তোমাদের বলিব। একটা কথা বলিতে ভুলিয়াছি, এই সমস্ত ব্যবহার বিধিও বিভিন্ন। যা তা দিলেই হয় না, যত খানি ইচ্ছা দিলেও হয় না। ইহার পরিমাণ আছে এবং সব স্থানে একরূপ পরিমাণ হয় না; একরূপ জিনিষ ব্যবহার হয় না। স্থান বিশেষে সার বিভিন্ন প্রকারের বিভিন্ন পরিমাণ দরকার হয়। যেমন যে জমিতে Nitrogen এর অভাব সে স্থানের ব্যবহারের জন্য সারে Nitrogen বেশী থাকিবে; যে জমিতে Phosphoric acid কম তাহাতে দিবার সারে Phopshoric acid বেশী থাকিবে। সে কারণ প্রত্যেক জেলার জমি পরীক্ষা করিয়া সেই অনুযায়ী মিশ্রিত সার ব্যবহৃত হয়। আবার সার বেশী ব্যবহার করিলে সমস্ত ফসল নষ্ট হইয়া যায়। কাজেই এই সমস্ত সার খুব সাবধানে ব্যবহার করিতে হয়। এবং সাবধানে ও নিয়মিত পরিমাণে ব্যবহার করিলে এই সমস্ত সার দেওয়া জমিতে আশাতীত সুফল উৎপন্ন হইয়া থাকে। - জমির উর্ব্বরা শক্তি দিন দিন কমে। এক বিঘা জমিতে এ বৎসর যদি ১০ মণ ধান জন্মে, আগামী বর্ষে হিসাব রাখিলে ৯ মণ ফলিতে

দেখা যাইবে, পরের বৎসর আরও কমিবে। আমাদের দেশের চাষীরা জমিতে ফসল দেয় বটে, কিন্তু সে সেই এক ঘেয়ে একই রকমের সার দেয় জমির উর্ব্বরা শক্তি তাহাতে বিশেষ যদি না ও কমে, বাড়ে না নিশ্চয়ই। সেই জন্য নূতন নূতন সার দিয়া জমিতে অধিক ফসল উৎপন্ন করার চেষ্টা যাহাতে আমাদের দেশের চাষীদের হয় তাহাই করা উচিৎ। চাষীরা সে শিক্ষা পাইলে ফসল প্রচুর জন্মিবে, ফসল জন্মিলে দেশে আর কোন অভাব থাকিবে না, সোণার দেশ সত্যই দিনে দিনে সোণার দেশ হইয়া উঠিবে।

শ্রীশিশির কুমার বসু



শিংনড়ী।

অটল ঘোষের মারকুটে গাই
শিংনড়ী তার নাম
বেচতে গেলে কেউ কেনে না
না নিলে ও দাম।

দেখতে পেলেই করবে তাড়া
পালিয়ে যাওয়া দায়,
গ্রামের লোকের ফসলগুলি
যখন তখন খায়।

হাজার বেঁধে আটক করে
রাখতে নারে ঘোষ,
গ্রামের লোকে সন্ধ্যা সকাল
দেয় যে তারি দোষ।

নূতন তখন রেল খুলেছে
ট্রেনটী আসে যায়,
ফোঁস ফুসিয়ে সকল গরু
চতুর্দ্দিকে ধায়।

আড়াইটার ট্রেন লেট হয়েছে
আসছে বিকাল বেলা,
ছেলের দলের কেউ জানেনা
করছে রেলে খেলা।

এমন সময় আচম্বিতে
আসলো রেলের গাড়ী,
সকল বালক পালিয়ে গেল
শব্দ শুনে তারই।

একটী ছেলে ছুটতে নারে
রইলো পড়ে পাছে
রক্ষা কর রক্ষা কর
ট্রেন যে এলো কাছে।

সময় নাই ওই রে বুঝি
ওই রে চাপা গেল,
ওই হোতাকে তড়িৎ বেগে
হঠাৎ ছুটে এলো!

বালককে হায় এক ঠেলাতে
ফেলে কাশের দলে,
পালাতে হায় পারলো নাক
পড়লো রেলের তলে।

রক্তে রাঙ্গা রেলের চাকা
দেখলে সবে ছুটে,
অটল ঘোষের গাইটা আহা
ধুলার মাঝে লুটে।

পিছন দিকের একটী পা তার,
কেটেই গেছে ভাই
যা হ'ক ছেলের প্রাণ বাঁচালে
শিংনড়ী সেই গাই।

ছেলেটী নয় অন্য কেউ আর
জমিদারের নাতি,
অতবড় বংশেরি হায়
চতুর্দ্দশীর বাতি।

অটল আসি বললে কাঁদি
ওরে সোণার গাই
কি দিয়ে ঋণ শুধবো রে তোর
ভাব্‌ছি শুধু তাই।

সর্ব্বনাশ যে আজকে হ'ত
হলে বালক খুন
সার্থক তুই খেয়েছিলি
খল্‌ছানি ও নুন।

জমিদারের নয়ন সজল
কাঁপছে তাঁহার গা
বলেন তুমি ভগবতী
সত্য তুমি মা।

রক্ষা তুমি করলে আজি
বংশেরি এই চিণে
ছেলের ব্যথা বুঝবে কে মা
মায়ের জাতি বিনে।

গাভীর এখন অবাধ গতি
গ্রামের সকল ঘরে,
প্রতি দিবস দু'সের খইল
বরাদ্দ তার তরে।

পা'টী খোঁড়া বেড়ায় ঘুরে,
ছুটতে নারে আর
সকল লোকে সদাই করে
আদর যতন তার।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

মরা ইন্দুর (মৃত-মূষিক)

'দিন ক্ষণ' দেখিয়া কোন কাজ আরম্ভ করার বিধি আমাদের দেশে আছে। পাঁজী পুঁথি দেখিয়া আজও আমাদের দেশের লোক বিদেশে যাত্রা করিয়া থাকেন; পাঁজীর শুভদিনের নির্ঘণ্ট খুলিয়া বিবাহের দিন স্থির হয়, ব্যবসা আরম্ভ করা হয়, ছেলের অন্নপ্রাশন কার্য্য সম্পন্ন হয়। মাহেন্দ্র ক্ষণে যাত্রা করিলে কার্য্য সিদ্ধির সম্ভাবনা থাকে; শুভলগ্নে বিবাহ হইলে বর ও কন্যার জীবন সুখময় হয়, শুভক্ষণে ব্যবসা আরম্ভ করিলে সিদ্ধি লাভ হইয়া হইয়া থাকে—সেই সিদ্ধি লাভেরই একটী গল্প তোমাদের বলিব।

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব নামে বারাণসীতে একজন শ্রেষ্ঠী বাস করিতেন। তাঁহার মত বিদ্বান, বুদ্ধিমান লোক সে সময়ে আর ছিল না। তিনি আকাশের গ্রহ নক্ষত্রাদি দেখিয়া শুভাশুভ ফলাফল নির্ণয় করিতেন। একদিন বোধিসত্ত্ব রাজদর্শনে যাইতেছেন, পথিপার্শ্বে একটি মরা ইন্দুর পড়িয়া ছিল। বোধিসত্ত্ব আকাশের নক্ষত্র পরীক্ষা করিতেই দেখিলেন: লগ্ন অতি শুভ! বলিলেন—আজ যদি কেহ এই মৃত ইন্দুরটা লইয়া গিয়া ব্যবসা আরম্ভ করে—তবে সে ব্যবসায়ে প্রভূত উন্নতি করিতে পারে।

এক দরিদ্র যুবক বোধিসত্ত্বের কথা শুনিতে পাইল। বোধিসত্ত্বকে সে চিনিত; বোধিসত্ত্বের মুখ দিয়া যে সত্য বৈ মিথ্যা বাহির হইত না দরিদ্র যুবক তাহা জানিত। সে মৃত মূষিকটিকে তুলিয়া লইয়া যাইতেছে—এক দোকানদার তাহার পোষা বিড়ালের খাবার খুঁজিতে বাহির হইয়াছিল—নগদ একটি পয়সা দিয়া ইন্দুরটাকে কিনিয়া ফেলিল।

যুবক এক পয়সার গুড় কিনিল, এক কলসী জল ও গুড়ের পাত্রটি লইয়া বনের ধারে বসিয়া আছে, রাজবাড়ীর মালাকরেরা ঐ পথ দিয়া বাগান হইতে ফুল তুলিয়া ফিরিতেছিল। রৌদ্রে অনেক দূর পথ আসিয়া তাহারা অত্যন্ত শ্রান্ত ও পিপাসার্ত্ত হইয়াছিল। যুবককে গুড় ও জল লইয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়া জল খাইতে চাহিল এবং গুড় ও জল খাইয়া তাহারা প্রত্যেকে এক এক মুঠা ফুল ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেল। যুবক ফুলগুলি বেচিল, বেচিয়া যে পয়সা পাইল, তাহা দিয়া পরের দিন বেশী করিয়া গুড় কিনিল এবং দুই তিন কলসী জল আনিয়া ঠিক সেই স্থানে বসিয়া রহিল। মালাকরেরা সেদিন ফুলের সঙ্গে গোটাকতক গাছও তাহাকে দিয়া গেল। যুবক সেগুলি বেচিয়া আট কাহন পুঁজি (capital) করিল।

এখন, একদিন—খুব ঝড় বৃষ্টি হইয়া গেছে। রাজার বাগানে গাছপালা ভাঙ্গিয়া রাশীকৃত হইয়া পড়িয়াছে, মালী বেচারা মাথায় হাত দিয়া বসিয়া ভাবিতেছে, কিরূপে বাগান পরিস্কার করে। অপরিস্কার বাগান দেখিলে রাজামহাশয় অনর্থ করিবেন, চাই কি তাহার কাঁচা মুণ্ডটাও কাটা যাইতে পারে। বেচারা কোন উপায়ই খুঁজিয়া পাইতেছে না, সেই যুবকটি আসিয়া বলিল—মালীভাই! মুখটি অত শুক্‌নো করিয়া কি ভাব?

মালী দুঃখের কথা বলিল। শুনিয়া যুবক হাসিল; বলিল, এই কথা বন্ধু! তার জন্য এত ভাবনা! আমায় বল না, আমি ওগুলা পরিষ্কার করিয়া দিই!

মালী ভারি খুসী!

"দাও না ভাই, আমি বাঁচি!"

"কিন্তু ওগুলা আমাকে দিতে হইবে ভাই!" মালী তাহাতে আপত্য করিবে কেন? বলিল,—আঃ তাহা হইলে ত আরো বাঁচি।

যুবক রাজ্যের ছেলেদের ধরিয়া আনিল। ছেলের দল গুড় পাইয়া মহাখুসী। একঘণ্টার মধ্যে বাগান সাফ্ হইয়া গেল। যুবক সেই সমস্ত ডালপালা শুকনা করিয়া কুমোরদের বেচিল। কুমোরেরা হাঁড়ি পুড়াইবে —দাম দিয়া সেগুলি লইয়া গেল।

যুবকের হাতে তখন চব্বিশ কাহন মজুত।

যুবক নূতন একটা উপায় বাহির করিল। বারাণসীতে যত ঘেসেড়া ছিল যুবক মাঠে জল লইয়া গিয়া পিপাসার সময় তাহাদের জল দিত। ঘেসেড়ারা যুবকের প্রত্যুপকার করিবার জন্য প্রায়ই বলিত—আপনি আমাদের প্রাণ বাঁচাইয়াছেন, আমরা আপনার কি কাজ করিব --বলুন।

যুবক বলিত —তোমাদের তৃষ্ণার সময় জল দিয়াছি, তোমাদের যে উপকার করিতে পারিয়াছি তাহাতেই আমি যথেষ্ট সুখী ; তবে তোমরা যখন একান্ত কিছু করিতে চাও, বেশ, আমার যখন দরকার হইবে—তখন বলিব।

সেইরূপই স্থির রহিল।

এই সময়ে একদিন যুবক সংবাদ পাইল, কোন এক অশ্ব বিক্রেতা এই নগরে পাঁচশত অশ্ব বিক্রয় করিতে আসিতেছে।—খবর পাইয়া যুবক সেই ঘেসেড়াদের কাছে গিয়া বলিল—ভাই সব, তোমরা আমার উপকার করিতে চাহিয়াছিলে, এখন আমার দরকার পড়িয়াছে—করিবে কি ?

সেকি বন্ধু ! করিব না ? তাহাও কি হইতে পারে ? বল বল কি করিব ?

ভাই, তোমরা আমাকে এক-এক আটি ঘাস দাও।

তুমি ঘাস কি করিবে বন্ধু ?

ভাই-সব, বারাণসীতে কাল পাঁচশত ঘোড়া লইয়া একব্যক্তি আসিতেছে।

আমি ঐ ঘাস তাহাদের বেচিব। আমার ঘাস বিক্রয় না হওয়া পর্য্যন্ত তোমরা সেই অশ্ববিক্রেতাকে ঘাস বেচিও না, এই আমার অনুরোধ।

বেশ, বন্ধু, বেশ।

পরদিন অশ্ববিক্রেতা নগরে আসিল। আর কোথাও ঘাস না পাইয়া হাজার কাহন দাম দিয়া যুবকের নিকট হইতে ঘাস কিনিয়া লইয়া গেল। যুবকের তখন হাজার কাহন মজুত হইল।

কয়েকদিন পরেই যুবক শুনিল, একখানি বড় জাহাজ মাল লইয়া বন্দরে আসিতেছে। যুবক একখানা গাড়ী ভাড়া করিয়া বন্দরে উপস্থিত হইল। জাহাজ তখনও আসে নাই,—যুবক করিল কি—তাহার সেই পুঁজী হাজার কাহন দিয়া জাহাজের সমস্ত মালেরই বায়না করিয়া ফেলিল। বায়না করিয়া আর একটা কাজ করিল। অনেকগুলি চাকর বাকর, আর চাপরাসী চোপদার ভাড়া করিয়া এক খণ্ড তাঁবু খাটাইয়া তাহার মধ্যে একটা কামরা খুব ভালো করিয়া সাজাইয়া বসিয়া রহিল। চাকর বাকরদের হুকুম দিয়া রাখিল, কেহ দেখা করিতে আসিলে আগে আমায় খবর দিবে, তারপর ভিতরে লইয়া যাইবে।

বন্দরে জাহাজ ভিড়িতেই বণিকদের হুড়াহুড়ি পড়িয়া গেল। কিন্তু বন্দরে আসিয়া যখন তাহারা শুনিল যে যত মাল সমস্তই একজন যুবক বায়না করিয়া গিয়াছে, তখন তাহাদের আপশোষের সীমা রহিল না। কি আর করে—ছুটিল, সেই যুবকের কাছে। তাহার তাঁবু, আর চাপরাসী চোপদার দেখিয়া বণিকদের মাথা ঘুরিয়া গেল—না জানি সে কত বড় লোক! কেহ আর দর দস্তুর করিল না; একবারে দুইলক্ষ মুদ্রা গণিয়া দিয়া মাল বন্দোবস্ত করিল।

যুবক দুই লক্ষ মুদ্রা লইয়া একদিন বোধিসত্ত্বের কাছে গিয়া একলক্ষ মুদ্রা তাঁহার পায়ের কাছে রাখিয়া বলিল—আপনার কৃপাতেই আমার এই বিভব

হইয়াছে। আমি দুইলক্ষ মুদ্রা লাভ করিয়াছি, আপনি একলক্ষ মুদ্রা গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ করুন।

বোধিসত্ত্ব যুবকের মুখে সমস্ত কথা শুনিলেন। তাঁহার অসাধারণ অধ্যবসায়, প্রকৃত মনুষ্যত্ব দেখিয়া তিনি তাঁহার একমাত্র কন্যাকে সেই যুবকের হাতেই সমর্পণ করিলেন। ('জাতক' হইতে)

যিরুসালেম অধিকার।

১৯১৭ সালের ৮ই ডিসেম্বর রাত্রে যখন তুর্কী সৈন্যেরা যিরুসালেম নগর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, তখন ইংরেজসৈন্যেরা তার বিন্দুবিসর্গ টের পায় নাই। তাহারা টের পায় পরদিন সকালে, তাও আবার বড় অদ্ভুত উপায়ে।

প্রত্যুষেই একজন ইংরাজ পাচক ডিমের সন্ধানে বাহির হইয়া পথ হারাইয়া ফেলে। তাহাকে যে দিক দিয়া যে গ্রামে যাইতে বলিয়া দেওয়া হইয়াছিল, পাচক ঠাকুর, ঘুমের ঘোর কাটে নাই বলিয়াই হউক বা আনকো জায়গা বলিয়াই হউক, পথ ভুলিয়া তার উল্টা দিকে যিরুসালেমে গিয়া পঁহুছে। কিছুক্ষণ পরে ঊর্দ্ধশ্বাসে ফিরিয়া আসিয়া সে রিপোর্ট করে যে সে ডিমের কথা জিজ্ঞাসা করায়, জনতা পরিবেষ্টিত "একটা লোক" তাহাকে কতকগুলো কি দিয়া একটা বক্তৃতা ঝাড়িয়া দিয়াছে!

পরে জানা গেল; "একটা লোক" আর কেহ নহে, যিরুসালেমের মেয়র মহাশয়। পরিত্যক্তসৈন্য হইয়া, তিনি ভাবেন ইংরাজ সৈন্যেরা বুঝি এইবার

হুড় হুড় করিয়া নগরের উপর আসিয়া পড়ে তাই—ইংরাজদের পোষাকপরা যাহাকেই প্রথম দেখিয়াছেন তাহার হস্তেই সহরের চাবি প্রদান করিয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছেন।

কিন্তু ঐ একবারেই মেয়র মহাশয়ের নিস্তার লাভ হয় নাই। উটী তাঁর মক্স করা হইয়াছিল বলিলেই হয়।

পাচকের কাহিনী ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ওয়াটসনের কাছে রিপোর্ট করা হইলে, তিনি সদলবলে যিরুসালেমে প্রবেশ করিয়া, কায়দা অনুযায়ী নগরের চাবি গ্রহণ করিলেন। কিন্তু ওয়াটসনের বড় কর্ত্তা ডিভিসনাল জেনারেল তিনি শুনিয়া বলিলেন, উঁহু, ও ঠিক হয় নি, নেবার কর্ত্তা ত তিনি। তৎক্ষণাৎ ওয়াটসনকে হুকুম হইল, তুমি চাবী ফেরৎ দাও, আমি গিয়া উহা স্বয়ং গ্রহণ করিব।

তাহাই হইল। কএক ঘণ্টা পরে, ডিভিসন-জেনারেল মহাশয় জাঁকালো রক্ষিসৈন্য পরিবৃত হইয়া আসিয়া, তিনবারের বার নগরের মেয়র মহোদয়ের হস্ত হইতে চাবীগুলি গ্রহণ করিলেন।

ডিভিসন-জেনারেলের আবার বড় কর্ত্তা, জেনারেল এলেনবিকে যখন নগর অধিকারের কথা তারযোগে জানান হইল, তখন এলেনবি তাহার জবাবে লিখিলেন, নগর গ্রহণ তিনিই করিবেন। অর্থাৎ ডিভিসন-জেনারেল নগর গ্রহণ করিবার কেহ নহেন। কাজেই চাবিগুলো মেয়রসাহেবকে ফেরৎ দেওয়া হইল। দুদিন বাদে আবার তাঁকে কেঁচে গণ্ডুষ করিতে হইল। এলেনবি আসিয়া চতুর্থবারের বার মেয়রের হস্ত হইতে নগরের চাবি গ্রহণ করিলেন।

নগর সমর্পণ নাটকের যবনিকার এইখানেই পতন হয়। অতএব বলিতে গেলে, সেই ইংরাজ পাচক ঠাকুরই আসল নগর অধিকর্ত্তা।

এই ভেতরের খবরটুকু জানাইয়াছেন, লণ্ডনের মেজর ভিভিয়ান গিলবার্ট আমেরিকার ব্রুকলিন সহরের Y. M. C. Aতে এক লেকচার প্রদানকালে। মেজর গিলবার্ট মেসোপোটেমিয়া সমর-অভিযানে অন্তর্ভুক্ত ও ঘটনাস্থলে হাজির ছিলেন।

শ্রীধানি লঙ্কা।

স্নেহের ঝারা

কোথা থেকে এলি বাছা কোন গগনের ফুল,
হাওয়ার তালে দুল্‌ছে খাসা চিকণ-কালো চুল;
মায়ের পাশে থাকিস্‌ বাছা ফুটিয়ে স্নেহের রাশি,
আনন ভরা ঝরছে শুধু মুক্তা ঝরা হাসি।
তুই যে ওরে ননীর পুতুল বাঙ্গালা দেশের মেয়ে,
মা জননী বিভোর যে তোর মুখের পানে চেয়ে;
তুই বাছা তার হীরার কণ্ঠি ভোরের প্রথম তারা;
ঘরের শোভা মনোলোভা মধুর স্নেহের ঝারা।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ পাল।



মা ও ছেলে।

বুদ্ধির বল।

সেই বনে ছিল তাহার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ। ডাক শুনিলে বনের পশুদের প্রাণ ভয়েই উড়িয়া যাইত। একাদিক্রমে এক বনে বাস করিয়া পশুরাজটি একটু অলস হইয়া পড়িয়াছিলেন, নড়িয়া-চড়িয়া একটু খুঁজিয়া-পাতিয়া যে আহার সংগ্রহ করিবেন, সেটুকু কষ্ট স্বীকার করিতেও আর পশুরাজ রাজী ছিলেন না। সেই বনেরই পশু বধ করিতেন আর ক্ষুধা মিটাইতেন। করিতে করিতে বনটি জীবহীন হইয়া পড়িতেছিল। তখন অন্য পশুরা পরামর্শ করিয়া একদিন মৃগরাজ সিংহের নিকটে উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল—মহারাজ! আপনি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হৌন্। আপনি আমাদের রাজ্যেশ্বর রাজা, আমরা আপনার দীন প্রজা, আপনার দয়া ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি। হে দেব, আপনি কৃপাপূর্ব্বক শ্রবণ করুন।

সিংহ চাটুবাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—তোমরা কি বলিতে আসিয়াছ?

রাজন্, ভয়ে কই, না নির্ভয়ে কই?

অভয়! কি বলিবে বাপু, নির্ভয়ে বল।

এতগুলি পশুকে একসঙ্গে দেখিয়া প্রভুর মনের যে অবস্থা হইতেছিল তাহা আর বলা যায় না। জিহ্বা হইতে এতই জল নিঃসৃত হইতেছিল যে তিনি ক্রমাগত ঢোঁক গিলিতেছিলেন।

প্রভো! এই অরণ্য প্রায় জীবশূন্য হইয়া আসিতেছে। আপনি যেরূপ ভাবে হত্যা করিতেছেন, তাহাতে আমাদের ভয় হইতেছে যে কিছুদিন পরে প্রভুকে নিরম্বু উপবাস করিতে হইবে; প্রভুর কষ্টের সীমা-পরিসীমা থাকিবে না, তাই আমরা এক পরামর্শ করিয়াছি।

কি পরামর্শ শুনি ?

প্রভু, আপনার আহার সময়ে আমরা একটি করিয়া পশু আপনা হইতেই আসিব, প্রত্যহ-ই আসিব। আপনিও ঐ একটি পশুতেই সন্তুষ্ট থাকিবেন। এইরূপ করিলে প্রভুরও ক্ষুন্নিবৃত্তি হইবে, আর অরণ্যের পশু-ও শীঘ্র নিঃশেষ হইবে না।

সিংহ দেখিলেন, যুক্তিটা মন্দ নয়। এখন গোগ্রাসে গিলিয়া অল্পদিন পরে একাদশী করাটা সুযুক্তি নয়। বলিলেন—আচ্ছা বাপু, এইরূপই হইবে। কিন্তু দেখিও, ঠিক সময়মত একটি করিয়া পশু আমি যেন সামনে পাই, নতুবা একদিনেই সকলকে বধ করিয়া ফেলিব। রাগ হইলে আমার জ্ঞান থাকে না, জান ত ?

আজ্ঞে তা আর জানি না ! আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, মহারাজ, যেমন বলিলাম, সেইরূপই হইবে।

সেইরূপই চলিতে লাগিল। কিছুদিন কাটে, তার পর একদিন পালা পড়িল—এক গরীব খরগোসের ! বেচারা পালা পড়িয়াছে শুনিয়াই ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

খরগোসের বুদ্ধিটা কিছু সূঁচোলো, অর্থাৎ তীক্ষ্ণ ! সে ভাবিয়া চিন্তিয়া সিংহটিকেই শেষ করিবার মতলব আঁটিল।

সিংহের আহার্য্য পৌঁছিত, ঠিক মধ্যাহ্নকালে। কিন্তু সেদিন অপরাহ্ণ হইয়া গেল, তবুও একটা জীবের দেখা নাই। রাগে সিংহের চোখে আগুণ ছুটিল, কেশর ফুলিয়া খাড়া হইয়া উঠিল, দাঁতে দাঁতে ঘর্ষিত হইতে লাগিল। আর কিছুক্ষণ দেখিবেন, তাহার পরই আজ বন নির্জীব করিবেন।

বেলা পড়িয়া আসিয়াছে, শশক কাঁপিতে কাঁপিতে দেখা দিল। তাহাকে



"রে পামর, এত দেরী !"

দেখিয়া সিংহের রাগ একেবারে দু'হাজার ডিগ্রী বাড়িয়া গেল। দাঁতে দাঁতে চাপিয়া বলিলেন—রে পামর! এত দেরী?

শশক বলিল—মহারাজ, আমি নির্দ্দোষ। পথে এক সিংহ আমাকে আক্রমণ করিয়াছিল। কিছুতেই ছাড়িবে না, বলে, খাইব, খাইব। আমি আপনার নাম করিলাম, তবুও ছাড়ে না, বলে এ বনের রাজা আমি, আমিই তোকে খাইব। আমি আপনাকে ডাকিয়া আনিতেছি বলিয়া দশ মিনিটের ছুটী লইয়া আসিয়াছি। সে বলিয়াছে, দশ মিনিটের বেশী দেরী হইলে সে এখানে আসিয়া আপনাকেই বধ করিয়া বলিবে!

আমাকেই বধ করিয়া ফেলিবে? বটে? এত বড় স্পর্দ্ধা! আমি হ'লুম কি-না, এ বনের রাজা, আমাকেই······চল্ ত দেখি কোথায় সে বেটা!

আসুন প্রভু, আমি আপনাকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাই।·········

এক কূপের নিকটে আসিয়া খরগোস বলিল—প্রভু, এইটি সে বেটার দুর্গ। বেটা নিশ্চয়ই ইহার মধ্যে আছে।

হাঁ—সিংহ কূপের পাড়ে উঠিয়া নীচের দিকে চাহিতেই দেখিলেন, হাঁ মস্ত এক বেটা সিংহকে দেখা যাইতেছে বটে! তবে রে!—বলিয়া গর্জ্জন করিলেন! শুনিলেন—সেও 'তবে রে' বলিয়া সাড়া দিল!

দাঁড়া—বলিয়া সিংহ মহাশয় দিলেন এক লাফ্, আর অতল জলে! অনেক হাঁকু-পাঁকু, অনেক ঘেউ ঘেউ, ঘ্যাস্ ঘ্যাস্—কিন্তু উঠিতেও পারিলেন না, আর বদ্‌মায়েস শশকটার ঘাড়ও মটকানো হইল না।

শশক কাণ দুটি খাড়া করিয়া খানিক নাচিল, তার পর বনে গিয়া বন্ধু-বান্ধবকে শুভ সংবাদটি দিয়া দিল। শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার।

উইলো গাছের গল্প।

(জাপানী উপকথা)

সে হাজার বছর আগেকার কথা। সেই সময়ে জাপানে একখানা ছবির মত গ্রামে এক বিশাল উইলো গাছ ছিল—এত বড় উইলো সচরাচর লোকের চোখে পড়ে না। গাছটির এক পাশ দিয়ে গ্রামের ছোট্ট নদীটি ঝির্‌ঝিরে বাতাস গায়ে মেখে, অবাধ গতিতে বয়ে যেত ; আর তারির অন্য পাশে নীল পাহাড়ের গায়ে রঙবেরঙের ফুলে ভরা সবুজ মাঠটি, বিকেল হলেই ছেলে বুড়োর দলকে, তার স্নিগ্ধ কোলে টেনে আন্‌ত। গ্রামের সকলেরই বিশ্রামের ও আরামের স্থান ছিল—সেই উইলো গাছের তলাটি। পথশ্রান্ত পথিক এসে তার তলায় বস্‌ত ; দুপুরের রোদের তাপ থেকে আপনাদের বাঁচিয়ে, গ্রামের বুড়োরা সেখানে বেশ আড্ডা জমিয়ে তুল্‌ত ; বিকেলে ছেলে মেয়ের দল এসে, তার চারিদিকে দৌড়াদৌড়ি, লুকোচুরি খেলে, তাদের কোমল-মধুর হাস্য ধ্বনিতে চারিদিকে একটা সজীবতা এনে দিত ; আবার সন্ধ্যার অল্প আলোতে—সূর্য্যের লাল আভা যখন গাছটির পাতাগুলোকে রঙিন্ করে তুল্‌ত, তখন অনেক তরুণ হৃদয়ের বিনিময়ের সাক্ষী হয়ে উইলো গাছটি তাদের উপর আশীর্ব্বাদ বর্ষণ কর্‌ত।

মানুষ বড় স্বার্থপর। প্রকৃতিকে সহজে আপনার আত্মার সঙ্গে মিশ্ খাওয়াতে পারে না ; তাই গ্রামের লোকেরা একদিন ঠিক্ কর্‌লে যে সেই গাছটিকে কেটে ছোট্ট নদীটির উপর একটা সেতু তৈরী কর্‌বে।

এমন মানুষও আছে যারা প্রকৃতিকে নিজের প্রাণে বেশ অনুভব কর্‌তে

পারে ; সেই গ্রামের জনপ্রিয় তরুণ কাঠুরে হিতারো, এই রকমই একজন মানুষ ছিল। উইলো গাছটির কাছেই সে অনেক পুরুষ থেকে বাস করে আস্‌ছে। তার প্রাণে এসে অনেক খানি ঘা লাগ্‌ল, যখন সে শুনলে যে গাছটি কেটে ফেলা হবে। গ্রামের লোকের মতে সে মত দিতে পার্‌ল না—সে সকলের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে উঠ্‌ল।

হিতারোর মনটা ছিল বেশ কোমল, ভাবুকতায় ভরপুর। জন্মাবধি দেখে দেখে উইলো গাছটির ওপর তার মায়া পড়ে গিয়েছিল। সে ভাব্‌ল, 'কতদিন, কতমাস, কত বছর—ধরে এই গাছ ঝড়, বৃষ্টি, রৌদ্র মাথায় করে দাঁড়িয়ে আছে তা' কেউ বল্‌তে পারে না—কতলোকের কতরকম স্মৃতি এই গাছের সঙ্গে জড়ান রয়েছে—আর আজ কিনা তার অবসান হবে কাঠুরের কুঠারের ধারে? না তা' হতে পারে না।'

হিতারো সোজাসুজি গ্রামের লোকদের কাছে গিয়ে বল্‌ল, 'ও গাছ কাটা হবে না—তার বদলে আমি আমার নিজের সম্পত্তি যে কয়টা গাছ আছে তা' তোমাদের দেব—সেতুর জন্যে তোমাদের যত কাঠ দরকার, তাই থেকে নাও।'

গ্রামবাসীরা সহজেই তাতে স্বীকৃত হ'ল ; তাদেরও প্রাণে এত বছরের পুরাণো গাছটার জন্যে একটু টান ছিল।

নিজের ক্ষতি স্বীকার করেও হিতারো গাছটিকে বাঁচাতে পেরেছে বলে, আনন্দে গান কর্‌তে করতে কাজে চলে গেল। সমস্ত দিনের শেষে শরীরের অনেকখানি শক্তি খরচ করে তার বদলে অনেকখানি ক্লান্তি শ্রান্তি নিয়ে সে যখন নিজের কুটীরের দরজায় এসে দাঁড়ল, তখন উইলো গাছের দিকে চেয়ে তার প্রাণটা কেমন আনন্দে ভরে উঠ্‌ল। সে কুটীরে না ঢুকে গাছের তলায়

এসে দাঁড়াল। সেখানে সে যা' দেখ্‌লে তাতে তাকে কিছুক্ষণের জন্যে নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে হ'ল। সে দেখ্‌ল, তার সাম্‌নে গোধূলির ম্লান আলো মেখে বড় সুন্দরী একটি মেয়ে, তারই দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কে এই মেয়েটি ? সেত কখনও একে দেখেনি, এই রকম অনেক কথা এসে তার প্রাণের দুয়ারে আঘাত দিল ; কিন্তু সে কোন কথা না বলে, আস্তে আস্তে মাথাটি নত করে, তাকে অভিবাদন কর্‌লে ; মেয়েটিও সেইভাবে মাথা নত করে তার অভিবাদনের উত্তর দিল। তারপর তাদের মধ্যে অনেক কথাই হ'ল ; কেবল হ'ল না পরিচয়ের কথা। মেয়েটি যখন বল্‌লে যে এইবার তাকে যেতে হ'বে, তখন হিতারোর মনে হল যেন সে কি হারিয়ে ফেল্‌ছে ! সেদিন সমস্ত রাত্রি হিতারো ঘুমোতে পার্‌ল না, তার মনে কেবলই সেই মেয়েটির সুন্দর মুখখানি ভেসে বেড়াতে লাগ্‌ল ; তার প্রাণের একটা শূন্য জায়গা মেয়েটির চিন্তাতে ভরপুর হয়ে উঠ্‌ল। হিতারো তাকে ভাল বেসে ফেলেছিল।

পরদিন সকালে উঠে সে দ্বিগুণ পরিশ্রম কর্‌তে আরম্ভ কর্‌ল, সেই মেয়েটির স্মৃতি মন থেকে মুছে ফেল্‌বার জন্যে, কিন্তু নির্ব্বোধ সে বুঝ্‌ল না যে তাতে তার প্রাণ আরও ব্যাকুল হয়ে উঠ্‌বে। সন্ধ্যা বেলায় মিষ্টি হাস্নুহানার গন্ধ যখন বাতাসটাকেও মিষ্টি করে তুল্‌ছিল, হিতারোর প্রাণটা আকুল হয়ে উইলো গাছের দিকে ছুটে চল্‌ল। দূর থেকেই তার ব্যাকুল চোখ দুটি দেখ্‌তে পেলে যে মেয়েটি আগের দিনের মত সেইখানে দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েটি আজ হাসিমুখে এসে তাকে অভ্যর্থনা কর্‌ল—বল্‌ল, 'এস বন্ধু, তোমার ক্লান্ত শরীর এই উইলো গাছের হাওয়া লাগিয়ে একটু সুস্থ করে নাও।'

হিতারো মেয়েটির কথা একটু বেশী করেই রাখ্‌ল। সে শুধু শরীর সুস্থ কর্‌ল না, তার ভালবাসার কথা প্রমাণ করে তার প্রাণকেও সুস্থ করে নিল।

দিনের পর দিন হিতারের সঙ্গে মেয়েটির দেখা হতে লাগ্‌ল; শেষে একদিন মেয়েটি তাকে বিয়ে কর্‌তে সম্মত হ'ল, কিন্তু তার আগে এক সর্ত্ত করে নিল। হিতারোর হাতখানি ধরে সে বল্‌ল, 'আমার আত্মীয় স্বজনের কথা কখন ও তুমি জিজ্ঞাসা কর্‌তে পার্‌বে না, কারণ আমার আপনার বল্‌তে কেউ নেই। তবে এ কথা তোমারে বল্‌ছি যে, আমি তোমার উপযুক্ত স্ত্রী হ'বার চেষ্টা কর্‌ব আর তোমার যা কিছু অভাব আমার ভালবাসা দিয়ে পূরণ কর্‌ব। তুমি এবার থেকে আমায় "হিগো" বলে ডেকো।' এই বলে হিগো হিতারোর মুখের দিকে চেয়ে রইল—তার চোখ দুটি থেকে তখন ভালবাসা উছ্‌লে পড়্‌ছিল।

তারপর হিতারো হিগোকে নিয়ে ঘরকন্না কর্‌তে লাগ্‌ল। একবছর পরে তাদের একটি ছেলে হ'ল; তারা ছেলেটীর নাম রাখ্‌ল—'চিয়াদো।" চিয়াদোর জন্মের পর থেকে হিতারো ও হিগোর জীবন আরও মধুর হয়ে উঠ্‌ল। চিয়াদো তাদের চোখের মণি হয়ে দাঁড়াল; এক দণ্ড তাকে না দেখ্‌লে হিতারো হিগো চারিদিক অন্ধকার দেখ্‌ত। বড়ই সুখে তদের দিন কাট্‌তে লাগ্‌ল; হিতারোর মত সৌভাগ্য তখন জাপানে অল্পলোকেরই ছিল।

সুখ সৌভাগ্য কিন্তু চিরদিন একভাবে কাহারও ভোগে আসে না। চিয়াদোর বয়স যখন পাঁচ বছর তখন সম্রাট্‌ তোবা ঠিক্‌ কর্‌লেন তে 'কায়োতে সহরে কোয়ানন দেবীর প্রকাণ্ড এক মন্দির তৈয়ারী কর্‌বেন, আর সেই মন্দিরে কোয়ানন্‌ দেবীর তেত্রিশ হাজার, তিন শ, তেত্রিশটি মূর্ত্তি থাক্‌বে। চারিদিকে রাজকর্ম্মচারীরা প্রচার করে দিল, যেখানে যত বড় গাছ আছে সব চাই। হিতারোর উইলো গাছটির দিনগুলিও সেই হুকুমের সঙ্গে সঙ্গে কমে আস্‌তে লাগ্‌ল।

গ্রামবাসীদের সবারই ইচ্ছা গাছটিকে দেবতার কাজে উৎসর্গ করা হয়; তাদের মনে হ'ল দেবতা এর জন্য তাদের ওপর আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করবেন; সেই জন্য হিতারোর শত চেষ্টাও এবার গাছটিকে বাঁচাতে পারল না।

* * * * * *

রাত্রি শেষ হয়—হয়, ভোরের আলো আর আঁধারে দ্বন্দ্ব তখন ও চল্‌ছে। আলো, আঁধারের বুকে ছুরি মেরে হিতারোর জানলার ফাঁক দিয়ে তার বিছানার ওপর এসে পড়্‌ল;—হিতারো জেগে উঠ্‌ল। একটা অস্ফুট কান্নার শব্দে মুখ ফিরিয়ে চেয়ে দেখ্‌ল, যে তার হিগো তারই মুখের দিকে চেয়ে, চোখের জলে তার সুন্দর গালদুটিকে ভিজিয়ে, কাঁদ্‌ছে। ব্যস্ত হয়ে উঠে হিতারো, হিগোর মুখখানি তুলে ধরে জিজ্ঞাসা করলে, 'কেন তুমি কাঁদ্‌ছ, কি হয়েছে তোমার?'

হিগোর গলা তখন বন্ধ হয়ে এসেছিল। প্রত্যেক কথাটিতে প্রাণের বেদনা মাখিয়ে, হিগো বল্‌তে লাগল, 'ওগো আমার স্বামি, এতদিন তোমাকে যা' বলিনি, যা' তোমাকে জিজ্ঞাসা পর্য্যন্ত করতে বারণ করেছিলুম, সেই কথা আজ আমি বল্‌ব। আমি কে জান?—যে উইলো গাছটিকে তুমি অত ভালবাসতে—নিজের সমস্ত সম্পত্তি দিয়েও যাকে বাঁচিয়েছিলে, আমি তারই আত্মা, তোমার দয়া আর ভালবাসার প্রতিদান দেবার জন্যেই আমি মানুষের বেশে তোমার কাছে এসেছিলুম আর মনে করে ছিলুম যে তোমাকে চির জীবন ধরে সুখী করব। কিন্তু ওগো প্রিয়—তা আর হ'ল না! ঐ তারা কুঠার দিয়ে গাছটিকে কাট্‌তে আরম্ভ করেছে—তার প্রত্যেক ঘা আমার বুকে এসে লাগ্‌ছে—উঃ আর পারি না; চিয়াদো—আমার প্রাণের চিয়াদো—রইল—তোমরা সুখে থাক—আমি যাই—'

হিতারো দেখ্‌ল হিগো তার নেই, অদৃশ্য হয়ে গেছে। তার মনে হল যেন

সে স্বপ্ন দেখেছে। সে বিছানা থেকে উঠে চিয়াদোকে জাগিয়ে দিল। চিয়াদো জেগে উঠে. হিগোকে দেখতে না পেয়ে, মা, মা বলে কাঁদতে লাগল। হিতারো তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'ছি ; বাবা কেঁদো না তোমার মা—উইলো গাছের দেবী ছিলেন ; এখন তিনি স্বর্গে চলে গেছেন—ঐ ফুজিরামা পাহাড়ের চেয়ে ঢের উঁচুতে। চল আমরা বাইরে গিয়ে দেখে আসি উইলোগাছটির কি অবস্থা হল।

ভোরের আলো বেশ ফুটে উঠেছে, সাকুরা ফুলের পাপড়িগুলি খুলতে আরম্ভ করেছে, এমন সময় হিতারো চিয়াদোর হাত ধরে শিশিরে ভেজা ঘাসের ওপর দিয়ে মাড়িয়ে গাছটির কাছে এসে দাঁড়াল ; গাছটি তখন ঘাসের ওপর লুটিয়ে পড়ে, মাটিকে জড়িয়ে ধরে তার শেষ নিশ্বাস ফেলছে। হিতারোর চোখ দিয়ে বড় বড় জলের ফোঁটা টপ্ টপ্ করে পড়তে লাগল।

কাঠুরের দল ততক্ষণে গাছটির ডালপালা সব ছেঁটে ফেলে, তাকে ঠেলে নদীর জলে ভাসিয়ে, 'কায়োতে' সহরে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল, কিন্তু কি আশ্চর্য্য ! তারা গাছটাকে এক চুলও নড়াতে পারল না। তাই দেখে হিতারো বলল, 'ভাই সব, এই গাছটিতে আমার স্ত্রীর আত্মা ছিল। আমার ছেলে চিয়াদো যদি হাত দিয়ে একবার গুঁড়িটা ছোঁয়, তাহলেই বোধ হয় তোমরা গাছটিকে নড়াতে পারবে।'

চিয়াদো তার ছোট্ট হাতদুখানি দিয়ে গাছটিকে জড়িয়ে ধরল—কাঠুরেদের আর একটুও কষ্ট করতে হ'ল না ; অতি সহজেই তারা গাছটিকে ঠেলে জলে ফেলে দিল। হিতারো তখন করুণস্বরে একটা গান গাচ্ছিল :—

"মুজান্ নারু কানা
মোতোয়া কুমানোনো ইয়ানিগো যুয়ুদি

সোদেত-আগেতারু কোনো মিদারিগো ওয়া
(ইয়োই) ইয়ো, ইয়ো ইয়োয়িতো না।”
শিশিরে সিক্ত কুমানো উইলো হ’তে,
যে ছোট ফুলটি ফুটেছিল এক প্রাতে ;
একা তারে দেখে, আকুল হয় যে প্রাণ
হেঁইয়ো, হেঁইয়ো, আরো জোরে দাও টান্।

এখনও খুব পরিশ্রমের কাজ করবার সময় জাপানের শ্রমজীবিরা এই গান গেয়ে থাকে।

শ্রীহরিদাস ঘোষ।

তক্ষশীলার রাজতক্ত

কাশীর রাজা ব্রহ্মদত্তের সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্রের নাম ছিল বোধিসত্ত্ব। তাঁহারা একশত ভ্রাতা, বোধিসত্ত্ব আবার সকলের ছোট, কাজেই রাজ্যপ্রাপ্তির আশা তাঁহার কোনকালেই ছিল না। তিনি তাহা জানিতেন। কিন্তু একদল শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত বোধিসত্ত্বের পিতার প্রাসাদে প্রত্যহ আসিতেন, বোধিসত্ত্বের উপর ভার ছিল—তাঁহাদের সেবা পরিচর্য্যা করিবার। একদিন ঐ পণ্ডিতগণ বোধিসত্ত্বকে বলিলেন—বৎস, তোমার কপালে রাজটিকা দেখিতেছি।

বোধিসত্ত্ব বলিলেন—প্রভু! আমার শতভ্রাতা রহিয়াছেন, আমি কিরূপে রাজ্যাধিকার পাইব ?

পণ্ডিতগণ বলিলেন—রাজকুমার! বারাণসীর রাজদণ্ড কোন কালেই তোমার

হাতে উঠিবে না, তবে এখান হইতে দ্বিসহস্র যোজন দূরে তক্ষশীলা নামে এক রাজ্য আছে। তুমি যদি সপ্তাহ মধ্যে সেখানে উপস্থিত হইতে পার, তবে তক্ষশীলার রাজসিংহাসন তোমার! কিন্তু একটা বড় কিন্তু আছে, রাজপুত্র!

রাজার তনয় জিজ্ঞাসিলেন—কিসের—কিন্তু প্রভু?

ঐ তক্ষশীলায় যাইবার দুইটিমাত্র পথ আছে। একটি যক্ষনগরীর ভিতর দিয়া যাইতে হয়, সেটি দিয়া যাইতে পারিলে সপ্তাহমধ্যেই সেখানে পৌছান সম্ভব আর একটি আছে সে-টি বড় ঘুর পথে, অনেক বিলম্ব হইতে পারে।

যক্ষনগরীর ভিতর দিয়া যাইলে যখন শীঘ্র পৌঁছিতে পারা যায় তবে অন্যপথে যাইব কেন?

পণ্ডিতগণ মৃদু হাসিয়া বলিলেন—তবে আর কিন্তু বলিতেছি কেন রাজকুমার! যক্ষিণীরা এক বিশাল মায়াকানন সৃজন করিয়া রূপে, গানে, গন্ধে ও নানাবিধ ভোজ্যদ্বারা পথিকদিগকে ভুলাইয়া কাননমধ্যে আনিয়া ভোজন করে—ঐ পথ আদৌ নিরাপদ নহে। তবে এমন দৃঢ়চিত্ত ব্যক্তি যদি কেহ যায় যে রূপে ভুলিবে না, গানে মুগ্ধ হইবে না, সৌরভে যে আসক্তিহীন ও রসনা যাহার সংযত—সেরূপ ব্যক্তির বিপদের কোনই আশঙ্কা নাই।

বোধিসত্ত্ব পণ্ডিতগণের পূজা করিয়া কহিলেন—প্রভু, আপনাদের আশীর্ব্বাদে বোধিসত্ত্ব ঐ সকলকে উপেক্ষা করিতে শিখিয়াছে।

বোধিসত্ত্ব সে দিনই তক্ষশীলা যাত্রার আয়োজন করিলেন; তাঁহার চারিজন অনুচর কিছুতেই তাঁহার সঙ্গ ছাড়িল না। বোধিসত্ত্ব পথের বিপদভয়ের কথা বলিলেন, তাহারা তাহা গ্রাহ্য করিল না—বোধিসত্ত্ব আর কি করিবেন, সঙ্গেই লইলেন।

কিয়দ্দূর আসিতেই সেই মায়াকানন দেখা গেল। রাজকুমারের একটি অনুচর

পায়ে ব্যথা হইয়াছে বলিয়া পিছাইয়া পড়িতে লাগিল। বোধিসত্ত্ব জানিতেন ঐ ব্যক্তি অত্যন্ত রূপপ্রিয় বুঝিলেন, সে কোন যক্ষিণীর রূপে ভুলিয়াছে। অনেক বুঝাইলেন, অনুচর বলিল—রাজকুমার পায়ে বড় বেদনা বোধ হইতেছে। আপনি অগ্রসর হৌন, আমি যাইতেছি।' কিন্তু আর তাহাকে যাইতে হইল না, যক্ষিণী ভুলাইয়া লইয়া গিয়া তাহার প্রাণে বধ করিল।

বোধিসত্ত্বের আর এক অনুচর নাচ-গানে মুগ্ধ হইয়া প্রাণ হারাইল; একজন সুবাসে ভুলিল, আর একজন যক্ষিণীর হাতে নানা সুখাদ্য দেখিয়া লোভে পড়িল, লোভ সামলাইতে না পারিয়া মায়া কাননে ঢুকিল—সবাই মরিল। বোধিসত্ত্ব একাকী চলিতে লাগিলেন।

যে পথ দিয়া যান, যক্ষিণী তাহার পিছনে ছুটে, আর চিৎকার করিয়া লোক ডাকে ও বলে—দেখ-দেখ আমার স্বামী কি নিষ্ঠুর! একা আমাকে গৃহে ফেলিয়া বিদেশ যাইতেছেন।

যে শুনে সেই বোধিসত্ত্বের নিন্দা করে। বলে, সুন্দরী স্ত্রীকে একা অসহায় অবস্থায় ফেলিয়া যাওয়া কোনমতেই উচিৎ হয় না! কেহ কেহ আবার বোধিসত্ত্বের নিকটে গিয়া বলিতে লাগিলেন—মহাশয় দেখিতেছি জ্ঞানী ব্যক্তি, এরূপ অন্যায় কার্য্য কেন করিতেছেন? বোসিসত্ত্ব বলেন—বাপু হে! আমি অবিবাহিত, আনার স্ত্রী নাই।

এই রকম ছুটিতে ছুটিতে যক্ষিণী তক্ষশীলা পর্য্যন্ত বোধিসত্ত্বের পিছনে পিছনে আসিয়া হাজির! এখন তক্ষশীলার রাজা মহাশয় সেই সময়ে বায়ুসেবনে বাহির হইয়াছিলেন, যক্ষিণীর অপরূপ রূপ দেখিয়া তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল। তিনি পার্শ্বরক্ষীদের ডাকিয়া বলিলেন—খবর না-ও ত হে ঐ স্ত্রীলোক কে?



"দেখ দেখ, আমার স্বামী কি নিষ্ঠুর !"

রাজার পার্শ্বচরের কাছে যক্ষিণী সেই অনুযোগই করিল—যে ঐ আমার স্বামী, আমাকে ফেলিয়া বিদেশ চলিয়াছেন।

রাজার লোক বোধিসত্ত্বকে বলিল—কেন হ্যা বাপু? স্ত্রী ফেলিয়া পালাও কেন? খাইতে দিতে পারিবে না ত বিবাহ করিয়াছিলে কেন? যাহোক্ বাপু স্ত্রীটিকে সঙ্গে নাও, গোল টোল বড় করিও না। কথাটা রাজার কাণে গেলে, অনর্থ হইতে পারে।

বোধিসত্ত্ব নির্ভীক, কহিলেন—ও আমার কেহই নহে; যক্ষিণী মানুষমারাই ওর ব্যবসা, আমাকে খাইবার জন্য ফাঁদ পাতিবার চেষ্টায় আছে। যক্ষিণী বলিতে লাগিল—উনি আমার প্রতি বিরূপ, তাই ঐ রূপ কথা বলিতেছেন।

বোধিসত্ত্ব বলিলেন—নিছক মিথ্যা কথা।

রাজা বলিলেন—যাহার স্বামী বা অধিকারী কেহ নাই, সে রাজার। অতএব এই রূপবতী স্ত্রীলোকটি আমার। রাজা যক্ষিণীকে লইয়া রাজপ্রাসাদে ঢুকিলেন, বোধিসত্ত্ব বলিলেন—সর্ব্বনাশ আসন্ন।

রাত্রে যক্ষিণী রাজার রাণী ও রাজপুরবাসী সকলকে ভক্ষণ করিয়া ফেলিল। সকালে উঠিয়া দেখা গেল, প্রাসাদের অলিতে-গলিতে হাড় আর হাড়।

প্রজারা বোধিসত্ত্বের কথার সত্যতা উপলব্ধি করিয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিল—এই রাজাশূন্য রাজ্যের আপনাকেই রাজা হইতে হইবে। এ তরণীর নাবিক নাই, আপনি ইহার কর্ণধার হৌন।

বোধিসত্ত্ব তক্ষশীলার সিংহাসনে আরোহণ করিলেন।

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার।

লোটন ষষ্ঠীর ব্রতকথা

(ননদ ভাজ)

(শ্রাবণ মাস)

এক দেশে এক বামুন আর বাম্‌নী থাকে। বামুনের একটী ছেলে আর একটী মেয়ে। বামুনের অবস্থা ভাল—স্বচ্ছলের সংসার। ঘরে কিছুরই অভাব নেই। বামুন ছেলের বিয়ে দিয়ে ঘর আলো বৌ এনেছে, মেয়ের বিয়ে দিয়ে জামাইকে ঘরজামাই ক'রে ঘরে রেখেছে। বৌএর সাতটী ছেলে,—মেয়ের তিনটী ছেলে। বামুন বাম্‌নী নাতিগুলিকে নিয়ে মনের আনন্দে দিন কাটাচ্ছেন। বামুনের ছেলেটা বড় ভাল—মা-বাপ ভিন্ন সে জানে না। দু' পয়সা রোজগার করে যা ঘরে আনে তা বাপের হাতে দিয়ে খালাস। ছেলের ভক্তি দেখে বামুন বাম্‌নী প্রায় বলাবলি করেন—'এমন যাদের ছেলে তাদের আবার দুঃখ কিসের।

শ্রাবণ মাস—ঝুপ ঝুপ ক'রে বৃষ্টি পড়্‌ছে। সেদিন শুক্লপক্ষের ষষ্ঠী। বাম্‌নী খুব ভোরে উঠেছেন—আজ ষষ্ঠী পূজোর আয়োজন কর্ত্তে হবে। পূজোর সব যোগাড় যন্ত্র করে—বাম্‌নী তাঁর সিন্দূর চুবড়ী থেকে লোটন ছটী বের কর্ত্ত গেলেন। এই সোনার লোটন ছটী তিনি তাঁর শাশুড়ীর কাছ থেকে পেয়েছিলেন,—এই লোটন ছ'টী দিয়ে ষষ্টি পূজো কর্ত্তেন। তাঁর মরবার পর বাম্‌নী এই লোটন ছ'টী দিয়ে বরাবর ষষ্ঠী ঠাক্‌রুণের পূজো ক'রে আস্‌ছেন। সিন্দূর চুবড়ী বের ক'রে বাম্‌নী দেখেন—তিনটী বই লোটন তাতে নেই। বাম্‌নী এই দেখেইত একেবারে গালে হাত দিয়ে বস্‌লেন। এমন সর্ব্বনাশ

কে কল্লে ? আমার এত দিনের যষ্ঠী পূজোর লোটন তিনটী কে চুরি কল্লে! বাম্‌নী প্রথমেই তাঁর বৌকে ডেকে জিজ্ঞাসা কল্লেন,—"হ্যাঁ বৌমা, আমার সিঁদুর চুপড়িতে ছ'টী যষ্ঠী পূজোর লোটন ছিল—তার তিনটী দেখছি—আর তিনটী গেল কোথায় ? তুমি কি কোথায়ও রেখেছ ?"

শাশুড়ীর এই কথায় বৌ ভাবলেন, শাশুড়ী তাকে চোর অপবাদ দিচ্ছেন। আর রক্ষা আছে। বৌ রেগে ঠোঁট ফুলিয়ে বল্লেন,—"এঁ্যা! আমায় এমন কথা। আমি লোটন নিয়েছি। এই আমি আমার সাত ছেলের মথায় হাত দিয়ে দিব্বি কচ্ছি, আমি যদি লোটন নিয়ে থাকি তা'হলে তেরাত্তির মধ্যে যেন আমি সাত ছেলের মাথা খাই।"

বৌএর এই কথা শুনে শাশুড়ী যাট্ যাট্ করে বল্লেন,—"এমন কথা কি মুখে আন্‌তে আছে—আমি কি তোমায় তাই বল্লুম বৌমা।"

তারপর বাম্‌নী তাঁর মেয়েকে ডেকে বল্লেন,—"হ্যাঁরে তুই আমার লোটন নিয়েছিস্ ?"

মেয়ে ভাল মানুষটীর মত উত্তর দিল,—"সেকি কথা মা—আমি তোমার লোটন নেব কি কর্ত্তে ? আমি তোমার লোটন চক্ষেই দেখিনি।"

বাম্‌নী তাঁর লোটন ক'টীর জন্যে এবাক্স সেবাক্স অনেক খোঁজাখুজি কল্লেন—কিন্তু লোটন তিনটী কোথায়ও পাওয়া গেল না। তখন আর কি কর্ব্বেন—ক্ষীরের তিনটী লোটন তৈরী করে সেবারকার মত পূজো সাল্লেন। এখন এদিকে হ'লো কি, সেইদিন রাত্রে বৌ তার সাতটী ছেলে নিয়ে শুয়ে ছিলেন—ভোরে উঠে দেখেন—সাতটী ছেলেই তার আশে পাশে মরে আছে। বৌ এই দেখে একেবারে বুক চাপড়ে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন। বৌএর কান্নায় বাড়ী শুদ্ধ লোক সকলে সেখানে ছুটে এলেন। বৌএর ঘরে এসে

সকলেই তো অবাক। বৌএর সাতটী ছেলেই মরে আছে। সকলেই হায় হায় কর্ত্তে লাগল। এমন সর্ব্বনাশও আবার মানুষের হয়। মেয়ে বামনীকে এসে বল্লে,—"মা, এখন আর কাঁদ্‌লে কি হবে—তোমার অপয়ে বৌএর জন্যেই এমন সর্ব্বনাশ হ'লো। বৌ নিশ্চয়ই ষষ্ঠীর লোটন তিনটী চুরি করেছে—তাই হাতে হাতে ফল পেলে।"

একথাটা বড় একটা কারুর আর সে সময় মনে ছিল না। মেয়ের কথায় সকলেই বৌকে ছ্যা ছ্যা কর্ত্তে লাগলো। কেউ কেউ বল্লে—এমন অলক্ষণে বৌকে এখনই বাড়ী থেকে দূর করে দেওয়া উচিত। বামুনের বৌএর কোন কথা বল্‌বার আর মুখ ছিল না। সে ছেলে কটীকে নিয়ে কেবল হাউ হাউ করে কাঁদ্‌তে লাগল। বামুন নাতিগুলির জন্যে বুক চাপড়ে কাঁদ্‌ছিলেন! কিন্তু শুধু কাঁদ্‌লে তো হবে না। নাতি কটার পোড়াবার ব্যবস্থা তো কর্ত্তে হবে। তিনি চোখের জল ফেল্‌তে ফেল্‌তে তার আয়োজন কল্লেন। ছেলে ক'টীকে পোড়াতে নিয়ে যাবার জন্যে পাড়ার ক'জন লোক এলো। কিন্তু বৌ কিছুতেই ছেলেক'টীকে পোড়াতে দেবে না। শেষে পাড়ার লোকেরা জোর করে বৌএর কাছ থেকে ছেলে ক'টীকে নিয়ে শ্মশানে চল্লো। বৌও কারুর মানা না শুনে তাদের পেছনে পেছনে চল্লো! শ্মশানে এসে যারা ছেলে ক'টীকে পোড়াতে এনেছিল,—তাদের পায়ে ধরে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বল্লে,—"ওগো আমার ছেলে ক'টীকে আমাকে দিয়ে যাও—ওদের তোমরা পুড়িও না।"

বৌএর কান্নাকাটিতে পাড়ার লোকেরা বিরক্ত হ'য়ে ছেলে ক'টীকে বৌএর কোলের ওপর ফেলে দিয়ে শ্মশান থেকে চলে গেল। বৌ সেই শ্মশানে একলাটী বসে সারাদিন কেবল চোখের জল ফেল্‌তে লাগলেন। দিন গেল—



সে কি মা! আমি কেন তোমার সোটন·

সন্ধ্যে হ'লো—শেষ, রাত্রি ফুরিয়ে এলো। বৌ তার মরা ছেলে ক'টাকে নিয়ে তবুও সেই শ্মশানে বসে বসে কাঁদ্‌তে লাগলেন। রাত হুপুরে শ্মশানে ভূত প্রেতেরা এসে হি—হি ধি ধি ক'রে নাচতে লাগল—বৌএর তাতেও ভয় ডর নেই। সে যেমন বসে ছিল, তেমনিই বসে রইল। বৌএর এই চক্ষের জলে মা ষষ্ঠীর আসন টল্লো। তিনি এক ময়ূরপঙ্খী করে সেই শ্মশান ঘাটে এসে উপস্থিত হ'লেন। ষষ্ঠী লাল চওড়া পাড় সাড়ী পরেছেন—লাল সিঁদুর মাথায় দিয়েছেন—লাল শাঁখা হাতে পরেছেন—বৌ এই দেখেই চিন্‌তে পাল্লেন—ইনিই নিশ্চয় মা ষষ্ঠী। বৌ ছুটে গিয়ে তাঁর পা জড়িয়ে ধল্লেন। মা ষষ্ঠী বল্লেন,—"তুই ছেলের মাথায় হাত দিয়ে দিব্যি করিছিস—তাই তোর সব ছেলে মরেছে—এখন আর কাঁদ্‌লে কি হবে বল ?"

বৌ কাঁদতে কাঁদতে বল্লেন,—"মা, আমি তো তোমার লোটন চুরি করিনি—তবে আমার এমন সাজা হ'লো কেন ? মা তুমি আমার ছেলেগুলিকে বাঁচিয়ে দাও।"

মা ষষ্ঠী বল্লেন,—"মিথ্যে হ'ক্ সত্যি হ'ক্—ছেলের মাথায় হাত দিয়ে দিব্যি কর্ত্তে নেই। যে মা ছেলের মাথায় হাত দিয়ে দিব্যি করে—তারই ছেলের এই দশা হয়।"

মা ষষ্ঠীর কথায় বৌ হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগলেন—আর বল্‌তে লাগলেন —"মা আমার দোষ হয়েছে—আমি বুঝতে পারিনি। আমার অপরাধ ক্ষমা কর—আমার ছেলে ক'টাকে বাঁচিয়ে দাও।"

মা ষষ্ঠীর কৃপা হ'লো। তিনি বৌএর সাতটী ছেলেকে বাঁচিয়ে দিয়ে অন্তর্ধান হ'লেন। অন্তর্ধান হবার সময় বলে গেলেন——

"ছেলের মাথায় হাতদিয়ে দিব্যি যেই করে।
তেরাত্তির মধ্যে তার অবশ্যি ছেলে মরে॥

বঞ্চিত সে হয় হেন পুত্র আর ধনে।
এই কথাটী থাকে যেন ছেলের মার মনে॥

তার পরদিন ভোর বেলায় বৌ ছেলে ক'টীকে নিয়ে ঘরে ফিরে গেলেন। বাড়ীর সবাই তো দেখেই অবাক্। বৌ মরা ছেলে নিয়ে গেছ্‌ল—জ্যান্ত ছেলে নিয়ে ফিরে এলো—কেমন করে? বৌ আগাগোড়া সব কথা সকলকে বল্লে, তখন বাম্‌নী নাতিগুলিকে বুকে নিয়ে মা ষষ্ঠীকে বার বার প্রণাম কর্ত্তে লাগলেন। সেদিন রাত্রে বামুনের মেয়ে তার তিনটী ছেলে নিয়ে শুয়েছিল, সকালে উঠে দেখে তার তিনটী ছেলেই মরে রয়েছে। আবার বামুনের বাড়ীতে মড়া কান্না উঠলো। বাম্‌নী কেঁদে কেঁদে বল্‌তে লাগলেন,—"মা মা, আবার কি অপরাধে এমন সাজা দিলে? বৌএর বেটা ক'টিকে যেমন করে বাঁচিয়ে দিয়েছ—মেয়ের ছেলে ক'টীকেও তেমনি করে বাঁচিয়ে দাও।"

বাম্‌নীর কান্নায় ষষ্ঠীদেবীর আবার আসন টল্লো। তিনি বাম্‌নীর কাছে এসে বল্লেন,—

তোর মেয়ে কল্লে চুরি সোণার লোটন মোর।
তাইতে মলো এমনি ক'রে তিনটী নাতি তোর॥
বৌএর তোর পা ধোয়া জল তিনটী ঢোঁক খেলে।
তবেই তার উঠবে বেঁচে তিনটী আবার ছেলে॥

মা ষষ্ঠীর এই কথা শুনে বাম্‌নীর মেয়ে তখনি গিয়ে বৌএর পা ধোয়া জল ঢোক্ ঢোক্ করে তিন ঢোঁক্ খেলে। মা ষষ্ঠী তার ছেলে তিনটিকে বাঁচিয়ে

দিলেন। পাড়ার সকলেই বলাবলি কত্তে লাগ্‌ল,—বাম্‌নীর মেয়ে যেমন দুষ্ট—তেমনি হাতে হাতে ফল পেয়েছিল—নিজে চুরি করে আবার পরের নামে দোষ দেওয়া!”

সেই থেকে পৃথিবীতে শ্রাবণ মাসে ষষ্ঠী পুজো প্রচার হ’লো। বামুনের মেয়ের লোটন চুরীর জন্যই এই ষষ্ঠী পূজোর নাম হয়েছে **লোটন ষষ্ঠী পুজো**

পাতালের দেশ।

(আমেরিকা)

পানকৌড়ি, পানকৌড়ি, একটা ডুব দে।
ডুব দিয়ে পানকৌড়ি পাতালে নেমেছে॥
পাতালের দেশখানা বড় চমৎকার।
সেথা, আশমানেতে চলে রেল, জলে মোটরকার॥
জমিন ছেড়ে করে তারা আশমানেতে বাস।
আর, গরুগুলো বসে’ খায়, কলে করে চাষ॥
সেথা, মানুষগুলোর চোখে ঠুলি, গরুর চোখ সাদা।
আর, দিদিমারা সভা করে, ঘরে থাকে দাদা॥
মোদের সকাল বেলায় তাদের জ্বলে সাঁঝের বাতি।
মোদের যখন দুপুর বেলা, তাদের নিশুৎ রাতি॥
তারা, দিবানিশি বাদুড়-ঝোলে মাথা করে’ হেঁট।
তাদের, টাকাকড়ির নাইক সীমা সবাই জগৎ শেঠ॥

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

চিঠি-চাপাটি।

আমার দেশের গ্রাহক গ্রাহিকা ও পাঠক পাঠিকা !

"আমার দেশ"কে যে তোমরা ভালবাস, স্নেহ কর, তা আমরা জানি; "আমার দেশ" পাইতে কোন বার যদি দেরী হইয়া যায়, তোমরা অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হও তাহাও আমরা জানি। "আমার দেশ" সংক্রান্ত কত চিঠিই আমরা রোজ পাই। তার মধ্যে তোমরা কত কথাই লিখিয়া থাক—কার কোন্ প্রবন্ধটি ভালো লাগিয়াছে, কোন্ গল্পটি সবার চেয়ে চিত্তাকর্ষক হইয়াছে, কোন্ ছবিখানি দেখিয়া আহ্লাদের সীমা নাই এবং কি ধরণের গল্প প্রবন্ধ বা ছবি তোমরা তোমাদের "আমার দেশে" প্রকাশিত হইতে দেখিতে চাও-এমনি আরও কত কি কথা সেই সব চিঠিগুলিতে লিখিত থাকে। এখন হইতে আমরা স্থির করিয়াছি যে সেই সকল চিঠির মধ্যে দরকারী চিঠিগুলি "আমার দেশে" প্রতি মাসে ছাপাইব। তোমাদের নিজেদের মধ্যে খবরাখবরের আদান প্রদানে তোমরা আনন্দিত হইবে বলিয়াই আশা করি। আমার দেশের" সকল গ্রাহক গ্রাহিকাদের মধ্যে আলাপ পরিচয় করাইয়া দেওয়াই আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য।

একদিনের ডাক খুলিয়াই পাইলাম, একখানি পোষ্টকার্ড! জগদ্বিখ্যাত বিজ্ঞানাচার্য্য পূজ্যপাদ প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের লেখা। চিঠিখানি অবিকল ছাপিয়া দিলাম, তোমরা পড়িলেই বুঝিবে তিনি তোমাদেরই মত "আমার দেশকে" কত ভালবাসেন।

তিনি দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন ইওরোপীয় দেশ হইলে পত্রিকাখানি হাজারে হাজারে বিক্রয় হইত;—সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই কিন্তু আমাদের দেশের

INDIA
POST CARD
WRITING SPACE

AMHERST STREET
CALCUTTA

Sj. Sisir Kumar Mitra
B.A.,
Sisir Publishing Ho
College Street Mark
(Local)

পো:ষ্ট ক

পত্রাংশ

College of Science.
Calcutta.
22.7.22.

My dear Sisir,

My warm congratulations to your artist for the excellent reproductions of Titian. Each of them can be framed and hung up in the room. If it were in any European country "আমার দেশ" should have sold by thousands.

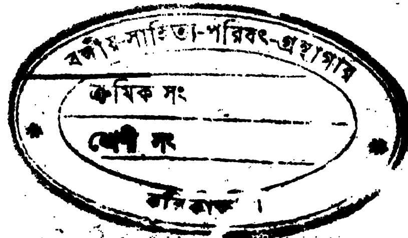
Yours sincly

P. C. Ray.

সে দিন এখনো আসে নাই। একদিন আসিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস আছে।

আমাদের দেশের ছেলে-মেয়েরা ভালো জিনিষের কদর বুঝিতেছে আরো বুঝিবে। কিন্তু হাজারে হাজারে না হৌক, তোমরা চেষ্টা করিলে "আমার দেশ" আর কিছু বেশী বিক্রীত হয়, সঙ্গে সঙ্গে আমরা ইহার আরো অনেক উন্নতি করতে পারি। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র যে দুঃখ করিয়াছেন, সে দুঃখও তোমরা দূর করিতে পার। তোমাদের দু' পাঁচজন বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন আছেনই, তোমরা যদি সেই দু' পাঁচজনের এক জনকেও "আমার দেশ" দেখাইয়া গ্রাহক করিয়া দাও, তোমাদের প্রত্যেকের এই চেষ্টা দ্বারাই "আমার দেশের" গ্রাহক সংখ্যা অনেক বাড়িয়া যাইতে পারে। তুমি যে আমার দেশ পড়িয়া আনন্দিত হও, সন্তুষ্ট হও, তোমার বন্ধু বান্ধব সেই "আমার দেশ" খানি দেখিলে যে আনন্দিত ও সন্তুষ্ট হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কাজেই তাঁহাকে গ্রাহক শ্রেণীভূক্ত করিয়া দিতে তোমাকে আদৌ কষ্ট পাইতে হইবে না, কেবল মাত্র একটু চেষ্টা! সেটা তোমাদের সকলেরই কর্ত্তব্য! "আমার দেশ" তোমাদের! আমাদের মত ইহার মঙ্গলচেষ্টা করা তোমাদেরও কি উচিৎ নয়?

আর একটি কথা, আগামী মাস হইতে আমরা দেশ বিদেশের নূতন নূতন অবশ্য জ্ঞাতব্য খবরগুলি তোমাদের উপহার দিব। তাহা হইতে তোমরা অনেক জানিতে ও অনেক শিখিতে পারিবে।



নূতন ধাঁধা।

১। ঝড়ের আগেতে ছুটি পাখা বিহীন
দেখিতে না পাই কভু কল্পনা-অধীন
ভালমন্দ বিচার করিতে আগে চাই
বিকৃত হইলে পরে আপনা হারাই
সকলের কাছে কিন্তু ভাল আর মন্দ
সাবধানে বল যেন নাহি লাগে ধন্দ।

২। তিন অক্ষরে নাম সর্ব্বলোকে খায়
দেবী বলে পূজে মোরে সকল সময়
প্রথম অক্ষর ছাড় যদি দুর্গন্ধেতে ভরি,
যতেক আনিয়া ব্যাধি লোকক্ষয় করি;
শেষ অক্ষর ছাড় যদি আমি হই যাহা
মুদির সতত ইচ্ছা করিবারে তাহা
আর মধ্যের অক্ষরটী ছাড় যদি ভাই
সুমিষ্ট সুফল এক আমি হয়ে যাই
বল দেখি কেবা আমি কিবা নাম ধরি
কোথায় জনম মোর কোথা বাস করি?

শ্রীসতীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩। তিন অক্ষরে এমন একটী স্থানের নাম কর যাহার প্রথম ও দ্বিতীয় একত্রে হইলে এমন একটী দ্রব্যের নাম হয়, যাহা সর্ব্বদাই তোমার সঙ্গে আছে এবং প্রথম ও তৃতীয় লইলেও সেই একই দ্রব্যের নাম হয়; বলত সেই স্থানের নাম কি?

শ্রীঅনাদিনাথ মুখোপাধ্যায়।

জ্যৈষ্ঠ মাসের ধাঁধার উত্তর।

১। হ্যারিকেন; ২। নীহার; ৩। বাজ।

যে সকল গ্রাহক-গ্রাহিকা তিনটী ধাঁধারই নির্ভুল উত্তর দিয়াছেন, তাঁহাদের নাম :—

শ্রীমতী অমিয়া রায়, ভবানীপুর; নির্ম্মলকুমার মুখোপাধ্যায়, সালকিয়া; কে, এ, এম, গোলাম রব্বানী উলিপুর; ইন্দুভূষণ চক্রবর্ত্তী, চিঙ্গিগড়; শচীন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও ফণীন্দ্র চক্রবর্ত্তী, কলিকাতা; মণীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ও শৈলেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, গোরক্ষপুর; চন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায়, সুরিয়া; সুব্রত সেনগুপ্ত, রঘুনাথগঞ্জ; রাজলক্ষ্মী সেনগুপ্তা, নেত্রকোণা; সুধাংশুশেখর গুপ্ত ঢাকা; কামেখ্যাচরণ চট্টোপাধ্যায় ঢাকা; সারদা মন্দিরের ছাত্র, গুপ্তিপাড়া; নির্ম্মলকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, গুপ্তিপাড়া; মনোভিরাম ও নয়নাভিরাম, শিলং; সলিলচন্দ্র সেন, সাতক্ষীরা; অজীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিলং; পরিমলবালা বসু, পাটনা; রবীন্দ্রকুমার বসাক, কলিকাতা; হাসিরাণী মিত্র, কলিকাতা; কল্যাণী দেবী, খুলনা; সলিলকুমার মিত্র, কলিকাতা; নির্ম্মলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, কিশোরগঞ্জ; সুষমা নাগ, রাঁচি; প্রফুল্লকুমার বিশ্বাস, গোয়াড়ী; সিদ্ধেশ্বর সাহা, নেত্রকোণা; সৌদামিনী বড়াল, গণেশতলা, দিনাজপুর; নীহার ঘোষ, বিজয় ঘোষ, রেঙ্গুন; কুশলচন্দ্র নিয়োগী রেঙ্গুন; অমূল্যকুমার রায়, রামকৃষ্ণ মজুমদার, হাসরা (ঢাকা); সভ্যবৃন্দ, মন্নুলাল মেমোরিয়াল লাইব্রেরী. বহরমপুর; অনিলকুমার বসু, চুঁচুড়া; মীনারাণী সেন, বিহার; জ্যোৎস্নাময়ী ঘোষ, হাওড়া, রবীন্দ্রনাথ বসু, বরিশাল; মঙ্গলচরণ গাঙ্গুলী, গোরক্ষপুর; দীনেশচন্দ্র গুপ্ত ওয়ারী; শোভা সেন, ধুলিয়া; সুধাংশুশেখর গুপ্ত, ওয়ারী।

যাঁহারা দুইটীর উত্তর দিতে পারিয়াছেন ঃ—

শ্রীমতী চিত্রা নাগ, ও সুব্রত নাগ, কলিকাতা; কালীকুমার কুণ্ডু, কুমার খালি; বীরেন্দ্রনাথ রায়, বেহালা; রবীন্দ্রনাথ দত্ত, কলিকাতা; সুধীন্দ্রমোহন ঘোষ, পুরুলিয়া; বিভূতিভূষণ মিত্র, বৰ্দ্ধমান; গুরুদাস ঘোষ. চন্দননগর; ভগবতীশঙ্কর পাঁজা, কলাইকুণ্ডু; শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, জব্বলপুর। ভবানী রায়, বগুড়া; সুশীলামণি ঘোষ, চন্দননগর; সন্তোষকুমার রায়, সিদ্ধান্তবাঘমারা; অমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বহরমপুর; জীবন চক্রবর্ত্তী, চট্টগ্রাম; অদ্রীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পুণা; বিজয়গোপাল ও অজয় গোপাল রায়, নেত্রকোণা; সুধীন্দ্রনাথ রায়, বেহালা; সুধীন্দ্রকুমার বসাক, কলিকাতা।

আষাঢ় মাসের ধাঁধার উত্তর।

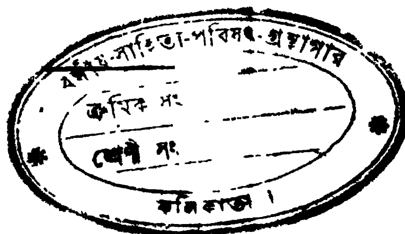
১। ঘটক। ২। মাতাল।

যাঁহারা দুইটী ধাঁধারই উত্তর দিয়াছেন ঃ—

কুমারী আভারাণী মজুমদার; প্রফুল্লকুমার বিশ্বাস, গোয়াড়ী; কুমারী সুষমা নাগ, রাঁচি; দীনেশচন্দ্র গুপ্ত ওয়ারী; শচীন্দ্রকুমার দত্ত, চট্টগ্রাম; গুরুদাস ঘোষ, চন্দননগর; সিদ্ধেশ্বর সাহা, নেত্রকোণা; বীরেশচন্দ্র মজুমদার, কলিকাতা; সতিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নামকুম (রাঁচি); মঙ্গলচরণ গাঙ্গুলী, গোরক্ষপুর; কুমারী রাজলক্ষী সেনগুপ্তা, নেত্রকোণা; বীণাপাণি দেবী ও কুমারী বারিবালা দেবী, বৰ্দ্ধমান; কুমারী হাসিরাণী মিত্র, কলিকাতা; সলিলকুমার মিত্র, কলিকাতা; রবীন্দ্রকুমার ও সুধীন্দ্রকুমার বসাক, কলিকাতা।

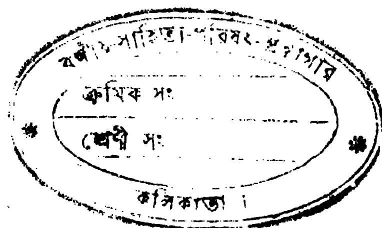
যাঁহারা একটীর উত্তর দিয়াছেন ঃ—

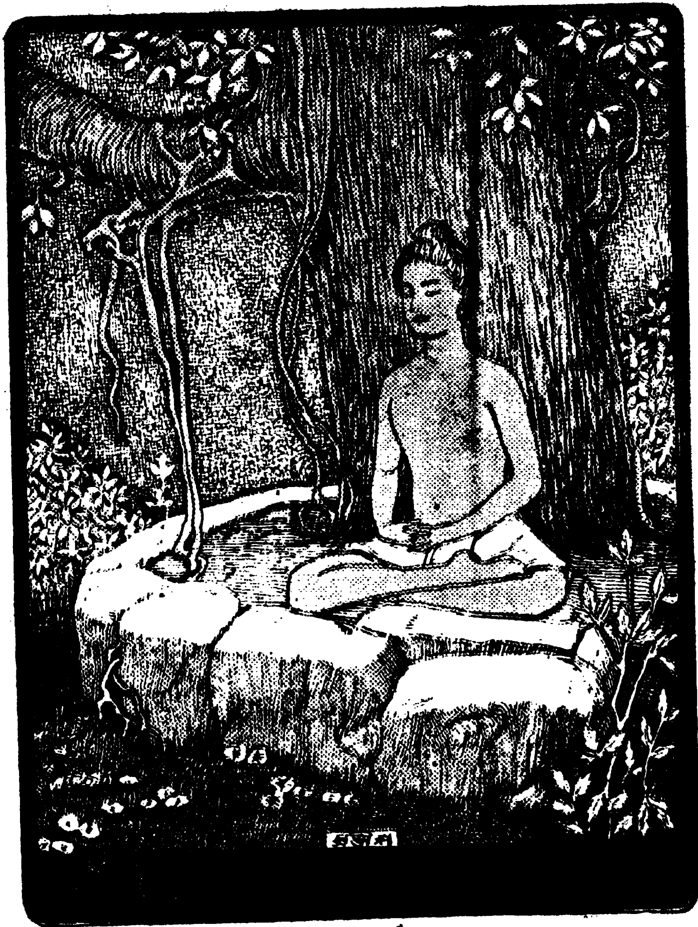
পরিমলবালা বসু, পাটনা ; হিমাংশুভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়, মেদিনীপুর ; বলাইকৃষ্ণ গোল, হুগলী ; সুধীন্দ্রনাথ রায় বেহালা ; চম্পাবতী সেন, মসুয়া ; রাধাবল্লভ বন্দ্যোপাধ্যায়, আসানসোল সভ্যবৃন্দ, মন্নুলাল মেমোরিয়াল লাইব্রেরী, বহরমপুর ; দেবীপ্রসাদ মিত্র, কলিকাতা ; শম্ভুচরণ সেন পাটনা ; বীণাপাণি দেবী শ্রীরামপুর ; প্রমোদনাথ মুখোপাধ্যায়, বরিশাল ; অণিমা দেবী, রাঁচি ; কালীকুমার কুণ্ডু, কুষ্টিয়া ; সুব্রত সেনগুপ্ত, রঘুনাথ গঞ্জ ; বিজয় ও নীহার ঘোষ, রেঙ্গুন ; অনাদিনাথ মুখোপাধ্যায়, চুঁচুড়া ; বিজনপ্রভা দত্ত, গাড়ীখোলা ; সুশীলার্গণ ঘোষ, চন্দননগর ; কৃষ্ণকমল ভৌমিক, তেজপুর ; রবীন্দ্রনাথ বসু, বরিশাল ; বিভূতিভূষণ মিত্র, বর্দ্ধমান ; নৃপেন্দ্রনারাযণ রায় চৌধুরী, ওয়ারী ; সুধীন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী, পাটনা ।



শিশির পাব্লিশিং হাউস,
প্রকাশক—শ্রীশিশিরকুমার মিত্র বি, এ ।
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা ।

বিদ্যোদয় প্রেস,
প্রিণ্টার—শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ।
৮।২ কাশী ঘোষ লেন, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা ।


বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।



বুদ্ধদেব

আমার দেশ

২য় বর্ষ, ৮ম সংখ্যা। ভাদ্র, ১৩২৯

স্বাস্থ্যপুরী।

(১)

সে ভারী এক মজার স্বপ্ন।

সেদিন অমলের মনটা ছিল বেজায় খারাপ। তাহারই সহপাঠী বন্ধুদের কথা ভাবিতে ভাবিতে সে স্কুল হইতে বাড়ী ফিরিতেছিল। বিমল, রাখাল, বিনোদ ক'দিন হইতে ক্লাসে আসে না। স্কুলের ফেরত তাহাদেরই বাড়ীতে সে গিয়াছিল। যাইয়া দেখে, সবাই সারি সারি বিছানায় শুইয়া আছে, কাহারও বা জ্বর, কাহারও বা সর্দ্দি, কাহারও বা পেটের অসুখ। অমলের মনটা হঠাৎ যেন কেমন গুম্ হইয়া গেল। তাই ত! এমন কেন হয়? এইত তাহারা দিব্যি স্কুলে আসিত যাইত। কিন্তু হঠাৎ এমন কেন হইল? কি কষ্ট!

—অসুখের তাড়নায় মুখগুলি তাহাদের শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গিয়াছে। এর কি কোন প্রতীকার নাই? এই সব ভাবিতে ভাবিতে সে কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। ঘুমের ঘোরে সে ভারী এক মজার স্বপ্ন দেখিল।

যেন এক কোন বহু দূর অচিন রাজ্যের উদ্দেশে অমল চলিয়াছে। কত দিন, কত রাত্রি কাটিয়া গেল তথাপি অমল চলিয়াছে—সে পথের সীমা নাই—অন্ত নাই—চলিয়াছে ত দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ এমনিই একটানা হাঁটিয়া চলিয়াছে—পথের ঝোপ ঝাড়, বন জঙ্গল, নদ, নদী সব পার হইয়া কত দিন রাত্রি সে হাঁটিয়াছে তথাপি তাহার কিছুমাত্র ক্লান্তি বা অবসাদ আসে নাই, উৎসাহের তার কিছুমাত্র কমতি ছিল না, সে অচিন রাজ্যে তাহাকে যে পঁহুছিতেই হইবে।

এমনি যাইতে যাইতে পথে তাহার দেখা এক পথিকের সঙ্গে।

পথিক জিজ্ঞাসিল, "বন্ধু; কোথা হইতে তুমি আসিতেছ? কত দূরে যাইবে?"

অমল বলিল, "বন্ধু, আমার বসতি ছিল পৃথিবীতে, স্বাস্থ্যপুরীর উদ্দেশে আমি বাহির হইয়াছি। কিন্তু আমি সে রাজ্যের পথ চিনি না। কোন পথে যাইতে হইবে আমায় বলিয়া দিবে বন্ধু?"

পথিক বিস্ময়ে অবাক হইয়া অমলের দিকে খানিকক্ষণ তাকাইয়া উত্তর করিল। "তোমরা পৃথিবীর লোক—সে রাজ্য ত তোমাদের জন্য নয়। ফিরিয়া যাও বন্ধু, স্বাস্থ্যপুরী এখনও পৃথিবীর চাইতে অনেক দূরে। পৃথিবীর লোক ত এখনও স্বাস্থ্যপুরীতে আসিবার উপযুক্ত হয় নাই।"

অমল কিন্তু একেবারে নাছোড়বন্দা। পথিককে সে ধরিয়া বসিল, স্বাস্থ্যপুরীর পথ তাহাকে দেখাইয়া দিতে হইবেই।

অমল বলিল,—"কি সুখে আর ছাই পৃথিবীতে থাকিব। সুখের সেরা সুখ-স্বাস্থ্যই যদি সেখানে খারাপ হইয়া গেল তবে আর বাচিয়া থাকিয়া লাভ কি? আমি তাই স্বাস্থ্যপুরীর সন্ধানে চলিয়াছি—এমন দেশ যেখানে অসুখ বিসুখ, রোগ তাপ কিছুই নাই। বলিয়া দাও বন্ধু, কোথায় সে পুরী, আমি আর পৃথিবীতে ফিরিব না।"

পাঁচ কথায় পথিকের সঙ্গে অমলের বেশ বন্ধুত্ব জমিয়া উঠিয়াছিল। তাই অমলের অনুরোধ উপরোধ আর সে ঠেলিতে পারিল না। পথিক স্বাস্থ্যপুরীর পথ অমলকে দেখাইয়া দিল, অমল এইবার স্বাস্থ্যপুরীর সোজা পথ ধরিল। আবার কত দিন কত রাত্রি হাঁটিতে হাঁটিতে সে আসিয়া যেখানে পঁহুছিল—

সে এক অপূর্ব্ব পুরী—

সে কি সুন্দর দেশ। তাহার পাহাড়, পর্ব্বত, নদ নদীর কি অপূর্ব্ব শোভা। পথ, ঘাট, ঝোপ, ঝাড়, বন জঙ্গল সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে—কোথায়—এতটুকু ময়লা নাই। প্রকৃতিতে যেন চির বসন্ত—গাছের ডালে সবুজ পাতা, তার উপর—কাল পাখী বসিয়া মনের আনন্দে গান গাহিতেছে। মানুষেরই বা সে কি অপূর্ব্ব রূপ! এমন সুন্দর মানুষ ত অমল কোন দিন দেখে নাই। স্বাস্থ্য, রূপ ও সৌন্দর্য্য যেন তাহাদের সর্ব্বাঙ্গে উথলিয়া পড়িতেছে। দেশের কোথাও রোগ, তাপ, জ্বরা নাই। সবাই মনের অনন্দে খেলিয়া, গল্প করিয়া কাজ করিয়া বেড়াইতেছে। অমল তখন বুঝিল

এই স্বাস্থ্যপুরী—

(২)

অমলের ছিল কতকগুলি বদ্ অভ্যাস। কিন্তু এ স্বাস্থ্যপুরীর দেশ—ওসব বদ্ অভ্যাস ত আর এখানে রাখা চলে না। তাই অমলকে সে সবই

ছাড়িতে হইল। এখানকার ছেলে বুড়ো সবাই জন্মাবধি স্বাস্থ্যের নিয়মগুলি মানিয়া চলে, তাই ধীরে ধীরে অমলেরও সেগুলি আয়ত্ত হইয়া গেল।

অমলের কোন কষ্ট ছিল না। সে দেশের লোকেরা পৃথিবীর এই নূতন লোকটীকে পাইয়া ভারী খুসি হইয়াছিল। তাহারা নিজেরা উদ্যোগ করিয়া এই নূতন আগন্তুককে তাহাদের দেশের কত কি সব নূতন জিনিষ দেখাইল। অমল একে একে তাহাদের সঙ্গে সে দেশে সব দেখিল, কত কি অদ্ভুত দৃশ্য সব—কিন্তু কই, দক্ষিণ দিকে ত তাহারা তাহাকে লইয়া গেল না। অমল একদিন একজনকে বলিল—

"চল ভাই! দক্ষিণ দিকটা এইবার দেখি, সে দিকটা ত একবারও দেখা হইল না।"

সেই লোকটি অবাক্ হইয়া বলিল,—"সে কি ভাই। ওদিকে বুঝি আবার মানুষ যায়। ছ্যা, ছ্যা, অমন কথা মুখেও আনিও না!"

বেচারা অমল আর করে কি, অপ্রস্তুত হইয়া মুখ বন্ধ করিল।

কিন্তু মুখ বন্ধ করিলে কি হয়। মন ত আর তাহাতে প্রবোধ মানে না। সেই এক দক্ষিণদিকের চিন্তা তাহার মনে ঢুকিয়া তাহাকে একেবারে—অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছিল। অমল দিন রাত্রি ভাবে তাই ত, দক্ষিণদিকে কি আছে।

সেদিন সকালে অমল সঙ্গীদের এড়াইয়া একাই ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িল। ঘুরিতে ঘুরিতে অমল যাইয়া হাজির, দক্ষিণদিকের সেই প্রকাণ্ড পাহাড়টার তলে। এদিক ওদিক দেখিতে দেখিতে দেখে এক কোণে একটি ছোট্ট সুড়ঙ্গ—গাছ পাতা দিয়া ঢাকা। অমল কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া সরাসর সেই সুড়ঙ্গের ভিতর ঢুকিয়া পড়িল। ভিতরে সে কি ভীষণ অন্ধকার! অমলের

গাটা ছম্ ছম্ করিয়া উঠিল। কিন্তু যখন একবার আসিয়াছে তখন শেষ পর্য্যন্ত ত তাহাকে দেখিতেই হইবে। অমল সেই ঘোর অন্ধকারে হাতড়াইতে হাতড়াইতে আরও খানিকটা অগ্রসর হইল। কিন্তু কিছু দূর যাইতে না যাইতে কি একটা শক্ত জিনিষে তাহার মাথা ঠুকিয়া গেল। হাত দিয়া দেখে একটা প্রকাণ্ড লোহার দরজা। কিন্তু শুধু তাই কি?

আবার ও কিসের চীৎকার?

কিসের যেন গোঙানি শব্দ আকাশ বাতাস ভেদ করিয়া হুঙ্কার দিয়া উঠিতেছে—যেন মেয়ে পুরুষ, ছেলে বুড়ো সব স্বর এক সুরে, এক তানে বাজিয়া উঠিয়াছে। অমল কাণ খাড়া করিয়া শুনিল সে গোঙানির মধ্য দিয়া একটি ঝঙ্কার মাত্র স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে—

দরজা খোল! দরজা খোল!!

সে স্বরের মধ্যে ছিল প্রাণভাঙা মন গলান কাকুতি মিনতি। অমলের মন গলিয়া গেল। সে ভাবিল এই পোড়া স্বাস্থ্যপুরীর লোকেরা হয় ত তাহাদের কোন পরাক্রমশালী শত্রুকে এই পর্ব্বত গুহার মধ্যে আটকাইয়া রাখিয়াছে—কি পাষণ্ড এই দেশের লোকেরা। অমল আর কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়াই সেই দরজার প্রকাণ্ড অর্গলটা ঝনাৎ করিয়া খুলিয়া ফেলিল। সঙ্গে সঙ্গে কিসের যেন একটা তীব্র আওয়াজ দিগন্ত কম্পিত করিয়া বাজিয়া উঠিল। সেই প্রকাণ্ড লোহার দরজাটা কড় কড় শব্দে খুলিয়া গেল। তাহার পরই প্রকৃতির সে কি দাপাদাপি মাতামাতি—দেখিতে দেখিতে ঘন কালো মেঘে সব আচ্ছন্ন হইয়া গেল, দূষিত বায়ুর গন্ধে আকাশ পাতাল ভরিয়া উঠিল—যেন বিশ্বের অমঙ্গল আসিয়া সেখানে জড় হইয়াছে; কি একটা প্রলয় ব্যাপার ঘটিয়া যাইবে।

অমল অবাক হইয়া বাহিরে দাঁড়াইয়াছিল। ভয়ে বিস্ময়ে তাহার নিশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছিল। সে দেখে বিশ্বের যারা শত্রু সব আজ বাহির হইয়া এই সোনার রাজ্য ছারেখারে দিবে। মনের সব সাহস জড় করিয়া অমল তখনই সেই দরজটা বন্ধ করিয়া দিল।

তাহার পরই আবার সেই চীৎকার। আবার সেই গোঙানি শব্দ।

অমল সেই সুড়ঙ্গ দিয়া বাহির হইয়া যাইবে, এই সময় দেখে স্বাস্থ্যপুরীর লোকেরা আসিয়া গুহামুখে জড় হইয়াছে। সেই ভীষণ শব্দ শুনিয়া সকলেই যে যার কাজ ফেলিয়া উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়াছিল; দক্ষিণদিকে আসিয়া দেখে এই কাণ্ড! অমল বেচারার আর বলিবার কিছুই ছিল না। সে হাঁ করিয়া তাহাদের দিকে তাকাইয়া রহিল। তাহারা আর কোন কথা না বলিয়া তাহাকে বন্দী করিয়া রাজার নিকট লইয়া চলিল।

(৩)

স্বাস্থ্যপুরীর রাজার বিরাট দরবার বসিয়াছে। দরবার বসিতে প্রথমেই বিচার হইবে অমলের। অমলকে আনিয়া সবাই হাজির করিল। একজন উঠিয়া বলিল,

"মহারাজ, প্রথমেই আমরা অনেকে বলিয়াছিলাম পৃথিবীর লোককে এই স্বাস্থ্যপুরীতে আসিতে দিয়া কাজ নাই,—ইহাকে তাড়াইয়া দেওয়া হউক। ঈশ্বর ত এই পৃথিবীর লোককে আমাদেরই মত জ্ঞান বুদ্ধি সব দিয়াছেন, কিন্তু তথাপি যখন উহারা সেই জ্ঞান বুদ্ধির ব্যবহার না করিয়া ঐ সোণার পৃথিবীটাকে অমন বিশ্রী কদর্য্য করিয়া রাখিয়াছে তখন কি উহারা স্বাস্থ্যপুরীতে আসিয়াও এই স্বাস্থ্যপুরীর নিয়মকানুন মানিয়া চলিতে পারিবে? উহাদের যদি তেমন ইচ্ছা থাকিত তবে পৃথিবীটাকেই ত উহারা স্বাস্থ্যপুরী করিয়া তুলিতে পারিত।

বিদ্যাবুদ্ধি থাকিলেও পৃথিবীর লোকেরা মানুষ নহে—তাই পৃথিবীটাকে উহারা রোগের আবাস করিয়া তুলিয়াছে। এখন নিজেদের সর্ব্বনাশ করিয়া এই লোক আসিয়াছে, আমাদের সর্ব্বনাশ করিতে। আমরা এই লোককে দক্ষিণ দিক যাইতে বলি নাই, যাইতে নিষেধ করিয়াছি—কিন্তু আমাদের নিষেধ না মানিয়া এই লোক দক্ষিণ দিকে যাইয়া সেই গিরিগহ্বরের দরজা খুলিয়া দিয়াছিল—আমাদের দেশের সর্ব্বনাশ করিতে। আর একটু হইলেই আমাদের এই স্বাস্থ্যপুরী পৃথিবীরই সামিল হইয়া যাইত।

রাজা তখন বলিলেন,

"তোমার কি বলিবার আছে বন্দি ?"

অমল উত্তর করিল,

"মহারাজ! এ আমার ইচ্ছাকৃত অপরাধ নয়—এই রাজ্যের সবটাই দেখিলাম—কিন্তু দক্ষিণ দিকটা দেখিলাম না—তাই মনে একটা প্রবল আগ্রহ জন্মিয়াছিল দক্ষিণ দিকটায় কি আছে দেখিতে। আপনি হয় ত জানেন না পৃথিবীর লোকেরা কিছু অনুসন্ধিৎসু—সব জানিবার সব শিখিবার আগ্রহটা তাদের কিছু বেশী। আমিও সেই আগ্রহবশেই দক্ষিণ দিকে গিয়াছিলাম—আপনার রাজ্যের সর্ব্বনাশ করিবার জন্য নয়। কিন্তু ব্যাপারটা কি হইল আমি এখনও ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না।

রাজা সব শুনিয়া বলিলেন—

"এ লোককে অপরাধী করা যায় না। যাক্, তোমাদের মধ্যে একজনে এই লোককে দক্ষিণ দিকে কি আছে দেখাইয়া আন। শুধু চোখে সে সব দেখিয়া ত বুঝিবে না—আমার মন্ত্রপূত চশমাটা উহাকে পরাইয়া দাও—তাহা হইলে গাছ, পাথর, জীব, জন্তু, প্রকৃতি সবাইয়ের অন্তরের কথা, ব্যথা সে

শুনিতে ও দেখিতে পাইবে; তাহার পর এই লোকের বিচার রাজসভায় হইবে।”

অমল মহাখুসি হইয়া সেই লোকটির সঙ্গে দক্ষিণ দিকে চলিয়া গেল।

(৪)

আবার দক্ষিণ দিকের সেই প্রকাণ্ড দরজাটা খুলিয়া গেল। অমল ও সেই লোকটি যাইয়া সেই গহ্বরের ভিতর ঢুকিল। ঢুকিয়াই সঙ্গের সেই লোকটি খুব সাবধানে আবার দরজাটি বন্ধ করিয়া দিল।

ভিতরে যাইয়া অমল দেখে সারি সারি সব ঘেরা যায়গা রহিয়াছে—সব অর্গল বদ্ধ। সেই লোকের কথা মত অমল ঘুরিয়া ফিরিয়া সব দেখিতে লাগিল।

সেখানে যাইয়া অমল দেখে প্রকৃতির যত কিছু ময়লা আবর্জ্জনা বিশ্রী জিনিষ সব এক এক স্থানে অর্গলবদ্ধ অবস্থায় জড় হইয়া আছে। দিব্য দৃষ্টির প্রভাবে অমল প্রত্যেক জিনিষের অন্তরের কথা—তাহার ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সব দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইল।

এক স্থানে অমল দেখে যত সব পচা পুকুর, আর তাতে এঁদো, ঘোলাটে জল, কেউবা সেই পুকুর পাড়ে ম্যালেরিয়া জ্বরে মরিয়া পড়িয়া আছে। আবার কেউবা কলেরা রোগে গতায়ু হইয়াছে। মুহূর্ত্তের মধ্যে সেই সব হতভাগ্য লোকেদের, সেই সব জীবাণুদের জীবনের প্রত্যেক ঘটনাটি তাহার সম্মুখে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিল। অমল দেখে যত সব রোগের জীবাণু সেই জলের মধ্যে কিলি-বিলি করিতেছে। আর এক মশা মহানন্দে সেই এঁদো পুকুর হইতে ম্যালেরিয়া রোগের জাবাণু লইয়া আশে পাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, কাহার গায়ে হুল ফুটাইয়া দিবে এই সন্ধানে। খানিকক্ষণের মধ্যেই আর একটি অতিত ইতিহাস

তাহার চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল—অমনই একটি মশা এক ম্যালেরিয়া রোগীকে কামড়াইয়া তাহার জীবানু লইয়া একটি সুস্থ ঘুমন্ত পুরুষকে কামড়াইয়াছিল—এমনি করিয়াই সে মালেরিয়াগ্রস্থ হইয়া—অকালে প্রাণ হারাইল।



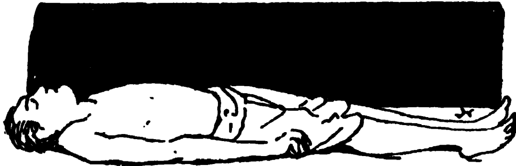
ঘুমন্ত পুরুষকে কামড়াইয়াছিল।

আর এক যায়গায় যাইয়া অমল দেখিল একটা ইন্দুর ও একটা মানুষ পাশাপাশি পড়িয়া আছে। তাহাদের অতীত জীবনের কাহিনী স্মরণ করিতেই বুঝিল, ঐ ইন্দুরটার হইয়াছিল প্লেগ। একটা ইঁদুরে মাছি আসিয়া ইন্দুরটাকে ধীরে ধীরে আক্রমণ করিতে লাগিয়া গেল। রোগের জীবানুও সেই সঙ্গে মাছিটার মধ্যে রহিয়া গেল। ঐ বেচারী-লোকটাকে যখন মাছিটা কামড়াইল তখন তার শরীরের মধ্যেও ঐ রোগের জীবানু যাইয়া ঢুকিল। প্লেগ হইতে আরাম হওয়াও আর সহজ নয়—বেচারা আর বাঁচিল না। স্বাস্থ্যপুরীর লোকেরা ঐ ইন্দুরের গলায় একটা কাল ফিতা বাঁধিয়া টানাইয়া রাখিয়াছিল (ফাঁসি নাকি?) যেন লোকে ইন্দুরের কাছে বড় বেশী না ঘেষে!



এমনি করিয়া অকালে সে প্রাণ হারাইয়াছে।

এক যায়গায় কয়েকটি ছেলে মেয়ে মরিয়া পড়িয়াছিল। সেই লোকটির নিকট খবর লইয়া অমল জানিল, তাদের বাপ মা ঐ ছেলেমেয়েদের জল হাওয়া সহ্য না করাইয়া পুতি পুতি করিয়া রাখিত, তাই বেচারারা অকালেই ভবলীলা সাঙ্গ করিয়াছে। এমনই একটি ছেলের জীবন তাহার চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। জামা কাপড় আঁটিয়া জানালা দরজা বন্ধ করিয়া তাহাকে দিবারাত্র রাখা হইত—এমনি করিয়াই অকালে সে প্রাণ হারাইয়াছে।



বন্ধ ঘরে একটি লোক মরিয়াছিল।

তারই পাশে একটা বন্ধ ঘরে একটি লোক মরিয়াছিল। সে বেচারা অতিরিক্ত সাবধান হইয়া ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করিয়া দিন কাটাইত তাই বিশুদ্ধ হাওয়ার অভাবে মারা গিয়াছে — পৃথিবীর কত লোকের স্বাস্থ্যই না নিত্যই এমনি বিশুদ্ধ বায়ুর অভাবে নষ্ট হইয়া যাইতেছে।

এক যায়গায় একদল লোক পাশাপাশি গাদি হইয়া পড়িয়া আছে—অমল খবর লইয়া জানিল তাহারা ছিল ভারি নোঙরা, সাতজন্মেও নাইত না, তাই তাদের চামড়ার দরজা সব বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। চর্ম্মরোগে তাহারা মারা গিয়াছে।

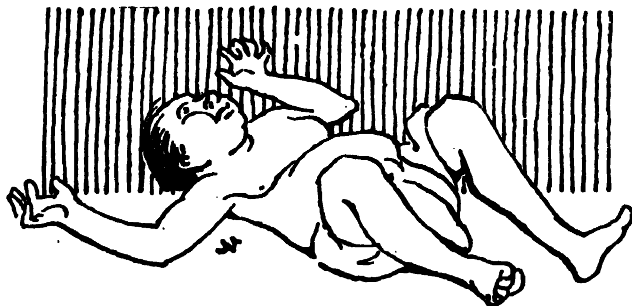
এমনি নোঙরামি করিয়া কেউ কেউ দাঁত মাজে না—দাঁতের রোগে সে ভুগিয়া



নোঙরামির ফল—চর্ম্ম রোগ।

মরে। কেউ বা নোঙরামি করিয়া নিজেদের ড্রেণ পরিস্কার করে নাই—তাই নিত্য রোগে ভুগিয়া তিলে তিলে তাহারা নিজেদের শরীর ক্ষয় করিয়াছে।

কোথাও বা দেখা গেল পেটুকরাম অতিরিক্ত খাইয়া তাল সামলাইতে না মরিয়া পড়িয়া রহিয়াছে, আবার কোথাও বা কেহ সারবান খাদ্যের অভাবে অকালে প্রাণ হারাইয়াছে।



পেটুকরাম

সেই দিব্য চশমার কল্যাণে এমনই একটি পেটুকরামের জীবনী তাহার চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল—সে বেচারা খাইয়াছিল গাণ্ডে পিণ্ডে—তাই হাস ফাস করিয়া শেষটা মারা গেল।

এক জায়গায় মাতালের কি দুরবস্থা দেখা গেল। বেচারা নেশায় ভোর হইয়া একেবারেই জ্ঞান হারাইয়াছিল, পরিধানে কাপড় নাই, সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত—এমনি করিয়াই সে জীবন হারাইয়াছে।



মাতাল

এক যায়গায় একটা মড়াকে দেখিয়া অমল ভারি আশ্চর্য্য হইল। বেচারার মুখটা খুবই বিষণ্ণ; কিন্তু আর কোন রোগ ত দেখা গেল না। কিন্তু তখনই দেখিতে পাইল, ঐ বিষণ্ণতা রোগেই লোকটা মারা গিয়াছে। সারা জীবনভোর সে বিষণ্ণ ভাবে গুম হইয়া দিন কাটাইত; ঐ বিষণ্ণতা হইতেই



এমনি করিয়াই সে প্রাণ হারাইয়াছে।

নানা প্রকার রোগ বেচারার হইয়াছিল, শেষটা তার খাবার হজম পর্য্যন্ত হইত না। এমনি করিয়াই সে প্রাণ, হারাইয়াছে।

এক যায়গায় মড়ার ভারী ভির। অমল পরীক্ষা করিয়া দেখিল সেগুলি সব ক্ষয় রোগের রোগী। পৃথিবীতে তাহারা স্বাস্থ্যের মোটামুটি নিয়মগুলিও মানে নাই, তাই তাহাদের দেহ তিলে তিলে ক্ষয় হইয়াছে। যে যায়গায় তাদের দেহগুলি ছিল সেখানে আলো ও

বাতাসের চিহ্নমাত্র ছিল না। অমল বুঝিল এমনই অন্ধকারে বদ্ধ ঘরে থাকিয়াই তাহারা এই রোগ বাঁধাইয়াছিল! প্রকৃতির নিয়ম না মানিয়া চলিলে এমনিই লোকের সাজা হয়।

অমলের তখন মনে পড়িল আমাদের দেশের অনেক অবোধ মেয়েদের কথা—তাহারা দরজা জানালা বন্ধ করিয়া, স্তিমিত প্রদীপের আলোকে সেলাই প্রভৃতি কত কাজ করিয়া থাকে—এমনি করিয়া তাহারা নিজেদের স্বাস্থ্য ও শরীর নষ্ট করিয়া অকালে ক্ষয় রোগে আক্রান্ত হয়।



এমনি করিয়া তাহারা নিজেদের স্বাস্থ্য ও শরীর নষ্ট করিয়া অকালে ক্ষয় রোগে আক্রান্ত হয়।

আরও কত কি দৃশ্য সেখানে ছিল। কিন্তু যে গুলি দেখিয়াছিল তাহাতেই অমলের শ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছিল। সে দূষিত বায়ু অমল আর সহ্য করিতে পারিতেছিল না। অমল বুকভরা চিন্তা ও বেদনা লইয়া গহ্বরের বাহিরে চলিয়া আসিল।

(৫)

অমল যখন রাজার দরবারে আসিয়া আবার হাজির হইল। রাজা সোৎসাহে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

"কি হে আগন্তুক,সব দেখিলে ?"

অমল ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল।

রাজা বলিলেন, "আগন্তুক, তোমরা পৃথিবীর লোক, তোমরা হয়ত আমাদের এই স্বাস্থ্যপুরীর নিয়ম জান না। আমাদের রাজ্যের প্রত্যেককেই স্বাস্থ্যের মোটা-মুটি নিয়ম কয়টি মানিয়া চলিতে হয়। এখানকার প্রত্যেক স্কুলের প্রত্যেক শ্রেণীতে স্বাস্থ্যের গল্প শুনান হয়। তাই ছেলেবেলা হইতেই স্বাস্থ্যের নিয়ম সম্বন্ধে সবাইয়ের মোটামুটি একটা ধারণা জন্মায়। এ রাজ্যের সবাইকেই সে নিয়ম মানিয়া চলিতে হয়—না মানিলে রাজদণ্ড ভোগ করিতে হয়। তাহা সত্বেও যাহারা স্বাস্থ্যের নিয়ম না মানিয়া নিজেদের প্রাণ দেয়, স্বাস্থ্যপুরীর আইন অনুসারে তাহাদের বাস হইবে রাজ্যের বাহিরে ঐ পর্ব্বত গহ্বরের মধ্যে। রোগ, অসুখ, ব্যয়রাম রোগের জীবাণু, প্রভৃতি স্বাস্থ্যের প্রতিকুল যত কিছু' সব ঐ পর্ব্বত গহ্বরের মধ্যে ঠেলিয়া রাখিয়াছি—এ রাজ্যে তাহাদের স্থান নাই। তোমরা পৃথিবীর লোক, তোমরাও যদি আমাদের মত এইরূপ স্বাস্থ্যের নিয়ম মানিয়া চল তবে তোমাদের পৃথিবীও ত স্বাস্থ্যপুরীই হইতে পারে। কিন্তু তোমরা ভারী অলস. ভারী মুর্খ—নিজেদের ভালর জন্য এই সাধারণ নিয়ম কয়টিও মান না—তোমাদের আর কি বলিব!

এই সময়ে একটি লোক মনে করিয়া দিল, এই লোককে কি শাস্তি দিবেন বলিয়াছিলেন!

রাজা বলিলেন, "হ্যাঁ, তোমার শাস্তির কথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। স্বাস্থ্যপুরীর নিয়ম ভাঙ্গিবার জন্য তোমার শাস্তি হইল—এই রাজ্য হইতে নির্ব্বাসন—তুমি পৃথিবীর লোক—আবার পৃথিবীতে যাও।

এইবার অমল বেচারা কাঁদিয়া ফেলিল। এই কষ্ট করিয়া সে স্বাস্থ্যপুরীতে আসিয়াছিল। তাহাকে আবার পৃথিবীতে ফিরিয়া যাইতে হইবে!

রাজা তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন।

"আগন্তুক, দুঃখ করিও না। এ রাজ্যে তোমার স্থান হইল না বটে, কিন্তু পৃথিবীতে যাইয়া তুমি অনেক কাজ করিতে পারিবে। এ রাজ্যের ত সব দেখিলে শুনিলে—এখন পৃথিবীকেও ঠিক স্বাস্থ্যপুরী করিতে পার কি না তাহার চেষ্টা দেখ। পৃথিবীতে যাইয়া সেখানে স্বাস্থ্যের বাণী শুনাও—সেখানেই তোমার কার্য্য—সেখানেই যাইয়া কার্য্য আরম্ভ কর।"

অমল বলিল, "কিন্তু পৃথিবীর লোক যে স্বাস্থ্যের কথা শুনিতে চায় না।"

রাজা বলিলেন, "শিখিবার কোন জিনিস শিশুকালেই মানুষ শিখিয়া থাকে। আমাদের এই দেশে খুব ছেলেবেলাতেই ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্যের গল্প বলা হয়। আমাদের ছেলেমেয়েরা রূপকথার চাইতেও সেই সব গল্প শুনিতে ভালবাসে। সেই সব গল্পের ভিতর দিয়া তাহারা স্বাস্থ্যের সব নিয়ম কানুন শেখে। তুমিও সেই গল্পগুলি শুনিয়া যাও। পৃথিবীতে যাইয়া সেই দেশের ছেলেমেয়েদের এই সব গল্প শুনাইবে—তাহা হইলে তাহারাই পৃথিবীকে স্বাস্থ্যপুরী করিয়া গড়িয়া তুলিবে।

অমল এত বড় একটা কাজের ভার পাইয়া মহা খুসি হইয়া চলিয়া গেল। নির্ব্বাসন দণ্ড আর তখন তাহার নিকট দণ্ড বলিয়া মনে হইল না—তাহা যেন তাহার নিকট মস্ত বড় একটা কর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়াইল।



৺মতিলাল ঘোষ।

৺মতিলাল ঘোষ

"অমৃতবাজার পত্রিকা"র প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক মতিলাল ঘোষের নাম ভারতের কোন লোকেরই নিকট অপরিচিত নাই। সম্প্রতি ইঁহার মৃত্যু হইয়াছে। পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক বলিলে মতিলালের পরিচয় পরিষ্কার হয় না। তাঁর প্রকৃত পরিচয় তোমরা এখন ভাল বুঝিতে পারিবে না; মতিলাল তোমার জন্য, আমার জন্য, বাঙ্গালীর জন্য, ভারতবাসীর জন্য কি করিয়া গিয়াছেন, ভারতবর্ষের কল্যাণে প্রাণ-মন নিয়োগ করিয়া যে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা তোমরা পরে বুঝিবে। এখন শুধু এইটুকু জানিয়া রাখ, দুঃখীর দুঃখে, পীড়িতের আর্ত্তনাদে মতিলালের হৃদয় কাঁদিত; অত্যাচার-উৎপীড়নের নাম শুনিলে মতিলালের হৃদয় উত্তেজিত হইয়া উঠিত। অনেকে আছেন, মানুষের দুঃখে কষ্টে যাঁহাদের হৃদয় বিচলিত হয়, কিন্তু ক্ষমতা নাই বলিয়াই হোক বা যে কারণেই হোক্ চুপ করিয়া থাকাই তাঁহারা সঙ্গত মনে করেন, মতিলালের প্রকৃতি সে ধরণের ছিলনা। দুর্ব্বলের পক্ষে, পীড়িতের জন্য, আর্ত্ত-অসহায়কে রক্ষা করিতে সকল সময়েই তাঁহার উচ্চ ও মনুষ্যোচিত অন্তঃকরণ প্রস্তুত হইয়া থাকিত। মতিলাল ও তাঁহার সহোদর স্বনামধন্য শিশরকুমারের নির্ভীকতা, সৎসাহসের পরিচয় পাইয়া দেশবাসী যেমন তাঁহাদের, প্রতি শ্রদ্ধাবান হইয়া উঠিল, তাঁহাদের নামেরও তেমনি প্রসার বাড়িতে লাগিল—গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টিও এই সময়ে সেদিকে পড়িল। শেষে এমনও দিন আসিল যখন গবর্ণমেণ্টও অমৃতবাজারের মতিলাল বা শিশরকুমারের পরামর্শ লইতে লাগিলেন। মতিলাল দেশসেবার এক নূতন আদর্শ দেখাইয়াছেন। ভারতবর্ষের ছেলেমেয়েরা, তাঁহার স্মৃতি ভুলিও না—ভবিষ্যতে সুযোগ পাইলেই তাহার জীবন কাহিনী পড়িও।

মন্‌সা ব্রতকথা

(সাত-বৌ)

(ভাদ্র মাস)

এক দেশে এক সওদাগর ছিল তার সাত ছেলে। সওদাগর তার সাতটি ছেলে উপযুক্ত হ'লে—সাত ছেলের বিয়ে দিয়ে বৌ ঘরে আন্‌লে। সওদাগরের স্ত্রীর সাতটী বৌএর মধ্যে ছয়টী বৌ মনোমত হ'লো। ছোটটী তাঁর মনের মত হ'লো না। ছ' বৌএর বাপের বাড়ী থেকে প্রতি মাসেই তত্ত্ব তাবাস আসে কিন্তু ছোট বৌএর বাড়ী থেকে তার কোন খোঁজ খবরই নেয় না। সওদাগরের স্ত্রী সেই জন্যে ছোট বৌটীকে মোটেই দেখ্‌তে পারেন না—কথায় কথায় খোঁটা দেন—সদাই তাকে দাঁতে দাঁতে রাখেন। ছোট বৌ আর কি করে—মনের দুঃখ মনে চেপে সংসারের কাজ কর্ম্ম করেন। আর ছ' বৌকে শ্বাশুড়ী ভাল খাওয়ান—ভাল পরান, ছোট বৌকে অশ্রদ্ধায় দু' মুঠো দেন। এইভাবে ছোট বৌয়ের দিন কাটে।

এখন হয়েছে কি, সওদাগরের বাড়ী যেখানে সেখানে একটা ভয়ঙ্কর অজাগর বন ছিল। সেইখানে মন্‌সা দেবীর আট্‌টী ছেলে তার গর্ত্তের ভেতর বাস কর্ত্ত। কিন্তু হঠাৎ একদিন সেই বনে আগুণ লেগে সব বন পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়ায় তারা সওদাগরের খিড়কির পুকুরে গিয়ে মাছ হয়ে থাকে। সেই অবধি তারা সেই পুকুরেই বাস কচ্ছে। এখন একদিন সন্ধ্যা বেলা সাতটী বৌএ মিলে খিড়কীর পুকুরে কাপড় কাচতে গেছেন। ছ' বৌ হাসি ঠাট্টা গল্প কচ্ছেন—ছোট বৌ দেখেন তাঁর পাশে এক ঝাঁক্ মাছ কিল্ বিল কচ্ছে—এই

যেমন দেখা অমনি তিনি গামছা দিয়ে মাছ ক'টীকে ধরে ফেল্‌লেন। সওদাগরের অন্য বৌরা তখন হাসি ঠাট্টায় এমনি মত্ত যে ছোট বৌ কি কচ্ছে না কচ্ছে তা তাঁরা মোটেই দেখতে পেলেন না। কাপড় কেচে বাড়ী এসে ছোট বৌ মাছ ক'টীকে একটী কল্‌সীর ভেতর জিইয়ে রাখ্‌লে। পরদিন সকালে উঠে ছোট বৌ মাছ ক'টীকে বার কর্ত্তে গিয়ে দেখে—সেই মাছক'টী আট্‌টী সাপ হয়ে আছে। সাপ ক'টীকে দেখে ছোট বৌএর বড় মায়া হ'লো। সে কাউকে কিছু না বলে সেই সাপ ক'টীকে পুষ্‌তে লাগ্‌লো। সওদাগরের বাড়ী, অভাব তো কিছুরই নেই—ছোট বৌ রোজ আট্‌ পো দুধ আর আট্‌টী কলা খাইয়ে সাপ কটীকে বাঁচিয়ে রাখ্‌লে! দুধ কলা পেয়ে সাপেদের আর আনন্দ ধরে না—তাদের মধ্যে যে বড় সে একদিন বল্লে,—"ভাই, সওদাগরের ছোট বৌ আমাদের এত যত্ন কচ্ছে—এত খাওয়াচ্ছে—ওর কিছু উপকার করা উচিত। চ', আর আমরা এখানে থেকে কি কর্ব্বো—মার কাছে গিয়ে ওর যাতে দুঃখ ঘোচে তার একটা ব্যবস্থা করিগে যাই। মা নিশ্চয়ই ওর দুঃখ ঘুচিয়ে দেবেন।"

যেমন পরামর্শ অমনি কাজ। তারা আট্‌ ভায়ে মায়ের কাছে গিয়ে সব বল্লে, "মা, সওদাগরের ছোট বৌ আমাদের ভারি যত্ন করেছে—ওর দুঃখ তোমাকে ঘুচুতেই হবে। ছোট বৌএর শাশুড়ী তাকে ভারি কষ্ট দেয়। মা, তুমি গিয়ে তাকে এইখানে নিয়ে এস তা'হলে তার আর কোন কষ্ট থাক্‌বে না।"

মন্‌সা দেবী ছেলেদের মুখে সব শুনে বল্‌লেন,—"না বাছা, তাকে এখানে এনে কাজ নেই। তোমাদের স্বভাব তো ভাল নয়—তোমরা আজ সন্তুষ্ট, কালই আবার হয় তো তার ওপর রুষ্ট হবে। তোমাদের যে খোলা স্বভাব।"

কিন্তু ছেলেরা কিছুতেই শুনবে না,—তারা ছোট বৌকে না আনলেই হবে না বলে ধরে পড়লো। মনসা দেবী কি করেন? ছোট বৌকে আনবার জন্যে ছোট বৌএর মাসী সেজে—নানা রকম সামগ্রী নিয়ে সওদাগরের বাড়ী গিয়ে উপস্থিত হ'লেন। সওদাগরের গিন্নী খাওয়ার পর পান চিবুচ্ছিলেন—মনসা-দেবীকে দেখে জিজ্ঞাসা কল্লেন,—"তুমি কেগো বাছা, কাকে খুঁজ্ছ?"

মনসাদেবী বল্লেন,—"আমি তোমাদের ছোট বৌএর মাসী গো। তাকে দিন কতকের জন্য নিতে এসেছি।"

সওদাগরের গিন্নী ছোটবৌকে দু'চক্ষে দেখতে পাত্তেন না—তাকে তাড়াতে পাল্লেই বাঁচেন,--"তবু ভাল যে এতদিনে বোনঝির খোঁজ হ'লো; তা বাপু, আজই তোমার বোনঝিকে নিয়ে যাও।"

মনসাদেবী ছোটবৌকে রথে করে বাড়ী আনলেন। ছোট বৌ তো মনসা দেবীর বাড়ী দেখেই অবাক—এ হ'লো স্বর্গের বাড়ী। এ বাড়ীর বাহারই অন্য রকম। মনসাদেবী ছোট বৌকে বাড়ী এনে খুব যত্ন কর্ত্তে লাগলেন—বল্লেন—"বাছা, তুমি রোজ আমার পূজোর যোগাড় করে দেবে—আর তোমার ভাইদের দুধ গরম করে রাখবে। যে দিকে ইচ্ছে যেও, শুধু দক্ষিণের ওই কুটুরীতে কখন ঢুকো না।"

ছোটবৌ মনের আহ্লাদে মনসাদেবীর বাড়ীতে আছেন। তাঁর কোন দুঃখ কষ্ট নেই। মনসাদেবী যেমন বলে দিয়েছেন রোজ সকালে উঠে তেমনি করেন। একদিন সেই দক্ষিণের কুটুরীতে উঁকি দিয়ে দেখেন—মনসাদেবী নাচছেন। এমন নাচ জীবনে আর কখন ছোটবৌ দেখেন নি। নাচ দেখে এমনি মোহিত হয়ে গিয়েছিলেন যে ভাইদের দুধ গরম করে রাখতে হবে সে কথা ভুলেই গেছলেন। নাচ ভাঙ্গলে তখন তাঁর মনে হ'লো ভাইদের দুধ



খাবে বলে ফণা তুলে-

গরম করে রাখতে হবে। তাড়াতাড়ি এসে দুধের কড়া উননে বসিয়ে দিলেন। এদিকে দেখেন যে তাঁর ভাইরা দুধ খেতে আস্‌ছে! তখন তিনি আর কি করেন; সেই কড়ার গরম দুধ বাটীতে ঢেলে ভাইদের খেতে দিলেন। সাপেরা যেমন দুধের বাটীতে মুখ দিয়েছে—গরম কড়ার দুধে অমনি তাদের মুখ পুড়ে গেল। সাপেরা একেবারে রেগে আগুন—অমনি ছোটবৌকে খাবে বলে ফণা তুল্‌লে। মনসাদেবী ছেলেদের এই আচরণ দেখে তাড়াতাড়ি ছুটে এসে বল্লেন,—"আমি তো তোমাদের বলেছিলুম যে ছোট বৌকে এখানে এনে কাজ নেই। তোমাদের খোলা স্বভাব। যা হবার তা হয়েছে—তোমরা ওকে খেওনা—আমি ওকে শ্বশুর বাড়ী রেখে আস্‌ছি।"

সাপেরা মায়ের কথা আর অমান্য কল্লে না—তারা ছোট বৌকে খেলে না—কিন্তু রাগে ফোঁস ফোঁস করে কেবল গজ্‌রাতে লাগ্‌ল। মনসাদেবী ছোট বৌএর অঙ্গে সব রকম এক একখানি গয়না পরিয়ে তার শ্বশুরবাড়ীতে রেখে এলেন,—আস্‌বার সময় বলে এলেন,—"তোমার ভাইরা তোমার ওপর ভয়ানক রেগে আছে—তোমার শ্বশুরবাড়ীতে যেন তাদের নিন্দেবান্দা করো না—তাহ'লে তারা আর তোমার রক্ষে রাখবে না। তাদের তুমি সুখ্যাতি করো, তাহ'লে তাদের রাগ প'ড়ে যাবে—তাহ'লে তারা তোমার বরাবর উপকার কর্ব্বে।"

অনেকদিন পরে ছোটবৌ শ্বশুরবাড়ী এসেছেন—এক অঙ্গ গয়না—কাজেই শাশুড়ী আগের চেয়ে ছোটবৌকে একটু যত্ন কল্লেন। কিন্তু আর ছয় বৌ তাঁর এক অঙ্গে গয়না দেখে পরস্পর গা টেপাটিপি করে বল্‌তে লাগ্‌ল,—"কত ঢংই দিনে দিনে দেখ্‌বো—এ আবার এক নতুন ঢং।"

ছোটবৌ তাদের কথায় উত্তর কল্লে,—

ভাইরা আমার লক্ষ্মীমন্ত
ভাবনা আমার নাই,
জন্ম জন্ম বাঁচুক তাঁরা
এইটা শুধু চাই ॥
আট্ ভায়ের বোন আমি
আমার আবার ডর।
তাঁদের কৃপায় হবে আমার
সোনা মোড়া ঘর ॥
এক অঙ্গে গয়না দেখে
এতই ঠেরাঠেরী।
সকল অঙ্গে গয়না দেবে
নয় তো বেশী দেরী ॥

মন্‌সার ছেলেরা ছোটবৌর শ্বশুরবাড়ী এসে তাদের কথা ছোট বৌ শ্বশুর বাড়ীতে কি বলে তাই শুন্‌বার জন্যে এধারে ওধারে লুকিয়ে ছিল। ছোট বৌএর কথায় তাদের রাগ জল হয়ে গেল। তারা মাকে এসে ধরে ব'স্‌লো,—"মা! ছোট বৌএর আর এক অঙ্গে গয়না না দিয়ে আমাদের ভারি নিন্দে হ'য়েছে। তুমি এখনি ছোট বৌএর আর এক অঙ্গে গয়না পরিয়ে দিয়ে এস। নইলে কিছুতেই চলে না।"

মন্‌সা দেবী ছেলেদের অনুরোধ এড়াতে পারেন না! আবার এক পুঁট্‌লি গয়না নিয়ে সওদাগরের বাড়ী গিয়ে উপস্থিত হ'লেন। সওদাগর গিন্নী মন্‌সা দেবীর যত্নের ক্রটী কল্লেন না। মন্‌সা দেবী ছোট বৌএর দেহ মুড়ে গয়না পরিয়ে দিয়ে বল্লেন,—"মা আমি তোমার সত্যি মাসি নই। আমি মন্‌সা দেবী। তুমি

আমার কৃপাপাত্রী—আমার পূজো তুমি পৃথিবীতে প্রচার কর। পৃথিবীতে মন্‌সা গাছ বলে এক রকম গাছ আছে—সেই গাছে আমি সর্ব্বদা থাকি। দশহরা ও নাগ্‌ পঞ্চমীর দিন যে নারী সেই গাছ এনে আমার পূজা করে তার সাপের ভয় থাকে না। আমার কৃপা সে চিরদিন পেয়ে থাকে। আর ভাদ্র মাসে শুদ্ধভাবে যে আমার পূজো করে আর আমাকে পান্তাভাতের ভোগ দেয়—লক্ষ্মী তার ঘরে অনন্তকাল থাকেন।"

এই বলে মন্‌সা দেবী অন্তর্দ্ধান হ'য়ে গেলেন! ছোটবৌ মন্‌সা দেবীর কথামত বছর বছর তাঁর পূজো কর্ত্তে লাগ্‌লেন। মন্‌সা দেবীর কৃপায় তাঁর আর কোন অভাবই রইল না। জোয়ান জোয়ান ছেলে হ'লো—ঘর আলো মেয়ে হ'লো—চাঁদের মত জামাই হ'লো। ধানে গোলা ভরে গেল—গায়ের দুধ উপ্‌ছে পড়্‌লো। ছোটবৌ মনের সুখে ঘর সংসার কর্ত্তে লাগ্‌লো।

ধেঁাড়া, বোরা, কেউটে, গোখরো
যায় না তাহার কাছে,
ভক্তি ভরে যে নারী
মনসা চরণ পূজে॥
পুকুর ভরা মাছ হয় তার
গোলা ভরা ধান,
মনসা দেবীর এমনি কৃপা,
এমনি তাঁর দান॥

শ্রীযতীন্দ্রনাথ পাল।

বাঘের মাসী।

(১)

ছোটনাগপুর অঞ্চলে ছেলেমেয়েদের জন্যে বাঘ ও বিড়াল সম্বন্ধে বেশ একটি গল্প প্রচলিত আছে, আমার দেশের ছোট ছোট পাঠক পাঠিকারাও বোধহয় তা শুনে কৌতুক বোধ করবে। গল্পটি এই—এক সময় বিড়াল ও তার বোন পো বাঘ দুজনেই ছিল বনের জীব, লোকালয়ে তাদের মোটেই গতি বিধি ছিল না। জীব-জন্তু শীকার করে তার সদ্যোষ্ণ রক্ত পান করে ও মাংস খেয়ে ক্ষুধার জ্বালা শান্ত করত, একদিন হঠাৎ এক পথিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ। পথিক দুটি ছাগল নিয়ে নিজের ঘরে যাচ্ছিল. বাঘ তার প্রাণ বধ করবার জন্য উদ্যত হতেই পথিক বলে উঠ্‌ল, "দোহাই পশুরাজ, আমার প্রাণ বধ করবেন না, করে আপনার লাভ কি?" বাঘ গর্জ্জন করে বলে উঠ্‌ল, লাভ আবার কি, আমার ক্ষুধার শান্তির জন্যে তোমার প্রাণ বধ করতে চাই এই লাভ। পথিক বল্‌লে, "ক্ষুধার শান্তি করবার জন্যে তবে ছাগ শিশু দুটিকে নিয়ে আমায় অব্যাহতি দাও, বাড়ীতে আমার স্ত্রী, আমার ছোট ছোট মেয়ে ছেলে সব আমার পথ চেয়ে আছে, কেন না আমি গেছলাম হাটে জিনিষ কিন্‌তে, এই দেখ পুঁট্‌লিতে আমার চাল, ডাল, নুন সব বাঁধা রয়েছে, এ সব নিয়ে গেলে রান্না হবে, আর বাচ্চা কাচ্ছারা খেতে পাবে।" খিদের জ্বালাটা পশুরাজের ও বেশ ভাল রকম, তা ছাড়া আরও গোট দুই বাচ্চা কাচ্ছা ছিল—কাজেই সে পথিককে রেহাই দিয়ে ছাগল দু'টিকে নিয়েই সন্তুষ্ট হলো। পথিক তখন এক খাবল নুন পুঁট্‌লি খুলে বাঘকে দিয়ে বললে, "এই একটা জিনিষ ছাগলের মাংসতে মাখিয়ে খেয়ে দেখ, ভাল লাগবে। কি

রোজ রোজ আলোণা মাংস খাও, নুন দিলে ওর দু গুণ সোদ পাবে।” বাঘ ‘তথাস্তু’ বলে সেটা থাবা পেতে নিয়ে নিল; পথিক চলে যেতেই ছাগল বাচ্ছা দুটির ঘাড় ভেঙে নুন দিয়ে সেই মাংস মাসী বোন্‌পোতে খেয়ে নিলে, নুনের স্বাদ পেয়ে বাঘ বেশ খুসীই হলো।

(২)

তার দিনকত পরের কথা, বাঘ সেদিন একটা ভেড়া শীকার করেচে, করেই তার মনে পড়ল নুনের কথা, তখন মাসীকে বল্‌লে “মাসী আমি ভেড়াটা একটু আগলে থাকি তুমি পোঁ করে ঐ গাঁয়ের মধ্যে ঢুকে কোনো গেরস্ত বাড়ী থেকে একটু নুন জোগাড় করে আন, এবার বাঘিনী আর বাঘা গুলকেও একটু নুনের সোয়াদ চাখাতে হবে, ভাল জিনিষ সেবারে একলা একলাই খেয়েছি।” মাসী তখন নুনের সন্ধানে নরম নরম পা ফেলে গাঁয়ের মধ্যে এক গোয়ালার বাড়ী গিয়ে হাজির! গোয়ালার বউ তখন রান্নাঘরের দুয়ার খুলে রেখে ছেলেকে ঘুম পাড়াতে গেছ্‌ল, মাসী নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে দেখলে, কড়া ভরা দুধ আওটান রয়েছে. এক দিকের এক মস্ত ভাঁড় চাপ চাপ দই, আর একটা ভাঁড়ে সদ্য জ্বাল দেওয়া ঘি ঢালা রয়েছে, তার সুগন্ধে ঘর খানি ভুর ভুর করছে, মাসী তখন বোনপোর বরাতী জিনিষের কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে ঐ সব জিনিষগুলি একে একে চেখে পরখ কর্‌তে লাগ্‌ল। পরখ করে বুঝল কাঁচা মাংসর চাইতে এ সবের স্বাদ ঢের ভাল আর গেরস্ত বাড়ীতে এসব জিনিষ আনায়াস লভ্য, সুতরাং বোনপোর কাছে ফেরবার মতলব ত্যাগ করে সে ঐসব জিনিষ ভোগের ব্যবস্থাটাই স্থির করে ফেল্‌লে, সেই থেকে বাঘের মাসী বিড়াল আমাদেরই গৃহস্থ পরিবার ভুক্ত হয়ে পড়্‌ল, বাঘ যে বনের বাঘ সেই বাঘই রয়ে গেল।

শ্রীসরসীবালা বসু।

অদৃশ্য কালী।

একরকম কালী আছে যা দিয়ে লিখলে দেখা যায় না, আগুনে গরম করে নিলে তবে দেখা যায়। যুদ্ধ বিগ্রহের সময় গুপ্তচরেরা গোপনীয় পত্রাদি এই রকম কালি দিয়েই লিখে থাকে; অদৃশ্য কালি নানান রকমের আছে। অতি সাধারণ এক ফল. নেবু, থেকেই এক রকম অদৃশ্য কালি লয়।

নেবুর রস দিয়ে ষ্টিল কলমে করে একখণ্ড সাদা কাগজে একটা কোন ছবিটবি আঁক। তার পর, লেখাটা রোদে শুকোতে দাও, খানিক বাদে দেখবে, কাগজ যে সাদা সেই সাদা।

আচ্ছা এইবার ঐ কাগজখানাকে মোমবাতির আলো বা ষ্টোভ বা উনানের আঁচের উপর ধর। তোমার আঁকা ছবিটা মোটা হলদে রেখায় স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠবে। ভেতরকার কথাটা যে না জানে সে সাদা কাগজে হঠাৎ একটা ছবির আবির্ভাব দেখে, এটাকে একটা ভেল্কিবাজী বলে ঠাওরাবে নিশ্চয়ই।

শ্রীধানি লঙ্কা।

উদ্ভিদের খাদ্য।

(রাসায়নিক)

Animal products প্রাণীজ সার সম্বন্ধে কিছু কিছু গত বারের "আমার দেশে" জানাইয়াছি। আজ তোমাদের রাসায়নিক (chemical manure) সার সম্বন্ধে দু'একটী কথা বলিব। ইহার বিষয় তোমরা রসায়ন শাস্ত্র chemistry না পড়িলে সম্যকরূপে বুঝিতে পারিবে না—সেইজন্য ইহাদের নাম ধাম মাত্র তোমাদের জানাইব। ইহাদের প্রস্তুত প্রণালী তোমরা বড় হইয়া যখন রসায়ন শাস্ত্র পড়িবে তখন শিখিবে।

Sulphate of Ammonia—সলফেট্ অফ এ্যমোনিয়া ইহা কয়লা হইতে প্রস্তুত হয়। ভারতে ইহা প্রচুর উৎপন্ন হয় ইহাতে প্রায় শতকরা ২০।২১ ভাগ Nitrogen থাকে।

Ammoniam Nitrate—এ্যমোনিয়াম নাইট্রেট্ও উত্তম সার, ইহাতে শতকরা ১৮ভাগ Nitrogen থাকে।

Nitrate of Soda—নাইট্রেট্ অফ সোডা—ইহা চিল্লিদেশে প্রচুর জন্মে। চিল্লির সমুদ্রতীরে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে ইহার স্তর পড়িয়া আছে। ইহাতে প্রায় শতকরা ১৫।১৬ ভাগ Nitrogen আছে।

Nitrate of Potash—নাইট্রেট্ অফ পটাস্ ইহা উত্তর ভারতে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় ইহাতে শতকরা ৯।১০ ভাগ Nitrogen ও ৩০।৩১ ভাগ Potash আছে।

Sulphate of Potash—সলফেট্ অফ পটাশ্ ইহাও ভারতে প্রচুর উৎপন্ন হয়। ইহাতে শতকরা ২৫ ভাগ পটাস (Potash) থাকে।

Superphosphate—Ordinary এবং Concentrated দুই প্রকারের আছে Ordinaryতে শতকরা ১৭।১৮ ভাগ ও Concentratedএ প্রায় শতকরা ৪০।৪৪ ভাগ Phosphoric Acid আছে—ইহা ভারতে বিদেশ হইতে আমদানি হয়।

বেসিং শ্লাস—ইহাও বিদেশ হইতে ভারতে আমদানি হয়। ইহাতে শতকরা ১৬।১৮ ভাগ Phosphoric Acid আছে—ইহা দেখিতে ঠিক মিহি লৌহ চূর্ণের ন্যায়।

Phosphate of Lime—ফস্ফেট অফ লাইম—ইহাতে শতকরা ১০।১২ ভাগ Phospheric Acid আছে।

Flour Phosphate—ফ্লাওয়ার ফস্ফেট্ ইহাও বিদেশ হইতে ভারতে

আমদানি হয়। ইহাতে শতকরা ২৫।৩০ ভাগ Phospheric Acid আছে এ সমস্ত ছাড়া Slaked lime ও সাররূপে ব্যবহার হয়। গন্ধক চূর্ণ ও উত্তম সার—ইহা অত্যন্ত মূল্যবান। ইহাও জাপান, আমেরিকা—ইটালি প্রভৃতি স্থান হইতে আমদানি হয়!

এই সমস্ত Chenical manure—রাসায়নিক সার ছাড়া—আরও ২।১ প্রকারের সার আছে—যেমন Fish Guano, Fish manure Fish dust শুঁটকি মৎস চূর্ণ, শুষ্ক চিংড়ি মাছের খোলা চূর্ণ ইত্যাদি —এসবও উৎকৃষ্ট সার—ইহাতে Nirotgen ও Phosphoric Acid দুইই আছে। ইহা ছাড়া বাদুড়ের পুরীষ ও উত্তম সার।

যাহা হউক এই ত গেল উদ্ভিদের খাদ্যের কথা—কিন্তু একটা কথা সর্ব্বদা মনে রাখা উচিৎ—যে এই সকল খাদ্য উদ্ভিদ্‌গণ জলে দ্রবীভূত (Dissolve) না করিয়া, খাইতে পারে না কাজেই জল না দিয়া কেবল মাত্র সার দিলে উদ্ভিদের খাদ্য উদ্ভিদ্ গিলিতেই পারে না। উদ্ভিদের খাদ্য গিলিবার জন্য জল যেমন দরকার তেমনই রৌদ্রও ভাল না হইলে উদ্ভিদ্ খাদ্য খাইতেই পারে না!

যাক্ এখন এই সমস্ত মূল্যবান সার না দিলে কি জমিতে গাছ জন্মায় না? জমিতে সার ব্যবহার না করিলেও উদ্ভিদ্ জন্মায়, তাহা হইলে সারের প্রয়োজনীয়তা কি?—এর উত্তর হচ্ছে—যে একই জমির উপর বারংবার কৃষি কার্য্যের দরুণ জমির উর্ব্বর শক্তি দিন দিন হ্রাস হইতেছে—এবং পৃথিবীর লোক সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হেতু ও সভ্য যুগের বিলাস বৃদ্ধি হেতু খাদ্য দ্রব্যের অভাব দিন দিন বাড়িয়া উঠিতেছে—সুতরাং অধিক পরিমাণে ফসল উৎপাদনের জন্য সারের ব্যবহার ক্রমশই বাড়াইতে হইবে—যাহাতে জমিতে রীতিমত সার দিয়া তা'র উৎপাদিকা শক্তি ৩।৪ গুণ বৃদ্ধি করিয়া দেশের অভাব দূর করিতে পারা যায় তারই চেষ্টা করা উচিৎ।

শ্রীশিশিরকুমার বসু।

প্রফুল্লতা

(অনুবাদ)

(১)

আছে একটী ছোট্ট মেয়ে—
তোমরা কি গো চেন’ তারে ?
পায় সে আদর যত্ন কত
যায় সে যখন যাহার দ্বারে।

(২)

মু’খানি তার ফুলের মেলা
স্বরটী পাখীর আলাপ যথা—
বাজে সবার সেরা গীতি
ধীরে যখন কয় সে কথা।

(৩)

যেথা যখন উদয় তাহার
—রবির সোনার কিরণ জ্বলে,
সবাই তারে চায় পেতে,
ছেলে মেয়ে বুড়োর দলে—

(৪)

সবাই তারে বাসে ভাল—
দীন দরিদ্র জ্ঞানী গুণী—
কে এ ছোট্ট বালিকাটী ?
নাম কি তার বল শুনি !

(৫)

তোমরা তারে দেখিয়াছ
শুনিয়াছ তাহার কথা—
আচ্ছা, আমিই দিচ্ছি বলে'—
'নামটী তাহার "প্রফুল্লতা" !

শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় বি, এ ।



দর্পচূর্ণ।

একদেশে ছিল এক মস্ত রাজা। তার একটি মেয়ে ছিল, সে পরমাসুন্দরী, এমন সুন্দরী সচরাচর কারো চোখে পড়ে না। কিন্তু মেয়েটি বড় গর্ব্বিতা ছিল। যাকে আমরা চলিত কথায় বলি দেমাকে। যাই হোক্, মেয়ে সেয়ানা হলে, রাজা তার বিয়ে দেবার জন্যে অনেক দেশের অনেক বড় বড় রাজা মহারাজার ছেলের সঙ্গে মেয়ের সম্বন্ধ করলেন; কিন্তু রাজকুমারী তাঁদের নাম শুনে, এক এক রকম কুৎসা রটনা করতে লাগ্ল। শেষে রাজা বল্লেন, আচ্ছা, আমি বড় বড় রাজার ছেলেদের এনে এক স্বয়ম্বর সভা করছি, তাদের ভেতর থেকে তোমার মনোমত বর বেছে নিয়ো!

একদিন স্বয়ম্বর সভা হলো, দেশের যত রাজা মহারাজার ছেলে মনিমুক্তা হীরকের কাজ করা কত রকম সুরঞ্জিত, মনোহর, পোষাক পরে রাজ সভায় এলেন। তাদের সব পোষাকের হীরা জহরত দর্শকগণের চোখে এক একবার ঝলক হেনে দিতে লাগ্ল। সবাই বল্লে—এইবার রাজকুমারীর বিয়ে নিশ্চয়ই হবে, এমন সব সুন্দর সুন্দর রাজপুত্র, সুন্দর সুন্দর পোষাক পরে এসেছে, এদের মধ্যে কেউ নিশ্চয়ই রাজকুমারীর মন হরণ কর্বে! কিন্তু দুঃখের বিষয় তাদের কাউকেই রাজ কন্যার পছন্দ হ'ল না, যে এল দেখে বল্ল—ওর মুখ হাঁদা, ওকে বল্ল—ওর মুখ পেঁচার মত, আর এক জনকে বল্ল—ওর বিড়াল-চোখ্। এম্নি করে সবাইকে হটিয়ে দিলে। রাজকুমাররা অপ্রতিভ হয়ে চলে গেল। রাজা তাঁর মেয়ে তাঁদের এম্নি করে অপদস্থ কর্ল বলে, নিজেও বড়ই অপ্রস্তুত হলেন। এবং ভয়ানক চটে গিয়ে মেয়েকে সেই সভার মাঝে দাঁড়িয়ে বল্লেন—এইসব রাজপুত্রদের কাউকেই যখন তোর পছন্দ হ'ল না,

তখন আর কাউকে পছন্দ হবেও না। আমি কাল সকালে যাকে আমার দরজায় দেখ্‌ব—তার সঙ্গেই তোর বিয়ে দেব। কারুর কথা আমি শুন্‌ব না।

পরদিন সকালে রাজা বিছানা থেকে উঠে চাকরকে বল্লেন—দেখ্‌তরে, দরাজায় কেউ আছে কি না ?—চাকর বল্লে—একটা ভিক্ষুক বসে রয়েছে। রাজা বল্লেন—নিয়ে আয় তাকে। নিয়ে আসা হ'ল তাকে। রাজা তখন তার সঙ্গে রাজকন্যার বিয়ে দিয়ে মেয়েকে রাজপুরী থেকে বিদায় করে দিলেন। কিছুদূর যেতে যেতে একখানি সুন্দর ফলের বাগান দেখ্‌তে পেয়ে রাজকন্যা তার স্বামী সেই ভিক্ষুককে জিজ্ঞেস্ করলে—এ বাগানটী কার ? বেশ ত ফলের বাগান। ভিক্ষুক বল্লে, এ বাগানটি সেই মহারাজার—যার ছেলের সঙ্গে তোমার বাবা তোমার বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। তুমি তাকে বিয়ে কর্‌লে—এ তোমার হোত ! রাজকন্যা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বল্লে—আহা ! আর কিছুদূর গিয়ে তারা কয়েকটা হীরা মনিমুক্তার খনি দেখ্‌তে পেলে। রাজকন্যা খুব ব্যগ্র ভাবে তার স্বামীকে সুধালে—এ গুলো কার ? সে বল্লে—এও সেই রাজার—তুমি তার ছেলেকে বিয়ে কর্‌লে এও তোমার হোত !

রাজকন্যা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বল্লে—আহা, এমন কপালও আমার !

আর কিছুদূর গিয়ে একটী সুন্দর রাজ প্রাসাদ দেখ্‌তে পেয়ে রাজকন্যে জিজ্ঞেস্ করলে—এ অট্টালিকা কার ? ভিক্ষুক বল্লে—এ সেই রাজার বাড়ী ! এঁর ছেলেকে বিয়ে কর্‌লে এবাড়ী তোমারই হোত ! রাজকন্যে রেগে কেঁদে গালেমুখে চড়িয়ে নিজের চুল ছিঁড়তে লাগ্‌ল। ভিক্ষুক হেসে বল্লে—এখন আর কেঁদে কি হবে ? ওই, চল, ঘরে যাই !

রাজকন্যে বল্ল—আমি যাব না !

ভিক্ষুক বল্লে—তাকি হয়? তোমায় কি আমি ছাড়্তে পারি? তুমি যে আমার বউ!

রাজকন্যে বল্লে—কোথায় যাব?

ভিক্ষুক দূরে একখানি কুঁড়ে ঘর দেখিয়ে বল্লে—ঐ যে কুঁড়ে খানা দেখতে পাচ্ছ না? ঐ ত আমাদের বাড়ী। ঐ কুঁড়েতে যেয়ে ঢুক্তে হবে।

রাজকন্যা কেঁদে ভিক্ষুকের পা জড়িয়ে ধরে বল্লে, তোমার পায়ে পড়ি, ওখানে গেলে আমি এক দিনও বাঁচবনা। আমায় ছেড়ে দাও। আমি বাড়ী ফিরে যাই।

ভিক্ষুক বল্লে—তাকি হয়? তোমায় কি আমি ছাড়তে পারি? তুমি যে এখন আমার বউ!

রাজকন্যে আর কি কর্বে! কান্নাকাটি বৃথা জেনে চল্ল তার সঙ্গে। গিয়ে ঢুক্‌ল সেই কুঁড়েতে! ভিক্ষুক তখন বল্লে—ভাত রাঁধ, আমি খাব। রাজকন্যে বল্লে—আমার চোদ্দ পুরুষেও ভাত রাঁধেনি, আমি জান্‌ব কি করে?

তখন ভিক্ষুক তাকে কোন রকমে ধরে বেঁধে ভাত রান্না শিখিয়ে দিলে। তার পর দিন ভিক্ষুক বল্লে—দ্যাখ, আমি ভিক্ষেয় বেরুব, আর তুই চরকায় স্থতো কাটবি, এই বলে একটা চরকা আর খানিকটা তুলো দিয়ে সে ভিক্ষে কর্‌তে বেরিয়ে গেল রাজকন্যা কি আর স্থতো কাট্‌তে পারে? তার নরম্ হাত, আঙ্গুলগুলো যেন চাঁপা ফুলের কলি! স্থতোল ধরে ফেটে ফেটে রক্ত ফুটে বেরিয়ে পড়্‌ল! ভিক্ষুকটা এসে বল্লে—ধ্যেৎ, তুই কোন কাজের নস্। যাক্, কাল্‌থেকে বাজারে হাঁড়ি বেচতে যেতে হবে, মনে থাকে যেন। রাজ কুমারী কেঁদে তার পা জড়িয়ে ধল্লে, বল্লে—আর যা বলো, তা করব; কিন্তু বাজারে হাঁড়ি বেচতে যেতে পার্ব্বনা, রাজবাড়ীর কত লোক, বাজারে

আসবে তারা আমায় দেখলে কত টিট্‌কারী দেবে, রাজকন্যের কান্না দেখে ভিক্ষুকেরও দয়া হল। বল্লে—আচ্ছা, না হয় হাঁড়ি বেচ্‌তে না গেলি কিন্তু নিকটে এক রাজবাড়ী আছে, তাদের একটা রান্না করার লোক দরকার, তুই কালথেকে সেই কাজেই যাবি। রাজকন্যা তথাপি কেঁদে বল্লে—ওমা তা আমি কি অত ভাত রাঁধ্‌তে পারি? রাজবাড়ী! কত লোক রোজ সেখানে খায়! ভিক্ষুক বল্লে— তা হবে না, সেখানে তোমাকে যেতেই হবে, যদি না যাস্ তবে মার্‌তে মার্‌তে নিয়ে যাব!

অগত্যা রাজকন্যে যেতে বাধ্য হল। এমনি করে রোজ সে রান্না করে ফিরে আস্‌বার সময় রোজ এক থালা করে ভাত নিজের জন্যে নিয়ে আস্‌ত! এক দিন সে রান্না সেরে নিজের জন্যে ভাত নিয়ে কাপড় ঢাকা দিয়ে যাচ্ছে এমন সময় শুন্‌লে, এক রাজপুত্র বিয়ে করতে আসছে। কতরকমের বাজনা বাজছে, রাস্তায় হাজার হাজার লোক কাতার দিয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে। সেও তাড়াতাড়ি দেখতে গেল! দেখলে রাজপুত্র ঘোড়া থেকে নেমে তার কাছে গিয়ে তার হাত চেপে ধল্লে, বল্লে—চল তুমি আমার সঙ্গে, আমি আজ তোমায় বিয়ে কর্ব্ব! রাজকন্যার খুব লজ্জা করতে লাগ্‌ল। সে জোর করে রাজার ছেলের মুঠো থেকে হাত ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা কর্‌লে। আর সেই সময় টানাটানিতে তার কাপড় ঢাকা আর এক হাতের থালার ভাত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়্‌ল। লোক জন আরো জোরে হো-হো করে হেসে উঠ্‌ল।

রাজকন্যার তখন এমন লজ্জা কর্‌তে লাগ্‌ল যেন তার ইচ্ছে হচ্ছিল সে মাটীর সঙ্গে মিশিয়ে যায়! তারপর রাজপুত্তুর তাকে বল্লে—আমিই সেই ভিক্ষুক! আমায় চিনতে পারলে না। এ কথা শুনে রাজকন্যে বিস্ময়ে তার

দিকে চেয়ে দেখলে, সত্যিই তাই। তবে সে রাজ বেশে সেজে এসেছে তাই হঠাৎ সে তাকে চিন্‌তে পারেনি। সে তখন তার দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে রইল। রাজপুত্তুর তার বিস্ময় ভেঙ্গে দিয়ে বল্লে—যেদিন তুমি আমাকে পছন্দ করলে না সেই স্বয়ম্বরের দিন—তোমার বাবা রেগে বল্লেন কাল্ সকালে যাকে দেখতে পাবেন, তার সঙ্গে তোমার বিয়ে দেবেন। তাই আমি তার পর দিন সকালে ভিক্ষুক সেজে তোমাদের দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলুম। তার পর তুমিত সবই জান, তবে তোমাকে একেবারে রাজপুরীতে না এনে তোমাকে একটু শিক্ষাদেবার জন্যে, তোমার দেমাকটা ভাঙ্গবার জন্যে তোমাকে অমন ভাবে রেখেছিলুম্। এখন দেখলুম্ তুমি শুধ্‌রেছ—তাই তোমাকে নিতে এলুম্। এখন চল রাজবাড়ীতে!

রাজকন্যা বল্লে—তুমি আমার জন্যে এত কষ্ট পেতে গেলে কেন?

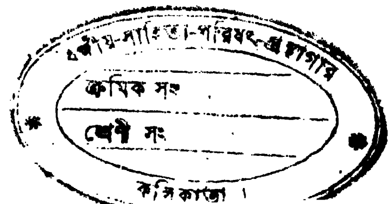
রাজপুত্তুর হেসে বল্লে—এ আর বুঝ্‌তে পার্‌ছ না?

রাজকন্যা বল্লে—কই না। কেন? কি জন্যে?

রাজপুত্তুর হেসে বল্লে—বা-রে, তোমায় যে আমি ছেলে বেলা থেকেই বড্ড ভাল বাসি!

রাজকন্যা হেসে মাথা নত কর্‌লে!

শ্রীগোপেন্দ্রনাথ সরকার।



হীরাজহরতের কথা।

তোমরা নিশ্চয়ই আমাদের পূর্ব্ব পুরুষদের ত্যাগের কথা পড়িয়াছ কিন্তু আজকাল আমরা টাকা পয়সাকে বড় বেশী ভালবাসিতে শিখিয়াছি সে জন্য আজ তোমাদের কাছে হীরাজহরতগুলি কি জিনিষ দিয়া তৈরী তাহা বলি। তোমরা সকলেই কয়লা দেখিয়াছ আর সেটা আমাদের প্রতিদিনের ঘরকন্নার কতখানি প্রয়োজনীয় তাও তোমরা জান। কিন্তু হীরা বোধ হয় খুবই কম দেখিয়াছ অথচ হীরা আর কয়লা হইতেছে একই জিনিষ। "কার্ব্বণ" (carbon) বলিয়া একটা জিনিষ আছে কয়লা, হীরা আর গ্র্যাফাইট এই তিনটা জিনিষই এই কার্ব্বণের বিভিন্ন মূর্ত্তি। আমরা যে পেন্সিলে লিখি তাহার সীস এই গ্রাফাইটেরই তৈয়ী। তোমরা জানো গাছপালা ভাল মাটীতে জলহাওয়া পাইলে খুব তাজা হয়—কার্ব্বণও তেম্নি সুবিধা সুযোগ পাইলে "হীরা" রূপে দেখা দেয়, তখন এর কালো রং ঘুচিয়া গিয়া উজ্জ্বল রং ফুটিয়া উঠে। আর আমাদের চোখে এত মূল্যবান হইয়া পড়ে; স্বচ্ছ হীরা গুলিরই দাম বেশী। মরসন (Morsen) বলিয়া এক ফরাসী বিজ্ঞানবিৎ কয়লা হইতে কৃত্রিম উপায়ে হীরা তৈরী করিয়াছেন। আবার হীরা পুড়াইয়া কয়লা পাওয়া গিয়াছে! এই দুইটা আবিস্কারই আমাদিগকে স্পষ্ট বুঝাইয়া দেয় যে হীরা আর কয়লা একই জিনিষ। নদীর চড়ায় কাদা বালির মধ্যে সোনা প্ল্যাটিনাম প্রভৃতি ধাতুর সহিত মিশ্রিত অবস্থায় হীরা পাওয়া যায়। প্রথম হীরা আরবী গঁদ হইতে বিশেষ মনোমুগ্ধকর থাকে না দুই চারিজন বিশেষজ্ঞের হাত ঘুরিয়া আসিতেই ইহার চেহারা একেবারে বদলিয়া যায়। ভারতবর্ষে বেলারী বলিয়া একঠা জায়গাতে হীরার একটা

খনি পাওয়া গিয়াছে। গোলকুণ্ডার "হীরার' খনি এতকাল জগৎ বিখ্যাত ছিল। হীরার মতন শক্ত জিনিষ খুব কমই আছে। কালো রং-য়ের হীরাও পাওয়া যায়। রংয়ের জন্য এরা হীরা জহরত রূপে ব্যবহার হয় না কিন্তু কাঁচ কাটিতে ইহাদের খুবই প্রয়োজন। "কোহিনুর" হীরার নাম তোমরা অবশ্যই শুনিয়াছ। ইহাই শ্রীকৃষ্ণের বুকের কৌস্তুভমণি বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। নাদির শাহ্ ভারত বিজয়ের পর আগ্রা হইতে ময়ুর সিংহাসনের সঙ্গে এই রত্নটাও লইয়া যান। পাঞ্জাব কেশরী আমাদের রণজিৎ সিংহ সেই দেশের ধন বাহুবলে আবার দেশে ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন। রণজিৎসিংহকে ইহার দাম জিজ্ঞাসা করিতে তিনি বলিয়াছিলেন "পাঁচজুতি"। ইহা এখন সম্রাট পঞ্চমজর্জের মুকুটে শোভা পাইতেছে।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে দক্ষিন আফ্রিকায় প্রিটোরিয়াতে একটা প্রায় তিন পোয়া ওজনের হীরা পাওয়া গিয়াছে। ইহার নাম 'কুলিয়ান' (culian)। ইহার মত হীরা আজ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই, যাওয়ার সম্ভাবনাও কম।

আমরা যাকে চীনে মাটীর পেয়ালা বলি সেগুলি প্রায় প্রত্যেক বাড়ীতেই আছে। এই পেয়ালাগুলি যে মাটী হইতে তৈয়ারী, তাহারনাম হইতেছে "এলুমিনা"। রং বেরং এর যে সব দামী পাথর আছে প্রায় সব কটা হইতেছে এই এলুমিনার বিভিন্ন খেয়াল লাল টক্‌টকে হীরা (Ruby). আসমানীরংয়ের টোপাজ (Topaz), সবুজ এমেরাল্ড (Emerald) আর রক্তবর্ণ সেপায়ার (shapplire) এই সব হইতেছে এই মাটীরই তৈয়ারী। লাল হীরা ব্রহ্মদেশে, আর এমারি (Emery) আসামের খাসিয়া পাহাড়, মানভুম, হায়দ্রাবাদ প্রভৃতি দেশে পাওয়া গিয়াছে। মায়াবীর বেশে এরা

আমাদের ভুলাইতে আসিয়া সফল হইয়াছে—আমরা ভুলিয়া গিয়াছি এরা ময়ুরপুচ্ছ পরা দাঁড় কাক।

মুক্তার উৎপত্তি সমুদ্রের তলায় ঝিনুকের খোলসের ভিতর। ঝিনুকরা সমুদ্রের তলায় শ্যাওলাবনের মধ্যে বাস করে। হয়তঃ একটা ঝিনুক হাঁ করিয়া বসিয়া আছে। এমন সময় ছোট্টকোণ জলচর প্রাণী খেয়ালের মাথায় একেবারে তার মুখের ভিতর ঢুকিয়া পড়িল। যেই ঢুকিয়া পড়া অম্নি ঝিনুকের মুখ বন্ধ আর বাহির হহবার জো নাই। ঝিনুক বেচারার প্রথমটা মহা মুস্কিল কারণ জুলুম করিবার এত বেশী শক্তি তাহার নাই। আস্তে আস্তে সে সেই প্রাণীটার চারিদিকে নালা দিয়া একটা স্বচ্ছ পালিস গোল খোলস তৈরী করে। এই জিনিষটাই হইতেছে মুক্তা আর এজন্যই আমাদের মেয়েদের এত সাধনা।

আশা করি তোমরা এই সমস্ত মোহ কাটাইয়া মানুষ হইতে পারিবে। "টাকাই জগতের আদর্শ নয়" একথা মনে লইয়া দেশমাতার পূজায় লাগিয়া যাইবে।

প্ল্যাটিনাম।

তোমাদের অনেকেই হয়ত এর নাম শুনিয়াছ কারণ এই ধাতুটার তৈরী ঘড়ী, বোতাম, গয়না আজকাল একটা খেয়াল হইয়া পড়িয়াছে। এর রংটা ঠিক রূপার মতন কিন্তু এর দাম সোনা হইতে অনেক বেশী। দক্ষিণ আমেরিকায় স্পেন দেশীয় লোকেরা নূতন দেশ আবিস্কারের অনুসন্ধানে বাহির হইয়া পিণ্টো (Pinto) নদীর চড়ায় বালির মধ্যে এ জিনিষটা প্রথম

দেখিতে পায়। এরা ইহার নাম দেয় "প্ল্যাটিনা" (Platina) স্পেন ভাষায় প্ল্যাটিনা মানে হইতেছে রূপা। রূপার মতন চেহারা বলিয়াই বোধ হয় এই নামকরণ হইয়াছিল। স্পেন দেশীয় শাসনকর্ত্তারা ভাবিলেন এত মহা ফ্যাঁসাদ, এই জিনিষটা থাকিলেত লোকে রূপা বলিয়া চালাইবার চেষ্টা করিবে অতএব তাঁহারা অনেক চিন্তার পর হুকুম দিলেন, এই ধাতুটাকে সমুদ্রে ফেলিয়া দিতে হইবে। কতগুলি মুর্খ লোকের জন্য এই মূল্যবান ধাতুটা সমুদ্রে স্থান পাইল।

তখন এর এক সেরের দাম ছিল ৫৲ আজকাল কিন্তু দাম হইতেছে সাড়ে তিন হাজার টাকা। দক্ষিণ আমেরিকায় এখনও ধাতুটা পাওয়া যায় আমাদের আসামে আর ব্রহ্মদেশে এই ধাতুটা কিছু কিছু পাওয়া গিয়াছে।

শ্রীঅশোককুমার চন্দ।

দু দিকই নেই।

(১)

একজন ভারি অন্যমনস্ক লোক এক কুমোরের দোকানে একটা কলসী কিনতে গেছে। দোকানে ঢুকতেই একটা কলসী উপুড় করা রয়েছে দেখে সে অতিমাত্র বিস্মিত হয়ে বলে উঠল, "কি আশ্চর্য্য! কলসীটার মুখ নেই!"

তারপর, কাছে গিয়া কলসীটা উল্টোতেই সে আর একবার বিস্মিত হয়ে গেল, বল্লে, "তাই ত এর যে তলাও নেই দেখছি!"

---

(২)

পণ্ডিতমশাই চশমার ওপর দিয়ে তাকিয়ে মধুকে সুধালেন, "হ্যাঁরে মোধো, ঠিক বলছিস এ রচনাটা তোর নিজের ?"

"হ্যাঁ, স্যার ; তবে দুটো একটা কথা ডিক্সনারির হতে পারে স্যার !"

---

(৩)

শিক্ষক – আচ্ছা বল দেখি, পাঁচ থেকে পাঁচ বাদ গেলে কি থাকে ?

ছাত্রেরা সব চুপ।

শিক্ষক—ধর, তোমার কাছে পাঁচটা আম আছে—পাঁচটাই তুমি খেয়ে ফেললে—কি রইল ?

ছাত্রঃ—আঁটি আর খোসা, স্যার ?

শিক্ষক—না, না, তা নয়, ধর তোমার পকেটে পাঁচটা পয়সা আছে—পকেটটা ছেঁদা, ছেঁদা দিয়ে পাঁচটাই পড়ে গেল,—কি থাকল ?

ছাত্রঃ—ছেঁদা স্যার !

---

(৪)

শিক্ষক মহাশয় বোর্ডে ৭২·৭ লিখিয়া উহাকে দশ দিয়া গুণ করিলে কি থাকে দেখাইবার জন্য দশমিক বিন্দুটী পুঁছিয়া দিলেন। তার পর, ছাত্রদের দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"অক্ষয়, বল দেখি, decimal pointটা কোথায় গেল ?"

কিছুমাত্র ইতস্তত না করিয়া অক্ষয় তৎক্ষণাৎ বলিয়া দিল, "আজ্ঞে, dusterএ স্যার !"

শ্রীধানি লঙ্কা।

বাঙ্গালী-বীর ভীম ভবানী

শক্তিচর্চ্চা আমাদের দেশে এক সময় খুবই প্রচলিত ছিল, এখনও কোথাও কোথাও এক-আধটু আছে বলিয়া শুনা যায়, কিন্তু এই শক্তির বিরুদ্ধে এত রকম বেরকমের শক্তি নিয়োজিত আছে যে অধুনা শক্তিচর্চ্চার নাম শুনিলেই একটা আতঙ্ক জাগিয়া উঠে! আমাদের বাঙ্গলাদেশে এককালে ঘরে-ঘরে শক্তিমান পুরুষের কথা শুনা যাইত, এখন সে সব স্বপ্ন বলিয়াই মনে হয়। এমন কি পনের বিশ বছর আগে চক্ষের সম্মুখে যে সব ছেলে-দের সুপুষ্ট ও সুস্থদেহ দেখিয়া আনন্দানুভব করিতাম, তাহাদের অনেককেই আর এখন দেখিতে পাই না; শুনিতে পাই তাঁহারা জীবিত —কিন্তু কোথায় কে জানে! যে দিনে বাঙ্গলাদেশে শক্তি-মান যুবক এবং কিশোরদের লইয়া একটা ফাঁড়াছেঁড়া পড়িয়াছিল, ভীম ভবানী

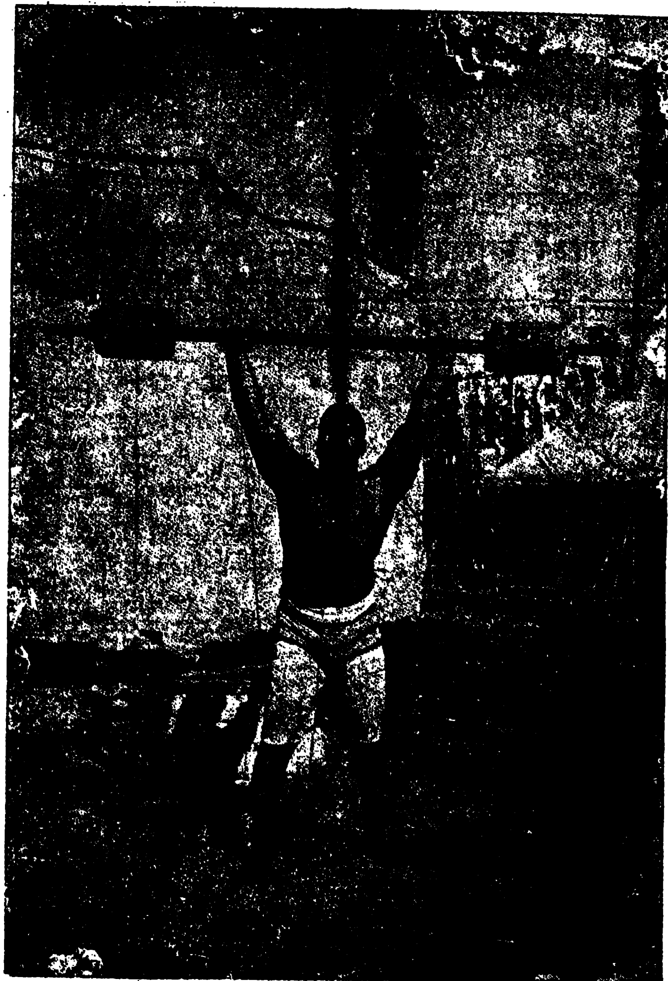


বঙ্গ-গৌরব ভবেন্দ্রমোহন সাহা

তখন অতি জীর্ণ-কায়, ম্যালেরিয়া গ্রস্ত কিশোর—বয়স১৪।১৫ বৎসর মাত্র।

ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া, ডিঃ গুপ্ত খাইয়া, ছেলেটি আরাম হইল। তবুও মাঝেমাঝে জ্বর-জাড়ি হয়, প্যানপেনে ঘ্যান-ঘেনে, না আছে শরীরের সুখ, না আছে মনের শান্তি! "লেখা পড়াও" অমনি নাম মাত্র! স্কুলের খাতাতে নামটিই আছে।

সেই সময়েই



বারবেলটার ওজন—৫ মণ।



ভীম ভবানী।

একদিন সমবয়স্ক একটি ছেলে ভবানীকে বেদম প্রহার করিল। তাহাতে ভবানীর মনে বড়ই ধিক্কার আসে। সে এই সময় হইতেই শক্তি সঞ্চয়ের চেষ্টায় তৎপর হইয়া উঠিল।

কলিকাতা দর্জ্জি-পাড়ায় তখন গুহ বাবুদের অসীম প্রতাপ। ধনে মানে তাঁহাদের খ্যাতিও যথেষ্ট, আবার তাঁহাদের বাড়ীতে তখন পালোয়ানের আখ্ড়া। স্বর্গীয়



ভবানীর খেলোয়াড় বেশ।

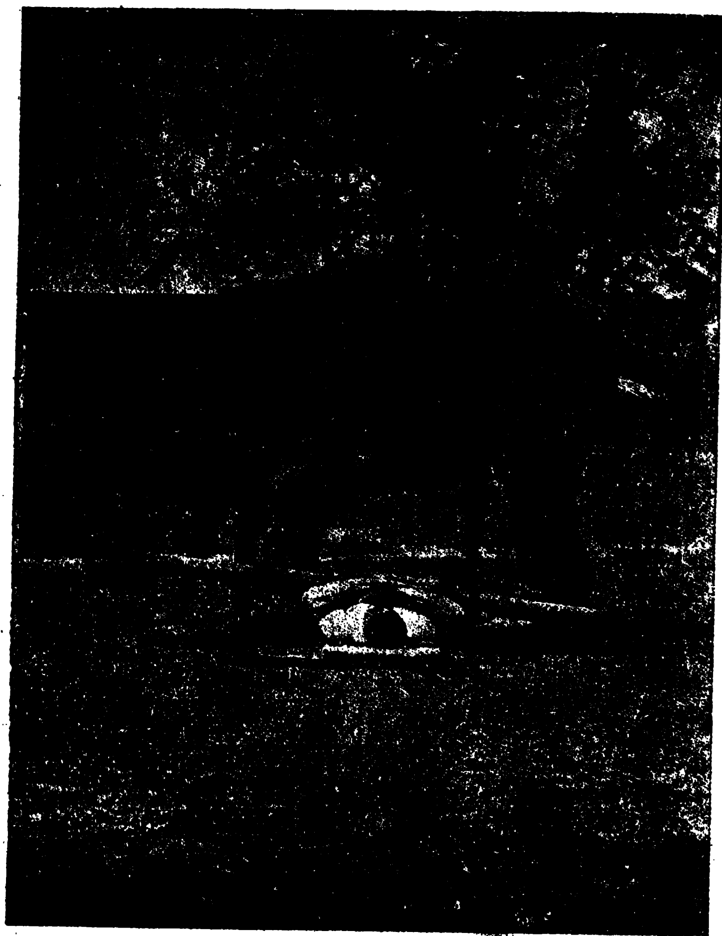
ক্ষেতু গুহ মহাশয় তখন জীবিত। সারা ভারতবর্ষ হইতে নামজাদা পালোয়ানগণ তাঁহার আখ্ড়ায় কুস্তি লড়িতে আসে। ক্ষেতু বাবুর আখড়ার মাটী না মাখিয়াছে এমন পালোয়ান তৎকালে ভারতবর্ষে ছিল না। ভবানী ক্ষেতু বাবুর শরণ লইল। ক্ষেতু গুহের আখড়াতেই বাঙ্গালীর মুখোজ্জ্বলকারী তুইটি যুবকই কুস্তীর প্যাঁচ শিখিতে লাগিল। এই তু'জনেই আজ পৃথিবীর সর্ব্বত্র বীর বলিয়া পরিচিত—একটি আমাদের ভীম ভবানী, অন্যটি গোবর।

ভবানীর যখন ১৯ বৎসর বয়স, তখন সুপ্রসিদ্ধ রামমূর্ত্তি কলিকাতায় খেলা দেখাইতে আসেন। ভবানী খেলা দেখিতে গিয়াছেন। তাঁবুতে তিল ধারণের স্থান নাই, ভবানী হতাশ ভাবে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। হঠাৎ কাহার করস্পর্শে চমকিত হইয়া ফিরিয়া দেখেন, এক অপূর্ব্ব সুন্দর দিব্যকায় ব্যক্তি! তেমন বীরমূর্ত্তি আর কখনও ভবানী দেখিয়াছেন বলিয়া মনে হইল না। আগন্তুক নির্নিমেষ নেত্রে ভবানীর দিকে চাহিয়া ছিলেন। কয়েক মুহূর্ত্ত অতিবাহিত হইলে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি খেলা দেখিতে আসিয়াছ?" তাহাই উদ্দেশ্য শুনিয়া আগন্তুক ভবানীর হাত ধরিয়া সস্নেহে বলিলেন, "তুমি আমার সঙ্গে আইস; আমি তোমাকে ভাল যায়গা দিতেছি।" তাঁবুর মধ্যে যেখানে দলের লোকেরা বসিয়া-দাঁড়াইয়া ছিল, সেইখানে একখানা আসন দেখাইয়া দিয়া বলিলেন, "বস।"

তাঁবুর মধ্যে উজ্জ্বল আলোক পড়িয়া একেবারে দিন করিয়া ফেলিয়াছে। বীরকায় পুরুষ পলকহীন নেত্রে তখনও বঙ্গীয় যুবকের দেহের দিকে চাহিয়া ছিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার বয়স কত?"

ভবানী বলিল, "ঊনিশ।"

"এই বয়সে তোমার এমন শরীর! আমি অনেক কুস্তীগীর পালোয়ান



নবাব বাহাদুরের পাগলা হাতি বুকের উপর দিয়া চলিয়া গেল

দেখিয়াছি, এমন অঙ্গসৌষ্ঠব, এমন বীর গঠন ত দেখি নাই! তোমার মত যুবক পাইলে আমার সর্ব্ববিদ্যা দিয়া পারদর্শী করিয়া তুলি!"

ভবানী তখনই জানিতে পারেন, ইনিই সুখ্যাত প্রোফেসর রামমূর্ত্তি! ভবানী রামমূর্ত্তির বীরপনা দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন; তাঁহার বীর বপুর দিকে চাহিতে চাহিতে ভবানীর তরুণ হৃদয় মধ্যে তুফান বহিল। খেলা ভঙ্গে রামমূর্ত্তি আবার সস্নেহে ভবানীকে আহ্বান করিলেন; আবার বলিলেন, "যদি তোমার মত যুবক পাইতাম"—ইত্যাদি!

মনস্থির করিতে, ভবানীর দিন তিনেক লাগিল। রামমূর্ত্তি ভবানীকে পাইয়া হর্ষ প্রকাশ করিলেন।

কিন্তু বাড়ীর লোকের মত পাওয়া শক্ত। জননী জীবিত, তিনি জানিতে পারিলে কিছুতেই রাজী হইবেন না। অতএব না বলিয়া পলায়ন করাই ভবানী যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন। রামমূর্ত্তির দলের সহিত একেবারেই রেঙ্গুন। রেঙ্গুন হইয়া সিঙ্গাপুর, যবদ্বীব প্রভৃতি পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তখনও ভবানীর খেলা দেখান আরম্ভ হয় নাই, শিক্ষা চলিতেছে। এই সময়ে একটি ঘটনা ঘটিল।

যবদ্বীপে এক ওলন্দাজ পালোয়ান রামমূর্ত্তির বীরত্বে সন্দিহান হইয়া তাঁহার সহিত মল্লযুদ্ধের ইচ্ছপ্রকাশ করিলেন। কেহ চ্যালেঞ্জ করিলে প্রত্যাখান করা বীরধর্ম্মের বিরুদ্ধ। রামমূর্ত্তি সম্মত হইলেন। ভবানী নিকটেই দাঁড়াইয়া ছিলেন, বলিলেন "গুরুদেব! আমি আপনার শিষ্য! ও আমার সঙ্গে আগে লড়ুক, আমি হারিলে গুরুদেব আছেন!"

রামমূর্ত্তি মহা খুসী। বলিলেন, "বহুৎ আচ্ছা বেটা,—লড়ো!"

তিন মিনিটের মধ্যে ওলন্দাজ পালোয়ান কাৎ! 'চিৎ' হইয়া পড়িতে রামমূর্ত্তি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি সাহেব, গুরুর সঙ্গে লড়িবে?"

ওলন্দাজের আর ‘গুরু, দেখিবার ইচ্ছা ছিল না। মুখটি চুণ করিয়া সরিয়া পড়িলেন।

রামমূর্ত্তির স্নেহ ভোগ করা ভবানীর ভাগ্যে বেশী দিন ঘটে নাই। শুনিয়াছি কোন এক বিখ্যাত শিল্পী, কলাবিদ্যার পারদর্শিতায় গুরুকে ছাড়াইয়া উঠিতেছে দেখিয়া গুরু শিষ্যকে দূর করিয়া দিয়াছিলেন। রামমূর্ত্তিও ভবানীকে দূর করিয়া দিলেন। গুরুমারা বিদ্যা লইয়া ভবানী বঙ্গদেশে ফিরিলেন। কিন্তু ঘরে আর মন বসে না! মাংসপেশীগুলা ফুলিয়া ফাঁপিয়া ধিক্কার দেয়—এই শরীর কি বসাইয়া রাখিতে পাইয়াছ? বাতে ধরিবে, জং ধরিবে, মড়িচা পড়িবে,—খাটাও, খাটাও!

প্রোফেসর কে, বসাকের হিপোড্রোম সার্কাস তখন এসিয়া খণ্ডে খেলা দেখাইয়া বেড়াইতেছিল। দৈবক্রমে তাহারা ভবানীকে লইয়া সফরে বাহির হইল। ভবানী সেই প্রথম স্বতন্ত্র ও স্বাধীন ভাবে আত্মবলের পরিচয় দিলেন। সে কি পরিচয়! কিছুদিন পূর্ব্বে লোকে রামমূর্ত্তির অদ্ভুত বলের পরীক্ষা দেখিয়াছিল, এবার যাহা দেখিল, তাহা আরো ভীষণ!

রামমূর্ত্তি একখানা মটর গাড়ী টানিয়া রাখিতেন, ভবানী দু'খানাকে দুই হাতে অচল করিয়া দিলেন; ৫ মণ বারবেলটাকে শিশুর ক্রীড়নকের মত টানা হেঁচড়া দেখাইলেন; সিমেণ্টের পিপের উপর ৫।৭ জন লোককে বসাইয়া পিপের ধার দাঁতে চাপাইয়া শূন্যে ঘুরাইয়া দিলেন; বুকের উপর চল্লিশ মণি পাথর চাপাইয়া তাহার উপর বিশ পঁচিশজনকে খাম্বাজ খেয়াল গাহিবার অবসর দিলেন। লোকে দেখিয়া অবাক হইয়া গেল।

‘সাঙ্ঘাইতে থাকিতে বেন ফার্ম্মার নামে একজন মার্কিণ পালোয়ান ভবানীকে চ্যালেঞ্জ করে। ১০০০ ডলার বাজী। বেচারা হারিয়া, ১০০০

ডলার গণিয়া দিয়া ধূলা ঝাড়িতে ঝাড়িতে মাঠ ছাড়িয়া চলিয়া যায়। ফার্ম্মার অপমানের প্রতিশোধ লইতে ভবানীর জীবন নাশের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়। স্থানীয় কন্‌সাল ভবানীর প্রাণ রক্ষা করেন। ফার্ম্মারের ক্রোধের কারণ জানিয়া কন্‌সাল স্বচক্ষে একবার বাঙ্গালী বীরের শক্তির পরিচয় লইবার অভিলাষ জ্ঞাপন করেন। তাঁহার একখানি নূতন মিনার্ভা মোটর গাড়ী ছিল। বলিলেন—আমি চালাইব, ভবানী যদি আমার গাড়ী থামাইতে পারেন এই গাড়ী তাঁহার। ভবানী সফল হইলেন, মিনার্ভা গাড়ীখানি পাইয়া ভবানী তাহা সেই খানেই বিক্রয় করিয়া দেন।

জাপানের মহিমান্বিত সম্রাট মিকাডো মহোদয় একবার ভবানীর বলের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে একখানি সুবর্ণপদক ও নগত ৭৫০ টাকা পুস্কার দেন।

এসিয়া জয় করিয়া ভবানী ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করিলেন। ভারতমাতা এই বীর পুত্রকে সযত্নে সগর্ব্বে বক্ষে ধরিলেন। সমগ্র ভারতবর্ষে ভবানীর বীরত্বের খ্যাতি বিস্তৃত হইয়া পড়িল। লোকের মুখে ভবানী আর ভবানী! তখনও তিনি 'ভীম' খেতাব পান নাই।

ভরতপুরের মহারাজ একবার বলেন, ভবানী যদি তিনখানা মোটর ধরিতে পারেন তবে তাঁহাকে হাজার টাকা পুরস্কার দিই। ভবানী ইতিপূর্ব্বেই দুই হস্তে দুখানা মোটর ধরিয়া তাঁহার অমানুষিক বলের পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু তিন খানা যে কিরূপে ধরিবেন তাহা তাঁহার বুদ্ধির অগোচর ছিল। মহারাজ বলিয়াছেন, "এইবার বুঝিব, বাঙ্গালী কেমন বীর!' ভবানী বলিলেন, "মহারাজ! আয়োজন করুন।"

ভরতপুরের মহারাজ বাহাদুর, ইংরাজ রেসিডেণ্ট ও রাজমন্ত্রী—তিনজনে তিনখানা মোটরে চড়িয়া বসিলেন। গাড়ীগুলির পিছনে প্রকাণ্ড রজ্জু বাঁধা

হইল। ভবানী একটা কোমরে ও দুইটী রজ্জু দুই হস্তে ধরিয়া বলিলেন—"Go." তিনজনেই একসঙ্গে ষ্টার্ট দিলেন। বিরাট শব্দ করিয়া এঞ্জিন চলিল। স্পীডোমিটারে জানা গেল এঞ্জিন পুরাদমে চলিতেছে কিন্তু কোনও গাড়ীই এক ইঞ্চিও নড়িতে চড়িতে পারিল না। যেখানে ছিল সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিল। গাড়ী তিনখানির পিছনের চাকাগুলি শূন্যে উঠিয়া পড়িল—খর-র-রশব্দে চাকাই ঘুরিতে লাগিল। মহারাজ সন্তুষ্ট হইয়া গাড়ী হইতে নামিয়া সাদরে বঙ্গীয় বীরযুবকের করমর্দ্দন করিলেন।

একখানা পাঁচ ফুট তিন ইঞ্চি লোহার বরগার উপর ৩০ জন লোককে বসাইয়া কাঁধের উপর ঝুলাইয়া ভবানী কর্ত্তৃক সে খানাকে অর্দ্ধবৃত্তাকারে পরিণত হইতে দেখিবার সৌভাগ্য এই লেখকেরই ঘটিয়াছিল। সর্ব্বাঙ্গ লৌহ শিকল-বদ্ধ ভবানীকে কেবলমাত্র নিশ্বাসের শব্দের সঙ্গেই মুক্ত হইতেও দেখিয়াছি। চক্ষের পলক ফেলিতে যতটুকু সময় লাগে, ততটুকু সময়ের মধ্যেই ভবানী ফুলের মালার মতই শিকলটাকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

একসঙ্গে মনুষ্য বোঝাই দুইখানি গো শকট (এক একখানিতে ৫০জন করিয়া) একই সময় বুক ও উরু-দেশের উপর দিয়া চলিয়া যাইতে দেখা গিয়াছে।

তার পর বুকের উপর হাতী তোলা। ভবানীর শিক্ষাগুরু প্রোফেসর রামমূর্ত্তি সর্ব্ব প্রথম বুকের উপর হাতী চালাইয়া অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয় দেন। পরে আরও দুইজন বঙ্গীয় বীর বক্ষে হাতী ধরিয়াছেন। সে সকলই সার্কাস দলের শিক্ষিত হাতী। ভবানীও এতদিন সার্কাসের হাতীই বুকের উপর তুলিতেছিলেন—এ পর্য্যন্ত অন্য হাতী তোলার চেষ্টাও করেন নাই। একবার মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুরের হাতীশালায় এক বুনো হাতী আসিয়া হাজির হয়। হাতীটা ওজনে ও আয়তনে, সচরাচর যে সব হাতী দেখা যায় তাহার

চেয়ে অনেক বেশী ! দৈর্ঘ্যে জীবটী নয়ফুট সাত ইঞ্চি। নবাব বাহাদুরের ইচ্ছা বুনো হাতীটাকে ভবানীর বুকের উপর দিয়া চালাইতে পারেন কি না পরীক্ষা করা। ভবানী নবাব বাহাদুরের অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, নবাব বাহাদুরের সন্তোষ বিধানার্থ হাতীটাকে বুকের উপর দিয়া চালাইতে তিনি সম্মত আছেন।

ইতিপূর্ব্বে কোন বীরই এইরূপ একটা অশিক্ষিত বিরাটকায় হাতী বুকে তুলিবার দুরাশাও করিতে পারেন নাই। সাধারণতঃ সার্কাসে যে সব জন্তু থাকে, অনাহারে অর্দ্ধাহারে তাহারা কৃশ ও নিবীর্য্য। ভবানী যখন সহস্র সহস্র দর্শকের সম্মুখে স্বয়ং নবাব বাহাদুর ও তদনীন্তন বঙ্গেশ্বরের সাক্ষাতে বুকের উপর দিয়া হাতী চালাইবার পর সুস্থ ও অক্ষত দেহে দাঁড়াইলেন, তখন দিগ্‌দিগন্তে তাঁহার জয়ধ্বনি উঠিল। বাঙ্গালীর অত্যদ্ভুত শক্তি দেখিয়া স্বয়ং বঙ্গেশ্বরও স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন।

ভবানী সর্ব্বশুদ্ধ ১২০ খানি স্বর্ণ ও রৌপ্য পদক পাইয়াছেন। পদক ব্যতীত শাল আলোয়ান অঙ্গুরি মোটর গাড়ী নগদ মুদ্রাও তিনি যথেষ্ট পাইয়াছেন। বাঙ্গালী জাতি—ভারতবাসী—তাঁহার সম্মানে সম্মানিত হইয়াছেন।

স্বদেশী মেলা বসিয়াছে। দেশমান্য (অধুনা স্যর) সুরেন্দ্র বন্দ্যো, বিপিন পাল, রসরাজ অমৃতলাল বসু প্রমুখ দেশের গণ্যমান্য বাক্তির সম্মুখে বীরত্ব লীলা দেখাইয়া ভবানী "ভীম" আখ্যা প্রাপ্ত হন। শুনা গিয়াছে অমৃতবাবু বলিয়াছিলেন, মহাভারতের ভীম এমনই একজন বীর ছিলেন। তুমি দেখিতেছি কলিকালের ভীম! আজ হইতে আর তুমি ত শুধু ভবানী নই, তুমি ভীম ভবানী।"

তখন হইতেই সাধারণ্যে ইনি ভীম ভবানী বলিয়া পরিচিত। পশ্চমাঞ্চলে ইঁহাকে লোকে "ভীমমূর্ত্তি" বলিয়া থাকে।

ভীমমূর্ত্তির আসল নাম হইতেছে, ভবেন্দ্রমোহন সাহা। ইহাঁদের পূর্ব্ব পুরুষগণ বীডন ষ্ট্রীটের সা-গণ বলিয়াই পরিচিত ছিলেন। ভবেন্দ্রের পিতা ৺উপেন্দ্রমোহন সাহাও বলিষ্ঠকায় পুরুষ ছিলেন। ভবানীরা বর্ত্তমানে নয় সহোদর। ভবানী মধ্যম; তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতারা ভবানীর শিক্ষকতায় শারীরিক বলের উৎকর্ষ সাধন করিতেছেন। সমগ্র বঙ্গদেশে এমন সুস্থ বলিষ্ঠ ও বীর পরিবার অধুনা অত্যন্ত বিরল।

ভীম ভবানীর বর্ত্তমান বয়ঃক্রম ৩১ বৎসর। তিনি অকৃতদার। বিলাস বাসনা তাঁহার নাই বলিলেও চলে, অত্যন্ত মোটামুটি রকমের জীবন ধারণ করাই ইহাঁর জীবনের উদ্দেশ্য।

এখন ভীম ভবানী আগাসীর সার্কাসে খেলা দেখাইতেছেন। আগাসী সার্কাস দল বর্ত্তমানে বঙ্গদেশে ঘুরিতেছে। এখন তাহারা টিটাগড়ে খেলা দেখাইতেছে বলিয়া শুনিয়াছি। ভীম ভবানী ইহাদের নিকট হইতে সাপ্তাহিক দেড় শত টাকা পারিশ্রমিক পাইয়া থাকেন। কিছু দিন হইতে তিনি আমেরিকায় যাইবার জন্য পাসপোর্টের চেষ্টা করিতেছেন; পাসপোর্ট পাইলেই ভবানী মার্কিন দেশ যাত্রা করিবেন। আমাদের গোবর পালোয়ান এখন আমেরিকায় আছেন; সে দেশের প্রায় সমস্ত পালোয়ানই গোবরের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে।

পরিশেষে ভীম ভবানীর খাওয়া দাওয়ায় একটা মোটামুটি ফিরিস্তি দাখিল করিতেছি। প্রাতে ২০০ শত বাদামের সরবৎ, এক ছটাক গব্য ঘৃত; মধ্যাহ্নে সাধারণ ভাত ডাল; অপরাহ্নে ২৲ বা ২৷৹ টাকার ফল ও ৫০টি বাদামের সরবৎ এবং এক সের মাংস। রাত্রে আধসের আটার রুটি ও তিন পোয়া মাংস আর বলিব না, ভয় হয় পাছে তোমরা আবার......! ইহাই ভীম ভবানীর দৈনন্দিন আহার। ইহা ছাড়া, তাঁহাকে দুই সের মাংস জলযোগ ও করিতে দেখিয়াছি।

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার।

খবরাখবর।

ব্যয়সংক্ষেপ। আমাদের মহানুভব ভারতসম্রাট রাজা পঞ্চম জর্জ বাৎসরিক দশ হাজার পাউণ্ড খরচ কমিয়ে ফেল্‌বেন—তারই ব্যবস্থা করছেন। রাজপরিবারের এবং নিজের অনেক ব্যয় বাহুল্য হ্রাস পাবে।

* * * *

বিলাতের অনেকগুলো বড় বড় খবরের কাগজের পরিচালক লর্ড নর্থক্লিফের মৃত্যু হ'য়েছে। এই ক'মাস আগে লর্ডনর্থক্লিফ্ আমাদের দেশ ভ্রমণ করে গেছলেন। তাঁর বিলেতে ফিরে যাবার আগেই আমাদের দেশ সম্বন্ধে মত জানবার জন্য খবরের কাগজ মহলে হুড়োহুড়ি লেগে গেছল।



লর্ড নর্থ ক্লিফ।

* * *

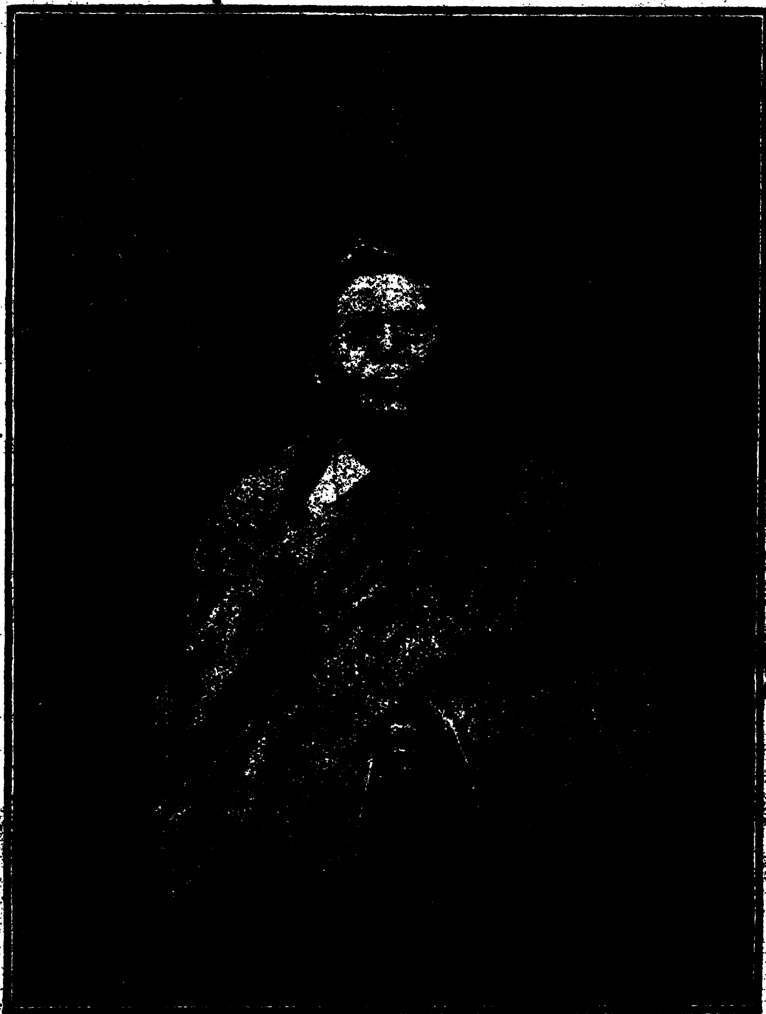
নর্থ ক্লিফের প্রতিপত্তি ছিল অসাধারণ। কোন কিছু ঘটনা ঘটলে সকলেই তাঁহার মতামতের জন্য তাঁহার মুখের দিকে চেয়ে থাকত, কারণ এটা সকলেই জানত যে আজ নর্থ ক্লিফ্ যা বলবেন দেশের বড় বড় কাগজওয়ালারাও সেই সুরে গাইবে এবং এটা তোমরা নিশ্চয়ই জান যে খবরের কাগজের মতামতের পর দেশের লোকে নির্ভর করে।

* * *

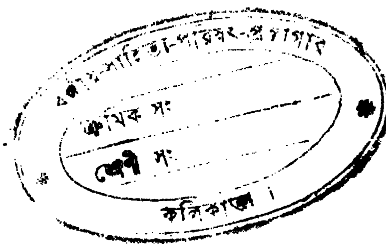

আর্থার গ্রিফিথ।

আয়রলণ্ডের সিনফিন দলের কথা তোমরা "আয়রলণ্ডের" কথায় পড়িয়াছ—সেই সিন্‌ফিন্‌ দলের প্রতিষ্ঠাতা, স্বদেশ-প্রেমিক মিঃ আর্থার গ্রিফিথের মৃত্যু হইয়াছে। খবরের কাগজের খবরে প্রকাশ, গ্রিফিথের মত দেশ-বৎসল, মহাপ্রাণ স্বজাতি-হিতৈষী এ যুগে আর জন্মায় নাই। * * *

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের নাম তোমরা নিশ্চয়ই শুনিয়াছ। দাশ মহাশয় কলিকাতা হাইকোর্টের একজন প্রতিপত্তিশালী ও উচ্চ শ্রেণীর ব্যারিষ্টার ছিলেন। তাঁহার রোজগার ছিল মাসে ৩০।৪০ হাজার টাকা। ব্যারিষ্টারি ছাড়িয়া অত টাকার মায়া ত্যাগ করিয়া দেশের কাজ করিবার জন্য চিত্তরঞ্জন সন্ন্যাস লইয়াছিলেন। সন্ন্যাস বলিলাম বলিয়া ভাবিও না যে তিনি জটা রাখিয়াছিলেন, ছাই মাখিয়া চিমটা লইয়া গিরি-কন্দরে ঢুকিয়াছিলেন। চিত্তরঞ্জন ঘর ছাড়িয়া, আদালত ছাড়িয়া পথে পথে ঘুরিয়াছিলেন, দেশের কাজ করিতে। নিজের মনে যাহা সত্য বলিয়া ভাবিয়াছিলেন, তাহারই অনুসরণ করিয়াছিলেন। এবং সেই সত্য পথে চলিতে চলিতেই



দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ।



তাঁহাকে কারারুদ্ধ হইতে হইয়াছিল। যে চিত্তরঞ্জন চিরদিন সুখের ক্রোড়ে লালিত পালিত হইয়া স্বীয় বিদ্যা বুদ্ধি প্রতিভার প্রভাবে দেশের ও দশের কাছে মহাসম্মানিত ব্যক্তির সম্মান পাইয়াছিলেন, কখনও কোন দিন যাঁহাকে এতটুকু কষ্টের মুখও দেখিতে হয় নাই—তিনিই একদিন হাসিমুখে কারাগারও বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। সুখের ক্রোড়ে লালিত, ঐশ্বর্য্যের তলে পালিত চিত্তরঞ্জন বিগত ছয় মাস যাবত কারারুদ্ধ ছিলেন। সম্প্রতি চিত্তরঞ্জন মুক্তি লাভ করিয়া আসিয়াছেন। দেশের চারিদিকে আনন্দ কোলাহল পড়িয়াছে। আমরা এই মহাপুরুষের জীবনের গুটিকত কথা তোমাদের পরে বলিব।

* * * *

মিঃ কলিন্স ঃ—আয়রল্যাণ্ডে একটা ভারি গোলমাল চলেছে। তাদের মধ্যে অনেকেই বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে, কারও অধীনতা তারা আর মান্‌তে চায় না। ইতিপূর্ব্বেই ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট আয়রল্যাণ্ডকে কতক স্বাধীনতা দিয়েছেন, কিন্তু সেখানকার অনেক লোক তাতে সন্তুষ্ট নয়—তারা ইংরেজের সঙ্গে সম্পর্ক রাখ্‌তে চায় না, ফলে নানারকম বিশৃঙ্খলা, মারামারি কাটাকাটি চল্‌ছে, এতটুক শান্তি নেই। দেশে শৃঙ্খলা আন্‌তে ইংলণ্ড ও আয়রলণ্ডের মধ্যে শান্তি স্থাপিত করতে যে ক'টি লোক আত্মনিয়োগ করেছিলেন, তার মধ্যে বড় বড় দুজনার মৃত্যু ঘটেছে—একজন আর্থার গ্রিফিথ, হৃদরোগে আক্রান্ত হ'য়ে মারা গেলেন ; আর একজন এম্ কলিন্স—বিদ্রোহীরা অতর্কিত ভাবে গুলি ক'রে তাঁকে হত্যা করেছে। সে দিনটি তাঁর বিবাহের দিন বলে স্থির ছিল, বন্ধুবর গ্রিফিথের মৃত্যুর জন্য সে দিন তাঁর বিবাহ বন্ধ রাখতে হ'য়েছিল কিন্তু সেই দিনই তাকে ভবলীলা শেষ করতে

হ'য়েছে। কোথায় বিবাহ—আর কোথায় মৃত্যু! কলিন্স ছিলেন, প্রধান সেনাপতি, ইংরেজের সঙ্গে যে সন্ধি হ'য়েছিল,তারই একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন তিনি। ইংরেজরা তাঁর এমন অকাল মৃত্যুতে বড়ই বিচলিত হ'য়েছেন। কলিন্স মৃত্যুর ঠিক পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে তার হত্যাকারীদের লক্ষ্য করে, বলেছেন—এদের আমি ক্ষমা করলাম!



মিঃ কলিন্স।

* * *

গ্রীসে তুর্কীতে যে লড়াই চলছিল তাতে তুর্কীর সম্পূর্ণ জিত হয়েছে। গ্রীকরা এখন বলছে, ছেড়ে দে মা কেঁদে বাচি—এবং ইংরাজদের ডাকাডাকি করছে, তুর্কীকে থামিয়ে যুদ্ধ স্থগিত করতে। ইওরোপের লোকেরা চোখে সর্ষের ফুল দেখছে! শেষ কি তুর্কীর হাতে পরাজিত হ'তে হবে।

* * * *

হিন্দুদের ঠাকুরদেবতারা সত্যিই জাগ্রত অথবা প্রাণহীন পদার্থ এই সন্দেহে প'ড়ে একটি মান্দ্রাজী যুবক ক্রমাগত ঠাকুর ভাঙ্গতে ও ঠাকুরের রথ পোড়াতে আরম্ভ করেছিল। দুধারি ভেঙ্গেছে আর পুড়িয়েছে। ধরা পড়ে যেতেই তাকে যখন বিচারালয়ে বিচারপতির সামনে হাজির করা হল সে বল্লে সে দেখ্‌তে চায়, দেবতারা তাকে সাজা দিতে পারে কি না! তাই থেকে বোঝা যাবে, বাস্তবিক দেবতাদের ক্ষমতা আছে কি নেই! বিচারক তাকে দুবছরের

জন্যে কঠোর শ্রমের সঙ্গে কারাবাসের আদেশ দিয়েছেন। জেলে গিয়ে দেখা যাক্, পাগলামী তার সারে কি-না! না সারলে পাগলা গারদে পাঠাবার ব্যবস্থা করতেও বিচার পতির আদেশ আছে।

*　　*　　*　　*

তোমরা হয়ত খবরের কাগজ পড়ে বা কারু কারু মুখে ভূ-পর্য্যটকদের খবর শুনেছ! অল্প কয়েকদিনের মধ্যে অনেকগুলি ভূ-পর্য্যটক ঘুরতে ঘুরতে ভারতবর্ষে দেখা দিয়েছেন—তাঁরা সকলেই পদব্রজে পৃথিবী ভ্রমণ করে বেড়াচ্ছেন। সব প্রথম দেখা দেন মিঃ মাটিনেট, এখন একটি বাঙ্গালী ভদ্রলোকও ছ'বছর ধরে বিশ্ব ঘুরে স্বদেশে এসেছেন, তাঁর নাম উপেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী, বি, এ, (লণ্ডন)। আর একটি ছ'বছরের ছেলে ভূ-প্রদক্ষিণ করতে বেরিয়েছেন, তবে ইনি হেঁটে নয়, কোলে চড়ে, শিশু ভূ-পর্য্যটকের আবার যদি কোন খবর পাই, তোমাদের দেব।

*　　*　　*　　*

সম্প্রতি কলকাতায় বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীটে স্বর্গীয় মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের বাড়ীতে এক খদ্দর মেলা বসেছিল। সেই মেলায় বক্তৃতাকালে ভারতপূজ্য আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র এখনো যাঁরা স্বদেশী কাপড় খদ্দর পরেন নি, তাঁদের সম্বন্ধে একটি গল্প বলেছেন! তিনি বল্লেন, যাঁরা খদ্দর পরেন নি, তাঁদিকে জিজ্ঞেস্ করলেই শুনতে পাই, আগেকার ছিল। এগুলো ফুরুলে খদ্দরই পরবেন। আমি ত বুঝতে পারি নে যে গরীব আমরা,টানাটানির সংসার আমাদের—তাতে দু' তিন বছরের কাপড় চোপড় আগাম কেনবার সামর্থ্য কারো আছে কি না! আমার মনে হয়, নাই! উদাহরণ স্বরূপ আচার্য্য বল্লেন এক গাঁজাখোরকে গাঁজা ছাড়াবার চেষ্টা করছি, শেষাশেষি সে রাজীও হয়েছে,

তা তার ট্যাকে শেষ একটি ছিলিম আছে সেইটি দেখিয়ে বল্লে এই ছিলিমটা ফুরুলেই আর নয়! দিন কতক পরে শুনলাম সে ছাড়েনি' বল্লুম—কি হে ছাড়লে না যে! সে অম্লানমুখে ট্যাক দেখিয়ে বল্লে—আজ্ঞে এই ছিলিমটা ফুরুলে! তার শেষ ছিলিম আর কখনই ফুরোল না!—আমাদের দেশ-বাসীর আগেকার কেনা কাপড় যে কবে শেষ হ'বে কে বলতে পারে।

* * * *

রায় বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেনের লেখা সরল বাঙ্গালা সাহিত্যের সঙ্গে তোমরা পরিচিত আছ। কিছুদিন ধরে বইটির কতক অংশ আমার দেশে বার হয়েছিল, তোমরা জান! এদেশের কত পুরানো গাথা, মিষ্টিছড়া, মজার মাজার গল্প দীনেশ বাবুর মিষ্টি কলমের মুখ দিয়ে বার হ'চ্ছিল। দীনেশ বাবু বইটি সম্পুর্ণ করে দিয়েছেন। বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে যে ছেলেরা এখন থেকেই প্রাণের সম্পর্ক একটা রাখতে চায়, তারা এ বইটি ২৲ টাকা খরচ করে পড়বে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

* * * *

আর একখানি অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থের খবর তোমাদের দিতেছি। এখানি যুগাবতার মহাত্মা গান্ধীর জীবনী। সেই নির্ভীক, তেজস্বী বীরের জীবনের কথাগুলি সহজ সরল সুমিষ্ট ভাষায় লিখিত। দেশের জন্য আজীবনের যুদ্ধ, দেশবাসীর কল্যানে সর্ব্ব স্বার্থ ত্যাগ, সত্যের জন্য, ধর্ম্মের জন্য সর্ব্বস্ব বলি—গান্ধী জীবনের এই সমস্ত ঘটনাই আছে। মহাভারতের ভীষ্মদেবের চরিত্র পাঠ করিতে করিতে তোমরা যেমন আনন্দ পাও, ইহা পাঠেও তোমাদের হৃদয় তেমন স্ফীত, উল্লসিত ও আনন্দিত হইয়া উঠিবে। **ছেলেদের গান্ধী** বইটি—বিজয়রত্ন বাবুর লেখা। তাঁর লেখার

পরিচয় ত তোমাদের কাছে নূতন করিয়া দিতে হবে না। বইটিতে ছবি আছে অনেকগুলি, দাম একটি টাকা।

*   *   *   *

সারা পৃথিবীর ইতিহাস কেবলমাত্র চিত্র ও গল্পের ভিতর দিয়ে আমাদের দেশের ছেলেমেয়েদের পড়বার জন্যে আমাদের পাবলিসিং হাউস্ থেকে ৬০খণ্ডে সম্পূর্ণ **পৃথিবীর ইতিহাস চিত্রে ও গল্পে** আগামী আশ্বিনে মাসের প্রথম থেকে মাসে মাসে বার হ'বে। কোন মাসে ২ খানা, কোন মাসে তিনখানা এই রকম করে ৬০ খানায় শেষ হ'বে। এর মধ্যে নিরস কিছু থাক্‌বে না, বাদ দেবার মত এতটুকু জঞ্জাল থাকবে না, থাকবে যা তা খাঁটি জিনিষ, অর্থাৎ গল্প আর ছবি! আর গল্প পড়তে ও ছবি দেখ্‌তে-দেখ্‌তে বইগুলি যখন পড়া শেষ হ'য়ে যাবে—তখন তোমাদের গল্পের ভাঁড়ার এত ভর্ত্তি আর জ্ঞানের পরিধি এত বড় হয়ে যাবে যে ভবিষ্যৎ জীবনে তা থেকে তোমরা অনেক সাহায্য পাবে। প্রতি খণ্ডের মূল্য ১৲টী টাকা।

*   *   *   *

মানুষই যে একমাত্র বুদ্ধিমান পশু (জীব) নয়, আজকাল তা বোঝা যাচ্ছে। মাছেদের বুদ্ধি বিবেচনা দেখ্‌লে অবাক হ'তে হয়। ছিপ দিয়ে মাছ ধরা হয় জান ত! বঁড়শীতে টোপ গেঁথে ফেলে তুমি বসে আছ ফাতাটি নড়লেই টান মেরে মাছ তুলবে। ফাতাও নড়ল, সবই হোল, ওঠ্‌বার বেলায় উঠ্‌লো একটা রম্ভা! এমন কি তোমার সেই গেঁথে দেওয়া টোপটির চিহ্ন পর্য্যন্ত নেই! কোথায় গেল টোপ্‌টি! মাছেরা কি করে জান? তারা জানে সেই টোপটি গিল্লে তোমার হাতে কি দশা হ'বে! তাই তারা টোপটি লেজের ঢেউ দিয়ে দিয়ে খসিয়ে টপ্ করে গিলে ফেলে! অবশ্য সবাই এমন বুদ্ধিমান হ'লে

ছিপ ঘাড়ে করে দুপুর-রৌদ্রে ভুগতে কেউ-উ বেরুত না। বোকা আছে বৈ-কি!

* * * *

হাঙ্গরেরা ভারি বুদ্ধিমান। সমুদ্রে তাদের ধরবার জন্য কাঁটা ফেলা হয়। তা, হাঙ্গরের সঙ্গে সঙ্গে মাছ-সৈন্য চার পাঁচটি থাকেই! তারা কাঁটা দেখ্‌লেই প্রভু-হাঙ্গরকে সতর্ক করিয়ে দেয়। হঠাৎ মাছ-সৈন্য কাছে না থাক্‌লে আর নেহাইৎ মরণ কাল উপস্থিত হ'লেই কাঁটায় আটকে পড়ে।

* * * *

জগদীশ আছে বোম্বাইয়ে, নরেন আছে কলকাতায়! হঠাৎ একদিন সকালে তারা কথা কইতে আরম্ভ করলে। অথচ কেউই স্থান পরিবর্ত্তন করে নি। নরেন ডেকে বল্লে—জগদীশ! আজ ভাই এখানে ভারি বৃষ্টি হ'চ্ছে! আর জগদীশ উত্তর দিলে তার—ভাই আজ সমুদ্রের ঢেউয়ে এমন সূর্য্য রশ্মি খেলা করছে কি বলব?—সত্যি এই রকমের কথাবার্ত্তা হ'বে, আস্‌ছে বছর থেকে। টেলিফোঁ লাইন বসাবার আয়োজন হ'চ্ছে। তোমরা একটি কাজ করে ফেল গো! এই বেলা বোম্বাইয়ে কেউ বন্ধু-বান্ধব আছে কি না ঠিক কর।

চিটি-চাপাটি।

সিদ্ধান্ত বাগমারা হইতে শ্রীমান সন্তোষকুমার রায় লিখিয়াছেন :—

"আমারদেশ পড়ে বড় আমোদ পাই। ইহার গল্পগুলি ও ছবি বড় ভাল লাগে। ইহাতে প্রতিমাসে প্রশ্নোত্তরের বৈঠক থাকিলে আরও ভাল হয়। আমরা অজানিত বিষয় গুলি জানিয়া লইতে পারি।"

—শ্রীমানের কথার উত্তরে আমরা বলিতে চাই যে এখন হইতে আমরা "জানা-জানি" বলে একটা বিভাগ রাখব। গ্রাহক-গ্রাহিকারা তাঁদের বক্তব্য প্রশ্ন করলে ছাপব এবং উত্তর আসিলে তাহাও প্রকাশ করবার চেষ্টা হবে।

গোরক্ষপুর হইতে শ্রীমান মঙ্গলচরণ গাঙ্গুলী জনাইয়াছেন :—

"আমারদেশ আমার খুব প্রিয়। ছেলেদের মাসিকের মধ্যে আমার দেশ প্রথম। এতে ইতিহাসের অংশ আর একটু করে থাকলে বেশ হ'বে।"

—সব জিনিষই আমাদের দিবার ইচ্ছা কিন্তু স্থান অল্প। "আমারদেশের" গ্রাহক সংখ্যা বাড়িলে আমরা ইহার জন্য আরও অর্থ ব্যয় করিতে পারি অধিক স্থানও দিতে পারি,ছবি, গল্প, ঐতিহাসিক ভৌগোলিক প্রভৃতি বিষয়ের নিবন্ধ দেওয়া যাইতে পারে।

ওয়ারি ঢাকা হইতে শ্রীমান নৃপেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরি লিখিয়াছেন :—

"বড়ই সুখের বিষয় যে "আমারদেশ," তাহার ছবি ও গল্প ক্রমেই ভালো হইতেছে।"

—শ্রীমানকে সুখী করিতে পারায় "আমারদেশ" ধন্য হইয়াছে। ছেলে-মেয়েদের আনন্দের সঙ্গে শিক্ষা দেওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য। শ্রীমানের মত হিতকামী গ্রাহক-গ্রাহিকাগণ আমার দেশের উন্নতি কল্পে প্রত্যেকে একটি করিয়াও গ্রাহক করিয়া দেন—ভবিষ্যতে আমার দেশের আরও শ্রীবৃদ্ধি হইবে এবং তাঁহারাও উত্তরোত্তর সুখী হইবেন।

নূতন ধাঁধার সম্বন্ধে কয়েকটী কথা।

প্রায় শতকরা ৬০ টি গ্রাহক-গ্রাহিকা আমার দেশে প্রকাশ জন্য নূতন ধাঁধা পঠাইয়া থাকেন। তাঁহাদের উৎসাহ দেওয়া আমরা সঙ্গত মনে করি। কিন্তু অধিকাংশ ধাঁধাই যাহা আসে দেখিতে পাই, নেহাৎ পুরানো এবং অন্যান্য পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়া গেছে। আমাদের ছোট ছোট গ্রাহক-গ্রাহিকা হয়ত সে খবর রাখেন না। আত্মীয় স্বজন বা বন্ধু বান্ধবের মুখে শোনা ধাঁধা গুলি লিখিয়া পাঠান। ইহা ঠিক নহে—তাঁহারা যাহার মুখে শুনিলেন, তিনি হয়ত আবার অন্যের মুখে, আবার তিনি হয়ত...কাজেই সে ধাঁধা নূতন নহে। ছেলে মেয়েরা অভিধান খুলিয়া, কথা কহিতে কহিতে ধাঁধা তৈরী করিবে তাহাতে তাহাদের কথার ভাণ্ডারও পূর্ণ হয় এবং ধাঁধাও রচিত হয়—ইহাই দেখা উচিৎ। এখন হইতে যাঁহারা ধাঁধা পাঠাইবেন তাঁহারা উক্ত উপায় অবলম্বন করিলে সুখী হইব। ধাঁধা প্রেরণকালে "স্বরচিত" বলিয়া লিখিয়া এবং গ্রাহক নম্বর নাম দিতে হইবে। তাঁহাদের সততায় আমরাও নির্ভয় হইয়া নির্ভর করিতে পারিব।



নূতন ধাঁধা

নিম্নলিখিত পত্রখানার "   " চিহ্নিত শব্দ গুলির পরিবর্ত্তে এক একটী করিয়া স্বাভাবিক ও অর্থ বোধক শব্দ বসাইয়া পত্রখানা পাঠ কর :—

"ভারতের প্রাচীন রাজধানী"

১।৯।২২

প্রিয় "পৃথিবী" চন্দ্র,

তোমার পত্র পাইয়াছি। অদ্য "লক্ষ্মী" যুক্ত "আকাশ" বাবু আমাদের বাড়ী আসিতেছেন। তিনি "৭০" ই "পৃথিবী" পুরে গমন করিবেন। আমি "শিবের বাড়ী" গিয়াছিলাম, তথায় একটী সুন্দর ও খুব বড় "ভূমিভেদ করিয়া উঠে এমন কতগুলির" উদ্যান দেখিয়া আসিলাম; সেখান হইতে কলিকাতা যাদুঘর দেখিতে গিয়াছিলাম তথায় একটী "নেপালের রাজধানী" দেখিলাম। শুনিলাম তোমার "বারাণসী" হইয়াছে, কলিকাতা হইতে তোমার জন্য বাক্সে করিয়া কয়েকটী "আরব দেশের প্রধান নগর" পাঠাইলাম। আমার সঙ্গে আমাদের পাড়ার "আফ্রিকার বিখ্যাত মরুভূমি" এখানে ভ্রমণ করিতে আসিয়াছেন। আমি "অন্তকরণ" বাবুর সহিত দেখা করিয়াছি। আমরা ভাল আছি তোমার মঙ্গল চাই। ইতি তোমার—

"বোম্বাই প্রদেশের প্রধান নগর।"

—শ্রীনিবারণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

[২]

আমি একটী ফল,
ভারতের ঘরে ঘরে আছি অবিরল।
কাঁচা খায় পাকা খায়,
শিশু কিন্তু দেখে মোরে খুব ভয় পায়।
সেই নামেতে আমি দেশ,
সমুদ্রের মাঝখানে আছি কিন্তু বেশ।
একবার আগুনেতে গেলে সব জ্বলে;
আমার নামটী ভাই দাও দেখি বলে।

শ্রীচন্দ্রকান্ত দত্ত।

শ্রাবণ মাসের ধাঁধার উত্তর।

১। মন ২। কমলা ৩। কানন

যে সকল গ্রাহক গ্রাহিকা তিনটি ধাঁধারই নির্ভুল উত্তর দিয়াছেন, তাঁহাদের নাম :—

শ্রীমতী সাবিত্রী দেবী, বলিহার; বিনয়েন্দ্র নারায়ণ সিংহ, ভাগলপুর; রবীন্দ্রনাথ দত্ত, কলিকাতা; কুমারী মীনারাণী সেন, বিহার; সৌদামিনী বড়াল, দিনাজপুর; এ, কে, এম্, নসের আলি সিকদার, ধাইদা; কুমারী আভারাণী মজুমদার, কলিকাতা; রাধাবল্লভ বন্দ্যোপাধ্যায়, আসানসোল; রবীন্দ্র কুমার বসাক, কলিকাতা; রবীন্দ্র নাথ সান্যাল, পোরজানা; অসিতকুমার নন্দী, ঢাকা; চন্দ্রপ্রভা কুণ্ডু, সুনামগঞ্জ; মনীন্দ্র বসু, এলাহাবাদ; মনোভিরাম ও নয়নাভিরাম বড়ুয়া, শিলং; সুধীন্দ্রকুমার বসাক, কলিকাতা; কুমারী সুবাসিনী সিংহ পাটনা; সন্তোষকুমার রায়, সিদ্ধান্ত বাগমারা; সৌরীন্দ্র মোহন ঘোষ, কেতিকা; সিদ্ধেশ্বর সাহা, নেত্রকোণা; মঙ্গলচরণ গাঙ্গুলী, গোরক্ষপুর; নৃপেন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরী, ওয়ারী; কুমারী হাসিরাণী মিত্র, কলিকাতা; পুষ্পলতা বসু, গিরিধি, সলিলকুমার মিত্র, কলিকাতা।

যাঁহারা তুইটি ধাঁধার উত্তর দিয়াছেন :—

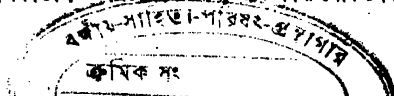
বীণাপাণি দেবী, বালিগঞ্জ; অনিলকুমার সেন, বহরমপুর; বঙ্গেন্দুকুমার মিত্র, হবিবপুর; কাননচন্দ্র বসু, ভবানীপুর; নীলা দেবী, রাঁচি; অরবিন্দু ঘোষ, উলুবেড়িয়া; বলাইকৃষ্ণ গোল, হুগলী; ইন্দুভূষণ চক্রবর্ত্তী; মেদিনীপুর; কুমারী রাজলক্ষ্মী সেন গুপ্ত, নেত্রকোণা। কালীকুমার কুণ্ডু, কুমারখালি; সুধীন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, পাটনা; শচীন্দ্র কুমার দত্ত, চট্টগ্রাম; মনোময় বন্দ্যোপাধ্যায়, টিটাগড়; গোপীনাথ ঠাকুর, শক্তিপুর; কালীকুমার লাহিড়ী, রায়পুর; শচীন্দ্রকুমার বসাক, কলিকাতা।

যাঁহারা কেবলমাত্র একটি ধাঁধার উত্তর দিয়াছেন :—

মথুরা প্রসাদ সাহা সামসেরগনর; রমনীমোহন চক্রবর্ত্তী, মাদারীপুর।

প্রকাশক—শ্রীশিশিরকুমার মিত্র বি, এ। শিশিরপাব্লিশিং হাউস, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

প্রিন্টার—শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। [illegible]-প্রেস, ৮।২ কাশী ঘোষ লেন, কলিকাতা



আমার দেশ

২য় বর্ষ, ৯ম সংখ্যা। আশ্বিন, ১৩২৯।

পরলোকগত কবি জীবেন্দ্রকুমার দত্ত "আমার দেশ"কে অত্যন্ত স্নেহের চক্ষে দেখিতেন, মৃত্যুর অল্পকাল পূর্ব্বে তিনি "আমার দেশে"র পাঠকপাঠিকাদের এই শেষ উপহার দিয়া গিয়াছিলেন।

—সম্পাদক।

পার্ব্বণী।

পূজার দিনের পাওনাটুকু
দিবি কে?
হরষ-হাসির পরশটুকু
নিবি কে?
বরষ পরে বারেক তরে
আসিরে ভাই, তোদের ঘরে,

একটুখানি আদর করে
ডাকবি নে?
হাসিখুসির মাণিক-কণা
রাখ্‌বি নে?
মায়ের পূজার বাজনা বাজে
মধুরে।—

আমিই কি আজ রইব শুধু
সুদূরে ?
আকাশ ভরা আলোর মেলা,
বাতাস ভরা সুধার খেলা,
ফুলের বনে পাখীর গানে
মাতায় রে !
যার যা' আছে মায়ের নামে
বিলায় রে !!
আজকে সবার পাওনাটুকু
দিয়ে দে !
গরীব দুঃখীর নয়ন-বারি
মুছে দে !
প্রবাসী বাপ ভায়ের সনে
মিল-লি তোরা হরষ মনে,

নূতন জামা কাপড় পরে
ছুটলিরে !
পূজোবাড়ীর আঙিণ তলে
জুটলি রে !
সেই পুলকের সবটুকু যে
এনেছি !
শিউলি ফুলের মোহন মালা
গেঁথেছি !
আজ যে ছুটি, নাইক পড়া,
দাঁত খিঁচুনি দিনটী ভরা,—
হাজার খেলা, হাজার মজা
লুটবি যে !
আমিই দিব তোদের সব
চাইবি যে !

অশুচি কে ?

কথিত আছে, কোন এক চণ্ডাল নদীতীরে কাঠের পাটা পাতিয়া ধপাস্ ধপাস্ করিয়া কাপড় কাচিতেছিল। নদীর পাড়ে ঝোপে বসিয়া এক যোগীপুরুষ ধ্যানমগ্ন ছিলেন। ক্রমাগত জলের ছিটা লাগিয়া যোগীর ধ্যান ভঙ্গ হইয়া গেল ; যোগীপুরুষ চণ্ডালকে কাপড় কাচা বন্ধ করিতে বলিলেন, চণ্ডাল কিন্তু শুনিতে পাইল না। তাহার ধপাস্ ধপাস্ শব্দ যোগীর কথা চাপা দিয়া ফেলিয়াছিল।

যোগী ভাবিলেন—চণ্ডাল তাঁহার কথা অমান্য করিল, তিনি ক্রোধে অন্ধ হইয়া আসন ছাড়িয়া উঠিয়া আসিলেন এবং চণ্ডালকে নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিতে লাগিলেন। চণ্ডাল বলিল, সে শুনিতে পায় নাই। বেচারা অনেক কান্নাকাটি করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল।

যোগী অস্পৃশ্য চণ্ডালকে ছুঁইয়াছিলেন বলিয়া নদীতে নামিয়া স্নান করিয়া ফেলিলেন। উঠিবার কালে দেখিলেন, চণ্ডালও স্নান সারিয়া উঠিতেছে। অথচ তাহার কাপড় চোপড়গুলি কাচা শেষ হয় নাই, তেমনি পড়িয়া রহিয়াছে।

যোগীপুরুষ বলিলেন—তুমি যে বাপু বড় স্নান করিলে ?

চণ্ডাল বলিল—আপনি যে আমাকে ছুঁইয়া দিলেন।

যোগীপুরুষ অধিকতর আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন—সে কি বাপু, তুমি ত চণ্ডাল, আমার স্পর্শে তুমি অশুচি হইবে কেন ?

চণ্ডাল হাসিয়া বলিল—আমি জাতে চণ্ডাল কিন্তু আপনি কাজে চণ্ডাল ! এত—চণ্ডাল ক্রোধ যাহার, অশুচি সে নয় ত কে ? শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার।



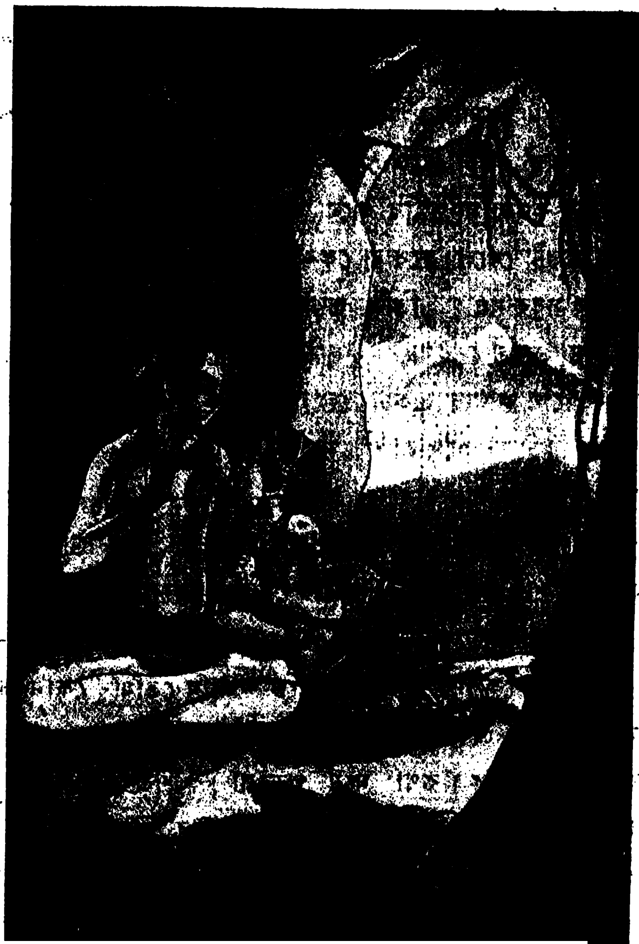
দুর্গাষষ্ঠির ব্রতকথা।

(শিব দুর্গা)

সকাল বেলা দুর্গা স্নান কর্ত্তে যাচ্ছিলেন। পুকুর ঘাটে জয়া বিজয়ার সঙ্গে দেখা হ'লো। জয়া বল্লে, মা তোমার গায়ে একেবারে মলা বিড় বিড় কচ্ছে—এস আজ তোমায় একটু সর ময়দা মাখিয়ে দিই।"

জয়ার কথায় মা দুর্গা বল্লেন, "না বাছা আজ থাক, সে আর একদিন হবে তখন।"

কিন্তু জয়া কিছুতেই মা দুর্গাকে ছাড়লে না। সে আজ মা দুর্গাকে সর ময়দা মাখাবেই। জয়ার বার বার অনুরোধে শেষ দুর্গাকে সম্মত হতে হ'লো। বিজয়া ছুটে গিয়ে সর ময়দা নিয়ে এল। দুর্গা গিয়ে পুকুর ঘাটে বস্‌লেন। সেইখানেই তারা তাঁকে সর ময়দা মাখিয়ে দিতে লাগলো। কথায় কথায় জয়া



শিবের হঠাৎ কার্তিকের কথা মনে পড়লো।

বল্লে—"মা তোমার যদি একটী ছেলে হ'ত তাহলে বেশ হ'তো। আমরা তাকে কত আদর যত্ন কর্ত্তুম।"

বিজয়া জয়ার কথায় সায় দিয়ে বল্লে,—সত্যি মা, ছেলে না থাক্‌লে মোটে সংসার মানায় না। আমাদের অমন যে কৈলাশ তাও ছেলের অভাবে শূন্য বোধ হয়। তোমার একটী ছেলে নেই—একি আমাদের কম দুঃখ?

জয়া বিজয়ার কথায় মা দুর্গার মনে হলো, তাইতো সকলের ছেলে আছে —আমারই বা একটী ছেলে হবে না কেন? এই কথা যেমন দুর্গার মনে হলো —আর কি তাঁর সবুর সয়? তিনি তখনই শিবকে ডাকতে পাঠালেন। দুর্গার ডাক পেয়ে ভোলানাথ সেইখানেই ছুটে এলেন। শিব এসে দাঁড়াবামাত্রই দুর্গা বল্লেন,—"ওগো আমার একটী ছেলে নেই। এই দণ্ডে—এখনি একটি ছেলে না হ'লে কিছুতেই হবে না।

ভোলানাথ দুর্গার কথায় হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লেন,—"দুর্গা, তোমার আবার ছেলের ভাবনা? ত্রিলোকের লোক তোমায় মা বলে ডাক্‌ছে। তবু কি তোমার মা হবার সাধ মেটেনি? আবার তোমার ছেলের ভাবনা!"

দুর্গা কি সে কথা শোনেন,—তিনি বেশ একটু রাগ ভরে বল্লেন,—"ছেলের অভাবে আমার এমন কৈলাশ শূন্য হয়ে আছে—আমি তোমার কোন কথা শুনতে চাইনে—আমায় এখনি একটী ছেলে নিয়ে এসে দাও।"

শিবের হঠাৎ কার্ত্তিকের কথা মনে পড়লো। শিব বল্লেন,—"এই কথা! তা তোমার ছেলে কার্ত্তিক তো আছে। সে তোমার পেটে হয়নি বটে কিন্তু তবুও সে তোমারই ছেলে। আমি এখনি তাকে পৃথিবীর কাছ থেকে এনে দিচ্ছি।"

শিবের মুখে কার্ত্তিকের কথা শুনে তাকে দেখবার মা দুর্গারও বড় ইচ্ছা

হ'লো। তিনি তখনই কার্ত্তিককে আনবার জন্যে শিবকে বল্লেন। দুর্গার কথা শিবতো কোনদিন ঠেল্‌তে পারেন না। তাই তিনি কার্ত্তিককে আনবার জন্যে তখনই পৃথিবীর কাছে ছুটলেন। এদিকে জয়া বিজয়া মা দুর্গাকে সর ময়দা মাখাচ্ছিল—তেমনি সর ময়দা মাখাতে লাগলো। সর ময়দার সঙ্গে দুর্গার গায়ের কত সব ময়লা আসে পাশে পড়েছিল,—মা দুর্গা আপন মনে তাই দিয়ে একটী সুন্দর পুতুল তৈরী কল্লেন। দুর্গা সেই পুতুলটী হাতে করে তুলে জয়া বিজয়াকে জিজ্ঞাসা কল্লেন, দেখদেখি কেমন পুতুলটী হয়েছে ?"

সত্যিই পুতুলটী বড় সুন্দর হয়েছিল। জয়া বিজয়া পুতুলটী দেখবার জন্যে যেমন পুতুলের দিকে ফিরেছে অমনি পুতুলটী মা মা করে কেঁদে উঠলো। গড়া পুতুল মা মা করে কেঁদে ওঠায় সবাই তো একেবারে অবাক্। দুর্গা তাড়াতাড়ি পুতুলটীকে কোলে নিয়ে স্তন পান করাতে লাগলেন। কিন্তু এমন ধারা কেমন করে হ'লো—তা আর কেউ টের পেলেন না। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে এই—নারায়ণ সেই সময় সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। পুতুলটী দেখে তাঁর মনে হ'লো—অমনি তিনি সেই পুতুলে আবির্ভাব হলেন। কাজেই গড়া পুতুল মা মা করে কেঁদে উঠলো।

ছেলের জন্যে দুর্গার মন বড় অস্থির হয়ে উঠেছিল, ছেলে পেয়ে তাঁর আর আনন্দ ধরে না। তিনি তাড়াতাড়ি স্নান সেরে তাড়াতাড়ি বাড়ী ফির্‌লেন। বাড়ী এসে দেখেন শিব এরই মধ্যে কার্ত্তিককে নিয়ে এসে হাজির হয়েছেন। দুর্গাকে ছেলে কোলে করে বাড়ী ঢুকতে দেখে মহাদেব অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন,—"দুর্গা তুমি আবার এ ছেলেটাকে কোথায় পেলে ?"

দুর্গা ছেলেটীকে কেমন করে পেলেন সে কথা মহাদেবকে আগাগোড়া বলে এক কোলে কার্ত্তিককে এক কোলে সেই ছেলেটিকে নিয়ে আদর কর্ত্তে

লাগলেন। দুর্গা এক ছেলের বদলে দুই ছেলে পেলেন এতে মহাদেবেরও বড় আনন্দ হ'লো—তিনি সমস্ত দেবতাদের ছেলেটীকে দেখবার জন্যে নিমন্ত্রণ করে পাঠালেন। দুর্গার ছেলে হয়েছে সংবাদ পেয়ে জনে জনে দেবতারা সব কৈলাশে এসে হাজির হলেন—ছেলের রূপ দেখে সবাই একেবারে ধন্যি ধন্যি কর্ত্তে লাগলেন। এখন দেবতাদের সঙ্গে শনিও ছেলে দেখতে এসেছিলেন। তিনি যেমন এগিয়ে গিয়ে ছেলের দিকে চেয়েছেন,—অমনি ছেলের মুখটী পুড়ে ছাই হয়ে গেল। চারিদিকে আনন্দ উৎসব হচ্ছে, এমন সময় হঠাৎ ছেলের মাথা উড়ে যাওয়ায় কৈলাশে একেবারে হৈ হৈ পড়ে গেল। দুর্গা রেগে আগুণ হয়ে শনিকে কাট্‌তে গেলেন। শনির আর একটু হ'লেই মাথাটা কেটে ফেলেছিলেন আর কি—কিন্তু দেবতারা সব স্তবস্তুতি করায় তাঁর রাগটা নরম হয়ে পড়লো। তিনি তখন শিবকে বল্লেন,—"যা হবার তাতো হয়েছে—এখন তুমি আমার ছেলেকে বাঁচিয়ে দাও।"

মহাদেব আর কি করেন। মাথা তো আর বিনা অপরাধে কেটে আনা যায় না। তিনি নন্দীকে ডেকে বল্লেন—"নন্দি যাও—দেখ উত্তর দিকে মাথা করে যে শুয়ে আছে—উত্তরে মাথা করে শুতে নাই—তুমি তার মাথাটা কেটে নিয়ে এস।

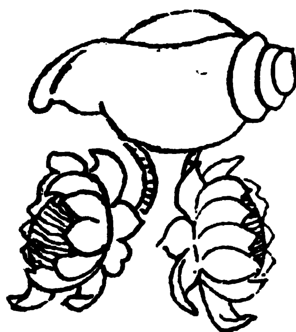
শিবের আদেশ পেয়ে নন্দী মাথা আন্‌তে গেলেন কিন্তু স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল খুজেও কোথায়ও উত্তর মাথা পেলেন না। হতাশ হয়ে নন্দী ফিরে আস্‌ছিলেন সেই সময় দেখেন একটি সাদাহাতী উত্তর দিকে মাথা করে শুয়ে রয়েছে। নন্দী আর কি করেন, তার মাথাটাই কেটে নিয়ে এলেন। মহাদেব সেই হাতীর মাথাটাই ছেলের কাঁধে বসিয়ে দিলেন, ছেলে আবার বেঁচে উঠলো। কিন্তু দুর্গা একেবারে রেগে আগুন! তাঁর অমন ছেলের শেষে কি না এমন হ'লো। দেবতারা তখন মা দুর্গাকে বুঝিয়ে বল্লেন,—"যে মা সে জন্যে দুঃখ করো না। হক্

ছেলের তোমার হাতীর মুখ—কিন্তু তোমার ছেলের সম্মান সব দেবতার চেয়ে বেশী হবে। তোমার ছেলের পূজো না করে কেউ অন্য দেবতার পূজো কর্ত্তে পার্ব্বে না।"

দুর্গা দেবতাদের কথায় শান্ত হলেন। শিব ছেলের নাম রাখলেন গণেশ। দুর্গা কার্ত্তিক গণেশকে নিয়ে সেই দিনই মাকে ছেলে দেখাবেন বলে বাপের বাড়ী গেলেন। মেয়ে এসেছে শুনে মেনকা ছুটে এলেন, মা দুর্গা মেনকাকে ছেলে দুটীকে দেখিয়ে বল্লেন,—মা আজ আমি এই ষষ্ঠীর দিনে ছেলে দুটী পেয়েছি। যে এই ষষ্ঠী কর্ব্বে—সে আমার কার্ত্তিক গণেশের মত ছেলে পাবে।"

আশ্বিন মাসে শুক্লপক্ষে ষষ্ঠী যেবা করে।
বীরপুত্র পায় সে মা দুর্গার বরে॥

শ্রীযতীন্দ্রনাথ পাল।



জগতের শ্রেষ্ঠ মানব, ভারতের মহাপুরুষ অকলঙ্ক চরিত্র মাহাত্মা গান্ধী ভারতের কারাগারে। চরিত্রে, মহত্ত্বে—মহাত্মার মত মানুষ পৃথিবীতে অতি অল্পই জন্মিয়াছেন, জন্মান নাই, বলিলেও চলে। এই সেদিন তাঁহার জন্মদিন উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। মহাত্মার শেষ বিদায়-বাণী খদ্দর ও চরকা। কারাগারে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে ঐ তুটি কথাই তিনি বলিয়াছিলেন, ভারতবাসীর কাছে ঐ তু'টি কথা জপমন্ত্র হওয়া উচিত।

আমরা ছেলেদের গান্ধী বহিটিতে খদ্দর ও চরকার কথা খুলিয়া বলিয়াছি, পড়িলে তোমরা সবই বুঝিতে পারিবে।

পূজোর আনন্দ।

আরত "পূজোর" নাইক দেরী
অধিক দেরী নাই—
এখন থেকে প্রাণটা মোদের
উঠ্‌চে নেচে তাই!
বাজ্‌বে আবার বাদ্যি নানা,
হবে কতই ধুম,
আবার মোদের চক্ষু থেকে
উড়ে যাবে ঘুম।
আবার মোরা পাব ছুটি,
পড়্‌তে নাহি হবে,
কর্‌ব শুধু ছুটোছুটী—
কেউ না কথা কবে।
তিন দিনে যে কতই আমোদ
কর্‌ব তাহা জানি—
ভয় কর্‌ব না মায়ের ধমক
বাবার চোখরাঙানি।
নতুন নতুন পোষাক প'রে
'নেমন্তনে' যাব,
ভাল মন্দ জিনিষ কত
মনের সুখে খাব।
দেখ্‌তে যাব 'সন্ধ্যে পূজো'
পাড়ার ছেলে মিলি—

কিন্ত খেলার মোটর গাড়ি
মিঠে পানের খিলি।
ভক্তি ভরে জগৎ মাকে
করব যে প্রণাম,
করবেন তিনি আমাদের ভাই
পূর্ণ মনস্কাম।
দু'হাত জুড়ে মায়ের কাছে
মাগিয়া লব বর—
বলব---মাগো রেখ দয়া
অবোধ ছেলের পর।
ধর্ম্মে যেন থাকে মতি,
কর্ম্মে মতি স্থির
মুছিয়ে দিতে পারি যেন
দুখীর নয়ন নীর।
গুরুজনের কথার যেন
অবাধা না হই,
দশের ভাল করতে যেন
নিজে দুঃখ সই।
দেশকে যেন ভালবাসি
হয়ে দেশের ছেলে—
দেশের সেবা করতে পারি
সকল কর্ম্ম ফেলে।"

শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় বি, এ।

আমার দেশ

নাইক অভাব দুঃখ লেশ
নাইক দৈন্য নাইক ক্লেশ—
এই তো গো সেই আমার দেশ!
মাঠ ভরা ঐ সবুজ ধান,
গগন-জোড়া পাখীর গান,
জুড়ায় চোখ, জুড়ায় কাণ.
জুড়ায় বুক, জুড়ায় প্রাণ!
দখিণ-হাওয়ায় দোদুল্ দোল্
দুল্ছে পাতার নীল্ আঁচল।
নীল সায়রের শীতল জল,
গাছ-ভরা সব ফুল ও ফল।
এই তো আমার লাগ্‌লো বেশ—
জন্মভূমি! আমার দেশ!!
গাভীর বাঁটে জমাট ক্ষীর,
কল্‌সী-ভরা নদীর নীর,
উঠান-পোরা ধানের রাশ—
মাথায় আকাশ, নিম্নে ঘাস।

এই তো আমার স্বর্গপুর,
হেথায় সকল দুঃখ দূর।
কোথায় ওরে কোথায় বল্
এমন মায়ের মাটীর কোল?
সরল শিশু দেশের ভাই
ব্যথার ব্যথী রয় সদাই—
একটুকুতেই চোখের জল—
এই তো মোদের শোকের বল।
এমন দরদ, এমন ঠাঁই,
এমন মা বোন্ এমন ভাই—
কোথাও ওরে কোথাও নাই!
হেথায় সবার কবির মন,—
পাহাড়, নির্ঝর, গভীর বন,
গগন-সীমায় গ্রামের সার,
গো-পথ, বিজন দীঘির পাড়,
আকাশ-ভরা মেঘের ভিড়,
বাতাস-উদাস নদীর তীর,

বৃষ্টি-ভেজা মাটীর রস
গন্ধে রে তার মন অবশ,
নাইরে ও সে কোথাও নাই
এমন দরদ, এমন ঠাঁই!
তিন পাশে কার সাগর-কোল
দেয়রে এমন দেয়রে দোল্?
লক্ষ্মীমায়ের যবের শীষ,
সরস্বতীর স্নেহ-আশীষ
কোথায় এমন ঝর্‌চে বল্?
কোথায় এমন চোখের জল?
কোয়েল দোয়েল বুলবুলি,
এমন কোমল ফুলগুলি,
দুষ্টু খোকন হাস্য মুখ
দুঃখী মায়ের ভরায় বুক,
ফুল্ ফসলের ফুল্-রাণী,
নাই হেন দেশ নাই জানি।

ধর্ম্ম-ভরা সতীর দেশ,
রয় কি সেথায় দুঃখ ক্লেশ?
কে বলে মোর কাঙাল মা,
রাণীর রাণী এই মা না?
জনম যেন পাই, শীতল
বুক-জুড়ানো মা তোর কোল,
তোমার কাজেই জীবন বয়—
দুধের সে ঋণ শোধ কি হয়?
হেথায় সকল দুঃখ দূর,
এই ত আমার স্বর্গপুর!
দাও মা আশীষ দাও অভয়—
জন্মভূমি! জয় মা জয়!!
কার মা এমন চমৎকার?
মা গো তোমায় নমস্কার!
এই তো আমার লাগ্‌লো বেশ—
আমার দেশ! আমার দেশ!!

কাজী নজরুল ইস্‌লাম।

আগুন জলে নিভে কেন ?

আগুনে জল ঢাললে আগুন নিভে যায় কেন, কখন ভেবে দেখেছ কি ?

দেখ, জল উদ্‌জান ও অম্লজান এই দুটো বায়ুর সংমিশ্রণে উৎপন্ন, আবার আগুনও ঐ দুটো বায়ুর যোগান না পেলে জ্বলে না। আবার দেখ আগুনে যাইই দাও না কেন, পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে যায়; সুতরাং নিভান দূরে থাক, আগুনে পড়ে' জলেরও পুড়ে যাওয়া উচিৎ; কিন্তু পুড়ে না।

কেন এমন হয় ? জল কেন পুড়ে না, তাই আগে বলে নি।

এই মাত্র বললুম, উদ্‌জান ও অম্লজান এই দুটো বায়ু একত্র মিশিলে জল হয়,—কিন্তু খুব গরম করলে পর তবে হয়, এটা মনে রেখো।

যে বায়ুকে বা দ্রব্যকে একবার পুড়ান হয়েছে তা আর দ্বিতীয়বার পুড়ে না। জ্বলন্ত আগুনে পড়লে জল যে পুড়ে না, তার কারণ জল পুড়ান দুই বায়ুর সংমিশ্রণ।

আগুনে পড়ে জল পুড়ে ত নাই উল্টে আর একটা কাণ্ড বাধিয়ে বসে। জ্বলন্ত আগুনের উত্তাপটা অনেকখানি নিজে হজম করে ফেলে আগুনকে ঠাণ্ডা করে আনে। ঠাণ্ডা হওয়ার দরুণ বাতাসের অম্লজান পুড়ন্ত অঙ্গারের সঙ্গে আর মিশতে পারে না, অম্লজানের যোগান কাজেই বন্ধ হয়ে গেলে, আগুনও নিভে যায়। যতক্ষণ অম্লজানের যোগান পায়, আগুন ততক্ষণই জ্বলতে পারে।

এইবার বুঝ্‌লে ?

সাধুতার পরাকাষ্ঠা।

ইব্রাহিম আদম নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া শেষে এক ধনীর আশ্রয়ে আসিয়া উপস্থিত হন। ইব্রাহিম আদম সে কালে একজন পুণ্যাত্মা সাধু বলিয়া দেশ-বিদেশে খ্যাত ছিলেন। কিন্তু এই ধনী ভদ্রলোক সাধু ইব্রাহিমকে চিনিতেন না। তিনি ইব্রাহিমকে উদ্যান রক্ষার ভার দিলেন। সাধুর তাহাতেই আনন্দ। উদ্যান রক্ষা করেন, আর উদ্যান মধ্যে নির্জ্জন কুটীর খানিতে বসিয়া ভগবানের নাম গান করেন।

একদিন জ্যৈষ্ঠ মাসে আমের সময় উদ্যানস্বামী কয়েকটি বন্ধুসহ উদ্যানে আসিয়া মালীকে বলিলেন—ওহে বাপু, আম ত পাকিয়াছে, গুটিকত মিষ্ট আম পাড়িয়া আন, আমার বন্ধুরা খাইবেন।

ইব্রাহিম আম পাড়িয়া প্রভুর সম্মুখে রাখিয়া দিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কোনটিই মিষ্ট হইল না। ধনী ভদ্রলোক মালিকে বলিলেন—সব ক'টিই ত টক্ আনিলে বাপু! ভদ্রলোকেরা আসিয়াছেন, গুটি কতক মিষ্ট ফল পাড়িয়া আন।

সাধু সবিনয়ে জিজ্ঞাসিলেন, কোন্ গাছ হইতে পাড়িব—বলিয়া দিন আনিতেছি।

ভদ্রলোক বিরক্ত হইয়া কহিলেন—এতদিন মালীর কাজ করিতেছ,—কোন্ গাছের ফল মিষ্ট জান না?

সাধু বলিলেন—আমি গাছ ও ফল রক্ষা করি, ভক্ষণ ত করি না এবং আমাকে আপনি ভক্ষণ করিতেও রাখেন নাই। কোন্ গাছের ফল মিষ্ট কোন্ গাছের ফল টক্ আমি কেমন করিয়া জানিব?

ভদ্রলোক বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন—তুমি কি বাগানের কোন ফলই খাও নাই ?

সাধু বলিলেন—না।

ভদ্রলোক এমন সাধুতা আর কখনো দেখেন নাই। মালী হইলে কি হয়! ইব্রাহিমের প্রতি শ্রদ্ধায় তাঁহার মন ভরিয়া গিয়াছিল। তাঁহার বন্ধুগণ বলিলেন—সচরাচর যে সব লোককে মালীর কার্য্য করিতে দেখা যায়—এ ব্যক্তি সে দলের নহে।

স্বাস্থ্যে চিত্রে ও গল্পে।

বিশুদ্ধ বায়ু

তেমন ঝড় কেউ কখনো দেখে নাই। সমুদ্র লাফাইয়া লাফাইয়া আকাশটার গায়েই জল ছড়াইয়া দিতেছে, আর সেই অসীম সমুদ্রের উপর জাহাজখানি একবার এদিকে একবার ওদিকে কাৎ হইয়া ডুবু ডুবু হইয়া উঠিতেছিল। কাল রাত্রি, তার উপর সমুদ্রের এই ভীষণ তর্জ্জন গর্জ্জন।

যাত্রীদের মধ্যে কান্নাকাটি পড়িয়া গেল, নাবিকদের মুখ শুকাইয়া, হাত পা অবশ হইতেছিল—প্রাণের আশা আর নাই। জাহাজের কাপ্তেন দেখিলেন—মহা বিপদ! যাত্রীদের আর্ত্তনাদে নাবিকরা বড়ই চঞ্চল হইয়া পড়িতেছে, বিপদের সময় ধৈর্য্যহীন হইয়া পড়িলে জাহাজ রক্ষা করিবার কোন উপায়ই থাকিবে না, কাপ্তেন হুকুম দিলেন—যাত্রীদের সব নীচে ডেকের মধ্যে একটা

ঘরে রাখিয়া আইস। সেখানে ওরা যত পারে চিৎকার করুক। তার পর ঝড়-বৃষ্টি থামিলে, সমুদ্র শান্ত হইলে, বিপদ কাটিয়া গেলে আবার উহাদের এখানে আসিতে দেওয়া হইবে।

যাত্রীরা কিছুতেই যাইবে না। কিন্তু কাপ্তেনও ছাড়িলেন না। নাবিকগণ ঠেলিয়া ঠুলিয়া যাত্রীদের লইয়া ডেকের মধ্যে একটা ঘরে বন্ধ করিয়া রাখিয়া আসিল।

কাপ্তেন সারারাত তুফানের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া জাহাজখানি বাঁচাইলেন। ভোরের দিকে সমুদ্র গর্জ্জন স্তব্ধ হইয়া গেল, আকাশে আবার রঙিন আলো ফুটিয়া উঠিল, কাপ্তেন দেখিলেন, বিপদাশঙ্কা দূর হইয়াছে। বলিলেন—এইবার যাত্রীদের আসিতে বল। তাঁহাদের খাওয়া দাওয়ার যোগাড় যাগাড় করিয়া দাও। সারারাত উঁহাদের বড়ই কষ্ট হইয়াছে।

দুইজন নাবিক কাপ্তেনের আদেশে নীচের তলায় সেই ঘরের দিকে চলিল। তালা খুলিয়া দেখিল, যাত্রীরা সব কামরার মেঝেতে লুটাইতেছে! নাবিকদ্বয় ভাবিয়াছিল,সারারাত ক্লান্তি ও দুশ্চিন্তার পর তাহারা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তাহারা কল্পনাও করিতে পারে নাই যে এতগুলি লোক সব চিরদিনের তরে চির-নিদ্রার কোলে লুটাইয়াছে! ঠেলাঠেলি করিতেই নাবিকদ্বয়ের চক্ষু স্থির হইয়া গেল।

এ যে সব প্রাণহীন দেহ!

নাবিকদ্বয় উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া কাপ্তেনকে খবর দিল, কাপ্তেন আসিলেন; জাহাজের ডাক্তার এতক্ষণ কোথায় ছিলেন বলা যায় না, তিনিও আসিলেন। কাহারো মুখে আর কথা সরে না।

অনেকক্ষণ পরে ডাক্তার বলিলেন—এইটুকু ঘরে এতগুলা লোককে বন্ধ করা অত্যন্ত অন্যায় কার্য্য হইয়াছে। এইটুকু ঘরে, তার উপর বন্ধ ঘরে তাজা হাওয়া আসিবার যাইবার পথ বন্ধ করিলে লোক কি কখনও বাঁচিতে পারে!

বাতাস না হইলে মানুষ বাঁচে না। কেন?—সেই কথাই বলিতেছি।

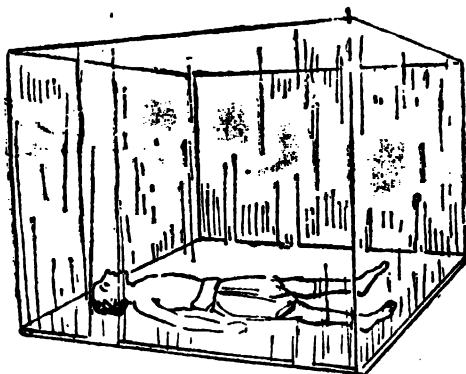
বাতাসে এক রকম গ্যাস আছে—অক্সিজেন (oxygen) তার নাম। এই গ্যাস অনবরত রক্তের সঙ্গে না মিশিলে মানুষের শরীর ভাল থাকে না। কাজেই এই অক্সিজেনের জন্যেই বাতাসের দরকার।

এখন ব্যাপারটা কি হয় জান? আমরা যখন নিশ্বাস লই, তখন সেই বায়ু নাক কিম্বা মুখ দিয়া সরাসর ফুসফুসে যাইয়া উপস্থিত হয়। আমাদের রক্তের ধারাও বহে ঐ ফুসফুসের মধ্যে। সুতরাং সেখানে দুজনকারই সাক্ষাৎ হয়।

তোমাদের রক্তের ইতিহাসটা একটু বলিয়া রাখি। ফুসফুসের ভিতর খুব ছোট্ট পাতলা এক রকম রক্ত-বহ-নালী আছে—ঐ নালীর ভিতর দিয়া রক্ত বহিয়া থাকে। ঐ নালীগুলি ভারি পাতলা,—এত পাতলা যে অক্সিজেন স্বচ্ছন্দে ঐ নালী পার হইয়া রক্তের সঙ্গে মিশিতে পারে, কিন্তু এমনই মজা, রক্ত কিন্তু বাহিরে যাইতে পারে না। এখন আমরা যে নিশ্বাস লই সে বাতাস কোথায় যায় তা ত জানিলে আমরা যে নিশ্বাস ফেলি সে বাতাস কোথা হইতে আসে জান কি? এদিকে অক্সিজেন গ্যাস ত রক্তের ভিতরে যাইয়া ঢুকিল, সঙ্গে সঙ্গে আর এক প্রকার দূষিত গ্যাস রক্তের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া নিশ্বাসের সহিত নির্গত হইয়া যায়। কিন্তু এই যে বাতাস শরীরের মধ্যে ঢুকিল আর বাহির হইয়া গেল—ইহারই মধ্যে কত কাজই না হইয়া গেল। যেই বাতাস শরীরের মধ্যে ঢুকিল, অমনি রক্ত, শরীরের পক্ষে উপকারী যে গ্যাস তাহা লইয়া শরীরের পক্ষে অনুপকারী যে গ্যাস জমা হইয়াছিল তাহা ঐ বাতাসের সঙ্গে নির্গত করিয়া দিল। সুতরাং নিশ্বাস ফেলিবার সময় যে বাতাস আমাদের শরীর হইতে বাহির হইয়া আসে—শরীরের জন্যে তাহা আর কোন কাজেই লাগে না। কারণ

তাহাতে অক্সিজেন গ্যাস ত থাকেই না। বরং যা থাকে তা শরীরের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপকারী—এবং অনুপকারী বলিয়াই শরীর বহুপূর্ব্বে তাহাকে নিশ্বাসের ভিতর হইতে বাহির করিয়া দিয়াছে।

এমন একটি যদি কাচের ঘর তৈরী করা হয়, তার চারিদিক বদ্ধ এবং তাহারই মধ্যে যদি একটি মানুষকে রাখা হয়, তাহা হইলে কিছুকালের মধ্যেই ঘরের ভিতর যেটুকু অক্সিজেন গ্যাস থাকিবে তাহা রক্ত খাইয়া লইবে—যাহা থাকিবে তাহা রক্ত কর্ত্তৃক নির্গত দূষিত গ্যাস—নিশ্বাসের সহিত বাহির হইয়া আসিয়াছে। তাহার পরই মানুষটি অক্সিজেন গ্যাসের অভাবে অজ্ঞান হইয়া পাড়বে—এবং মারা যাইবে—সেই দূষিত গ্যাস শরীরের ভিতর ঢুকিলে উপকার ত দূরের কথা বরং অপকারই হইবে।



এবং মারা যাইবে।

তোমরা ঘরে বসিয়াই এক রকম পরীক্ষা করিতে পার। একটা ছোট মোমবাতি জ্বালিয়া একটা বড় কাচের পাত্র ঢাকা দেও। তাহার পর কাচের


কাচ পাত্রে মোমবাতি

পাত্রে যেখানে বাতাস চলাচলের পথ থাকিবে সেগুলি কোন কিছু দ্বারা বন্ধ করিয়া দেও, কি হইবে বল ত ? খানিকক্ষণের মধ্যেই এই আলোটা ঘরের সমস্ত অক্সিজেন গ্যাস পোড়াইয়া ফেলিবে, এবং তাহার পর যদি বাহির হইতে আর অক্সিজেন গ্যাস না পায় ত নিভিয়া যাইবে।

আমাদের দেশের লোকদের একটা ভুল ধারণা আছে—তাহারা সচরাচর ঘরের জানালা দরজা সব বন্ধ করিয়া শোয়—পাছে অসুখ বিশুখ করে, ঠাণ্ডা লাগে। লোকের কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ ভুল। বাহিরের বিশুদ্ধ হাওয়া না পাইলে মানুষের শরীর ভাল থাকিতে পারে না! ডাক্তারেরা বলেন, শরীরের উপর কোন একটা আচ্ছাদন দিয়া ঘরের সব দরজা জানালা খুলিয়া শোওয়া উচিত—তাহাতে শরীরের কোন ক্ষতি ত হয়ই না, বরং উপকারই হয়। আর যাহারা রোগের ভয়ে দরজা জানালা সব বন্ধ করিয়া থাকে তাহাদিগকেই রোগে আগে ধরে। এই কারণেই, আমাদের দেশের কত লোকই না রোগে ভুগিতেছে!

বিশুদ্ধ বায়ুসেবন করিতে পারিলে মানুষের অর্দ্ধেক রোগ সারিয়া যায়। এমন যে ভীষণ ক্ষয় রোগ—তাহার প্রতিকারের প্রধান উপায় বিশুদ্ধ বায়ুসেবন করা। স্বভাবের নিয়মই এই মানুষ বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিবে—মানুষ অপ্রাকৃত ভাবে কতকগুলি বদ্ধ বাড়ীঘর করিয়া প্রকৃতির বিরুদ্ধে থাকিলে তাহাকে ত রোগে ব্যায়রামে ভুগিতেই হইবে।

যাহারা সহরে থাকে এই কারণেই তাহাদের শরীর খারাপ হয়। প্রত্যহ তাহাদের অন্ততঃ দুইবার করিয়া কোন খোলা যায়গায় বিশুদ্ধ বায়ুসেবন করা উচিত।

আর একটা বিষয়ে সকলেই দৃষ্টি দিবে। রাত্রে শুইবার সময় যাহাতে

সব জানালা দরজাগুলি খোলা থাকে তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে—যেন ঘরের ভিতর দিয়া বাতাস যাতায়াত করিতে পারে। আর পারতপক্ষে বেশী লোক এক ঘরে শুইবে না। ঘরের জানালা দরজা যদি তেমন বন্ধ থাকে, তবে ঘরে যেন অনেক লোক না থাকে।

বিশুদ্ধ বায়ু মানুষের জীবন ও স্বাস্থ্য রক্ষা করে। তাহার প্রতি সকলেরই বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া উচিত।

অদ্ভুত সাপ।

"হিজলী-হিতৈষী" খবর দিতেছেন, পাবনা হইতে ৫ ক্রোশ দূরবর্ত্তী "এক খণ্ড রথখোলা" নামক মাঠে অজন্মা হওয়ায় জমির মালিক একজন সাপুড়েকে ডাকাইয়া বলেন, বাপু তোমায় ১০৲ বকশিশ দিব, আমার জমি ভাল করিয়া দিতে পার? সাপুড়ে সম্মত হইয়া সেখানে যাইয়া তুবড়ী বাঁশী বাজাইয়া নানাপ্রকার মন্ত্র আওড়াইতে থাকে। কিছুকাল পরেই সম্মুখস্থিত গর্ত্ত হইতে একটি বহুফণাযুক্ত সাপ ফণাগুলি তুলিয়া গর্জ্জন করিতে থাকে। সাপটির শরীর হইতে একপ্রকার অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ প্রকাশ পাইতেছিল। সাপুড়ে তখন জমি ভাল করা অপেক্ষা "চাচা আপন প্রাণ বাঁচা" নীতির অনুসরণ করাই শ্রেয়ঃ মনে করিয়া উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করে। সে পরে বলিয়াছে যে এরকম বহুশীর্ষ সর্প সে জীবনে কখনও দেখে নাই। তাহার মতে সাপের উষ্ণ নিশ্বাস বায়ুতেই নাকি জমি জরিয়া যাইতেছে। রামায়ণে সীতার পাতাল প্রবেশে, মহাভারতে জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞে ও শ্রীকৃষ্ণের কালীয়দমনে এবং অন্যান্য পুরাণাদিতেও বহুমুখ সর্পের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। নাগরাজ বাসুকী

যিনি পৃথিবী ধারণ করিয়া আছেন তিনি নাকি সহস্রশীর্ষ। পূর্ব্ববঙ্গে শ্রাবণ মাসে এক হইতে বিয়াল্লিশ ফণাযুক্ত মৃন্ময় নাগ প্রস্তুত করিয়া মনসা পূজা করা হইয়া থাকে। শুনা যায়, পার্ব্বত্য প্রদেশেও নাকি কখনও কখনও এইরূপ বহুফণাযুক্ত সর্প দৃষ্ট হয়।

শ্রীধানি লঙ্কা।

চাট্‌নী।

(১)

একদা একজন যুবক কোন এক সুপ্রসিদ্ধ ব্যবসায়ীর দোকানে নিম্নলিখিত পত্র খানা লিখিয়াছিল। তাহার একখানা ক্ষুরের প্রয়োজন ছিল বলিয়া সেই পত্রে একখানা ক্ষুর পাঠাইবার জন্য লিখিয়াছিল ঃ—

প্রিয় মহাশয়, আপনার একখানা বিজ্ঞাপন দেখিয়া—একখানা ক্ষুরের জন্য অদ্য তিন টাকা এই পত্রের সঙ্গে পাঠাইলাম, অনুগ্রহ করিয়া আমাকে একখানা ক্ষুর পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। ইতি শ্রীকা…

পুনঃ আমি ৩৲ তিনটাকা পাঠাইতে ভুলিয়া গিয়াছি, কিন্তু আশা করি আপনাদের মত বড় ব্যবসায়ী যে প্রকারেই হউক আমাকে একখানা ক্ষুর পাঠাইয়া দিবেন সন্দেহ নাই।”

উক্ত ব্যবসায়ী পত্রখানা পাইয়া তাহার উত্তরে ঐ যুবককে লিখিল—“প্রিয় মহাশয়, আপনার মূল্যবান আদেশ পত্র পাইয়া আপনার আদেশ মত অদ্য ডাকে একখানা ক্ষুর পাঠাইলাম। আশা করি ক্ষুরখানা আপনার পছন্দমত হইবে।”

পুনঃ "আমরা ক্ষুর পাঠাইতে ভুলিয়া গিয়াছি, আশা করি আপনার মত লোকের ক্ষুরের কোনই আবশ্যক নাই।"

---

(২)

একজন ডাক্তার কোন রোগী দেখিতে যাইয়া রোগীকে বলিলেন "মানসিক চিন্তাই সকল অসুখের কারণ, আপনি মনে করুন আপনি যেন আরোগ্য লাভ করিয়াছেন এবং আর কোনদিন পীড়িত হইবেন না।" রোগী বলিল,—"ডাক্তার বাবু যদি তাই হয়, তবে আপনি মনে করুণ যে আপনাকে ভিজিট্ দেওয়া হইয়াছে।"

---

(৩)

একদিন একটী বালককে তাহার পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন "রমেশ! তুমি প্রতিদিনই ক্লাশে সকল ছেলের নীচে থাক কেন?" রমেশ উত্তর করিল,—"তাহাতে কি আসে যায়, শিক্ষকগণ ক্লাশের সকল ছেলেকেই এক পড়া পড়াইয়া থাকেন।"

শ্রীনিবারণ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

মায়ের মুখ।

(জাপানী গল্প)

পুরাণো—অতি পুরাণো কালের কথা।······

জাপানের নিতান্ত একটা পাড়াগাঁয়ে,—লোক জনের বড় বসতি ছিলনা সেখানে,—একজন লোক তার স্ত্রী ও মেয়েকে নিয়ে বাস করতো। সবে ঐ একটী মেয়ে, তাই তারা তাকে বড্ড ভালবাসতো। মেয়েটী ছিল পরমা সুন্দরী, আর সে পেয়েছিল অবিকল তার মায়ের চেহারা।

একদিন ঐ মেয়ের বাপকে কি একটা কাজে বাধ্য হ'য়ে জাপানের রাজধানীতে যেতো হ'লো। সে-সহরটা তাদের গাঁ থেকে অনেক দূরে। মেয়েটী তখন খুব ছোটো। বাপ সহরে যাচ্ছে শুনে মেয়ে বাপকে তার জন্যে সুন্দর সুন্দর খেলনা আনতে ব'লে দিল, তার মা-ও কিছু কিছু ফরমাস্ দিতে ছাড়লে না।

মেয়ের মা তাদের গাঁ ছেড়ে কোনো দিন একপা-ও নড়েনি, তাই স্বামীকে অতদূর দেশে পাঠিয়ে তার মনে বড় ভাল লাগলো না।······কিন্তু সে সেটা সাম্‌লে নিয়ে ভাবলে,—তা'দের আশে পাশের দু'দশ খানা গাঁয়ের কেউ কোনো দিন সহর দেখেনি, এই সবে মাত্র তার স্বামী যাচ্চে,—তা' আবার একেবারে সহরের সেরা সহর রাজধানীতে;······এটা তার পক্ষে একটা মস্ত বড় গৌরবের বিষয় সন্দেহ নেই, এবং একথাটা সে বুক ফুলিয়ে মেয়ে মহলে বলতে পারবে;······এই ভেবে মনে মনে দুঃখের ভিতরও বেশ একটা আনন্দ সে অনুভব করলে।

যখন তার স্বামীর বাড়ী ফিরে আসবার সময় হ'লো, সে তার মেয়েকে

বেশ সাজিয়ে গুজিয়ে দিলে, নিজেও বেশ একখানা নীল শাড়ী পরলে!...... যখন স্বামীকে ভালয় ভালয় অতদূর দেশ থেকে বাড়ী ফিরে আসতে দেখলো, তখন তার আনন্দের সীমা রইলো না। মেয়ে তার পছন্দ মত খেলনা পেয়ে খুসী হ'য়ে হাত তালি দিয়ে নেচে উঠ্‌লো।

লোকটা তার স্ত্রীকে সহরের ও পথের কত গল্পই না শোনাতে লাগলো; ......পাড়াগাঁয়ে-মেয়ে সে, স্বামীর মুখে সে-সব কথা তার কাছে আজগুবি ব'লেই মনে হ'লো। স্বামী তাকে বল্লে, শুনেচো গো! তোমার জন্যে ভারী একটা সুন্দর জিনিষ এনেচি, যা' তুমি কোনো দিন ছ্যাখোনি,—ভারী সুন্দর জিনিষ!......এই ব'লে সে তার হাতে একটা সাদা কাঠের বাক্স দিয়ে বল্লে, —খু'লে ছ্যাখো দিকি, এর ভেতর কিছু দেখ্‌তে পাচ্চো কিনা? স্ত্রী বাক্সটা খু'লে একখানা মুখ দেখবার আর্শি বের করলে, তার এক পিঠে রূপার মতন সুন্দর ঝক্‌ঝকে আয়না, আর এক পিঠে ফুল, পাতা ও পাখীর রঙ্‌বেরঙের ছবি আঁকা। সে আর্শির ভেতর তাকিয়ে দেখেই অবাক্ হ'য়ে গেল,...... একি! এর ভেতর যে একখানি বড় সুন্দর মেয়ে মানুষের মুখ!—সে চোখ চেয়ে তাকায়, হাসে, ঠোঁট নেড়ে মনে মনে কথা বলে!!......স্ত্রী অবাক্ হ'য়ে দেখ্‌চে—দেখে তার স্বামী জিজ্ঞেস করলে, কি দেখ্‌চো?

স্ত্রী বল্লে,—দেখ্‌চি, একজন সুন্দর মেয়ে মানুষ আমার পানে দিব্বি চেয়ে আছে, সে হাস্‌চে, ঠোঁট নাড়চে,—যেন কি বলতে চাইচে;......আর দেখেচো কি মজা?—আমি যেমন নীল শাড়ী পরেচি, সেও ঠিক তেমনি পরেচে!

স্বামী তার কথা শুনে হেসে বল্লে, আচ্ছা বোকা দেখ্‌চি তুমি, এটা যে তোমার নিজেরই মুখ, এ জিনিষটাকে আর্শি বলে। পাড়াগাঁয়ে যদিও এ জিনিষটা

কেউ দেখেনি, কিন্তু সহরে সবারি ঘরে একটা একটা আছে, এটানা হ'লে তাদের মোটেই চলে না।

স্ত্রী স্বামীর কথা শুনে অবাক্ হ'য়ে গেল, ওমা বলে কি গো! নিজের মুখ দেখা যায় এমন জিনিষও আছে!......সে সেটা পেয়ে ভারী খুসী হ'লো। কিন্তু সেটাকে সে আর বেশী নাড়া চাড়া করলে না, যত্ন ক'রে একেবারে সিন্দুকে তু'লে রাখ্‌লে ;......অমন একটা চমৎকার জিনিষ, তা' কি আর নিত্যি-ত্রিশে ব্যবহার করা চলে? মেয়েকে অবধি সে আর্শি খানার কথা বল্লে না, কি জানি, অমন একটা চমৎকার জিনিষ দেখ্‌লে হয়ত মেয়ে আর ছাড়্‌তেই চাইবে না, ভেঙ্গে চু'রেওবা ফেলতে পারে।

মেয়ে ক্রমে বড় হ'লো,—বেশ ডাগর মেয়ে। সে মায়ের মতই সুন্দরী ; নাক, মুখ, চোক, ঠিক তেমনি,—যেন এক ছাঁচে ঢালা। মা মনে ভাবলে, এখন মেয়ে সেয়ানা হয়েচে, আর্শি খানা তাকে এখন দেখালে ভাঙ্গবার ভয় নেই বটে, কিন্তু আর্শিতে তার অমন সুন্দর মুখখানা যখন সে দেখ্‌বে, তখন সে মনে করবে, সে বড় সুন্দরী, এই ভেবে সে হয়ত দেমাকে হ'য়ে পড়বে।...... কাজেই মা আর সে আয়নার কথা মেয়েকে বল্লেই না, যেমন সিন্দুকে তোলা ছিল, তেমনি র'য়ে গেল।

মায়ের ব্যামো হ'লো,—খুব কঠিন ব্যামো।......অনেক অষুধ পত্র খেয়ে-ও যখন সে ভাল হ'লো না, কেবলি ভুগতে লাগ্‌লো, তখন তার ঠিক ধারণা হ'লো যে, এ যাত্রা সে আর বাঁচবে না।......একদিন সে মেয়েকে ডেকে বল্লে,—দ্যাখ্ মা, এবার আর আমার বাঁচবার আশা নেই, দিন দিন যেন নেতিয়ে পড়্‌চি, শীগ্‌গির-ই তোদের ছেড়ে চ'লে যাবো।......আমি তোকে একটা জিনিষ দিয়ে যাচ্ছি, আমার জন্যে যখনি তোর মন পুড়বে বা যখনি

তুই অবসর পাবি, তখনি তার ভেতর চেয়ে দেখিস্, তাহ'লে দেখ্‌বি, আমি মরিনি, সব সময় তোর সাথে সাথেই রয়েচি ;—এই ব'লে সে মেয়ের হাতে সেই কাঠের বাক্স সমেত আর্শিখানা দিয়ে জন্মের মত চোখ মুদ্‌লো।

মেয়ে কখনো তার মায়ের শেষ আদেশ ভোলেনি।......প্রত্যেক দিন সকাল-সন্ধ্যায় সে আর্শিখানা নিয়ে নিরালায় ব'সে তার পানে তাকিয়ে থাকতো, আর তাতে তার নিজের মুখখানা দেখে ভাবতো, মা তার পানে হাসিমুখে তাকিয়ে রয়েচে, কোনো দুঃখ কষ্টের চিহ্ন নেই তাতে।......সে রেতে নিরালায় আয়নাখানা খু'লে ব'সে তাতে যে নিজের মুখখানা দেখ্‌তো, তাকে মায়ের মুখ মনে ক'রে, তার কাছে নিজের সমস্ত দিনের সুখ দুঃখের কথা বলতো ;—এম্নি করে সে ভুলে গেল যে তার মা মরেচে,—এম্নি করে মাতৃহারা মেয়ে মায়ের শোক ভুলে গেল।

তার বাপ রোজ মেয়েকে অম্নি করে আয়নাখানার সাথে কথা বল্‌তে দেখে একদিন জিজ্ঞেস করলে, কি কথা বলিস্ তুই খুকী আয়নাখানার সাথে? মেয়ে তার ডাগর ডাগর টানা টানা ভাসা ভাসা চোক দুটী বাপের মুখের ওপর ফেলে বল্লে,—জানোনা তুমি বাবা?—আমি যে এর ভেতর মাকে দেখে তাঁরি সাথে কথা বলি। তারপর সে বাপকে মায়ের সেই মরার সময়ের কথাটা বলে, বল্লে,—আজো বাবা আমি মায়ের সেই শেষ আদেশ মেনে চল্‌চি।

বাপ মেয়ের অমন মাতৃভক্তি ও মায়ের কথায় অমন অটল বিশ্বাস দেখে চোখের জল ধরে রাখতে পারলে না, টস্‌টস্ ক'রে গড়িয়ে তার বুক ভেসে যেতে লাগলো!......কিন্তু সে বল্‌তে পারলেনা যে, এটা তার মায়ের মুখ নয়, এটা তার নিজেরি মুখ আয়নায় দেখা যাচ্ছে,—পাছে মেয়ে তার মনে বড় একটা ব্যথা পায়, এই ভেবে।

শ্রীচন্দ্রকান্ত দত্ত সরস্বতী-বিদ্যাভূষণ।

বিদ্যাসাগরের গল্প।

দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মহত্ত্বের কয়টি গল্প আজ আমি তোমাদের বলিব। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পিতামাতা অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন। বহু কষ্টে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। পরের বাড়ী থাকিয়া কোন রকমে চারিটি পেটের ভাত জোগাড় করিয়া তাঁহার পাঠ্যাবস্থা অতীত হইয়াছে। অনেক সময় নিজে রান্না করিয়া অপর সকলকে খাওয়াইয়া পরে খাইতে হইয়াছে। তৈলের পয়সার অভাবে আলো জ্বালিয়া পড়িতে না পারিয়া রাস্তার আলোকে দাঁড়াইয়া পাঠ মুখস্থ করিতে হইয়াছে। বাল্যে ও পাঠ্যাবস্থায় বিদ্যাসাগরের ভাগ্যে বহুদিনই শুধু মাত্র লবণ ভাত জুটিয়াছে। ডাল তরকারী বা কোনরূপ ব্যঞ্জন বা দধি দুগ্ধ ক্বচিৎ পাইতেন। বিদ্যাসাগর নিজের অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিতে জানিতেন, তিনি সেই লবণ ভাতই পরম সন্তুষ্টমনে আহার করিতেন। বিদ্যাসাগর পরে বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন, অনেক অন্নহীনকে অন্ন দান করিয়াছেন, কত দান ধ্যান করিয়া বিখ্যাত হইয়া গিয়াছেন; কিন্তু তিনি বাল্যের সেই দরিদ্র অবস্থার লবণ ভাতকে চিরদিনই ভালবাসিতেন।

বিদ্যাসাগর যখন উপার্জ্জন আরম্ভ করিলেন তখন তাহার বাড়ীতে নিত্য নিত্য কত লোক খাইত, কত রকম সুখাদ্য ব্যঞ্জনাদি তৈরী হইত। দধি দুগ্ধেরও কিছু অপ্রতুল ছিল না। এত খাদ্য জিনিস থাকিতেও বিদ্যাসাগর কিন্তু মধ্যে মধ্যেই শুধু লবণ ভাত খাইয়া তৃপ্তি বোধ করিতেন। তিনি বলিতেন 'বাল্যে বহুদিন আমার শুধু লবণ ভাত খাইয়া কাটিয়াছে, আজও সে অভ্যাস রাখিতে হয়। মানুষ বলিয়া পরিচিত হইবার সময়ের

সেই যে আহার ও শিক্ষা তাহা আজ একেবারে ভুলিয়া গেলে চলে কি করিয়া ?'

দারিদ্র্যের শিক্ষা এবং তাহার উন্নত মহিমা আমরা অবস্থা পরিবর্ত্তনে একেবারে ভুলিয়া যাই, বিদ্যাসাগরের জীবনী ও তাঁহার কার্য্য আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই বিদ্যাসাগর তাহা কখনও ভুলিয়াছিলেন না। তাই তিনি পূর্ব্বের সেই দরিদ্র অবস্থা ও তাহার ক্লেশ স্মরণ করিয়াই পরের এত উপকার করিতে পারিয়াছেন ও নিজ নাম অমর রাখিয়া গিয়াছেন ।

বিদ্যাসাগর মহাশয় একদিন ই, আই, আর, লাইনের কোন একটি ষ্টেসনে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। এমন সময় একখানি গাড়ী আসিয়া ষ্টেসনে লাগিল। দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরা হইতে একজন ভদ্রবেশধারী যুবক বাহির হইয়া 'কুলী কুলী' করিয়া ডাকিতে লাগিলেন। বিদ্যাসাগর দেখিলেন, যুবকটির সঙ্গে ছোট্ট একটি হাত-ব্যাগ মাত্র। গাড়ী সামান্য সময় অপেক্ষা করিয়া ষ্টেসন ছাড়িয়া চলিয়া গেলেও যুবকটি ব্যাগ হাতে লইয়া তেমনি দাঁড়াইয়া রহিলেন ও 'কুলী কুলী' করিতে লাগিলেন।

বিদ্যাসাগর অনেক সময়ই অতি সামান্য বেশে চলিতেন। তাঁহার বেশভূষা দেখিয়া কাহারও বুঝিবার উপায় ছিল না যে ইনি ভারত বিখ্যাত বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগরকে সম্মুখ দিয়া যাইতে দেখিয়া যুবকটি কহিল 'এই—ব্যাগটা ঘোড়ার গাড়ীতে তুলে দিতে হবে—চল।'

বিদ্যাসাগর একবার যুবকটির দিকে চাহিয়া ব্যাগটি হাতে উঠাইলেন। একটি হাত-ব্যাগ হাতে লইয়া ষ্টেসনের বাহিরে গিয়া গাড়ীতে উঠিবেন তাহাও একটি কুলী না হইলে বাবুর চলিতেছে না,—বিদ্যাসাগর মহাশয় অনেকক্ষণ এই তামাসা দেখিতেছিলেন। যুবকটি ষ্টেসনের বাহিরে আসিয়া গাড়ীতে উঠিয়াছেন এমন

সময় দু' তিনটি ভদ্রলোক 'এই যে বিদ্যাসাগর মশায়' এই বলিয়া পরম ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন। দেখিতে দেখিতে বিদ্যাসাগরের চারিদিকে অনেক লোক জড় হইয়া গেল। এইভাবে বিদ্যাসাগরের দর্শন পাইয়া সকলেই বড় সুখী, কত পুণ্যফলে যেন তাহারা এমন মহাপুরুষের দর্শন পাইয়াছে। ব্যাগটি তখনও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হাতে। যুবকটি ব্যাপার দেখিয়া বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া একদৃষ্টে বিদ্যাসাগরের পানে চাহিয়া রহিলেন। কুলীকে পয়সা দেওয়ার জন্য মানিব্যাগ হইতে পয়সা বাহির করিয়াছিলেন সে হাত যেন অসাড় হইয়া গিয়াছে। লোকজনের ভীড় বিদ্যাসাগরের চারিদিকে ক্রমেই বাড়িতেছিল। বিদ্যাসাগর যুবকটির বিব্রত অবস্থা দেখিয়া বলিলেন, 'বাবা, এই নাও তোমার হাত-ব্যাগ পাঁচসের ওজনের হাত ব্যাগটি নিয়ে ষ্টেসনের বাইরে গাড়ীতে আসতে পাচ্ছিলে না—তাই এগিয়ে দিলুম।

যুবক লজ্জায় অধোবদন হইলেন; গাড়ী হইতে নামিয়া বিদ্যাসাগরের পদধূলি লইলেন, বিদ্যাসাগর সস্নেহে তাহার মস্তকে হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া গাড়ীতে উঠাইয়া দিলেন।

বিদ্যাসাগরের মহত্ত্বের আরও একটি গল্প তোমাদের বলিব। বিদ্যাসাগর প্রথম জীবনে গবর্ণমেণ্টের অধীনে চাকুরী করিতেন, পরে কোন কারণে তিনি এই চাকরী ছাড়িয়া দেন। চাকরী করিবার সময় তিনি গবর্ণমেণ্টের তহবিল হইতে চারি হাজার টাকা বেশী লইয়াছিলেন। এই যে চারি হাজার টাকা ক্রমে তাঁহার হিসাবে বেশী আসিয়া পড়িয়াছে, একথা বিদ্যাসাগর মহাশয়ও জানিতেন না, গবর্ণমেণ্টও জানিতেন না। চাকুরী ছাড়িবার বহুদিন পরে তিনি তাঁহার হিসাব পরীক্ষা করিতে করিতে দেখিলেন যে তিনি সরকার হইতে চারি হাজার টাকা বেশী লইয়াছেন। হিসাব দেখিয়াই তিনি শিক্ষাবিভাগের

অধ্যক্ষকে চিঠি লিখিলেন যে এই টাকা তাঁহার হিসাবে বেশী আসিয়াছে এবং ইহা তিনি ফিরাইয়া দিতে চাহেন। ডিরেক্টর সাহেব তাঁহার আফিসের খাতাপত্র ও হিসাব পরীক্ষা করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পত্রের উত্তরে লিখিলেন যে গবর্ণমেণ্ট তাঁহার নিকট কিছুই পাইবেন না।

বিদ্যাসাগর মহাশয় কিন্তু ছাড়িবার পাত্র নহেন। তাঁহার হিসাবে যখন তিনি দেখিতেছেন যে তিনি বেশী টাকা লইয়াছেন তখন নিশ্চয়ই উহা তিনি পরিশোধ করিবেন। বিদ্যাসাগর ডিরেক্টরকে ঐ টাকা গ্রহণ করিবার জন্য পুনরায় পত্র লিখিলেন। তখন ডিরেক্টর সাহেব বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের সহিত পরামর্শ করিয়া ঐ টাকা গ্রহণ করিলেন। এই সব সত্য ঘটনা এখন আমাদের নিকট সেকেলে গল্প বলিয়া মনে হয়। পরের নিকট হইতে ফাঁকি দিয়া দুপয়সা লইবার ইচ্ছাই যখন দেশের লোকের মধ্যে প্রবল তখন এরূপ ঘটনা যে অত্যাশ্চর্য্য তাহাতে আর সন্দেহ কি ? সত্যের প্রতি আদর অর্থাৎ যাহা সত্য তাহাই করিতে হইবে ও অন্যায় যাহা তাহার প্রতি ঘৃণা এই যাঁহার আছে তিনিই মহৎ। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মহত্ত্ব ও উচ্চ হৃদয়ের অনেক সত্য কাহিনী তোমাদের বলিয়াছি এ ঘটনাটিতে ও তোমরা শিক্ষার বহু জিনিষ পাইবে ও বুঝিতে পারিবে বড় লোক হইতে হইলে সর্ব্ব বিষয়ে কত উচ্চ হওয়া মানুষের দরকার।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।

অধ্যবসায়ের বল

একটি বালক কোনমতেই সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়িয়া উঠিতে পারিত না। ব্যাকরণে তাহার বড়ই ভয় ছিল। সূত্র মুখস্থ না হওয়ায় এবং সন্ধি প্রকরণ বলিতে অক্ষম হইত বলিয়া প্রায়ই তাহাকে শিক্ষকের কাছে মারধোর খাইতে হইত।

একদিন অত্যন্ত মার খাইয়া লেখাপড়া ছাড়িয়া দিবার সঙ্কল্প করিয়া সে বিদ্যালয় ত্যাগ করিল।

এখন, ছেলেটি অপরাহ্ণ কালে নদীর বাঁধা ঘাটে বসিয়া বিষন্নমনে নিজের জীবনের কথাই ভাবিতেছিল। হঠাৎ তাহার দৃষ্টি পড়িল সোপানের পাথরের মধ্যে মধ্যে গর্ত্তের উপরে। বালক দেখিল, একটি রমণী কলস কক্ষে লইয়া ঘাটে আসিয়া কলসটি সেই গর্ত্তের উপর বসাইয়া জলে নামিয়া গেলেন। বালকের বুঝিতে দেরী হইল না যে ঐ গর্ত্তগুলি ঐ রূপেই হইয়াছে।

হঠাৎ বালকের মনে হইল, সামান্য মৃৎ কলসের পুনঃ পুনঃ স্পর্শে পাথর গর্ত্ত হইয়া গেল, আর আমার মেধা কি পাথরের চেয়েও শক্ত, কিছুতেই ব্যাকরণের সূত্রগুলির স্পর্শে গর্ত্ত হইবে না?

এই বালকই উত্তরকালে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ লিখিয়াছিলেন। তাঁহার নাম ব্যোপদেব। ব্যোপদেব যাদববংশীয় মহাপরাক্রান্ত রাজা মহাদেবের সভাপণ্ডিত হইয়াছিলেন।

বি।

ঘ্রাণে আবিষ্কার।

রূপোর পালিশ করা (silver-plated) জিনিসপত্র আখছারই তো দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু দেখে কেউ ভেবেছ কি কেমন করে' ওতে রূপো লাগিয়ে দেওয়া হ'য়েছে ? শুনে আশ্চর্য্যান্বিত হ'য়ো না, নেহাৎ দৈবচক্রেই এ আবিস্কারের গোড়াপত্তন।

একদিন দু'জন বৈজ্ঞানিক তাঁ'দের পরীক্ষাশালায় বসে' তাড়িত নিয়ে, একটা পরীক্ষা ক'রছিলেন। কি পরীক্ষা ক'রছিলেন, তা'তে দরকার নেই। একটা জটিল রকমের যন্ত্রের সবটা খাড়া ক'রবার পর, তাঁ'রা দে'খলেন যে, তাড়িত ব্যাটারি থেকে তাঁদের যন্ত্রে সংযুক্ত একটা তার ছিড়ে' গেছে। তা'র জায়গায় আর-একটা নতুন তার জুড়ে দেওয়া দরকার।

কিন্তু সময়ের তাড়া বড়, পরীক্ষা সমাধা করে' ফেলাটাও বড় দরকার। কি করা যায় ? শেষে রাসায়নিকদের একজনের মনে পড়'ল যে, অম্ল-জারিত (acidulated) জল, তারেরই মতনই তাড়িত-পরিবহন করে।

এক ফোঁটা অম্লজারিত জল ফেলে, তা'র ওপরে ছেঁড়া তারের দুটো ডগাকে মুখোমুখি করে রাখা হ'ল ; সুইচ (switch) খুলে দেওয়া হ'ল, জলবিন্দু তা'র কর্ত্তব্য সুন্দরভাবেই ক'রলে ; কোথাও কোন গণ্ডগোল বা'ধ্‌ল না।

খানিকক্ষণ ধরে' পরীক্ষাটা চ'লবার পর, রাসায়নিক দু'জনের একজনের মনে হ'ল, জলজান (hydrogen)—বায়ুর মতন লবণ মধুর বায়ুর গন্ধ পাচ্ছেন ; তাঁ'রা আঁতিপাতি ক'রে খুঁড়তে লেগে গেলেন, এই বায়ু (gas) বেরুচ্ছে কোথা থেকে। এ বায়ুর গন্ধ যে বেরুবে তা' তো তাঁ'রা কেউ প্রত্যাশা করেন

নি। তাঁ'রা স্থির জানছিলেন যে, বকমুখ গুলির কোনটা থেকেই জলজান leak করতে পারে না। তাঁ'দের যন্ত্রের ক্রিয়াবশতঃ জলজান-বায়ু উৎপাদিতও হচ্ছে না। তবে?

খোঁজ, খোঁজ। হেঁট হ'য়ে এধার ওধার শুঁ'কতে শুঁ'কতে একজনের নাকে সেই এক ফোঁটা অম্ল-জারিত জল লেগে গেল। গন্ধটার ঝাঁজ এইখানটাতেই সবচেয়ে বেশী ছিল। সেই অতিক্ষুদ্র জলবিন্দু আতস-কাচ দিয়ে পরখ ক'রে দে'খ্‌লেন, তারের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত শত শত ছোট্ট ছোট্ট বুদ্‌বুদ্‌ সত্যি সত্যি লাফিয়ে লাফিয়ে বেরুচ্ছে।

এই বুদ্‌বুদ্‌গুলো বারিবিন্দুর ওপর ভেসে উঠে ফুট ফুট করে ফেটে গিয়ে তা'দের ভেতরকার বায়ুটাকে খালি বা আজাড় করে দিচ্ছিল। তাঁ'রা যে জলজানের গন্ধ পাচ্ছিলেন তা' ঐ বায়ুরই গন্ধ।

তা'র পর তাঁ'রা ঐ বারিবিন্দুর ব্যাপারটাকে বড় ক'রে দেখবার জন্যে বড় গোছের আর একটা যন্ত্র খাড়া করলেন। তাঁরা বড় একটা গামলায় অম্লজারিত জল পুরলেন। দুটো তার নিয়ে দুটোরই একটা করে মুখ জলে ডুবিয়ে রা'খলেন। একটা তারের অপর মুখ ব্যাটারিতে জুড়ে দিয়ে সুইচ্‌ খুলে দিলেন। তাড়িত ব্যাটারি থেকে প্রথম তারটি দিয়ে জলের ভেতর দিয়ে গিয়ে অপর তারটা দিয়ে যাতায়াত করতে লাগল। দ্বিতীয় তারটা যদি কোন একটা বৈদ্যুতিক বাতি বা পাখার সঙ্গে যোগ করে দাও, তা হ'লে একটা আস্ত তার সরাসরি দেওয়া থাকলে যেমন হ'ত, ঠিক তেম্নি ভাবে বাতি জ্বলবে, পাখা চলবে। যাই হোক, যে পরীক্ষকদের কথা ব'লছিলুম তা'দের কথা বলি—তাঁ'রা ঐ রকম ক'রে দে'খ্‌লেন জলে ডুবান দুটো ডগা থেকেই টপাটপ জলজান পূর্ণ বড় বড় বুদ্‌বুদ্‌ বেরুচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে একটা বড় আবিস্কার হ'য়ে গেল। আবিস্কার এই হ'ল যে, জলের

যে দু'টো উপাদান, জলজান ও অম্লজান (hydrogen ও oxygen), সে দুটোকে তাড়িতের দ্বারা পৃথক করে' ফেলা যায়।

যন্ত্রটার আরও উন্নতিসাধন করে' সুধু জল নয়, অন্যান্য অনেক জিনিষের মধ্যে "সিলভার নাইট্রেট্" দিয়ে পরীক্ষা করলেন। "সিলভার নাইট্রেট" হ'চ্ছে নাইট্রিক এসিড বা যবক্ষারজান অম্লে গলান রূপা।

জল যে ভাবে বিশ্লিষ্ট হ'য়ে গিয়ে'ছিল, "সিলভার নাইট্রেট" ও তেম্নিভাবে বিশ্লিষ্ট হ'য়ে গেল। ব্যাটারি থেকে একটা তার গিয়াছিল গামলায়, ও গামলা থেকে একটা তার সেই তাড়িত প্রবাহ বহন করছিল। যে তারটা দিয়ে গামলা-থেকে তাড়িত প্রবাহিত হ'চ্ছিল, তা'র ওপর রূপোর এক পর্দ্দা পড়ে' গেল।

এই আবিস্কারই হ'ল উত্তরকালের electro বা silver plating—নামে ব্যবসায়ের মূল। সুধু কৌতূহলেই এত বড় একটা ব্যবসায়ের মূলোৎপত্তি।

আজকাল যে জিনিসটায় রূপোর পালিশ ক'রতে হয়, সেটাকে ঋণ তারের (negative wire) মুখের কাছে সংযোগ করা হয়; তা'র পর "নাইট্রেট অফ সিলভারে" ডুবিয়ে তাড়িত চালিয়ে দেওয়া হয়; তুলে নিয়ে দেখা যায়, জিনিষটার ওপর চক্‌চকে চাঁদির এক পাত্‌লা স্তর পড়েছে।

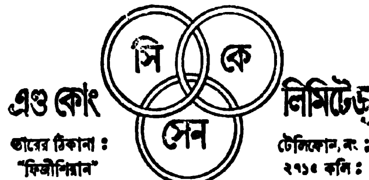
শ্রীধানিলঙ্কা।



ইস্, বাবা কি দুষ্টু !—

কী ভীষণ দুষ্টু বল' দেখি, আমার জন্য 'জবাকুসুম' এনে বলেছেন কি না আনি নি ! আমি বুঝি তোমার দুষ্টুমি ধরতে পারি নি, না ? 'জবাকুসুম' তেল মেখে নাইতে হা—ঃ—ঃ—ঃ আমার যে কী ভাল লাগে বলতে পারি না ।

তোমাদের বলা রইল, যদি তোমাদের বাবা 'জবাকুসুম' তেল না এনে দেন, আমাদের চিঠিতে লিখো—নইলে ভাল হবে না কিন্তু—



২৯ নং, কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা ।

সয়তানের প্রায়শ্চিত্ত।

গরীব চাষি সে। ছোট্ট ক্ষেতখানি তার বাড়ী থেকে অনেকটা দূরে। পূর্ব্বাকাশে উষার প্রথম আলোর রেখাপাত হয়েছে, ঘরের কোণের আমের ডালে পাখীগুলি ডানা ঝাড়ছে আর প্রভাতী তান তুলছে, এমন সময় সে লাঙ্গল কাঁধে করে', বলদ দুটী নিয়ে মাঠের পানে চলল, হাতে তার গামছায় জড়ান মাটির থালায় ভরা পান্তাভাত আর নুন লঙ্কা—তার দুপুরের আহার্য্য।

জমীর পাশে বিরাট অশথ গাছ, তারই তলাতে সে তার গামছায় মোড়া খাবার রেখে বলদ দুটিকে লাঙ্গলে জুড়ে জমি চাষ আরম্ভ করল। বেলা বাড়তে লাগল। ক্রমে তার বলদ দুটিও শ্রান্ত হ'ল আর সে নিজেও ক্ষুধা বোধ করল। তখন বলদ দুটিকে মাঠে ছেড়ে দিয়ে লাঙ্গলের ফাল্‌টাকে মাটির ভিতর বিঁধিয়ে দিয়ে সে অশথ তলায় খাবার খেতে এল। কিন্তু গামছা তুলে দেখে, কোথায় খাবার ?—শূন্য গামছা পড়ে আছে। খোঁজ, খোঁজ, খোঁজ, সারা জায়গাটা সে তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখল, কিন্তু কোথাও তার খাবার মিলল না। আর মিলবেই বা কেমন করে—কারণ সেই অশথ গাছেই ছিল এক ছোট সয়তান, সেই তার খাবারের থালা লুকিয়ে রেখে দিয়েছিল, ভেবেছিল ক্ষিধেদ সময় খাবার না পেয়ে সে না জানি কত গালাগালিই করবে।

সে কিন্তু খাবার না পেয়ে শুধুই বলল—যাক, আমি ত ক্ষুধার জ্বালায় মরে যাচ্ছি না, যে নিয়েছে হয়ত সে আমার চেয়ে অনেক বেশীই ক্ষুধার্ত্ত হয়েছিল। ভগবান তার মঙ্গল করুন।' এই বলে সে পুকুরে যেয়ে খানিকটা জল খেল, তার পর কোমল ঘাসের উপর বিশ্রাম করতে বসল।

সয়তান যখন দেখল যে এত করেও সে চাষিকে পাপের পথে নামাতে

পারল না বরং সে উল্‌টে চোরকে আশীর্ব্বাদ করল তখন সে নিতান্তই হতাশ হয়ে নরকে তাদের সর্দ্দার সয়তানের কাছে উপস্থিত হয়ে তার নিকট সমস্ত ব্যাপারটি জানাল। সর্দ্দার সয়তান ত' চটে লাল, বললে, 'এ নিশ্চয় তোর দোষ। চাষিরাই যদি গালাগালি ছেড়ে দেয়, তাহলে ত' পৃথিবীতে আমাদের রাজত্বই উঠে যাবে। আমরা আর দাঁড়াব কোথায়? এক্ষুণি ফিরে যা, আর আজ থেকে তিন বৎসরের মধ্যে যদি তাকে নরকে না নামাতে পারিস্ ত' তোকে আমি গঙ্গার জলে চুবিয়ে তুলব।

গঙ্গার জলের নাম শুনেই ত' ছোট্ট সয়তানের চক্ষু স্থির! সে তাড়াতাড়ি পৃথিবীতে ফিরে এসে ভাবতে লাগল কেমন করে এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবে—ভেবে ভেবে সে এক মতলব ঠিক করল।

কুলি মজুরের বেশ ধরে সে ঐ চাষির কাছে কাজ নিল। প্রথম বছর সে এক জলা ভূমিতে বীজ বুনল। সেবার একেবারেই জল হ'ল না—সবার ফসল রোদের তাপে পুড়ে গেল, কিন্তু ঐ চাষির ক্ষেত ভরা ফসলগুলি ধানের ভারে নুয়ে পড়ল। চাষির সম্বৎসরের খাবার হয়েও আরও অনেক ধান ঘরে মজুত হ'ল। পর বৎসর সে খুব উচু ভুঁইয়ে বীজ বুনল। সেবার আকাশ ভেঙে বাদল এল—অন্য সব চাষিরা জলাভূমিতে চাষ করেছিল, তাদের ধানের ক্ষেত বানে ভেসে গেল, কিন্তু ঐ চাষির গোলা ভরা এত ফসল জম্‌ল যে সে ভেবেই পায় না এত'ধান নিয়ে কি কর্‌বে!

সয়তান তখন তাকে বাকী শস্যগুলি দিয়ে সরাব তৈয়েরী করবার পরামর্শ দিল। সরাব তৈয়েরী হ'ল, চাষি প্রথমে নিজে খেয়ে নিল তার পর পাড়াপর্শিদের নিয়ে আমোদ করতে সুরু করল। সয়তান তখন তার সর্দ্দারের কাছে উপস্থিত হ'য়ে বুক ফুলিয়ে বলল, এইবার আমার প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে।' সর্দ্দার চাষির বাড়ী চল্‌ল।

সেদিন সে গাঁয়ের সব মাতব্বর চাষিদের তার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করেছে। এক ছোকরা মজুর তাদের সবাইকে সরাব দিতে যাচ্ছে, এমন সময় হঠাৎ পা পিছ্‌লে পড়ায় তার হাতের সরাব মাটিতে পড়ে গেল। চাষি ত রেগেই অস্থির যে এতখানি সরাব নষ্ট হ'ল। মজুরকে সে খুব গালি দিল। সয়তান সর্দ্দারকে চুপি চুপি বল্‌ল—দেখ্‌লে সর্দ্দার, যখন ক্ষিধেয় ওর পেট জ্বলে যাচ্ছিল আর মুখের গ্রাস চোরে নিয়ে গেল তখন কিন্তু ও চোরকে গালি দেয় নি, আশীর্ব্বাদই করেছিল।'

এক গরীব চাষি ক্ষেতে কাজ করে ফিরছিল, পিপাসায় জিব্‌ শুকিয়ে গিয়েছে। অত লোক জড় দেখে সে সেখানে যেয়ে এক গ্লাস সরাব চাইল—কিন্তু তার দিকে কেউ ফিরেও তাকাল না। সর্দ্দার ত' দেখে শুনে ভারী খুসি। শিষ্য ছোট্ট সয়তান বল্‌ল, 'আরও মজা আছে।'

চাষিরা এক গ্লাস করে সরাব খেয়েই এ ওর গায়ে ঢলে পড়ে একে অন্যের প্রশংসা সুরু করে দিল যেন কত আত্মীয়তা, কত বন্ধুত্ব! সর্দ্দার সয়তান বল্‌ল, 'এক গ্লাস খেয়েই যদি মানুষ এমন শেয়ালের মত শয়তানি শিখ্‌তে সুরু করে ত' দেখ্‌ছি দুদিনে জোচ্চোর বাটপাড়ের হাট বসে যাবে।' শিষ্য বল্‌ল, 'দাড়াও না একটু।'

তারা যখন আর এক গ্লাস করে নিঃশেষ করল তখন কোথায় গেল আত্মীয়তা, কোথায় রইল হৃদ্যতা!—সবাই মিলে বকাবকি, তারপর হাতাহাতি, চুলোচুলি আরম্ভ হ'ল।

সর্দ্দার বলল 'চমৎকার।' শিষ্য বলল 'আরও আছে—প্রথম গ্লাস খেয়ে এরা শেয়ালের মত ধূর্ত্তামি শিখল, দ্বিতীয় গ্লাস খেয়ে ক্ষেপা কুকুরের মত

মারামারি স্থুরু করল, আর এক গ্রাস পেটে গেলেই তখন সবাই ঠিক বুনো শূয়োরে পৌঁছাবে।”

ক্রমে যখন সবাই আর এক গ্রাস করেও খেয়ে ফেলল তখন তাদের বুদ্ধি স্থুদ্ধি একেবারে লোপ পেল। তারা অনবরত চীৎকার আরম্ভ করে দিল, অথচ কেউ কারও কথা শুনছে না, কে যে কি বলছে নিজেরাই তা' বুঝছে না। এমনি কিছুক্ষণ হল্লার পর কেউ একা, কেউ বা ছুজনাতে, কেউ বা তিনজনা মিলে দলে দলে ঢুলতে ঢুলতে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল—তার পর কেউ রাস্তার মাঝে, কেউ পগারের ভিতর গড়াগড়ি দিল। চাষি যাচ্ছিল তাদের সবাইকে রাস্তায় খানিক এগিয়ে দিতে, ঘরের দোরেই ছিল কতকটা জায়গায় খুব কাদা, তারই ভিতর পড়ে যেতে তার মাথা হতে পা পর্য্যন্ত কাদায় ভরে গেল, আর সে তারই মধ্যে গড়াগড়ি খেতে খেতে শূয়রের মত গোঁ গোঁ করতে লাগল।

সর্দ্দার তখন শিষ্যকে বলল, 'কি তোফা জিনিষই তৈয়ের করেছিস! শেয়ালের রক্ত, ক্ষেপা কুকুরের রক্ত আর বুনো শূয়োরের রক্ত এই তিনটা মিশিয়ে এটা তৈয়ার হয়েছে, না? শেয়ালের রক্ত থেকে চাষিরা ধূর্ত্তামি শিখেছে, ক্ষেপা কুকুরের রক্তের আস্বাদ পেয়ে মারামারি স্থুরু করেছে, আর শূয়রের রক্তের গুণে এখন ভাগাড়ে পড়ে গড়াগড়ি দিচ্ছে।'

শিষ্য বলল, 'সে সব কিছুই নয়। আমি শুধু এমন ব্যবস্থা করেছিলেম যাতে ঐ চাষির ক্ষেতে প্রচুর ফসল জন্মে। পশুত্ব ওর ভিতরে বরাবরই ছিল—কেবল যতদিন ওকে পেটের জন্য গতর ভাঙা খাটুনি খাটতে হোত ততদিন সে পশুত্ব বাইরে বিকাশ পাবার কোন স্থুযোগ পায়নি। একদিন ছিল যখন এই চাষির ছুবেলা আহার জুটত না, তবু তখন মুখের গ্রাসটা কেড়ে নিলেও ও ক্রুদ্ধ হয় নি। যখন ভূঁইয়ে অতিরিক্ত শস্য জমতে লাগল আর

সে শস্য কি কাজে লাগাবে তা ও ভেবে পায়নি, তখন আমি সরাব তৈয়ারী করার পরামর্শ দিলাম। ফলে যে মুহূর্ত্তে এই চাষি ভগবানের অমূল্য দান আহার্য্যকে নিতান্তই অপ্রয়োজনীয় সরাবে পরিণত করল সেই মুহূর্ত্তে ওর ভেতরকার সুপ্ত পশুত্ব জেগে উঠল। আর একবার যখন ও সরাবের স্বাদ পেয়েছে, তখন চিরদিন পশুই থেকে যাবে।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাশগুপ্ত।

চোরে-চোরে মাস্‌তুতো ভাই।

তিন থাকে চোর, তাদের ভারি ভাব!

তারা একসঙ্গে খায় দায়, রাত হলেই তিনজনে তিন দিকে চুরি করতে যায়। এমনি করেই দিন যায়।

হঠাৎ একদিন তাদের আপোষের মাঝে খুব তর্কাতর্কি সুরু হলো ঃ—

বড় চোর বল্লে "আমি যাই এত বুদ্ধি ধরি তবেই না তোরা করে খাচ্ছিস্!

মেজ চোর মহা রেগে বল্লে "সে কথাটা আর বলতে হয় না দাদা, এ শর্ম্মা যদি না থাকতো ত' হীরে-মতি দূরে থাক্ এক মুঠো অন্নও জুটত' না।"

ছোট চোর থামিয়ে বল্লে "কাজ কি অত কথায় ভাই? আজ রাতে যে যার পরিচয় দিও বুদ্ধির। যে সব চেয়ে বাহাদুরী দেখাবে আমরা মেনে নেব তারই বুদ্ধির দৌলতে খেতে পাই। ব্যস্!"

সেই কথাই ঠিক হ'ল। সন্ধ্যের একটু আগে বেরিয়ে পড়লো যে যার নিজের সন্ধানে।

ছোট চোর পথে যেতে যেতে দেখে এক বুড়ো চলেছে মাঠের মাঝ দিয়ে তার ছোট টাট্টু টাতে চড়ে'।

সে তখন কি একটা মতলব ঠাউরে নিজের পথ ছেড়ে সটাং বুড়োর পেছনে এসে হাজির হ'ল।

বুড়োর পাদানির সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা ছিল একটা নধর ভেড়ার ছানা। ঘোড়ার পেছন পেছন ছানাটাও আপন মনে হেঁটে যাচ্ছিল। তার গলায় একটা ঘণ্টাও বাঁধা ছিল।

ছোট চোরটা করলে কি?—ছানাটা খুলে নিয়ে, দড়িটায় ঘন্টিটী বেঁধে, সেটী ঘোড়ার ল্যাজে দিল ঝুলিয়ে। তার পর আর তাকে পায় কে? বাচ্ছাটাকে বুকে নিয়ে সে চোঁচা দৌড়!

বুড়ো চলেছে নিজের খেয়ালে। ক্ষেত-আল উঁচু-নীচু ভেঙ্গে সে বেশ আপন তালে মেতে চলে যাচ্ছে। ল্যাজে বাঁধা ঘন্টিটী ঠিন্ ঠিন্ করে বেজে যেন বুড়োকে মনে করিয়ে দিচ্ছে 'ওগো আমিও আছি—তোমার পাছু পাছুই চলেছি।' তাই বুড়ো নিশ্চিন্ত মনে চলেছে বাড়ীর পানে।

ও সর্ব্বনাশ! বাড়ী গিয়ে দেখে একি হয়েছে! তার অমন সাধের সদ্য কেনা ছানাটি নেই, কে চুরী করে নিয়েছে! বুড়ো মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লো।

বাইরে বেরিয়ে বুড়ীর ব্যাপার বুঝতে আর বাকী রইল না।

বুড়োর কাছে গিয়ে খিঁচিয়ে বল্ল "কপাল যদি এখানে বসেই চাপড়াবে তাহলে খোঁজ করবে কে? যতক্ষণ হা হুতাশ করছো ততক্ষণ তারা পগার পার হ'ল হয় ত! এখুনি যাও, গিয়ে দেখ, সন্ধান পাও না কি। দেরী হলে সরে পড়বে।"

বুড়ো ছিল একটু বোকা ধাঁজের আর ভাল মানুষের এক-শেষ। যে যা বলে সে বেচারা তাই শোনে—এখনও তাই বুড়ীর কথায় দ্বিরুক্তি না করে খোঁজে বেরুল।

যে পথ দিয়ে এসেছিল, সেই পথেই চললো। পথের মাঝে যাকে দেখে বলে—ওগো আমার অমন সুন্দর ভেড়ার ছানাটী কোন্ পথে গেছে দেখেছ কি তোমরা?"

উত্তরে কেউ বল্লে 'না,' কেউ হাসে, কেউ ঠাট্টা করে—"এই যে আমার কাছে।"

বড় চোর ছোট চোরের কীর্ত্তি সবই গাছের আড়াল থেকে দেখেছিল, তাই বুড়োর ফিরে আসারই অপেক্ষায় ছিল সে।

বুড়ো তার কাছ দিয়ে যেতেই সে বল্লে "তুমি কি খুঁজে বেড়াচ্ছ?"

বুড়ো বল্ল "আর ভায়া দুখের কথা কারেই বা বলি—কেই বা শোনে? হাট থেকে সদ্য কেনা—কর্করে পাঁচটী টাকা খসিয়ে কিনেছিলুম একটী ভেড়ার বাচ্চা—সেটা কে চুরী করে নিল। তা বাবা সেটাকে এই রাস্তা দিয়ে যেতে দেখেছ কি?"

চোর একটু মুরুব্বিয়ানা চালে বল্লে "ওঃ তবে সেটা তোমারই ভেড়া? তা কি জানি আগে? এই মাত্তর একটা লোক সেটাকে কোলে করে এইদিক পানেই গেল। কিন্তু যখন সে চুরীই করেছে, তখন তুমি চুপি চুপি গেলেই ভাল; নইলে তোমার ঘোড়ার খটাখট্ তার কাণে গেলে পাড়ী দেবে এমন, যে তার পাত্তাই পাবে না।"

বুড়ো তার কথায় যেন হারানিধি ফিরে পেল, এমনি ভাবে বল্লে "বেঁচে থাকো, সুখে রাজ্যিপাট কর, বাবা, বাঁচালে আমায়। আর একটী যদি

কাজ কর বাবা বর্ত্তে যাই, এটাকে একটু রাখ যখন আসবো দিও। এই এলাম বলে।" বলেই সে আর উত্তরের অপেক্ষা না করে ছুট্‌তে ছু্‌টতে চলে গেল।

বড় চোর আর দেরী না করে টাট্টুর পিঠে চেপে জোরে চাবুক মারতেই সেটা যেন বাতাসে ভর রেখে উড়ে চলতে লাগলো।

এদিকে বুড়ো ভেড়ার খোঁজে মিথ্যে হায়রাণ হয়ে বাড়ী ফিরবে বলে, যেখানে ঘোড়া রেখেছিল—ফিরে এল। হায়রে কপাল—কোথায় বা ঘোড়া আর কোথায় কি! ফিরে পাবার আর উপায় নেই দেখে অগত্যা বাড়ী ফিরলো। এমনিতর সর্ব্বস্ব খুইয়ে বুড়ীর কাছে কি বখশিশ্ পেল, তা আর নাই বল্‌লাম।

আড্ডায় এসে দেখে মেজ চোর তখনও আসেনি। তাই ঘোড়াটাকে বেঁধে দিল খোঁটায় আব একটু ঘাস জলও দিল। ভেড়াটার বন্দোবস্ত আগেই করা হয়েছিল।

এরা দুজনে গল্প করছে ইতিমধ্যে হাসি মুখে শুধু হাতে মেজ চোর এসে দাঁড়াল।

বড় চোর বল্লে "কৈ হে কি আনলে ? এ যে শুধু হাত দেখছি।"

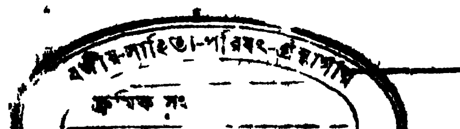
তখন বড় ও ছোট তাকে বসে বসে নিষ্কর্ম্মা অন্ন গেলে ব'লে তাড়িয়ে দিতে উদ্যত হ'লো—দেখে মেজ চোর বলে উঠলো. সে কি! আমি যে তোমাদের ভাই !

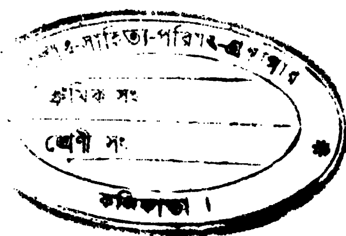
তারা গরম। বল্লে—ওঃ ভারি ভাই! দূর হ! কিসের ভাই, কিসের সম্পর্ক ?

মেজ চোর হাসিমুখে বল্লে—সে কি দাদা! ভাই নয় ?

ভাই বলে ভাই, একেবারে চোরে চোরে **মাসতোত ভাই** ।

শ্রীবাণী দেবী।







हाः ! हाः !! हाः !!!

আমার দেশ

২য় বর্ষ, ১০ম সংখ্যা।

কার্ত্তিক, ১৩২৯

বাকি।

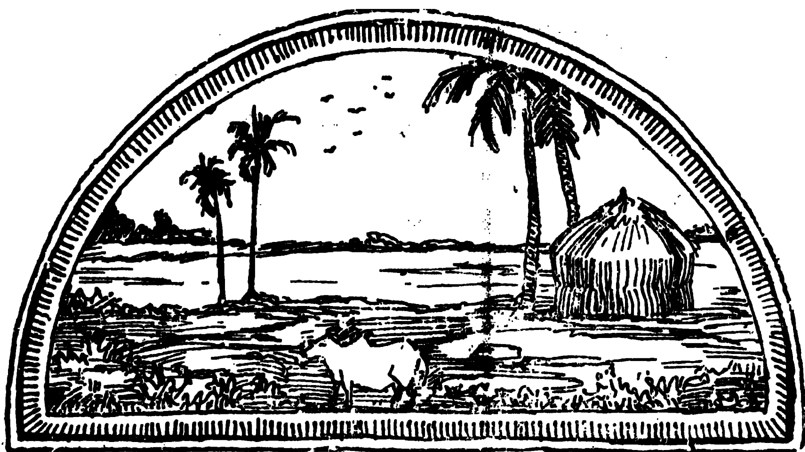
(১)

এখনো বাকি বহু বাকি।
এখনো কুসুমের
ফুটিতে দেরী ঢের,
মুকুলে ভরে আছে শাখী,
আরও যে দূর নভে
উঠিতে তোরে হবে
নীড় যে গিরিচূড়ে পাখী।

(২)

পাষাণে মূরতিটী
ফোটেনি পরিপাটি
রেখেছে রেখা শুধু আঁকি
এখনো বাকা শশী
রয়েছে দূরে বসি,
চকোর করে ডাকাডাকি।
এখনো বাকি বহু বাকি।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।



"শ্রীনিবাসের ভিটা"

(নাটিকা)

প্রথম দৃশ্য

দুজন হাঘরে ভিটার পরিচয় দিচ্ছে।

১ম। পুরাতন এক বনের ধারে নদীর পারে বাসাটি,
সকাল সাঁঝে বইছে সেথা জলের খাসা হাওয়াটি,
ফুলের বাগান গন্ধে মাতান কোকিল ফিঙ্গে দোয়েল গায়,
ষড় ঋতুর চরণ চতুর সেথা নুপুর বাজিয়ে যায়,
সারা অঙ্গে রঙ্গে রঙ্গে খেলেন সেথা প্রকৃতি,
সেথায় আসি বসত করা কত কালের সুকৃতি।

২য়। হাজার হাজার বরষ গত পুণ্যব্রত মহাজন,
বিজনপুরি বসত করি করল গো তায় তপোবন,
তাঁদের নামে গ্রামে গ্রামে আজও রটে পুণ্যশ্লোক
নিত্য তাঁদের স্মরণ করে আজও শত গ্রামের লোক।
১ম। কালের গতি সূক্ষ্ম অতি বংশে তাঁদের ঘটল দোষ,
করম গুণে তাঁদের পানে পড়ল আসি বিধির রোষ,
বুদ্ধি হত পদানত ইষ্টে জানে ইষ্ট নয়,
উল্টা মতি উল্টা গতি ন্যায়ের প্রতি সদাই ভয়,
আপন ঘরে সদাই ডরে পরের ঘরে যেতে নাই,
বড় ঘরের বংশ মোরা তাতে মানের হানি ভাই।
২য়। গত ঝড়ে গেছে উড়ে চিলে ছাদের মাথাটি,
ঝরঝরিয়ে বৃষ্টি পড়ে ভেজে গায়ের কাঁথাটি,
দুখে সারা তবু তারা মানের গরব ছাড়ে না,
ভাবে বসে, রাজা এসে ভিটা তো আর কাড়ে না ?
বলে বেবাক্ যায় যদি যাক্ ভিটা আগলে রব যে,
কাড়তে এলে ভিটাখানা ছাড়ব না কো সহজে
বল্‌ব এটা তপের ভিটা হেথা তপের বাঁধা ঘর
সত্যযুগের কেনা মোদের ভিটাখানার অনেক দর।
১ম। খাজনা বিনা ভিটা খানা বিকিয়েছে যে অনেক কাল
জান্‌তো না কেউ খবরটি তার জানতো না কেউ ঘরের হাল,
শুধু যে হায় রাজার দয়ায় আজও তারা ভিটায় রয়
এই কথাটি জানতে তাদের অনেক সময় হলো ব্যয়।

২য়। রাজার দয়া তাদের পরে কত তারা জানত না'
তাইতে তারা তেমন করে রাজাকে ভাই মানতো না,
কেমন করে জানলে পরে তাদের ছেলে শ্রীনিবাস,
কেমন করে বুদ্ধি ফেরে বলব তারি ইতিহাস,
আপন মুখে বলবে তার জগৎজোড়া কাহিনী,
তোমরা শুনে বলবে সবাই এমনটি কই শুনিনি'।

১ম। হট্টগোলের মাঝে থাকি সবায় ডাকি বলি তাই,
শ্রীনিবাসের ভিটার কথা মন দিয়া আজ শুন ভাই।

[দুজনের প্রস্থান]

আড়াল হইতে গান—

তুমি, হাত ধরে আর তুলবে কত
আমায় বারে বারে,
আমি, পিছিয়ে থাকি দৃষ্টি রাখি
আপন অহঙ্কারে।
ভুলে যাইযে তোমার প্রসাদ,
ঘুচায় আমার সব অবসাদ,
নিত্য নূতন জীবন দানে
নে যায় মরণ পারে।
মরণকে মোর ভাল বাসা
সেই ত জীবন নাশা গো
অন্ধকারের অকুলনীরে
সেই ত তরী ভাসা গো,

ভয়েংসে জন হল সারা
হারিয়েছে কূল নাই কিনারা
একটুখানি প্রসাদ দিয়ে
বাঁচাও এবার তারে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

(ভাঙ্গা পুরান সহর, সামনের রাস্তায় দুজন বিদেশী নাগরিকের প্রবেশ)

১ম। ভাঙ্গাচোরা এ সহর খানা কাদের হে? দেখে মনে হয় সহরটা এককালে খুব জমকালো ছিল, এত যে ভেঙ্গে পড়েছে তবু এর গোড়ার বাঁধুনি একটু আলগা হয়নি, দেওয়ালগুলোর গাঁথুনি কেমন মজবুত দেখেছ, এক একখানা ইঁট যেন পাথরের খণ্ড, ভাঙ্গা ইঁটের টুকরো গুলো রাস্তায় যেন পাথরকুচি ছড়িয়ে আছে। মজবুত হে মজবুত, সহরটা আসলে খুব মজবুত।

২য়। হোক গে মজবুত এখন এর যা দশা, দেখলে শেয়াল কুকুরেরও কান্না পায়, বাড়ীগুলো ভাঙ্গা, দেওয়ালগুলো ফাটলে ভরা, ফাটল ফুঁড়ে মাথা তুলেছে মস্ত মস্ত গাছ, তাদের মোটা মোটা শিকড়গুলো মাটি পর্য্যন্ত লম্বা আর চারদিক জুড়ে ফাটলের মধ্যে বাসা করেছে চামচিকে, ছুঁচো, ইঁদুর আরসোলা ও মাকড়সা,—রাম রাম--এ আবার সহর!

১ম। যাই হোক্ তবু ঘুরে ফিরে চারদিকটা ভাল করে একবার দেখে আসা যাক্। এ সহরে কি লোক নেই?

২য়। মরেছে হে মরেছে, লোকগুলো মরেছে, মানুষ থাকলে

সহরের এমন দশা হয়? দেখছ না আকাশ জুড়ে মাথার উপর শকুনি গৃধিণী উড়ছে।

১ম। তাইত হে এখানে যে দেখছি আগাগোড়া মরণ উৎসব চল্‌ছে! ঘটা করে মরছে হে এরা ঘটা করে মরছে; গাছগুলো শুকিয়ে মরছে, পুকুরের জল পচে মরছে, বাতাস গলি ঘুঁজিতে বদ্ধ হয়ে হাঁপিয়ে মরছে, রাশি রাশি সাপ ব্যাঙ ভাঙ্গা বাড়ীর দেওয়াল চাপা পড়ে দিনরাত মরছে, তাদের মরা শরীরের পচা গন্ধে রাস্তা চল্‌তে প্রাণ বেরচ্ছে—চল হে চল আমাদের দলবল ডেকে এনে মৃতদেহগুলো সৎকার করে ভাঙ্গা ফাটা যা আছে সব মেরামত করে সহরটা নূতন করে গড়ে তোলা যাক্‌।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

ভাঙ্গা অট্টালিকার বারাণ্ডায় বসে শ্রীনিবাস। বণিকদলের প্রবেশ। বজ্র, পুঁথি, কর্ণিক হাতে রাজপেয়াদার প্রবেশ। শ্রীনিবাসকে রাজপেয়াদার রাজদত্ত মালমস্‌লা প্রদান।

শ্রীনিবাস। কাজ করে যে খাব আমি নাইকো এমন শকতি,
রাজ দুয়ারে মাগব গিয়ে নাইকো সে রাজ ভকতি।
ঘরের আমার নাইকো চালা পেটের অন্ন জোটে না,
নয়ন হতে তবু আমার ঘুমের আলস ছোটে না।

উঠতে গেলেই অঙ্গখানি এলিয়ে পড়ে মাটিতে,
পা দুখানি জড়িয়ে ধরে দু এক কদম হাঁটিতে।
পড়সী যারা নিত্য তারা গালি দে যায় আমাকে
হেঁট মুখে রই কথা না কই ভাবে বেজায় দেমাকে।

(বণিকদলের প্রবেশ)

১ম। তুমি কে হে, তোমার নাম কি, এ বাড়ীখানা কি তোমার ?

শ্রী। আমার নাম শ্রীনিবাস ঠাকুর। অনেক পুরুষ থেকে এ সহরে আমার বাস। প্রায় দু হাজার বছর হল আমার পূর্ব্বপুরুষ এ সহরখানা তৈরী করে গেছেন। মশায়, এ আজকের জিনিষ নয়। অতি প্রাচীন, মশায়, অতি প্রাচীন।

২য়। হোঃ হোঃ হোঃ প্রাচীন তো বুঝলুম হে, কিন্তু প্রাচীনের উপর কি নূতন করে সংস্কার হতে নেই ? শুধু কেবল প্রাচীন হয়ে থেকেই চরম সুখ, হাঃ হাঃ হাঃ বল কি হে ? ও দিকে প্রাচীন অট্টালিকা যে মাথায় ভেঙ্গে পড়ে তার কিছু ঠিক আছে ? সংস্কার চাই হে সংস্কার চাই।

৩য়। দেশের রাজা হুকুম করেছেন তাঁর রাজ্যের সব জায়গা নূতন হবে, পুরণো ভাঙ্গা ফাটা এক চুল কোথাও থাকতে পারবে না।

৪র্থ। তোমরা যদি তোমাদের ঘর বাড়ী সহর বাজার সব নূতন করে তৈরী না কর তবে আমরা তোমাদের সহর কেড়ে নিয়ে নূতন করে গড়ে তুলব। মাল মসলা সব আমরাই দেব, সহরটা তাহলে আমাদেরই হয়ে যাবে।

শ্রী। আমাদের পূর্ব্বপুরুষ স্বয়ং রাজার হাত থেকে এ সহর কিনেছিলেন, এবং এমনতর মাল মসলা দিয়ে সহরটা গড়েছিলেন যে, তোমাদের মাল মসলা

তার সঙ্গে মিশ খাবে না, একটাও বাড়ী জোড় খাবে না হে, একটাও বাড়ী জোড় খাবে না।

১ম। জোড় না খায় প্রাচীন সব ভেঙ্গে ফেলে আগাগোড়া আমরা নূতন করে গড়ব।

শ্রী। পারবে না হে, পারবে না। একেবারে এ সহর ভেঙ্গে ফেলতে পারবে না। এ সহর আগুন দিয়ে গাঁথা, জল দিয়ে বাঁধা, বাতাস দিয়ে ছাপা আকাশ দিয়ে মাপা। এ ভাঙ্গবার নয়—ফাটবে, চটবে কিন্তু একেবারে ভাঙ্গবে না হে, একেবারে ভাঙ্গবে না। হাজার তোমরা জোর দেখাও, তাড়াতে আমাদের পারছ না।

২য়। ভাঙ্গা কাটা কিছু তো আর দেশে রাজা রাখবেন না, হুকুম করেছেন পৃথিবী তাঁর নূতন হবে। সংস্কার না কর রাজা নিজেই সহর থেকে তোমাদের তাড়িয়ে দেবেন তখন কি করবে ?

শ্রী। বছর বছর রাজার খাজনা আমরা গুণে দিচ্ছি রাজা আমাদের তাড়াবেন কোন্ আইনের জোরে ?

(রাজ পেয়াদার প্রবেশ রুখে শ্রীনিবাসের সামনে এসে)

রাজ পে। কি বলছ ঠাকুর বছর বছর রাজার খাজনা তোমরা গুণে দিচ্ছ ? দেখতো তোমার দলিলখানা বের করে, কত বছর খাজনা দাওনি ?

(জোর দেখিয়ে দলিলের বাক্স আনতে শ্রীনিবাসের ঘরে প্রবেশ)

(মাকড়সার জালে ঢাকা দলিলখানা ঝাড়তে ঝাড়তে ভীত শ্রীনিবাসের বাইরে আগমন)

এক হাত মাথায় ও এক হাতে দলিল ধরে শ্রীনিবাস নরম গলায় টেনে টেনে—"ও বাবা ! তিনশো বছরের খাজনা বাকি ! এতকাল যে খাজনা দেওয়া

হয়নি তা আমার মনেই ছিল না, ভিটাখানা কবে বাকি খাজনার দরুণ রাজসরকারভুক্ত হয়ে গেছে তার ঠিকানাই নেই।

(দরদর ধারায় চোখে জল পড়ছে, চাপা আওয়াজে শ্রীনিবাস)

কি হবে ভাই রাজ পেয়াদা, ভিটায় তো আমাদের দখল নেই, রাজা তো এখন সহরটা আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নেবেন, আর তো আমাদের দাবী নেই জোর নেই, বহু বছর খাজনা দিইনি সহর তো আমাদের অনেক কাল সরকারভুক্ত হয়ে গেছে। এখন আমরা দাঁড়াই কোথা ?

রাজ পে। সহর এখন রাজার, দাও ছেড়ে তাঁর হাতে সহরের ভার। রাজা আসছেন, তোমাদের সঙ্গে নিয়ে এ সহর তিনি নিজেই গড়ে তুলবেন। তাঁর আসার খবর দিতে ও তোমাদের দিয়ে কাজ সুরু করিয়ে দিতেই আমাকে আগে পাঠিয়েছেন। এই নাও মাল মসলা, সুরু করে দাও কাজ, ঠাকুর, এখুনি সব বদলাতে সুরু করে দাও। ভিটে সহর সব নতুন করে তুলতে হবে, আগাগোড়া নতুন। প্রাচীনকে যে নিত্যি নতুন করে তোলা চাই, তা কি জাননা ? স্বয়ং ভগবানই যে নিত্য নূতন হয়ে দেখা দেন, রূপটা তো বদলান চাই ঠাকুর !

(বজ্র পুঁথি ও কর্ণিক শ্রীনিবাসকে প্রদান, জিনিষগুলি হাতে নিয়ে অবাক্ ও ব্যাকুল দৃষ্টিতে শ্রীনিবাসের ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখা)

রাজ পে। অন্য সব সহর রাজ্য, রাজা আর পাঁচজনকে ভাগ করে দিয়েছেন, কেবল এই সহরটি রেখেছেন নিজের জন্য, এখানে রাজার নামেই সব কাজ হবে, অন্য কারো নামে এখানকার কোন কাজ হতে পারবে না।

(দৌড়ে গিয়ে শ্রীনিবাসের রাজপেয়াদাকে আলিঙ্গন)

শ্রী। নিন্ রাজা নিন্, সব নিন্, আসুন তিনি এ রাজ্যে, তাঁর রাজ্য তিনি

করুন, আমরা তাঁর চিরদাস হয়ে কেবল তাঁর কাজে জীবন ধারণ করে থাকি। [উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

(রাজপথ, জনসাধারণ। ঘোড়া থেকে নেমে রাজা জনসাধারণের মধ্যে দাঁড়ালেন।)

সঙ্কল্প। রাজা আস্‌ছেন রাজা আস্‌ছেন, ঐ রে ঐ, রাজা আসছেন।

১ম। কই রে কই?

২য়। ঐ যে রে, দেখতে পাচ্ছিস নে, ঐ যে সাদা ঘোড়ায় চড়ে মুখে সোণার আলোর আভা নিয়ে, চারিদিককে সোণার আলোয় ডুবিয়ে।

৩য়। বলিস কি সাদা ঘোড়া, মুখে সোণার আলোর ঝালোর আভা, বলিস কি?

২য়। হ্যাঁ রে ধবধবে সাদা, আগাগোড়া সাদা, কোথাও কালোর দাগটুকু নেই; আর ঘোড়াটা কি তেজী, চলছে যেন চারিদিকে আগুন ঠিকরে পড়ছে, ঘোড়ার পায়ে জ্বলন্ত আগুণ রে জলন্ত আগুণ।

৩য়। ওঃ তাই বুঝি দুপাশের লোকগুলো সরে সরে যাচ্ছে, আগুণের হল্‌কায় ওদের চোখ ঝল্‌সে যাচ্ছে বলে? ওঃ তাই বুঝি ছেলেগুলো চেঁচিয়ে কেঁদে কেঁদে উঠছে আগুণের আঁচ গায়ে লাগছে বলে? পেয়েছিরে পেয়েছি, এইবার দেখতে পেয়েছি। উঃ চেহারাখানার কি জলুস!

৪র্থ। এত ফুলের গন্ধ কোথা থেকে আসছে রে?

২য়। কেন রাজার গলায় যে মস্ত বড় ফুলের মালা, দেখতে পাচ্ছিস নে?

৪র্থ। রাজার গলায় ফুলের মালা! কে পরিয়ে দিল?

২য়। কেন, আমাদের শ্রীনিবাস ঠাকুর, জানিস নে বুঝি!

৪র্থ। শ্রীনিবাস ঠাকুর! সত্যি?

২য়। সত্যি না তো কি মিথ্যে?

১ম। কাছে এসে পড়েছেন রে কাছে এসে পড়েছেন, এই যে রাজা কাছে এসে পড়েছেন।

২য়। চল্ চল্ এগিয়ে রাজাকে প্রণাম করি।

(সকলের প্রণাম)

ভীড় ঠেলে ছোট্ট মেয়ে এগিয়ে রাজার হাত ধরে প্রশ্ন করছে।

মে। তুমিই কি রাজা? তুমি ত আমাদেরই মত মানুষ, তবে তোমাকে লোকে মানুষ না বলে রাজা বলে কেন?

রা। সেটা লোকের ভুল, আমি রাজা নই, আমি সত্যিকার মানুষ।

মে। তবে তোমাকে লোকে মানুষ না বলে রাজা বলে কেন?

রা। সেটা লোকের ভুল, আমি রাজা নই, আমি সত্যিকার মানুষ।

মে। বাঃ তবে তুমি আমাদের সঙ্গে না থেকে আলাদা থাক কেন?

রা। লোকে আমাকে রাজা খেতাব দিয়ে ঠেলে আলাদা করে রেখেছে, কাছে আসতে দেয় না,—সেই তো আমার দুঃখু।

মে। তাই বুঝি তুমি আমাদের কাছে এসেছ আমাদের মধ্যে থাকবে বলে? তাই বুঝি ঘোড়া থেকে নামলে আমাদের সঙ্গে হাঁটবে বলে? বাঃ কি মজা, রাজা আর আমরা এক হয়েছি—কি মজা!

রা। আমার প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছিল ঘোড়ার পিটে চড়ে চলতে; আর রাতদিন একলা থেকে কেবল বিশ্রাম করতে। তোমাদের মাঝে এসে পড়ে আজ আমি বাঁচলুম, রাজা হওয়ার দুঃখু থেকে নিষ্কৃতি পেলুম। এখন আমি তোমাদের দশেরই একজন।

গে। তুমি যদি রাজা নও এ সহর তবে কার?

রা। দশের। (সকলে গান।)

আমাদের এই সহর খানার রাজার পরেই ভার,
রাজা এসে দেবেন গড়ে সহর চমৎকার।
উঠবে গেঁথে আগাগোড়া
ভাঙ্গাচোরায় লাগবে জোড়া
পুরাতনের অঙ্গে আহা নূতন অলঙ্কার।
চলবে সহর রাজার নামে
বিকাবে মাল আসল দামে
রাজার সঙ্গে হবে মোদের সহজ ব্যবহার।

শ্রীহেমলতা দেবী।

চাটনি।

এক রাজা রাজ্য মধ্যে ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, রাজবাড়ীতে যে নূতন একটী পুষ্করিণী কাটা হইয়াছে তাহাতে আগামী কল্য প্রভাতে সকল প্রজারই একটু একটু দুধ ঢালিয়া দিতে হইবে। সমস্ত প্রজা যদি একটু করিয়া দুধ দেয়, তবে সহজেই পুষ্করিণী দুধেই পরিপূর্ণ হইবে। এই আদেশ শুনিয়া প্রজাগণ সকলেই মনে করিল যে সকলেই ত দুধ ঢালিবে, অতএব আমি যদি দুধের পরিবর্ত্তে একটু জল ঢালিয়া দেই তবে তাহা কেহ টের পাইবে না। এই ভাবিয়া প্রত্যেক প্রজাই পুষ্করিণীতে দুধের পরিবর্ত্তে জল ঢালিতে লাগিল। অবশেষে দেখা গেল কেহই দুধ ঢালে নাই। প্রত্যেকেই এক কল্পনা করিয়া জল ঢালিয়াছে। কাজেই 'রাজার পুকুর আর দুধে ভরা হইল না'।

শ্রীনিবারণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।






আর্থারের গল্প

সে আজ অনেকদিনের কথা। ইংলণ্ডে তখন মার্থিন নামে একজন অদ্ভুত লোক বাস করতেন। তাঁর বুদ্ধির ধার যেমন খর ছিল, জ্ঞানও তেমনি ছিল গভীর। তিনি এত অদ্ভুত অদ্ভুত কাজ দেখাতে পারতেন যে লোকেরা অবাক হয়ে যেত। ইংলণ্ডের রাজারও তাঁর সম্বন্ধে এত উঁচু ধারণা ছিল যে তিনি মার্থিনের পরামর্শ না নিয়ে কোন কাজ করতেন না।

রাণী ছিলেন, কর্ণওয়ালের রাজার মেয়ে। ফুলের মত সুন্দর রূপের সঙ্গে ফুলের মতই কোমল ছিল তাঁর মনটি। তাঁর প্রথম সন্তান জন্মাবার আগে রাজা প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, যদি ছেলে হয়, তাহলে তাকে মার্থিনকে দিয়ে দেবেন। রাণীর যথাসময়ে একটি ছেলে হল। ছেলেটীর সুন্দর মুখখানি দেখে রাণীর খুব মায়া হলেও, রাজা তাঁর কথা রাখলেন। দুজন বড়বংশের মেয়ে সোনার ঝালর দেওয়া বিচিত্র নক্সা আঁকা একখানি চাদরের ওপরে রাজকুমারকে শুইয়ে তাঁকে নিয়ে গেল রাজবাড়ীর সিংহ দরজায়। সেখান থেকে মার্থিন শিশুটিকে নিয়ে গেলেন আপনার বাড়ীতে। কেউ জানলে না, কেউ শুনলে না।

মার্থিন ক্রমেই বুড়ো হয়ে পড়ছিলেন—তাই রাজার ছেলেকে মানুষ করবার ভার দিলেন তাঁর এক বন্ধুর হাতে— সার একটার। এঁর বীরত্ব ও মহত্ত্বের কথা সকলেই জানত আর সেই জন্যে সবাই তাঁকে গ্রাহ্য করত। এই দুজনের হাতে রাজকুমার আর্থারকে সঁপে দিয়ে রাজাও খুব নিশ্চিন্ত হলেন।

আর্থার যত বড় হতে লাগল, একটার তাকে সাহসী ও সত্যবাদী হতে শিক্ষা দিতে লাগলেন। তাকে সঙ্গে করে তিনি জঙ্গলে জঙ্গলে শিকার করে বেড়াতেন—গরীব দুঃখী দেখলে, আর্থারের হাত দিয়ে ভিক্ষা দেওয়াতেন। সন্ধ্যার পর ঘরের মাঝে আগুনে হাত পা সেঁকতে সেঁকতে তাকে কত গল্প শোনাতেন—দেশের আগেকার রাজাদের কথা, পুরাণের গল্প, দেবদেবীর কাহিনী।

এই সময় রাজার মৃত্যু হল। রাণী তাঁর শোকে পাগলের মত হলেন। স্বামী নেই, একটি মাত্র ছেলে—তা সে-ও যে কোথায় তার সন্ধান এক মার্থিন ছাড়া কেউ জানেনা। রাণী ছেলেকে দেখবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে মার্থিনের কাছে বার বার লোক পাঠাতে লাগলেন। মার্থিন বলে পাঠালেন যে, ঠিক উপযুক্ত সময়েই রাজকুমারকে তিনি রাজসভায় পৌঁছে দেবেন। রাণীর অধীরা হবার কোন দরকার নেই।

বছর কয়েক কেটে গেল। মার্থিন কাণ্টারবারির প্রধান পুরুতকে বল্লেন—"এই বৎসরের বড়দিনের সময় দেশের সব বীরদের আর জমিদারদের এখানে নিমন্ত্রণ করুন। দেশের রাজা সে সময় তাদের দেখা দেবেন।" পুরুত ঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন যে—লোকে কি করে রাজাকে ঠিক চিনতে পারবে?" মার্থিন তখন সেই গির্জ্জার আঙ্গিনার দিকে দেখিয়ে বললেন—"ওই যে তরোয়ালটা পাথরখানির ভেতর অর্দ্ধেকটা পোঁতা রয়েছে ওটার গায়ে সোনার

অক্ষরে লেখা আছে যে, যে তরোয়ালকে পাথর থেকে টেনে তুলতে পারবে, সেই ইংলণ্ডের প্রকৃত রাজা। তাই আমি দেশের লোককে এখানে জড় করতে চাই—তারা এসে সকলে চেষ্টা করুক।”—

বড়দিনের সময় পুরুতের ডাকে সকলে এসে হাজির হল। একে একে সকলেই তরোয়ালে হাত দিলে। সফল হলেই সিংহাসনে বসতে পাবে, এই লোভে যে তালপাতার সেপাই সেও একবার টানলে—আর যাদের বীর পালোয়ান বলে নামডাক, তাঁরা ত চেষ্টা করলেনই কিন্তু কেউ তাকে একটুও নড়াতে পারলে না।

পুরুত ঠাকুর তখন বললেন—“যে এখনও বোধ হয় আমাদের রাজার আসবার সময় হয়নি। আগামী বছরের প্রথম দিনেও আবার মেলা বসবে। সেদিনও সকলে আর একবার চেষ্টা করে দেখতে পারবেন।”

আবার সেদিনও বহুলোক জড় হল। প্রথম দিন এসে পৌঁছাতে পারেনি এমন অনেক লোক এই দিন এসে উপস্থিত হল। দোকানীরা এই সুযোগে রঙ চঙ-এ কত জিনিষের দোকান খুলে বিক্রী করতে লাগল। বড় বড় ঘোড়সওয়ার তেজী ঘোড়ায় চড়ে নানা কৌশল দেখাতে লাগল।

মেলা দেখতে একটারের ছেলে কে'র সঙ্গে আস্‌ছিলেন রাজকুমার আর্থার। পথে কে' হারিয়ে ফেল্‌লেন তাঁর চমৎকার তলোয়ারখানি। অস্ত্রহীন হয়ে সকলের সামনে যেতে তাঁর ভারি অপমান মনে হল। তিনি বললেন—“ভাই আর্থার, কি লজ্জার কথা বল ত! তরোয়াল না নিয়ে আমি ওখানে যেতে পারব না। তুমি একাই যাও।” তাঁর দুঃখ দেখে, আর্থার বল্‌লেন—“তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমি এখুনি আর একখানা তরোয়াল এনে দিচ্ছি।” এই বলে তীরের বেগে তিনি ঘোড়া ছুটিয়ে বাড়ী ফিরলেন।

ফিরে দেখলেন যে বাড়ীর সব দরজা বন্ধ। সকলেই মেলা দেখতে চলে গিয়েছে। বাড়ীতে ঢোকবার কোন উপায়ই নেই। আর্থার বিরক্ত হয়ে ভাবলেন—"ধাঃ, মিছামিছি ঘুরে মরলুম। এখন করি কি? বন্ধুকে কথা দিয়েছি, তরোয়াল এনে দেব—আমাকে কথা রাখতেই হবে—এখন তরোয়াল পাই কোথায়?" এই সময় হঠাৎ তাঁর মনে পড়ে গেল গির্জ্জার তরোয়ালের কথা। "সেই তরোয়ালটা যদি তুলতে পারি তাহলে ত' আমার কথা থাকে। আর বন্ধুকেও অস্ত্রহীন হয়ে যেতে হয় না।" এই স্থির করে তিনি গির্জ্জার দিকে ঘোড়া ফিরালেন।

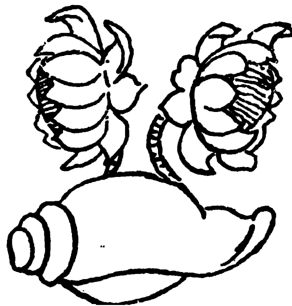
গির্জ্জার উঠানে পৌঁছে ঘোড়া থেকে লাফিয়ে পড়ে আর্থার সেই তরোয়ালের বাঁট ধরে এমন এক টান দিলেন যে, একটানেই সেটা সোজা বেরিয়ে এল। আর্থার তখন খুসী হয়ে তরোয়াল নিয়ে ঘোড়ায় চড়লেন আর গিয়ে বন্ধুকে সেটা দিলেন। সেখানা কোথায় পেলেন, কি করে পেলেন সে বৃত্তান্ত কিছুই বললেন না।

কে' তরোয়াল দেখে ভাবলেন যে "এখানা ত' আমার তরোয়াল নয়। ঐত' সেই গির্জ্জার পোতা তরোয়াল।" তিনি আর্থারকেও কিছু না বলে একেবারে মেলার মাঠে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর বাবাকে গিয়ে তরোয়ালখানি দেখিয়ে বললেন—"এই দেখুন সেই তরোয়াল। এখানা যখন আমি পেয়েছি, তখন আমারই সিংহাসন—আমিই রাজা।" একটারের কিন্তু ছেলের কথায় প্রত্যয় হল না। তিনি মাথা নেড়ে বললেন—"অসম্ভব, তুমি এটা কেমন করে পেয়েছ আমায় বল দেখি।" তখন কে' বাধ্য হয়ে স্বীকার করলেন যে তরোয়ালখানি তিনি নিজে আনেন নি,—আর্থার তাঁকে দিয়েছেন। আর্থার কোথায় ও কেমন করে পেয়েছেন তা তিনি জানেন না।

একটার বিরক্ত হয়ে বল্লেন—"তাই তুমি নিজেকে রাজা বলে জাহির করছিলে? আচ্ছা, আর্থারকে সঙ্গে করে আমার সঙ্গে গির্জ্জায় চলো।" গির্জ্জায় গিয়ে সেই তরোয়ালখানা আবার পাথরের ভেতর ঢুকিয়ে দিয়ে নিজের ছেলেকে টেনে বার করতে বললেন। কে' প্রাণপণ চেষ্টা করেও তা'কে তুলতে পারলেন না। কিন্তু আর্থার অতি সহজেই পূর্ব্বের মত তরোয়ালখানি টেনে তুললেন। চারিদিকে যত লোক এই অপূর্ব্ব ব্যাপার দেখছিল, জয়-ধ্বনি করে উঠলো। একটার ও তাঁর ছেলে হাঁটু পেতে তাঁকে রাজা বলে স্বীকার করলেন।

অল্পসময়ের মধ্যেই এই সংবাদ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল—দলে দলে লোক রাজাকে দেখতে এল। তা'রা আর্থারের সুন্দর চেহারা, বীরের গঠন আর নম্র স্বভাব দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল। তিনি ক্যামেলট্ সহরে সিংহাসনে বসলেন।

শ্রীমতি অমলা দেবী।



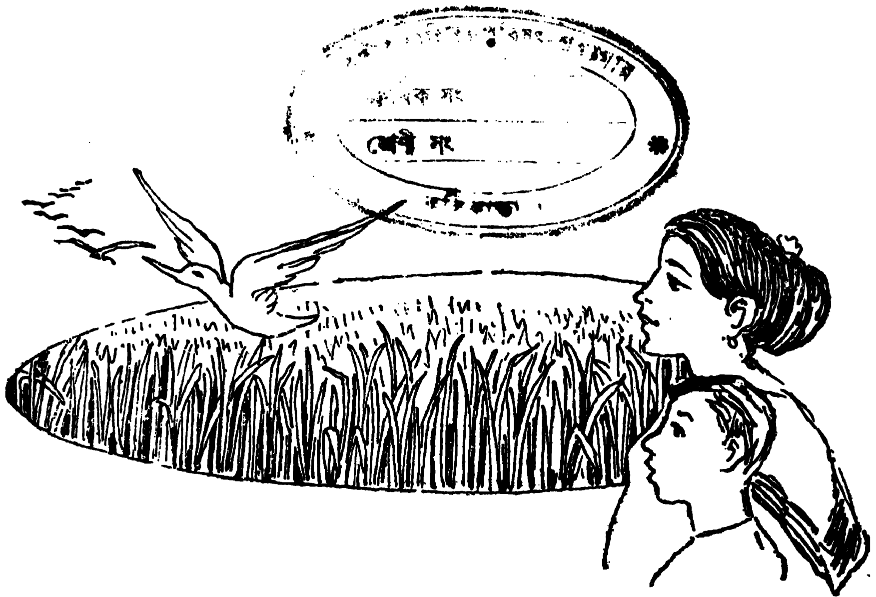
পরাজিতের সম্মান।

রোগা ছেলে আহা বহুদিন পরে
এসেছে করিতে খেলা,
সাথীদের সনে খেলার মাঠেতে
আজিকে বিকাল বেলা।
দেহটী এখনো হয়নি সবল
ঢাকেনি ক' হাড়গুলি,
তবু খেলা করে, হাসে ম্লান হাসি
অসুখের কথা ভুলি।
গাঁটা গোঁটা ছেলে দেখেছিনু তারে
শরীরে কতই বল,
অধর আঙ্গুর চুপ্‌সিয়ে গেছে
আঁখি দুটী ছলছল।

অপর দলের প্রধান খেলুড়ি
আসিয়াছে খেলা দিতে,
রোগা ছেলে গিয়া ধরিল তাহারে
পারে না যে সামালিতে।
সবল বালক পলায়ে গেল না
দম ছাড়ি গেল থামি',
সাধ করে সে যে ধরা দিল আহা
বুঝিনু কেবল আমি।
হার মেনে যবে জেতার নিকটে
দাড়ালো বালক হাসি
আমি আঁখিজল রোধিতে নারিনু
চুমা দিনু ভালবাসি।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

———



চুলের বিলাস :

দেবতাদের জন্য একগোছা চুল নিবেদিত করে রাখা প্রচীন গ্রীকদের মধে একটী প্রথা ছিল। কতকটা হিন্দুদের টিকি রাখার মত। মৃতব্যক্তি নরকে পৌঁছিলে যমরাজ প্লুটোর পত্নী প্রোজার্‌পাইন্‌ এটী তার মাথা থেকে কেটে নিতেন। কোন গ্রীক মরে গেলে তার একটী চুলের গোছা কেটে নিয়ে তার বাড়ীর সদর দরজার উপর ঝুলিয়ে রাখা হত! এতে লোকে বুঝতো যে সে বাড়ীতে কেউ মরেছে। রোম নগরে প্রাচীন কালে ভার্জিল্‌ নামে একজন মস্ত বড় কবি ছিলেন। তিনি ঈনিড্‌ নামে একখানি মহাকাব্য লিখে গেছেন। এই মহাকাব্যে রাণী ডাইডোর মৃত্যুবর্ণনা করতে গিয়ে ভার্জিল্‌ বলছেন যে, দেবতাদের দূত আইরিস্‌ এসে ডাইডোর পবিত্র কেশগুচ্ছ লক্ষ্য করে বলছেন,— 'আমার আদেশমত এই কেশগুচ্ছ ভক্তিভরে প্লুটোর কাছে নিয়ে যাও।'

তির্ব্বতের পূজারী লামারা মুমূর্ষুদের মাথা থেকে চুল কেটে নেয়, যাতে তাদের আত্মা স্বচ্ছন্দে মাথার উপর দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারে।

প্রচুর ঘন চুল থাকলে লোকে সুন্দর ও বীরপুরুষ বলে। চুল ও দাড়ি অনেক সময় ধর্ম্ম কার্য্যের জন্য রক্ষা করা হয়, যেমন 'বাবা তারকনাথের চুল।' প্রাচীন হিব্রুগণ নেড়া হওয়া বা কামানো দুঃখ ও অপমান সূচক মনে করত। মোয়াবপ্রদেশ ধ্বংস করবার ভবিষ্যদ্বাণী করে সাধু আইজায়া ও জেরিমায়া বললেন, 'সকলের মাথায় টাক * পড়বে ও সকলের দাড়িই ছেঁটে দেওয়া হবে।' খ্রীষ্টানদের ধর্ম্মগ্রন্থ বাইবেলে আছে যে প্রথম সৃষ্ট মানুষ আডাম্ বক্ষোবিলম্বিত দাড়ি নিয়েই জন্মেছিলেন। এই দাড়িরক্ষা করা ইহুদীগণের মধ্যে ধর্ম্মের একটী অঙ্গ। খামখেয়ালী দাঁড়ি ছোঁয়া তারা ব্যক্তিগত অপমান মনে করত। কেবল শিশুরা ও নিকটাত্মীয়েরাই আদর করে দাঁড়ি ছুঁতে পেত, আর দাড়ির কাছে কেউ হাত তুললে বোঝা হত যে সে অতিথি। এ ধর্ম্মভাবটী মুসলমানদের মধ্যেও আছে। তাদের ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহম্মদের দাড়িতে কখনও ক্ষুর স্পর্শ করেনি। টেকো মাথা দেখতে পেলেই আরব দেশের লোকেরা ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিয়ে প্রতিজ্ঞা করে বলত, 'আমি যদি এ কাজ করে থাকি ত ঈশ্বর যেন আমায় টেকো করে দেন।' প্রাচীন ব্যাবিলন্, আশিরিয়া ও পারস্যদেশে দাড়ির খুব কদর ছিল। পূর্ব্বতন নিনেভা নগরীর পুরুতেরা কোঁকড়ানো তেল-চুকচুকে দাড়ি রাখতেন। পারস্য দেশের রাজারা খুব ভাল করে দাড়ি আঁচড়ে সুবর্ণসূত্র দিয়ে তাহা বেঁধে রাখতেন। গ্রীকেরা বরাবরই দাড়ি রাখতো, কিন্তু মহাবীর আলেকজান্দার সমস্ত গ্রীক দেশে দখল করে সকলকে দাড়ি ফেলতে হুকুম দিলেন,

* টাকের শুদ্ধ ভাষা ইন্দ্রলুপ্ত।

কারণ লম্বা দাড়ি থাকলে এটা বাগিয়ে ধরে শত্রুর পক্ষে 'যুদ্ধং দেহি' বলা খুব সহজ। খৃঃ পূঃ ২৯০ পর্য্যন্ত রোমানগণ চুল ও দাড়ি দুই রাখতো। তারপর রোমানরাজ হাড্রিয়ানের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত (১১৭ খৃঃ অঃ) তারা দুইই ছেঁটে ফেলতো। রোমান সাম্রাজ্যের অবনতিকাল পর্য্যন্ত আবার তাদের চুল ও দাড়ি রাখবার সখ জেগে উঠলো। রোমান্ ইতিহাস-লেখক লিভির একটী উজ্জ্বল বর্ণনা থেকে দাড়ির সম্বন্ধে প্রাচীন রোমানগণের ধারণা বেশ বোঝা যায়। গ্যল্ দেশের লোকেরা রোম দখল করে সিনেট বা রাজপরিষদে ঢুকে দেখে যে, কিউরুল্ চেয়ারে মহা মহা রোমান্ ধুরন্ধরেরা বেশ গম্ভীরভাবেই বসে আছেন: প্রথমে এভাব দেখে বিজেতারা একটু দমে গেলেও শেষে একজন গ্যল্ সাহসে ভর করে একজন সিনেটারের দাড়িতে একটু আঘাত দেয়। তখনি সিনেটারটী নিজ প্রভুত্বপ্রকাশক হস্তিদন্তনির্ম্মিত একটী দণ্ড দ্বারা তাকে বেশ জখম করে দিলেন। তারপর সব সিনেটারেরাই অবশ্য নিহত হলেন।

উত্তর আমেরিকার আদিম অধিবাসীরা একে একে দাড়ির সব চুলগুলি উপড়ে ফেলাই সৌন্দর্য্য মনে করে। প্রাচীন ঈজিপ্টের অধিবাসীরা দাড়ি ও চুল দুইই কামাতো। চুলের প্রাচুর্য্য যে শারীরিক শক্তি প্রকাশক, সে ধারণা এখনও আছে। খ্রীষ্টানদের মধ্যে এই ধারণা শ্যাম্‌সনের গল্প থেকে বদ্ধমূল হয়েছে। শ্যামসন্ তার কুহকিনী পত্নী ডালিলার কাছে স্বীকারই করেছিল— 'আমার মাথার চুল কামিয়ে ফেল্‌লেই আমার সব শক্তি চলে যাবে, আমি সাধারণ লোকের মতই দুর্ব্বল হয়ে পড়বো'। ডালিলা তার চুলের সাতটী গোছা কেটে নেবার পর দুর্ব্বল শ্যামসনকে বন্দী ও অন্ধ করে ফেলা হলো। আবার নূতন চুল গজিয়ে উঠলে সে অনেক লোকপরিপূর্ণ একটী প্রকাণ্ড মন্দির একেবারে চূর্ণবিচূর্ণ করে ফেললে।

প্রাচীন জার্ম্মানরা বুড়ো বয়েস পর্য্যন্ত দাড়ি রাখতো। প্রথম ফ্রেডেরিক্ নামে মধ্যযুগের একজন জার্ম্মানরাজার নামই ছিল 'বারবারোসা (Barbarossa) অর্থাৎ ; 'রাঙা দাড়ি'। প্রাচীন ও নবীনযুগের মধ্যে চুল রাখা সম্বন্ধে অনেক ধারণাই একেবারে বদলে গেছে। মেয়েদের চুলের অনেক ফ্যাশানই ইতিমধ্যে দেশে বিস্তার লাভ করেছে। পুরাতন একদল ফরাসী রাজাদের মধ্যে লম্বা চুল রাখা রাজোচিত বলে মনে করা হত। শোণের নুড়ির মত তাঁদের স্বল্প কেশগুচ্ছ তাঁরা নানা ভঙ্গিমায় প্রসাধন করতেন। রাজাজ্ঞায় প্রজাদের মাথার পিছন দিকটা কামিয়ে ফেলতে হতে, আর সম্মুখের চুল আঁচড়ে পুচ্ছপ্রতিম একজোড়া গোঁফ রাখতে হতো। এ বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ বিখ্যাত ইংরাজ ইতিহাসলেখক গিবনের "রোমসাম্রাজ্যের অবনতি ও পতন" নামক ইংরাজী গ্রন্থে আছে।

ইংল্যাণ্ডের রাজারাণীদের মধ্যেও এই চুলের নানাবিকাশ দেখা যায়। ত্রয়োদশ শতাব্দীর একটী চিত্র থেকে দেখা যায় যে, প্রথম রিচার্ড্ ও কাস্তিলের রাজ কন্যা ইলিয়ানর খুব দীর্ঘ তরঙ্গায়িত চুল রেখেছেন। এই শতাব্দীর শেষে রমণীর কেশগুচ্ছ সোনা ও রূপার বিচিত্র জালে আবদ্ধ রাখা হত। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে সপ্তম হেনরীর পত্নী এলিজাবেথ্ তেকোনা একটা শিরোভূষণ পরতেন, তার ভিতর থেকে চুলের রাশ বিচিত্র সাপের মত কণ্ঠে বক্ষে ছড়িয়ে পড়ত। দ্বিতীয় চার্লসের সময় মুক্তামর শিরোভূষণ দিয়ে কোঁকড়ানো চুল আটকে রাখা হত। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এক বিচিত্র ফ্যাশান্ আমদানি হলো। চুলকে কুঁকড়ে ফেলে মাথার উপর চূড়া করে বেঁধে তাতে কাঁটা, ফিতে, পমেটম্, ও পাউডারে আচ্ছন্ন করে রাখা হত। কেশপ্রসাধনের জন্য রীতিমত একদল কারিকর ছিল ; তারা কাজের তাড়ায় একটুও ফুরসৎ

পেতো না। সৌখীন মেয়েরা কোনও নিমন্ত্রণে যাবার দু'তিন দিন আগে হতেই এই রকম করে' চুল বেঁধে বসে থাকতেন। তাতে করে' রাত্রে বিছানায় গিয়ে শোবার যো ছিল না,—চেয়ারে দীর্ঘভাবে বসে' সমস্তরাত কাটাতে হত। ফ্যাশানের কি যন্ত্রণা!

প্রথম চার্লসের সঙ্গে যখন পার্লামেণ্টের যুদ্ধ বাঁধলো, তখন রাজার দলেরা লম্বা চুল রাখলে, তার নাম হলো 'প্রেমের কুন্তল' (love-locks); আর বিপক্ষ দলের (তাদের নাম round heads বা গোল মাথা) চুল একেবারে কদম-ফুল করে ছেঁটে ফেললে। টাক ঢাকবার জন্য পরচুলো ব্যবহার অনেকদিনই ইংল্যাণ্ডে প্রচলিত ছিল। ব্রিটিশ মিউজিয়ম বা বিলাতের যাদুঘরে মিশর দেশের একটা পরচুলো আছে, সেটা চার হাজার বছরের পুরানো। ইংরেজ জজ্ ও ব্যারিষ্টারেরা এখনও পরচুলো ব্যবহার করেন।

চুলে পাউডার মাখানো ইংলণ্ড্ ও ফ্রান্সে অষ্টাদশ শতাব্দীর একটা বিখ্যাত ফ্যাশান্। শ্বেতসারের সঙ্গে ভায়োলেট বা আর কোনও সুগন্ধি মিশিয়ে এই চূর্ণ প্রস্তুত করা হতো। শ্বেতসার ছাড়া আর কোনও চূর্ণ যাতে ব্যবহার করা না হয় তার জন্য আবার একটা আইন প্রচারিত হয়েছিল। ১৭৯৫ খৃষ্টব্দে এই চুলের পাউডারের উপর ইংল্যাণ্ডে একটা টেক্সই বসানো হলো।

দাড়ির সম্বন্ধে রাজারাজড়ারা অনেক খেয়াল দেখিয়ে গেছেন। প্রথম চার্লসের যে চাঁছাছোলা দাড়ি ছিল, তার নাম 'ভ্যান-ডাইক দাড়ি।' স্পেন্ দেশেও অনেকদিন লম্বা দাড়ির কদর ছিল। পর্ত্তুগিজ্ আদ্‌মিরাল্ জুয়ান্ দে কাস্‌ত্রো যখন গোয়া নগরী থেকে একটা শুল্ক তুললেন, তখন সেখানকার মিউনিসিপালিটিতে তিনি নিজ গোঁফের কয়েক গাছি চুল উপহার দিয়ে বললেন, 'আমার শক্তির চিহ্ন স্বরূপ এই অলঙ্কারের সঙ্গে পৃথিবীর সমস্ত সোনাও তুলিত

হতে পারে না। ইওহান মেয়ো (Johan Mayo) নামক একজন জার্ম্মান্ চিত্রকরের দাড়ি এত লম্বা ছিল যে তিনি দাঁড়ালে ইহা ভূমিতলে লুঠিয়ে পড়তো; তাই তিনি চলাফেরার সুবিধার জন্য এই সুদীর্ঘ দাড়িটী কোমরবন্ধের মত কটিতটে জড়িয়ে রাখ্‌তেন।

শ্রীমোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায়।

আদর।

আমার তনু নীলি তোরা যুগল মাণিক পারা,
আলাদীনের প্রদীপ তোরা চন্দ্র সূর্য্য তারা।
ধন্বন্তরীর সুধা তোরা সাগর সেঁচা ধন,
রমা মায়ের কনক নূপুর কর্ণ বিনোদন!
আমার ঘরের পিক-পাপিয়া মুরজ বীণাবেনু,
আমার দুঃখ-মন্দাকিনী-তটের স্বর্ণ রেণু!
আমার জীবন পাথার পরে তোরা আলোক-কেতু,
আমার ধর্ম্ম মোক্ষ তোরা—পরকালের সেতু।
পারিজাতের কুঁড়ি তোরা স্বর্গ সুরের রেশ,
আমার প্রাণের প্রাণটী তোরা আদি মধ্য শেষ।

শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়।



জয়মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত।

(বারমেসে)

(শ্রীমন্ত সওদাগর)

(কার্ত্তিক মাস)

[সুপরিচিত লেখক যতীন্দ্রনাথ পাল "আমার দেশে"র পাঠক-পাঠিকাগণকে ব্রত কথা শুনাইতেন। সম্প্রতি যতীন্দ্রনাথ ধরাধাম ত্যাগ করিয়াছেন—আর নূতন নূতন তাঁর লেখা কোন জিনিষই আমার তোমাদের উপহার দিতে পারিব না। তোমাদের মধ্যে যারা সমস্ত ব্রতকথা একত্রে পড়িতে চাও—যতীন বাবুর "ব্রত পার্ব্বণ" এক খণ্ড আমাদের এখান হইতে কিনিতে পার। সম্পাদক।]

উজ্জয়িনী নামে ভারতবর্ষে একটা দেশ আছে। সেই দেশে এক সওদাগর ছিলেন,—তাঁর নাম ধনপতি। ধনপতি সওদাগরের ধন দৌলতের অভাব ছিল না। কিন্তু তাঁর কোন সন্তান না থাকায় তাঁর মনে এতটুকুও সুখ ছিল

না। ধনপতি সওদাগরের দুই স্ত্রী। বড়টীর নাম লহনা,—ছোটটির নাম খুল্লনা। দুই সতীনে বড় মিল। পরস্পর পরস্পরকে একদণ্ড না দেখ্‌লে থাক্‌তে পারেন না। দুই সতীনে প্রতি মঙ্গলবারে মঙ্গলচণ্ডীর পূজো করেন, —পূজো শেষ হ'লে উভয়ে কামনা করেন আমাদের দু'জনের মধ্যে যার হ'ক একটী সন্তান হ'ক্। তাঁদের পূজোয় মঙ্গলচণ্ডী সদয় হ'লেন। ধনপতির ছোট স্ত্রী খুল্লনার গর্ভ হ'লো। খুল্লনার গর্ভ হ'য়েছে দেখে লহনার আর আনন্দ ধরে না। মা মঙ্গলচণ্ডীর কৃপায় খুল্লনার যে গর্ভ হ'য়েছে তা বুঝ্‌তে দু'সতীনের বিলম্ব হ'লো না। তাঁরা আরো প্রাণ দিয়ে মঙ্গলচণ্ডীর পূজো কর্ত্তে লাগ্‌লেন। গর্ভ হ'বার সঙ্গে সঙ্গে খুল্লনার দেহে লাবণ্য ফুটে উঠ্‌লো —দেখ্‌তে দেখ্‌তে ছ'মাস কেটে গেল। ধনপতি সওদাগর বাণিজ্যের জন্যে মাঝে মাঝে বিদেশে যেতেন। তিনি হ'লেন সওদাগর, তাঁর বাণিজ্য না কল্লে কি আর চলে? সেই সময় তিনি একবার সিংহলে যাবেন, স্থির কল্লেন। সাত নৌকা বোঝাই করে—ধনপতি সওদাগর সিংহলে যাবার জন্যে প্রস্তুত হ'লেন।

সেদিন মঙ্গলবার—দিন ভালো—ধনপতি সওদাগর সিংহলে যাবেন। লহনা স্বামীর যাবার সময় তাড়াতাড়ি এসে স্বামীর পায়ের ধূলো নিলেন। কিন্তু খুল্লনাকে না দেখে ধনপতি জিজ্ঞাসা কল্লেন,—"ছোটবৌ কোথায়?"

খুল্লনা তখন মঙ্গলচণ্ডীর পূজো কচ্ছিলেন। লহনা স্বামীকে সেই কথা বল্‌লেন। ধনপতি তো তাই শুনে রেগে আগুন। আমি তার স্বামী—আমি যাচ্ছি বিদেশে বাণিজ্য কর্ত্তে—কোথায় সে ছুটে এসে আমার সঙ্গে দেখা কর্ব্বে, তা না মঙ্গলচণ্ডীর পূজো কচ্ছে?" ধনপতি সওদাগর রাগে গরগর কর্ত্তে কর্ত্তে খুল্লনা যেখানে মঙ্গলচণ্ডীর পূজো কচ্ছিলেন সেইখানে গিয়ে উপস্থিত

এবং কাউকে কোন কথা না বলে লাথি মেরে মঙ্গলচণ্ডীর ভাঁড় ভেঙ্গে ফেলে দিলেন। লহনা কি কর-কি কর বলে' স্বামীকে বাধা দিতে গেলেন—কিন্তু বাধা দিতে পাল্লেন না। মঙ্গলচণ্ডীর ভাঁড় ভেঙ্গে ঘরময় ছড়িয়ে পড়লো। ধনপতির ওপর মঙ্গলচণ্ডীর কোপদৃষ্টি পড়লো। ধনপতি খুল্লনাকে একটীও কথা না বলে সিংহলে বাণিজ্য কর্ত্তে চলে গেলেন।

মাসের পর মাস কেটে যেতে লাগল—খুল্লনার একটী ছেলে হ'লো। দেখে দু'সতীনের প্রাণ জুড়িয়ে গেল। খুল্লনা ছেলেটী প্রসব কল্লেন বটে—কিন্তু লহনাই কোলে পিঠে করে ছেলেটীকে মানুষ কর্ত্তে লাগলেন। ছেলেটীর নাম রাখলেন তাঁরা—শ্রীমন্ত। শ্রীমন্ত ক্রমে একবছর দু'বছর করে পাঁচ বছরের হ'লো। কিন্তু তবুও ধনপতি সওদাগর ফির্‌লেন না। লহনা খুল্লনা স্ত্রীলোক তাঁরা আর কি কর্ব্বেন—তবুও যতদূর পাল্লেন, স্বামীর সন্ধান কর্ত্তে লাগলেন। ধনপতি সওদাগরের কোন সন্ধানই মিল্‌লো না। সকলেই বল্লে —ধনপতি সওদাগর সমুদ্রে নৌকা ডুবি হয়ে মারা গেছেন।

লহনা আর খুল্লনা স্বামীর জন্যে চোখের জল ফেলেন আর ছেলেটীকে বুকের ভেতর করে মানুষ করেন। শ্রীমন্তের পাঁচ বছর বয়স হ'লে তাঁরা তার হাতে খড়ি দিলেন। তার পর থেকে শ্রীমন্ত পাঠশালায় যেতে আরম্ভ কল্লে। পাঠশালার গুরুমশাই শ্রীমন্তের স্মরণশক্তি দেখে অবাক হ'য়ে গেলেন। অন্য ছেলেরা যা শেখে একমাসে, শ্রীমন্ত একদিনে তা শেখে। এইভাবে আর সাত বছর কেটে গেল, শ্রীমন্ত বার বছরে পড়লো। বার বছর বয়সেই শ্রীমন্ত মস্ত পণ্ডিত হয়ে উঠলো। তাই দেখে তার সহপাঠি ছেলেরা হিংসায় জ্বলে যেতে লাগল। তারা শ্রীমন্তকে পাঠশালা থেকে তাড়াবার জন্যে মনে মনে এক মতলব স্থির করলে।

ছেলেটাকে পাঠশালে পাঠিয়ে দিয়ে দুই সতীনে পথের পানে চেয়ে থাক্‌তেন। সেদিনও তেমনি পথপানে চেয়ে বসে ছিলেন,—সেই সময় শ্রীমন্ত কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বাড়ী ফিরে এলো। ছেলের চোখে জল দেখে দুই সতীনের প্রাণ ফেটে গেল। আকুল হয়ে তাঁরা জিজ্ঞাসা কর্ত্তে লাগলেন,—"বাবা কি হ'য়েছে—গুরুমশাই কি তোমায় মেরেছেন—তুমি কি বাবা পড়া বল্‌তে পারোনি ?"

শ্রীমন্ত কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বল্লে,—"না মা! গুরুমশাই আমায় কিছু বলেন নি। আজ আমার পাঠশালার ছেলেরা আমায় বড় অপমান করেছে। মা! আমায় সত্যি করে বলো—আমার বাবা কোথায়—তাঁর নাম কি ?"

লহনা ছেলের চোখের জল মুছিয়ে দিতে দিতে বল্‌লেন,—"বাবা—এখন পাঠশালা থেকে এলে, খাও দাও, তারপর তোমায় সব কথা বল্‌বো এখন।"

কিন্তু শ্রীমন্ত তার বাবা কোথায় এবং তার নাম কি না শুনে কিছুই খাবে না বল্‌লে—তখন আর লহনা কি করেন! কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে ছেলের কাছে আগাগোড়া সব কথা খুলে বল্‌লেন। মার সব কথা শুনে শ্রীমন্ত বল্ল,—"মা আমি কালই সিংহলে যাব। আমি তাঁর ছেলে—আমার আর একদিনও নিশ্চিন্ত হ'য়ে বসে থাকা উচিত নয়—যতদূর সম্ভব তাঁর খোঁজ করা উচিত।"

লহনা খুল্লনা ছেলেকে অনেক বুঝালেন—সিংহল সে অনেক দূর—সমুদ্র—পার হয়ে যেতে হয়—সমুদ্রে অনেক বিপদ। তুমি দুধের ছেলে কেমন করে সিংহল যাবে? এই সব। কিন্তু শ্রীমন্ত কোন কথা শুন্‌লে না। সে বল্লে, "মা তোমরা যদি আমায় সিংহলে যেতে না দাও তাহ'লে আমি জল টুকু পর্য্যন্ত খাব না।"

তখন লহনা খুল্লনা কি করেন। তাঁদের বিশ্বাসী মাঝিকে সাতখানি নৌকা সাজাতে বল্লেন। নৌকা প্রস্তুত হ'লে শ্রীমন্ত দুই মায়ের পায়ের ধুলো মাথায়



বাবা, যদি কখন বিপদে পড়……

নিয়ে নৌকায় উঠলেন। যাবার সময় মা মঙ্গলচণ্ডীর ফুল ছেলেকে দিয়ে বলে দিলেন,—"বাবা যদি কখন বিপদে পড়, মা মঙ্গলচণ্ডীকে ডেক, তাহ'লে আর তোমার কোন বিপদ থাক্‌বে না।"

শুভক্ষণে দুই মায়ের পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে মা মঙ্গলচণ্ডীর নাম স্মরণ করে শ্রীমন্ত সিংহল যাত্রা কল্লে। সুবাতাসে নৌকা সাতখানি নাচ্‌তে নাচ্‌তে ভেসে চলে গেল।

একমাস যায় দু'মাস যায়, নৌকা ক্রমাগতই চলেছে। কত নদ নদী পার হয়ে শ্রীমন্তের নৌকা সাতখানি সমুদ্রে এসে পড়লো। সমুদ্র দিয়ে যেতে যেতে একদিন আকাশে মেঘ করে উঠলো—সাঁই সাঁই করে ঝড় চারিদিকে মাতা-মাতি আরম্ভ করে দিলে—সমুদ্র গর্জ্জন কর্ত্তে লাগল। নৌকা ডোবে আর কি! মাঝি মাল্লারা হাল ছেড়ে দিলে। আর রক্ষার কোন উপায় নেই। এই মহা বিপদে পড়ে শ্রীমন্তর মায়েদের কথা মনে পড়লো। সে আকুল হয়ে এ বিপদ থেকে উদ্ধার করবার জন্যে মা মঙ্গলচণ্ডীকে ডাক্‌তে লাগল। শ্রীমন্তের ডাকে মা মঙ্গলচণ্ডীর আসন নড়্‌লো। মার কৃপায় ঝড় থেমে গেল—সমুদ্র পূর্ব্বের মত শান্ত হ'লো। আবার নৌকাগুলি যেমন চল্‌ছিল তেমনি চলতে লাগ্‌লো। সিংহলের আর বেশী দূর নেই—আর এক দিন গেলেই সিংহলে পৌছোন যাবে। শ্রীমন্তের আনন্দ ধরে না—আর একদিন পরেই তার জন্ম সার্থক হবে—সে তার বাপের সন্ধান পাবে। সেদিন শ্রীমন্ত নৌকার বাহিরে বসেছিল,—হঠাৎ সে দেখ্‌লে—সমুদ্রের মাঝখানে একটী পদ্ম ফুটে রয়েছে। সেই পদ্মের উপর একটী দেবীর মত সুন্দর মেয়ে মানুষ বসে আছেন। তিনি একটী হাতীর শুঁড় ধরে একবার গিলছেন আবার উখরে ফেল্‌ছেন। এই দেখে শ্রীমন্তের বড় আশ্চর্য্য বোধ হলো। তার প্রাণ যেন তাকে বলে দিলে

এই মা মঙ্গলচণ্ডী—এঁরই কৃপায় সে সকল বিপদ থেকে উদ্ধার হয়ে এসেছে। এই কথা যেমন তার মনে হ'লো অমনি সে,—মা মঙ্গলচণ্ডী—মা মঙ্গলচণ্ডী বলে আকুল হয়ে ডেকে উঠলো। এদিকে নৌকাও ততক্ষণে সুবাতাসে অনেক দূর চলে এল।

দেখতে দেখতে সে দিনটাও কেটে গেল—শ্রীমন্তের নৌকা সাতখানি সিংহলে এসে পৌঁছোল; শ্রীমন্ত মা মঙ্গলচণ্ডীর নাম স্মরণ করে রাজার সঙ্গে দেখা কর্ত্তে গেল। সিংহলের রাজা তখন গৃহে বসেছিলেন। শ্রীমন্ত সেই সভায় গিয়ে উপস্থিত হ'লো। শ্রীমন্তের চেহারা দেখে রাজার আপনা হ'তেই শ্রীমন্তের ওপর কেমন স্নেহ হ'লো—তিনি তাকে পাশে ডেকে বসিয়ে একে-একে তার পরিচয় নিতে লাগলেন। শ্রীমন্ত রাজাকে একে একে তার পরিচয় দিয়ে বল্লে,—মহারাজ—আমি সমুদ্র দিয়ে আসতে আসতে এক অদ্ভুত জিনিস দেখেছি। সমুদ্রের ভিতর দেখলুম একটা পরমাসুন্দরী স্ত্রীলোক একটা পদ্মের ওপর বসে একটি হাতীর শুঁড় ধরে একবার গিলছেন—আবার একবার উগ্‌রে ফেলছেন।"

শ্রীমন্তের এই কথা শুনে রাজা একেবারে চটে আগুন হ'লেন। গর্জ্জন করে বল্লেন—আমি ভেবেছিলুম এ ছেলেটা সরল—এটাও দেখছি মিথ্যাবাদী।

শ্রীমন্ত রাজার কথা কিছুই বুঝতে পাল্লে না—হাঁ করে রাজার মুখের দিকে চেয়ে রইল। রাজা শ্রীমন্তকে তিরস্কার করে জিজ্ঞাসা কল্লে,—"চলো, তুমি আমাকে সেই অদ্ভুত জিনিষ দেখাতে পারো?"

শ্রীমন্ত সরল মনে উত্তর দিল,—"মহারাজ, কেন দেখাতে পার্ব্বো না! আমি এইমাত্র দেখে এলুম—নিশ্চয়ই দেখাতে পার্ব্বো। চলুন আমার সঙ্গে সমুদ্রের কূলে, আপনি এখনি তা স্বচক্ষে দেখতে পাবেন।"

রাজা আর কাল বিলম্ব কল্লেন না,—তখনি সব সভাসদগণকে নিয়ে শ্রীমন্তের সঙ্গে সমুদ্রের কূলে গিয়ে উপস্থিত হ'লেন। কিন্তু সমুদ্রের কূলে এসে শ্রীমন্ত দেখলে কোথায়ও কিছু নেই। সমুদ্র ঢেউয়ের উপর ঢেউ তুলে মহা গর্জ্জন কর্চ্ছে। রাজা কমলেকামিনী না দেখতে পেয়ে রেগে তখনি জহ্লাদকে হুকুম দিলেন,—"এই মিথ্যাবাদী ছেলেটাকে এখনি মশানে নিয়ে গিয়ে শিরচ্ছেদ কর।"

জহ্লাদ শ্রীমন্তকে টান্তে টান্তে শ্মশানে নিয়ে গেল। শ্রীমন্ত মশানে গিয়ে মা মঙ্গলচণ্ডীকে কাঁদ্তে কাঁদ্তে ডাকৃতে লাগলো। শ্রীমন্তের কান্নায় আবার মা মঙ্গলচণ্ডীর আসন টল্ল। তিনি একটি থুড়্থুড়ে বুড়ী বেশে মশানে এসে উপস্থিত হ'লেন ও শ্রীমন্তকে কোলে নিয়ে বস্লেন। জল্লাদ বুড়ীটাকে তাড়িয়ে দিতে গেল কিন্তু বুড়ী এমনি হুঙ্কার দিয়ে উঠ্লো—যে তার হাতের খাঁড়া খসে পড়ে গেল—সে ভয়ে কাঁপ্তে কাঁপ্তে রাজাকে গিয়ে খপর দিলে। খপর পেয়ে রেগে সমস্ত সৈন্য সামন্ত নিয়ে রাজা মশানে এসে হাজির হ'লেন। তখনি বুড়ি আবার একটা হুঙ্কার দিয়ে উঠ্লো! সঙ্গে সঙ্গে রাজার সৈন্য সামন্ত অজ্ঞান হয়ে পড়্লো। রাজা তখন ভয় পেয়ে বুড়ীর অনেক স্তুতি কর্ত্তে লাগলেন। রাজার স্তবে যা মঙ্গলচণ্ডী সন্তুষ্ট হ'য়ে বল্লেন,—"রাজা তুই বিনা অপরাধে আমার এই ছেলেকে মশানে বধ কর্ত্তে পাঠিয়েছিস কেন ?"

রাজা ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে হাত জোড় করে বল্লেন,—"মা আমার কোন অপরাধ নেই। আপনার এই ছেলে আমাকে মিথ্যা কথা বলেছে।"

বুড়ী হুঙ্কার দিয়ে বল্লেন,—"না আমার ছেলে কখন মিথ্যা কথা বলেনা। তুই মহা পাপী তাই তুই কমলে-কামিনী দেখতে পাস্নি। যদি ভাল চাস

তো এখনি আমার ছেলেকে মুক্ত করে তোর মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দে। আর এর বাবা ধনপতি সওদাগর—তার সাত নৌকা ধন নিয়ে তাকে তুই কারাগারে বন্দী করে রেখেছিস—এখনি চৌদ্দ নৌকা ধন দিয়ে তাকে মুক্ত করে দে। নইলে তোর বংশে বাতি দিতেও একজন রাখবো না।"

রাজা তখন ভয়ে ভয়ে তখনি তা'তে সম্মত হ'লেন। বল্লেন,—"মা তুমি যা বল্‌ছ তা আমি সমস্তই এই দণ্ডেই কচ্ছি—তবে অনুগ্রহ করে আমায় একবার কমলেকামিনী মূর্ত্তিটা দেখাও।"

মা মঙ্গলচণ্ডীর রাজার উপর দয়া হ'লো। তিনি রাজাকে বল্লেন,—"যা এইবার তুই সমুদ্রের মুখে গেলে কমলে কামিনী মূর্ত্তি দেখ্‌তে পাবি।"

মা মঙ্গলচণ্ডী এই বলে অন্তর্দ্ধান হয়ে গেলেন। রাজা শ্রীমন্তকে সঙ্গে নিয়ে তখনি ছুটে সমুদ্রের মুখে গেলেন; এবার তিনি কমলে-কামিনী মূর্ত্তি দেখতে পেলেন—তাঁর জন্ম সার্থক হয়ে গেল। রাজা ফিরে এসে তখনই ধনপতি সওদাগরকে মুক্ত করে আন্‌লেন। সেই সঙ্গে অন্য যে সব বন্দী ছিল তারাও মুক্ত হ'লো! সবাই শ্রীমন্তকে ধন্য ধন্য কর্ত্তে লাগলো। রাজা তাঁর অপরাধের জন্য ধনপতি সওদাগরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কল্লেন। ধনপতি সওদাগর আগাগোড়া শুনে ছেলেকে কোলে তুলে নিলেন। বাপ ব্যাটায় পরিচয় হলে তারপর ধুমধামের সহিত শ্রীমন্তের সঙ্গে রাজা তাঁর মেয়ের বিয়ে দিলেন। ধনপতি সওদাগরে একশ' নৌকা ধন বোঝাই করে ছেলে বৌ নিয়ে দেশে যাত্রা কল্লেন।

লহনা খুল্লনা ছেলের মঙ্গল কামনায় প্রতি মঙ্গলবার মঙ্গলচণ্ডীর পূজো করেন। চণ্ডীর কৃপায় স্বামী পুত্র ঘরে ফিরে এলো। তাঁরা একজন ছেলেকে একজন বৌকে বরণ করে ঘরে তুল্‌লেন। বাড়ীতে ধনপতি সওদাগর মহা

ধূমধাম করে মঙ্গলচণ্ডীর পূজা দিলেন। তাঁদের ধন ঐশ্বর্য্যের আর কোন অভাব রইল না। সেই থেকে মঙ্গলচণ্ডীর পূজো বারমাস ঘরে ঘরে প্রচার হ'লো।

মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত করে যেইজন।
পুত্রহীনা হ'লে পায় পুত্র মহা ধন ॥
ভক্তিভরে চণ্ডী পূজা যেইজন করে।
অন্নপূর্ণা হয়ে চণ্ডী থাকে তার ঘরে ॥









"বিনোদের দেশসেবা"

বিনোদলাল বড় গরীবের ছেলে—তার মা পাড়ায় পাড়ায় মুড়ী বেচিয়া কোনওরূপে কায়ক্লেশে দিন চালায়। বিনোদ মায়ের একমাত্র ছেলে, সহরের এক কোণে একখানা খোলার ঘরে মায় পোয়ে দিন যাপন করে। এত কষ্টেও বিধবা মা তাকে নিকটবর্ত্তী স্কুলে ভর্ত্তি করে দিয়েছে, বিধবার আশা বিনোদ লেখা পড়া শিখে মানুষ হ'বে—মা'র দুঃখ ঘোচাবে। বিনোদ ও কখনও ভুলে যেত না—যে তাকে লেখাপড়া শিখ্‌তেই হ'বে—মানুষ হ'তেই হ'বে।—কাজেই স্কুলে শ্রেণীর মধ্যে সে ছিল ভাল ছেলে—হেড্‌মাষ্টার ম'শায় তার অবস্থা জান্‌তেন—ফ্রি পড়াতেন।—একদিন সকালে বিনোদ তার মার কুঁড়েখানির দাওয়ায় বসে—স্কুলের পড়া মুখস্থ কচ্চে—এমন সময় দেখ্‌লে—একদল লোক—ছেলে, বুড়, সবরকমেরই লোক তার মধ্যে আছে—নিশান নিয়ে—স্বদেশী গান গাইতে গাইতে তার কুড়েখানির সামনে দিয়ে যাচ্চে—সে ছুটে গিয়ে তাদের মধ্যে একজনকে জিজ্ঞাসা কল্লে—"আপনারা কারা"—

"আমরা স্বদেশী ভলান্টিয়ার—জান না খোকা বাঙ্গলা দেশটায় বন্যায় বন্যায়

হয়ে গিয়েছে আজ এখানে বন্যা কাল সেখানে বন্যা—তাই আমরা সেই বন্যা-পীড়িত লোকদের সাহায্যের জন্য পথে পথে মার নাম গেয়ে ভিক্ষা করচি—যে স্বদেশী হ'বে—যার দেশের জন্য প্রাণ কাঁদবে—যার দেশের জন্য কাজ করবার ইচ্ছে হ'বে সে যা'দেবে তাই আমরা আগ্রহ ভরে নেব।"

বিনোদলালের চো'খ ছল ছল করে উঠল—এই ভলান্টিয়ার দলের প্রতি শ্রদ্ধায় তার প্রাণ পূরে গেল—সে ছুটে মার কাছে গেল—কিন্তু হঠাৎ মনে হ'লো ঘরে ত একটীও পয়সা দূরে থাক্ কানাকড়িও একটা নেই।—যে কয়টী পয়সা মা কাল পেয়েছিল—তা দিয়ে মুড়ীর চা'ল কেনা হয়েচে—সে গুলি আজ ভেজে তবে কালকের খাবার সংস্থান ও কালকের চা'ল কেনবার পয়সার যোগাড় হ'বে। বিনোদের চোখ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল—হায়—সে গরীব বিধবার সন্তান—নিঃস্ব সে, তার দেশের জন্য বন্যাপীড়িত ভাইদের জন্য একটী পয়সাও দিতে পারল না—দুঃখে বেদনায়—তার চোখ ফেটে অশ্রুধারা ঝরতে লাগল।

মা—পুত্রের চোখে অশ্রু দেখে সন্তানের প্রাণে সান্ত্বনা দেবার জন্য বললেন —"বড় হও বাছা—লেখাপড়া শিখে মানুষ হও—তারপর দেশের কাজ করো।"

১২ বৎসর বয়স্ক বালক পুত্র মার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—"মা কতদিনে বড় হ'ব? কতদিনে দেশের কাজ কর্ত্তে পারব।"

মাতা পুত্রের মুখ চুম্বন করিয়া বলিলেন "বাছা দেশের জন্যে যেন এইরূপই তোমার প্রাণ কাঁদে—দেশের কাজের জন্য যেন তোমার এই রকম আগ্রহই চিরকাল থাকে—আর ভগবান ইচ্ছে করলে তুমি এখন থেকেই দেশের জন্য কিছু না কিছু কর্ত্তে পারবেই। এক মনে দেশের কথা ভাব, ভগবান আপনিই

তোমায় পথ দেখিয়ে দেবেন্—গরীব বিধবার সন্তান তুমি ভগবান ছাড়া আর যে তোমার উপায় নেই বাপ্।"

মার এই কথায় বিনোদের প্রাণে সেই থেকে এক চিন্তা হ'ল—কি ক'রে দেশের সামান্য উপকারও আমার দ্বারা হ'বে—কি করে, বন্যাপীড়িত ভাইদের আমার যথাসাধ্য—শক্তি দিয়ে সাহায্য কর্ব্ব ? এখন থেকে এই হল—বিনোদলালের ধ্যান—চিন্তা, বিনোদ প্রত্যহ স্কুলে আসে যায়—পথে আসতে যেতে তার এক চিন্তা, সেই কি ক'রে তাহার সামান্য শক্তি দেশের কাজে নিয়োজিত কর্ব্বে। হঠাৎ একদিন তার মনে এক খেয়াল চাপ্‌ল—তার স্কুলের যাবার পথে দু'ধারে কতকগুলি কাপাস তুলোর দোকান আছে, সেই সব দোকানের সামনে রাশি রাশি তূলা পড়িয়াছে--রাস্তায় উড়িতেছে—সে প্রত্যহ ঐ স্থান হইতে তূলা সংগ্রহ করিয়া আনিতে আরম্ভ করিল। এইরূপে প্রত্যহ স্কুল হইতে আসিবার সময় কোঁচড়ে করিয়া তূলা আনিয়া অনেক তূলা সংগ্রহ করিল। এখন তাহার চিন্তা কি করিয়া ঐ তূলাগুলির দ্বারা সূতা প্রস্তুত করে। একদিন পথে একখানি হ্যাণ্ডবিল কুড়াইয়া পাইল, তাহাতে লেখা আছে—"অমুক ঠিকানায় প্রত্যহ সন্ধ্যার পর শিক্ষার্থীগণকে বিনামূল্যে চরকা শিক্ষা দেওয়া হয়।

সেই দিনই মাকে বলিয়া সে সন্ধ্যার পর চরকার অবৈতনিক বিদ্যালয়ে যাইতে লাগিল। এইরূপ আগ্রহে—সে অল্প সময়ের মধ্যে খুব সরু সূতা প্রস্তুত করিতে শিখিল এবং তাহার সংগৃহীত তূলা দ্বারা প্রচুর সূতা প্রস্তুত করিল। চরকা বিদ্যালয়ের শিক্ষক তাহার একান্ত আগ্রহ ও অসামান্য যত্ন দেখিয়া তাহাকে তাঁত বয়ণ শিক্ষা দিতে লাগিলেন। অল্প দিনের মধ্যে বিনোদলাল তাঁত বয়ন প্রণালী আয়ত্ব করিয়া ফেলিল।

বিনোদের আজকাল অবসর খুবই কম। সকালে উঠিয়া বিদ্যালয়ের পাঠ অভ্যাস করিতে হয়—নিয়মিত সময়ে বিদ্যালয়ে যাইতে হয়—বিদ্যালয়ের পরে প্রায় দুই ক্রোশ রাস্তা হাঁটিয়া বালক চরকা শিখিতে যায় এবং অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত সেখানে চরকা ও তাঁত অভ্যাস করিয়া বাড়ী আসে। ইহাতে তাহার শ্রান্তি নেই—ক্লান্তি নেই—অবসাদ নেই—প্রত্যহই সে খুব উৎসাহের সহিত তাঁত ও চরকা শিক্ষা করে, তাহার মনে এক চিন্তা—মহাত্মা বলিয়াছেন—ইহাতেই দেশের কাজ হইবে। ১২ বৎসর বয়স্ক নিঃস্ব বিধবার সন্তান—মহাত্মার আদেশ পালন করিতে অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে লাগিল—অল্পদিনের মধ্যে বিনোদলাল তাহার সংগৃহীত তূলার সূতায় দুই জোড়া উৎকৃষ্ট খদ্দর প্রস্তুত করিল এবং তাহার মধ্য হইতে প্রথম জোড়া আনিয়া মায় পদতলে রাখিয়া বলিল—"মা—আজ তোমাকে আমার নিজের হাতের তৈয়িরি সূতায় নিজের হাতে বোনা খদ্দর পরিয়ে আমার জীবন সার্থক করব।" আহ্লাদে মার প্রাণ গলিয়া গেল, আদরে পুত্রের শিরে আশীষ চুম্বন অঙ্কিত করিলেন, পুত্রের প্রাণ বিজয়োল্লাসে গর্ব্বে, ভরিয়া উঠিল। আজ বোধ হয় একটা সাম্রাজ্য জয় করিয়া আসিলেও—কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও উচ্চ পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইলেও সে এত আনন্দ অনুভব করিত না—

* * * * * *

খদ্দরের মেলায় সভাপতি মহাশয় গুণানুসারে পুরস্কার বণ্টন করিতেছেন—প্রথম পুরস্কারের অধিকারীর ডাক পড়িল। ভিড়ের মধ্য হইতে হেট মুণ্ডে একটী বার বৎসর বয়স্ক বালক উঠিয়া কম্পিতপদে সভাপতি মহাশয়ের সম্মুখে

দাঁড়াইল। দেশপ্রসিদ্ধ স্বদেশ নেতার প্রশান্ত দৃষ্টি সেই বালকের উপর পতিত হইল—মধুর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"তোমার নাম বিনোদলাল? তুমিই এই খদ্দরখানি নিজের তৈয়ারি সুতায় নিজের হাতে বুনিয়াছ?—"

বালক কম্পিতস্বরে উত্তর করিল "আজ্ঞে হ্যাঁ—"

সভাপতি মহাশয়ের পার্শ্বোপবিষ্ট অবৈতনিক চরকা বিদ্যালয়ের সম্পাদক দণ্ডায়মান হইয়া এই ক্ষুদ্র বালকের আগ্রহ, চেষ্টা, প্রাণান্ত পরিশ্রম এবং তাহার নিঃস্ব অবস্থা প্রভৃতির কথা সুললিত স্বরে বক্তৃতা করিলেন। চারিদিক হইতে ধন্য ধন্য ধ্বনি উঠিল, বিনোদলালের ক্ষুদ্র বক্ষের স্পন্দন দ্বিগুণ হইল।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন "বিনোদ তোমার দেশহিতৈষিতা অবর্ণনীয়—আর তোমার হাতে বোনা এ খদ্দর অমূল্য—এর যথোচিত পুরস্কার হ'তে পারে না তথাপি এ'র পুরস্কার স্বরূপ অকিঞ্চিৎকর ৫০০ শত টাকা আমরা তোমাকে দিতেছি। গ্রহণ কর।"

বালক বিনীতভাবে সেই মুদ্রা গ্রহণ করিয়া বলিল "মাননীয় সভাপতি মহাশয়, আমার এ পুরস্কার আমি আমার বন্যাপীড়িত দুঃস্থ ভ্রাতাদের সাহায্যের জন্য দিতেছি—আপনি তাঁহাদের নিকট পাঠাইবার বন্দোবস্ত করুন। আমার মাকে যে আমি নিজের হাতে বোনা কাপড় পরাইতে পারিয়াছি—ইহাই আমার পুরস্কার! অন্য পুরস্কারের আশা করি না।" সমস্ত সভা ধন্য ধন্য করিয়া উঠিল; সভাপতি মহাশয় বলিলেন—"বাবা তোমার এ দান প্রত্যাখান করা বুড়োর সাধ্য নহে—তোমার দেশের জন্য এ দান আমি মাথা পেতে নিলুম—এ দান দেশের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে খোদিত

থাক্‌বে—পুরাকালের দধীচির অস্থি দানও তোমার দানের সঙ্গে তুলনা হয় না—।'

সভাপতি মহাশয় বলিলেন—"আমি আজই উত্তর বঙ্গে আচার্য্যদেবের নিকট এই টাকা তোমার নাম করিয়া পাঠাইয়া দিতেছি।

বিনোদ যুক্তকরে, নতমুখে বলিল—"আমার নামে নয়, মহাশয়, একটি গরীব ভায়ের নাম করিয়া পাঠাইয়া দিন। আমার দেশের ভাই-বোনের একটু কাজে লাগিয়াছি, আমার মত ক্ষুদ্র লোকের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট !—

আর একবার সমস্ত সভা বিনোদলালের জয়ধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠিল।

শ্রীশিশিরকুমার বসু।

জলপ্লাবন।

উত্তর বঙ্গদেশ বর্ষার জলে ভাসিয়া গিয়াছে, এ সংবাদ তোমরা ইতিপূর্ব্বেই পাইয়াছ। লক্ষ লক্ষ দুঃস্থ গৃহ-হীন, অন্নহীন দেশবাসীর হাহাকার নিশ্চয়ই তোমাদের কাণে পৌঁছিয়াছে এবং আমাদের ধ্রুব বিশ্বাস সেই সব ভাই-বোনেদের দুঃখে তোমাদের বুক ব্যথায় ভরিয়া গিয়াছে। কল্পনায় তোমাদের অশ্রু সজল মুখ আমরা নিয়তই দেখিতে পাইতেছি। কিন্তু ভাই! তোমার দেশবাসীর এই দুঃখ-দুর্দ্দিনে সুধু অশ্রু ফেলাই ত তোমার কাজ নয়। গৃহ-কোণে বসিয়া শুইয়া তাহাদের দুঃখে অশ্রুবর্ষণ করিলে ত তাহাদের দুঃখ ঘুচিবে না ভগিনি! এমন কিছু কর, যাহাতে তাহাদের এতটুকু উপকার হয়। এমন কিছু কর, যাহাতে তাহারা বুঝিতে পারে যে তাহাদের এই কচি কচি ভাই-

বোনগুলির বুক তাহাদের দুঃখে গলিয়াছে, যাহাতে তাহারা জানিতে পারে যে এক দেশবাসী ভাই-বোনগুলির বুকে তাহাদেরও একটা স্থান আছে; এক মাতৃভূমির সন্তান বলিয়া তোমাদের কাছে তাহাদেরও একটা দাবী আছে। এমন কিছু কর, যাহাতে তোমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্নেহ-সরল বুকগুলি আপনা হইতেই উন্নত হইয়া উঠে, তৃপ্তিতে ভরিয়া যায়। সে 'কিছু' পরের দুঃখে আত্মদান করা। যৎটুকু পার, আর যেমন করিয়া পার।

কিছু জানে না, আগে হইতে কোন আভাস পায় নাই, হঠাৎ মাথার উপরে আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। বৃষ্টি, বৃষ্টি, অবিরল ধারে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল আর সেই বারিধারা রেলপথের বাঁধে আটক খাইয়া—হু হু করিয়া গ্রামের দিকে ছুটিতে লাগিল। ছুটিতে ছুটিতে যেখানে যা পাইল,—গৃহস্থের গৃহ, কৃষকের কুটির, গরু-বাছুর, কাপড় চোপড়, সব ভাসাইয়া লইয়া গেল। চালের কলসী গেল, আল্‌নায় পরিবার কাপড় ছিল গেল, সারা বরষ খাটিয়া খুটিয়া রাজার খাজনা দিয়া পেটে খাইয়া যা কিছু যৎসামান্য সঞ্চিত ছিল, তাহাও গেল। রহিল কেবল সেই নিঃস্ব গৃহহীন পরিবার, বুকভরা বেদনার রাশি, চক্ষুপোরা অশ্রু আর পাষাণ-গলা হাহারব। সন্ধ্যায় যখন সে শুইয়াছিল, তাহার সব ছিল, সকালে যখন সে শয্যাত্যাগ করিল, তাহার কিছু নাই, কিছু নাই! চারিদিকে জল, হু হু করিয়া ছুটিয়াছে, যেখানে যাহা পাইতেছে—ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে। এমনি করিয়া তাহাদের সব গেছে, আহার করিবে এক মুষ্টি তণ্ডুল নাই, দেহের লজ্জা নিবারণ করিবে, একখণ্ড বস্ত্র নাই, মাথা গুঁজিবে এমন কুঁড়ে খানিও নাই। সারা ভারতের লোকের বুক তাহাদের দুঃখে কাঁদিয়া উঠিয়াছে, সারা ভারত হইতে যে যার সাধ্যমত সাহায্য তাহাদের উদ্দেশ্যে পাঠাইতেছে। বাঙ্গালী ছেলেমেয়ে দিনের পর

দিন রাত্রির পর রাত্রি অক্লান্ত পরিশ্রমে পথে পথে গান গাহিয়া ভিক্ষা সংগ্রহ করিয়া বেড়াইতেছে। আর বলিতে বুক দশহাত ফুলিয়া উঠে বাঙ্গালীর ছেলে-মেয়ের সে কি আত্মত্যাগ, কি কঠোর সে কর্ত্তব্য জ্ঞান! তোমরা শুনিয়া সুখী হইবে বঙ্গ দেশীয় সেবা-সমিতির আচার্য্য দেবচরিত্র মনস্বী ডাক্তার প্রফুল্ল চন্দ্র রায় বলিয়াছেন যাহা দেখিতেছি তাহাতে আমার আনন্দের, গর্ব্বের সীমা নাই কিন্তু এখনো চাই, এখনো ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে, পরের দুঃখে এখনো কাঁদিতে হইবে, আরও অর্থ আরও বস্ত্র সংগ্রহ করিতে হইবে—নতুবা দুঃখ দূর হইবে না। আমরা "আমার দেশ সেবা ভাণ্ডার" নাম দিয়া একটি Fund খুলিলাম। আমার দেশের পাঠক-পাঠিকা, গ্রাহক-গ্রাহিকা, বন্ধু-বান্ধব যাঁহার যাহা সাধ্য যাঁহার যাহা ইচ্ছা তিনি এই ভাণ্ডারে তাহাই দান করুন। অর্থ বস্ত্র যাঁহার যাহা ক্ষমতা। আমরা সঞ্চিত অর্থ ও সামগ্রী মধ্যে মধ্যে আচার্য্যদেব প্রফুল্লচন্দ্রের নিকট প্রেরণ করিব, বলিব, এগুলি "আমার দেশের" কচি কচি ছোট ছোট বিমল হাতের দান! আচার্য্যদেব সন্তুষ্ট হইবেন, বন্যাপ্রপীড়িত দুঃস্থেরা সাহায্য পাইবে, আমাদের ভাণ্ডার খোলাও সার্থক হইবে।

সমস্ত দানই—যত ক্ষুদ্রই কেন সে হোক্ না—আমরা "আমার দেশে" দাতার নামসহ ক্রমান্বয়ে প্রকাশ করিব। আমার দেশের গ্রাহক-গ্রাহিকাগণ "গ্রাহক" বলিয়া, পাঠক-পাঠিকাগণ "পাঠক" বলিয়া ও বন্ধু-বান্ধব "বন্ধু" বলিয়া উল্লেখ করিবেন। খামের ভিতরে ডাক টিকিটে এক বা দুই টাকা পর্য্যন্ত পাঠানো চলে তাহার বেশী পাঠাইতে হইলে মণি-অর্ডার করাই যুক্তিযুক্ত। সম্পাদক মহাশয়ের নাম ও ঠিকানায় পাঠাইলেই চলিবে।

দেখিও ভাই-বোন সব, যেন "আমার দেশের" সেবা-ব্রত বিফল না হয়,—তাহাতে তোমাদেরই কলঙ্ক রটিবে।

শোক-সংবাদ।

দুঃসংবাদ যে দেয়, তাহার চেয়ে দুর্ভাগা আর কে আছে? আমি আজ তোমাদের অনেকগুলি দুঃসংবাদ দিতে আসিয়াছি। আমার দেশের চিরপ্রিয় লেখক, বঙ্গ সাহিত্যে প্রথিতযশা ঔপন্যাসিক যতীন্দ্রনাথ পাল আর ইহজগতে নাই। আর আমরা যতীন্দ্রনাথের ছড়া, কবিতা, গল্প, তোমাদের উপহার দিতে পারিব না, সে লেখনী চিরতরে নীরব হইয়া গেছে, বঙ্গভাষা জননীর আদরের সন্তান যতীন্দ্রনাথ মাত্র যুবা বয়সে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। ছেলেদের জন্য যতীন্দ্র নাথ যে কত লেখা লিখিয়াছেন, তাহারা যে তাঁহার কত প্রিয় ছিল, তাহা বলা যায় না। "আমার দেশের" পাঠক পাঠিকাদিগকে মাসে মাসে হাসির ছড়া উপহার দিতে, তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সরস মধুর ব্রত কথার গল্প বলিতে যতীন্দ্রনাথের শ্রান্তি ছিল না, ক্লান্তি ছিল না। যতীন্দ্রনাথ সাত আট বছর সাহিত্য সাধনা করিয়া ছিলেন, তাহারই ফলে শতাধিক গ্রন্থ তিনি রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পিতা স্বর্গীয় ধীরেন্দ্রনাথ পাল-ও একজন সুপ্রতিষ্ঠিত গ্রন্থকার ছিলেন—তাঁহারও প্রতিভা এমনই সর্ব্বতোমুখী ছিল, তিনিও মৃত্যুকালে বহু শত গ্রন্থ রাখিয়া গিয়াছিলেন।

যতীন্দ্রনাথ দুইটি অপোগণ্ড শিশু ও কিশোরী পত্নী ফেলিয়া তাঁহার অক্ষয় লেখনীর মায়া ত্যাগ করিয়া সামান্য দুই দিনের জ্বরে, ৩৫ বৎসর বয়ঃক্রম পূর্ণ না হইতে দেহ ত্যাগ করিলেন।

*　　*　　*　　*　　*

বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিতা সুলেখিকা ইন্দিরা দেবীও ৪৫ বৎসর বয়সেই কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। তাঁহার রচিত উপন্যাসগুলি চিরদিনই বঙ্গভাষার অমূল্য সম্পদ হইয়া রহিবে। তোমরা বিগত যুগের সাহিত্যিক ৺ভূদেব

মুখোপাধ্যায়ের নাম নিশ্চয়ই শুনিয়াছ, ইন্দিরা দেবী ছিলেন তাঁহারই নাতনী। ইন্দিরা দেবীর ছোট বোন শ্রীমতী অনুরূপা দেবী আমাদের দেশে সাহিত্যে যথেষ্ট যশঃ অর্জ্জন করিয়াছেন।

* * * * *

"উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম" নামে বাঙ্গালা ভাষায় একখানি পুস্তক আছে। তোমরা বড় যখন হইবে বইটি পড়িবে, বুঝিবে এমন উচ্চাঙ্গের সাহিত্য পুস্তক বাংলায় আর আছে কি-না সন্দেহ! সেই বইটির রচয়িতা চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও সম্প্রতি ধরাধাম ত্যাগ করিয়াছেন।

* * * * *

মেয়েদের ব্রতকথা গ্রন্থ প্রণেতা আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এম, এ বি-এল, মহাশয়-ও সম্প্রতি স্বর্গারোহণ করিয়াছেন।

* * * * *

বাঙ্গালী-বীর ভীম-ভবানী—যাঁহার জীবন-কথা এই সেদিন তোমাদের শুনাইয়াছি—তিনিও সম্প্রতি মাত্র চার দিনের জ্বরে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। ভীম-ভবানী আমাদের বাঙ্গালীজাতির গৌরব ছিলেন, তাঁহার অকাল মৃত্যুতে বাঙ্গালীর যে ক্ষতি হইল, তাহা কখনো পূরিবে কি-না সন্দেহ! মৃত্যুকালে ভবানীর বয়স মাত্র ৩১ বৎসর হইয়াছিল।

* * * * *

এক সঙ্গে এতগুলি দুঃসংবাদ দিতে আমারি হৃদয় ভাঙ্গিয়া যাইতেছে।

খবরাখবর।

শীতকালের গরুর দুধ। শীতকালে গরুর দুধে চর্ব্বি কম থাকে, কাজেই সে দুধের স্বাদ কম ও অল্প জোরী হয়। কিন্তু এমনটা কেন হয় তা অনেকেই জানত না। সম্প্রতি জানা গেছে। একটা মোকর্দ্দমায় গয়লাকে অল্প চর্ব্বি সুদ্ধ দুধ দেওয়ার জন্যে আদালতে অভিযুক্ত হ'তে হ'য়েছিল। গয়লার তরফ থেকে একজন রাসায়নিক পরীক্ষক প্রমাণ করে দেন যে এতে গয়লার বা তার চাকর বাকরের কোন জুচ্চুরী নেই, শীতের সময় গরু চর্ব্বি টর্ব্বি দেহের মধ্যে লুকিয়ে রাখে, শীত নিবারণ করবার জন্যে—মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্‌। তোমরা পরখ করে দেখো, শীতকালের খাঁটি দুধও পাতলা বলেই মনে হবে।

ক্ষয়রোগের অব্যর্থ মহৌষধ। জারমেণীতে কুকুর-চুরী করে একটা লোক কুকুরের চর্ব্বি থেকে ক্ষয়রোগের এক মহৌষধ বার করেছে। কিন্তু দুনিয়ার লোকের কুকুর চুরীর অপরাধে বেচারা জেলে গেল।

প্রধান মন্ত্রীর বই। ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী লয়েড জর্জ্জ মহাশয় বিগত মহাযুদ্ধের সম্বন্ধে একখানি বই লিখ্‌বেন স্থির করেছেন। বইখানি লেখা হ'লে যে প্রকাশক ছাপাবে সে এখন থেকেই ১৫০০০০০৲ টাকা দেবে বলেছে। বুঝে দেখ ব্যাপারটা, কোথায় বই, কোথায় কি! গ্রন্থকার কত টাকা পাবেন ঠিক হ'য়ে গেছে, এমন নইলে দেশ! বইখানা অবশ্যই ভালো হ'বারই সম্ভাবনা যে হেতু লয়েড জর্জ্জের মত বিদ্বান বিচক্ষণ রাজমন্ত্রী লিখ্‌চেন—কি বল?

বোম্বাইয়ের নূতন শিক্ষাপদ্ধতি। খাস বোম্বাইয়ে ও বোম্বাই প্রদেশে বিনা বেতনে সর্ব্বজনীন শিক্ষা পদ্ধতি প্রচলিত হবার কথা হ'চ্ছে। খুবভাল কথা। কত গরীব-গুর্ব্বো যে লেখাপড়া শিখ্‌বে—তার আর সংখ্যা নেই।

গরিলা। ৬ ফুট হইতে লম্বা একটি বনমানুষকে এলিজাবেথ মিউজ্যমে আনা হয়ে'ছে। মিউজ্যামের প্রধান কর্ত্তা বলেন, তিনি অনেক ঘুরে ঘুরে এদের সম্বন্ধে অনেক তথ্য জান্তে পেরেছেন তার মধ্যে প্রধান হ'চ্ছে এই যে এরা দ্বিবিবাহ করে না আর স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের নিয়ে চিরদিন বাস করে। হঠাৎ যদি স্ত্রী মরে যায় বা কেউ তাকে বধ করে পুরুষ গরিলা শোকে অধীর ও মুহ্যমান হইয়া পড়ে। আর হত্যাকারীকে যদি পায় নখে ছিঁড়ে ফেলে।

মেয়েদের ব্যায়াম। ছেলেরা অনেক রকম-বে-রকমের খেলা ও ব্যায়াম করে থাকে। যে সব ছেলে নিয়মিত ব্যায়ামাদি করে তাদের বেশ সুস্থ সবল দেখা যায়। কিন্তু মেয়েরা কি ব্যায়াম করবে, কোন্ খেলা তাদের উপযোগী বিচার করবার জন্যে বিলেতে এক মহা সভা আহূত হ'য়েছিল। মেয়েদের ব্যায়াম করা যে খুবই দরকারী তা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেছেন কিন্তু কোন্ ব্যায়ামটা উপযোগী তা এখনো নির্দ্ধারিত হয় নি। ফুটবল মেয়েদের পক্ষে সুবিধার নয়, যন্ত্র-পাতি সুদ্ধ জিমনাষ্টিকেও ভয় আছে, সাঁতার বা নৌকা চালানায় তাদের বুকের অসুখের সম্ভাবনা, ক্রিকেট খেলার উপযোগী মেয়েরা হ'তে পারে না; লন্ টেনিস্ নেট্বল প্রভৃতি খেলা মন্দ নয় বলে বিবেচিত হয়েছে। আমাদের দেশের মেয়েদের ব্যায়ামের অভাব নেই। লেখাপড়া, শিল্পকার্য্য প্রভৃতি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যে সব মেয়েরা আমাদের ঘর কন্নার কাজ শিক্ষা পায়, ব্যায়াম ব্যায়াম করে' তাদের কখনই চিন্তা করতে হ'বে না।

সামরিক শিক্ষালয়। ভারতবাসীদের সামরিক বিভাগে প্রবেশ করে, কাজ করবার উপযোগী করে তোলবার জন্যে দেরাদূনে একটি সামরিক শিক্ষালয় স্থাপিত হ'য়েছে। কলেজটির নাম হ'চ্ছে Prince of Wales Royal Indian Military College এত কাল পর্য্যন্ত ভারতবাসীগণকে ভারতীয় সমর বিভাগে

প্রবেশাধিকার লাভ করতে হ'লে Sandhurst এ Royal Military College এ পাশ দিতে হ'ত কিন্তু ভারতে শিক্ষা দেবার কোন ব্যবস্থাই আগে ছিল না। এখন এই দেরাদুন কলেজ থেকে শিখে ছাত্ররা সহজেই বিলাতের সামরিক বিদ্যালয়ে ঢুকতে পারবে। প্রধান সেনাপতি তাহাদের তত্ত্বাবধানে থাকবেন। এই কলেজে ঢোকবার কতকগুলি আইন কানুন তোমাদের অবগতির জন্যে এইখানেই বল্‌ছি।

১৩ বছরের বেশী বয়সের কোন ছেলেকে নেওয়া হ'বে না; ১২॥ বছরের ছেলে পাওয়া গেলে ১৩ ও নয়। সাধারণতঃ কলেজে ঢোকবার আবেদন পত্র লোক্যাল গবর্ণমেণ্টের হাতে পেশ করতে হ'বে। আর ছাত্রের পিতা বা স্বাভাবিক অভিভাবককে স্বীকার পত্র দিতে হ'বে এই মর্ম্মে যে ছাত্রটি সৈন্য বিভাগই তার জীবনের লক্ষ্য করবে।

এই কলেজে সাধারণ শিক্ষা (General Line) সঙ্গে সঙ্গে এমন দেওয়া হ'বে যে ছেলেদের মধ্যে কেউ যদি সামরিক বিভাগের পরীক্ষায় অনুপযুক্ত হয়—সে ফিরে এসে প্রাথমিক পরীক্ষাদি দিয়ে আবার সাধারণ বিভাগে ফিরে যেতে পারে। আমাদের দেশে বহুকাল হ'তে এ অভাবটা পুরামাত্রাতেই ছিল, আজ তাহা পূরণের সময় আসিয়াছে। সামরিক শিক্ষা না থাক্‌লে জাতির আত্মনির্ভরতা জন্মে না, জাতির কল্যানও হয় না। আজ আমরা ঠিক বল্‌তে পাচ্ছিনা আমদের দেশের লোক ও এই দেশের ছেলেরা এই সামরিক শিক্ষালয়টিকে কেমন ভাবে নেবে, তবে এটা ঠিক কথা যে, এই শিক্ষাকে বরণ করে নিলে মঙ্গল ছাড়া অমঙ্গল হ'বে না।

লালগোলো ঘাটে একটি মেয়ে অসাধারণ সাহসিকাতার পরিচয় দিয়েছে। মেয়েটির নাম কমলকুমারী। কমলকুমারীর ছোট বোন্ নন্দরাণী হঠাৎ পদ্মায় পড়ে

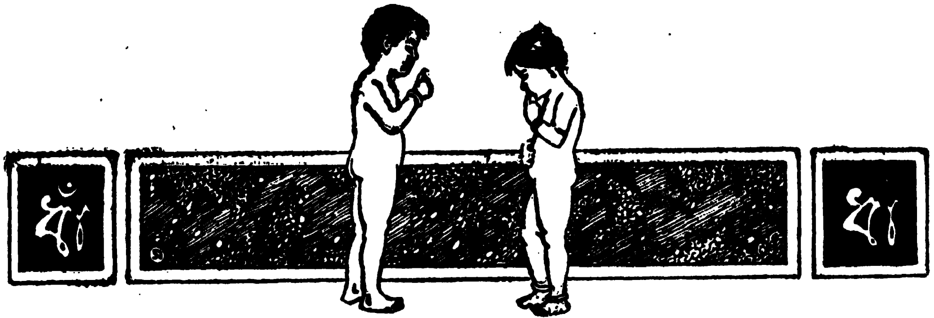
যায়। বর্ষার নদী, তাতে আবার পদ্মা—সে যে কি ভীষণ তা আর কি বলব। নন্দরাণীর দিদি কমলকুমারী যখন দেখ্‌লে যে বোন্‌টি তার উত্তাল স্রোতের মুখে খড়ের মত ভেসে চলেছে তখন সে কারো প্রত্যাশা না করে নিজেই লাফিয়ে পড়ে', সাঁতরে তাকে তুলে নিয়ে আসে। Royal Humane Society কমলকুমারীর উপস্থিত বুদ্ধি, সাহস ও বীরত্বের প্রশংসা করে' এক সার্টিফিকেট পাঠিয়েছেন।

* * * * *

'মান্দ্রাজ মেলের' খবরে প্রকাশ একটি এগারো বছরের ছেলে উচ্চ অঙ্ক বিদ্যার পরিচয় দিয়ে মান্দ্রাজের শিক্ষিত সম্প্রদায়কে বিস্মিত ক'রে দিয়েছে। মান্দ্রাজ হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীযুক্ত রামেস্বামী বালকটিকে পরীক্ষা করে বলেছেন, সে একটি প্রতিভা—Genius। তাকে মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সী কলেজের উচ্চ অঙ্ক শ্রেণীতে পড়তে অনুমতি দিবার এবং তার এই অনন্য সাধারণ প্রতিভার উপযুক্ত পারিতোষিক দিবার জন্য সকলেই কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিতেছেন।

* * * * *

হেনরি ফোর্ড। রাস্তাঘাটে তোমরা ফোর্ড মটর দেখিতে পাও; খুব হাল্কা গাড়ী, সব গাড়ীর অপেক্ষা দ্রুত ছুটে, দাম-ও কম। এই গাড়ীর যিনি প্রচারক এবং যাঁর কারখানায় ফোর্ড গাড়ী তৈরী হয়, তাঁর নাম মিঃ হেনরি ফোর্ড,—পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনী তিনি,—তাঁর দৈনিক আয় ১৫০,০০০০৲ লক্ষ টাকা। ভেবে দেখ, দৈনিক আয় পনেরো লক্ষ টাকা—উঃ!



নূতন ধাঁধা।

১। এক কূপের ভিতর একটা ব্যাঙ ছিল। কূপটি ৩০ ফিট গভীর। ব্যাঙটা রোজ দিনের বেলায় ৩ ফিট্ করে উঠ্‌ত কিন্তু রাত্রে আবার দু ফিট করে পড়ে যেত। তবুও একদিন সে একেবারে উপরে উঠে পড়েছিল। বল ত কতদিন পরে সে উপরে উঠ্‌ল ?

শ্রীমতী মায়াময়ী মজুমদার।

২।

তিন অক্ষর নাম মম নাহি গো ঈশ্বর,
ক্ষতি নাই ত্যাজ যদি আমার শেষাক্ষর।
আমা বিনা সংসারে কেহ থাকিতে চাহে না,
তাই কি সঙ্গিনী মোরে কিছুতেই ছাড়ে না ?
প্রথমাক্ষর বাদ দিলে হই আমি প্রাণী,
সকলেই জান মোরে, সন্দেহ মানি নাহি।
মধ্যাক্ষর ছাড়িলে মিষ্টতায় ভ'রে যাই,
এখন চিনিতে মোরে পার নাই কি ভাই ?

শ্রীমতী সৌদামিনী বড়াল।

ভাদ্র মাসের ধাঁধার উত্তর

১। কলিকাতা
১-৯-২২

প্রিয় জগৎচন্দ্র,

তোমার পত্র পাইয়াছি। অদ্য শ্রীযুক্ত গগনবাবু আমাদের বাড়ী আসিতেছেন। তিনি সত্বরই মেদিনীপুরে গমন করিবেন। আমি শিবপুর গিয়াছিলাম, তথায় একটী সুন্দর ও খুব বড় উদ্ভিদ্ উদ্যান দেখিয়া আসিলাম; সেখান হইতে কলিকাতার যাদুঘর দেখিতে গিয়াছিলাম। তথায় একটী কাটামুণ্ড দেখিলাম, শুনিলাম তোমার কাশি হইয়াছে, কলিকাতা হইতে তোমার জন্য বাক্সে করিয়া কয়েকটী মস্কট পাঠাইলাম। আমার সঙ্গে আমাদেব পাড়ার সাহারা এখানে ভ্রমণ করিতে আসিয়াছেন। আমি হৃদয়বাবুর সহিত দেখা করিয়াছি। আমরা ভাল আছি, তোমার মঙ্গল চাই।—ইতি তোমার—বড়দা—

তবে উপরিউক্ত কথাগুলি ছাড়া অন্যরূপেও ধাঁধাটির উত্তর হওয়া সম্ভব। কোন কোন গ্রাহক-গ্রাহিকা ভারতের প্রাচীন রাজধানী "দিল্লী," বোম্বাই প্রদেশের প্রধান নগর "বরদা" করিয়াছেন। কেহ কেহ 'জগৎ' স্থানে "ভুবনও" করিয়াছেন; কেহ গগনবাবু না করিয়া "অবনী"বাবু করিয়াছেন,—তাঁহাদের উত্তরও নির্ভুল হইয়াছে।

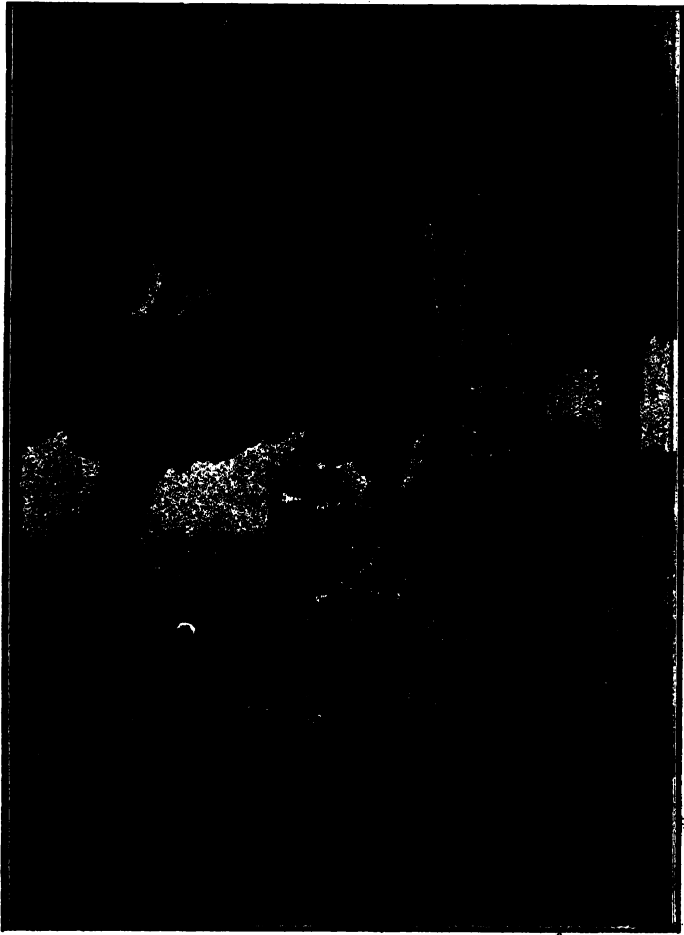
২। লঙ্কা।

যাঁহারা ভাদ্রের ধাঁধার উত্তর দিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদের নাম :—

শ্রীমতী মীনারাণী সেন, বিহার; রাজপৎ সিংহ, জিয়াগঞ্জ; কালীকুমার কুণ্ডু, কুমারখালি; বিনয়েন্দ্রনাথ দাস, পাবনা; রবীন্দ্রকুমার বসাক, কলিকাতা; কুমারী হাসিরাণী মিত্র, কলিকাতা; সাধনকুমার দত্ত, কলিকাতা; রবীন্দ্রনাথ দত্ত, কলিকাতা; হারাণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা; জ্ঞানশরণ রায়, পাবনা; কালীকমল লাহিড়ী, রায়পুর; লীলাবতী দেবী, লাকসা; এম, নসের আলি সিকদার, ধাইদা; লতিকা মিত্র, কলিকাতা; শান্তিদাস সিংহ, কলিকাতা; নৃপেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী, ওয়ারী; হিমাংশুভূষণ গাঙ্গুলী, মেদিনীপুর;

মথুরাপ্রসাদ লাহা, সামসেরনগর; সৌদামিনী বড়াল, দিনাজপুর; সুধীন্দ্রকুমার বসাক, কলিকাতা; কুমারী অশোক সেন, কলিকাতা; রণধীর রায় ও রণজিৎ রায়, রাঁচি; চন্দ্রপ্রভা কুণ্ডু, সুনামগঞ্জ; বিভূতিভূষণ মিত্র, বর্দ্ধমান; কুমারী রাজলক্ষ্মী সেন গুপ্ত, নেত্রকোণা; অসিতকুমার নন্দী, কক্সবাজার; কুমারী হেণারাণী ঘোষ, কলিকাতা; সৌরীন্দ্র মোহন ঘোষ, কেতিকা; মঙ্গলচরণ গাঙ্গুলী, গোরক্ষপুর; কাননচন্দ্র বসু, ভবানীপুর; অনিলকুমার সেন, আগড়তলা; নরেন্দ্রকিশোর চক্রবর্ত্তী, আসাম; বঙ্গেন্দুকুমার মিত্র, হবিবপুর; কুমারী বাবিবালা দেবী, বর্দ্ধমান; সুব্রত ও চিত্রা নাগ, কলিকাতা; শরদিন্দু ঘোষ, উলুবেড়িয়া; রাধাবল্লভ বন্দ্যোপাধ্যায়, এসানসোল; সুধাংশুশেখর গুপ্ত, গুয়ারী; সান্ত্বনাকুমার দাস, ধুবড়ী; অজয়নাথ চক্রবর্ত্তী, কুড়ীগ্রাম; অজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়; বিজনপ্রভা দত্ত, গাড়ীখোলা; বীণাপাণি গোস্বামী, শ্রীরামপুর; বোধীন্দ্রনাথ মজুমদার, রাজনগর; সুশীলামণি ঘোষ, মণিরামপুর; রেণুকা দত্ত, পাটনা; বীণাপাণি দেবী, সিদ্ধেশ্বর সাহা, নেত্রকোণা; সুকেশচন্দ্র গুপ্ত, চট্টগ্রাম; সলিলকুমার মিত্র, কলিকাতা। কুমারী আভারাণী মজুমদার।

কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসের ধাঁধার উত্তর পৌষ মাসের "আমার দেশে" বাহির হইবে। গ্রাহক-গ্রাহিকাগণ অগ্রহায়ণের কাগজ পাইয়া, দু'মাসের ধাঁধার উত্তর এক সঙ্গে পাঠাইবেন।



সুকন্যা চ্যবনের পায়ের নীচে পড়িয়া বলিল—ক্ষমা করুন ঋষি, আমি আপনাকে কষ্ট দিয়া সুখী হইতে চাহি না। আমি আজ হইতে আপনার সেবা করিবার দাবী চাহিতেছি। আজ হইতে সুকন্যা আপনার ধর্ম্মপত্নী।



২য় বর্ষ, ১১শ সংখ্যা। অগ্রহায়ণ, ১৩২৯।

অশ্বিনীকুমারদ্বয়।*

বেদের মধ্যে যত দেবতার কথা আছে তাহাদের মধ্যে অশ্বিদ্বয় অতি প্রধান। ইঁহাদিগকে আমরা সাধারণতঃ অশ্বিনীকুমারদ্বয় নামে জানি।

ইঁহাদের জন্মের গল্প এইরূপ। ত্বষ্টা ঋষির এক কন্যা ছিল, তাহার নাম সরণ্যু; বিবস্বানের সঙ্গে সরণ্যুর বিবাহ। সমস্ত বিশ্বসংসার নিমন্ত্রিত হইল, এই সময়ে এক মহা বিপদ ঘটিল। বিবাহের মুহূর্ত্তে দেখা গেল কন্যা নাই। ত্বষ্টা তো একবারে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। সেই নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের মধ্যে যাঁহারা বুদ্ধিমান ও প্রবীণ, তাঁহারা বলিলেন "চুপ চুপ—একথা লইয়া গোলযোগ করা ঠিক নয়—সরণ্যুকে পাওয়া গিয়াছে।"

[* পৃথিবীর ইতিহাস চিত্রে ও গল্পের "বৈদিক ভারত" হইতে উদ্ধৃত। রায় বাহাদুর ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন রচিত]

কোনরূপে এক নকল সরণ্যুকে দাঁড় করান হইল ; ত্বষ্টা ও তাঁর স্ত্রী চোখের জল মুছিতে মুছিতে সেই কন্যাটিকেই 'সরণ্যূ' বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন, তাহা না হইলে যে লোকের কাছে মুখ দেখান দায় হইয়া পড়িত। বিবস্বানের সহিত সেই সরণ্যূর বিবাহ হইয়া গেল। অশ্বিদ্বয় বা অশ্বিনীকুমারেরা এই সরণ্যূর যমজ পুত্র।

ক্রমে অশ্বিনীকুমারদ্বয় মহা বলবান হইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহারা যেমনই যোদ্ধা তেমনই কিংবা ততোধিক চিকিৎসকরূপে বিখ্যাত হইলেন। তাঁহাদের আকাশের ন্যায় প্রকাণ্ড বড় জাহাজগুলি সমুদ্রে বাঁধা থাকিত। জলযুদ্ধে তাঁহাদের সঙ্গে কেহ আঁটিয়া উঠিতে পারিত না।

তাঁহাদের সম্বন্ধে বেদে অনেক গল্প আছে। ভুজ্যু নামক একব্যক্তিকে শত্রুরা তাড়াইয়া সমুদ্রের জলে ফেলিয়া দিয়াছিল ; সাতদিন সাতরাত্রি ঐ ব্যক্তি একখণ্ড কাঠ ধরিয়া জলে ভাসিতেছিল। লবণজল খাইয়া বেচারীর পেট ফুলিয়া গিয়াছিল এবং অবশেষে সে এমনই হীনবল হইয়া পড়িয়াছিল যে সে আর সেই কাঠখানি ধরিয়া জলের উপর ভাসিয়া থাকিতে পারে নাই। এই অবস্থায় অশ্বিনীকুমারদ্বয় তাহাকে খুঁজিতে পা'ল উড়াইয়া তাঁহাদের বড় একখানি জাহাজে উঠিয়া সমুদ্রে চলিয়া যান, কত দিক্ বৃথা খুঁজিয়া হয়রাণ হন, তাহার পর একদিন সহসা দেখিলেন মহাসমুদ্রের মধ্যে একটা সাদা কাপড়ের বস্তার ন্যায় কি ভাসিতেছে। তখন তাঁহারা দ্রুত গতিতে যাইয়া সেই বস্তাটিকে তুলিয়া লইলেন ; দেখিলেন সে একটা মৃতপ্রায় মানুষ, তখনও একটু একটু শ্বাস বহিতেছে,—কথা বলে না, চোখ দুটি মাছের চোখের মত নিশ্চল হইয়া আছে, সে অভ্যাস বশতঃ কাঠখানি ধরিয়া আছে, তাহার হাতের শিরাগুলি শক্ত হইয়া উহা ধরিয়া রহিয়াছে। এই অবস্থায় তাঁহারা অতি যত্নে তাহাকে উঠাইয়া আনিয়া চিকিৎসা করিতে সুরু করিয়া দিলেন।



অশ্বিনীকুমারদ্বয় দ্রুতগতিতে যাইয়া সেই বস্তাটিকে তুলিয়া লইলেন ; দেখিলেন সে একটা মৃতপ্রায় মানুষ......

কয়েকদিন পরে যখন সেই ব্যক্তি জ্ঞান ফিরিয়া পাইল, তখন তাঁহারা দেখিলেন, এই সেই ভুজ্যু, যাহার জন্য তাঁহারা জল-স্থল খুঁজিতে বাকি রাখেন নাই। এই ভুজ্যু আবার যখন পিতার ক্রোধে বাড়ী ঘর ত্যাগ করিয়া বহু দূর দেশে পীড়িত হইয়া পড়িয়াছিল, তখন আবার অশ্বিনীকুমারেরাই তাহাকে নীরোগ করিলেন।

তাঁহারা আরও অনেক দুঃসাধ্য পীড়া আরোগ্য করিয়াছিলেন। মহাপাপে ঘোষা নামক এক ব্যক্তির কুষ্ঠ রোগ জন্মে, তাহার চেহারাটি ছিল খুব সুন্দর, কিন্তু কুষ্ঠ হওয়াতে সে চেহারা একবারে বদলাইয়া গেল। তিল ফুলের ন্যায় তার সুন্দর নাকের ডগাটা খসিয়া পড়িল, তার চোখ দুটি ছিল পদ্ম ফুলের মত, এখন কিন্তু চোখের পাতা দুটি ফুলিয়া গিয়া কালো চোখের তারা দুটি ঘৃণিত একটা ডোবার জলের মত চিক্ চিক্ করিতে লাগিল। তার যে দুটি পা গোলাপী আভায় মন ভুলাইত, তাহা শত ছিদ্রময় মৌমাছির চাকের মত কুৎসিত হইয়া পড়িল, এই অবস্থায় অশ্বিনীকুমারদ্বয় তাহার চিকিৎসার ভার লইলেন।

আকাশের ঘনঘটা দূর করিয়া বায়ু যেমন উহাকে নির্ম্মল করে, তখন আবার তাহাতে চন্দ্র-সূর্য্যের কিরণ ফুটিয়া উঠে, তেমনই ইঁহাদের চিকিৎসায় ঘোষার রূপ-যৌবন আবার উজ্জ্বল হইল। ঘোষা অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের উদ্দেশ্যে অনেক স্তুতি করিয়াছিলেন।

বিস্পলা নাম্নী একটি স্ত্রী কোন দুষ্ট লোকের হাতে পড়ে; সেই ব্যক্তি রাগিয়া গিয়া তাহার ডান পাখানি একবারে এক তরবারীর আঘাতে কাটিয়া ফেলে, তখন অশ্বিনীকুমারদ্বয় সৌভাগ্যক্রমে সেইখানেই ছিলেন। তাঁহাদের কাছে মৃতপ্রায় বিস্পলাকে একটা খাটলিতে করিয়া লইয়া আসা হয়। অশ্বিনীকুমারেরা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহার ছিন্ন পাখানি কোথায়?" উত্তরে জানিলেন, সেই দুষ্ট

লোকটি পাখানি খণ্ড খণ্ড করিয়া বহুদূরে ফেলিয়া দিয়াছে—তাহা আর পাওয়ার উপায় নাই।

তখন চিকিৎসকেরা এমন একখানি লৌহের পা তৈরী করিলেন যে তাহা ঠিক বিস্পলার ডান পায়ের মতই হইল, তাহার উপর রং দিয়া এমনই কৌশলে জুড়িয়া দিলেন যে অতি অল্প সময়ের মধ্যে স্ত্রীলোকটি পূর্ব্বের ন্যায় পথে-ঘাটে বেড়াইতে লাগিল, কেহ বুঝিতে পারিল না যে তাহার ডান পা'টি নাই।

তাঁহারা এদিকে স্ত্রীলোকের গর্ভাবস্থার চিকিৎসাও অতি সুন্দর রূপ করিতেন। ধর বধ্রিমতীর উদাহরণটি। তিন দিন ধ্বস্তাধ্বস্তি, অনেক মন্ত্র তন্ত্র জপ—এ সকলে কোন ফলই হইল না। বধ্রিমতীর উদরস্থ শিশু কিছুতেই বাহির করা গেল না,—তাহার প্রাণের আশা ছাড়িয়া দিতে হইল। এমন অবস্থায় অশ্বিনীরা যন্ত্র দ্বারা কি সুন্দর ভাবেই না তাহার সুপ্রসব করাইয়াছিলেন। সেই যে সুন্দর ছেলেটি হইল, তাহার নাম ছিল "হিরণ্য হস্ত"।

রেভ নামক ঋষিকে দস্যুরা একবার বাগে পাইয়া বাঁধিয়া লইয়া যায়; কেউ বলিল, "এখনই আমাদের তীক্ষ্ণ ছুরি দিয়া ইঁহাকে কাটিয়া ফেলি।" কিন্তু আর একজন বলিল "এই ঋষি হচ্ছে আমাদের শত্রু—দেবতাদের চাঁই। ইহাকে এত সহজে পৃথিবী হইতে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে না। ঐ যে নরক কুণ্ডের মত একটা কূপ পথের পার্শ্বে আছে, ওটা ভয়ানক গভীর, ঐ গর্ত্তে ঋষিটাকে হাতে পায়ে দড়ি বাঁধিয়া ফেলিয়া দেওয়া হউক, আস্তে আস্তে ফেলিয়া দিবে, যেন তখনই না মরে। তার পরে অন্ধকারে ধীরে ধীরে শ্বাস রোধ হইয়া, না খাইয়া পচিয়া মরুক, এই হবে ইহার উচিত শাস্তি।"

সকল দস্যুই এই কথাগুলি বেশ ভাল মনে করিল। তাহারা রেভ ঋষিকে নানা ছন্দে বাঁধিতে লাগিল,—বাঁধিবার সময় কেউ তাঁর নাকের উপর ঘুষি মারিল,

নাক বহিয়া দর দর করিয়া রক্ত পড়িল, কেউ বা চড়ের উপর চড় মারিয়া তাঁহার গাল ফুলাইয়া দিল।

সাত দিন পর্য্যন্ত রেড ঋষি সেই কুঁয়োটার মধ্যে পড়িয়া পচিতে লাগিলেন।

এদিকে দেবতারা ও ঋষিরা রেড ঋষিকে খুঁজিতে খুঁজিতে সেই কুঁয়োর কাছে আসিয়া গোঁ গোঁ শব্দ শুনিয়া দাঁড়াইলেন। রেড ঋষির আত্মীয় বলিল, "এ নিশ্চয়ই রেডের ঘ্যাঙরাণী, সে একবার বিষম জ্বরে পড়িয়া এইরূপ শব্দ করিয়াছিল।" তখন দড়ি নামাইয়া, দীপ লইয়া, একটি লোক কুঁয়োর নীচে নামিয়া পড়িল। বহু কষ্টে একটা মাংসপিণ্ডের মত ঋষিকে উপরে উঠান হইল, বড় বড় বিষ পোকা তাঁর গা কামড়াইয়া ধরিয়া তাঁর মাংসগুলি লাল ও ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। অশ্বিনীকুমারেরা এই অবস্থা হইতে তাঁহাকে যে ভাবে বাঁচাইয়া তুলিলেন, তাহা অতি আশ্চর্য্য।

দস্যু ও রাক্ষসদের সঙ্গে দেবতাদের যুদ্ধে অশ্বিনীকুমারদ্বয় সর্ব্বদা সাথে সাথে থাকিতেন ; কোন বিপদ হইলেই অমনই তাঁহাদের সাহায্যের দরকার হইত। দেবগণের মিত্র আহুষ রাজাকে এক সময়ে শত্রুরা সৈন্যদ্বারা বেষ্টন করিয়া ফেলে। সেই ঘোর বিপদের সময় অশ্বিনীকুমারেরা তাঁহাদের সোনার রথের চাকাগুলি দ্রুতবেগে ঘুরাইতে ঘুরাইতে, একটা দিকে শত্রু সৈন্যের বেষ্টনী ভাঙ্গিয়া ফেলেন এবং শ্যেন পাখী যেমন অকস্মাৎ ছোঁ মারিয়া পায়রাকে লইয়া যায়, সেই ভাবে আহুষকে নিজেদের রথের উপরে তুলিয়া আনিয়া অতি শীঘ্র চলিয়া আসেন। অশ্বিনীরা এমন তাড়াতাড়ি, এমন কৌশলের সঙ্গে এই কার্য্য উদ্ধার করেন যে শত্রুরা একেবারে মাথায় হাত দিয়া হতবুদ্ধি হইয়া বসিয়া পড়িল।

বিষ্ণুপা ঋষির পুত্রটি মরিয়া গেল, কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার আত্মীয়েরা শিশুকে শ্মশানঘাটে লইয়া গেল। তাহার মৃত্যুর খবর পাইয়া অশ্বিনীকুমারেরা

বলিলেন—"তার তো মরিবার কথা নয়। কাল ত তাকে দেখিয়াছি, তার যে পীড়া তাহাতে শ্বাসরোধ হইয়া সে মড়ার মতন পড়িয়া থাকিতে পারে, আনাড়ী চিকিৎসকেরা তখন তাহা মৃত্যু বলিয়া ভুল করিতে পারে, তার শব তো জ্বালানো হয় নাই?" একজন বলিল, "এই লইয়া গেল"। তখন কালবিলম্ব না করিয়া অশ্বিনীকুমারদ্বয় নিজেদের সোণার রথে চড়িয়া অতি শীঘ্র শ্মশানঘাটে আসিয়া দূর হইতেই চীৎকার করিয়া বলিলেন, "মড়া জ্বালাইও না।" সবে চিতা তৈরী হইয়াছে, তাঁহার উপর নূতন কাপড় পরাইয়া শিশুটীকে রাখা হইয়াছে, সেই সময়ে অশ্বিনীকুমারেরা যাইয়া নাড়ি পরীক্ষা করিয়া বলিলেন—"এ শিশু মরে নাই। একে চিতা হইতে নামান হউক।"

তার পর তাঁহাদের দেওয়া ঔষধের গুণে বিষ্ণুপার ছেলে ধীরে ধীরে চোখ মেলিল এবং উঠিয়া বসিল।

ঋজ্রাস্ব ঋষি বৃদ্ধকালে একেবারে অন্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট দিনরাত্রি এক হইয়া গিয়াছিল; পদ্ম ফুল ফুটিলেও তিনি তাহা দেখিতে পাইতেন না, পদ্মের মত সুন্দর নিজের ছেলেদের মুখ দেখিয়াও তিনি জুড়াইতে পারিতেন না। অশ্বিনীরা সেই দুইটি নষ্ট চক্ষের দৃষ্টি ফিরাইয়া দিলেন। তখন আনন্দে গদগদ হইয়া এই সুন্দর পৃথিবীটা নূতন চক্ষে দেখিয়া ঋজ্রাস্ব অশ্বিনীকুমারদের স্তুতি গাহিয়া আকাশ প্রতিধ্বনিত করিয়াছিলেন।

বেদে অশ্বিনীকুমারদের আরও অনেক আশ্চর্য্য চিকিৎসার কথা লিখিত আছে।

শত্রুরা অত্রিঋতিকে সাত পাক দড়িতে বাঁধিয়া আগুনের মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছিল। তখন তাঁহার মৃত্যু নিশ্চত জানিয়া সেই আগুনের মধ্যে তাঁহাকে ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছিল। অশ্বিনীকুমারদ্বয় নানারূপ কৌশলে এমন সকল ঔষধ



অশ্বিনীকুমারদ্বয়......চীৎকার করিয়া বলিলেন—"মড়া জ্বালাইও না।"

সেই অগ্নিকুণ্ডে ফেলিয়া দেন, যাহাতে তাহার দাহিকাশক্তি অনেকটা নষ্ট হইয়া যায়, তার পর আগুন নিবাইয়া অর্দ্ধদগ্ধ-চর্ম্ম-বিশিষ্ট ঋষিকে টানিয়া বাহির করিলেন এবং সুচিকিৎসার দ্বারা তাঁহার জীবন রক্ষা করিলেন।

একদিন অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের পাড়ার একটা লোক কাঁদিয়া আসিয়া পায়ে পড়ে! সেই লোকটার নামে বলিতে থাকে—"আমার জীবিকা চালাইবার কোন উপায় নাই—একটা গাই আছে, উহা রোজ দুই তিন সের দুধ দিত—তাতেই আমার সংসার কোনরূপ চলিত। এখন গাইটা একেবারে বৃদ্ধ হইয়া গিয়াছে—তাকে অনেক কচি ঘাষ খাওয়াইয়া দেখিয়াছি,—কিছুতেই এককোঁটা দুধ দেয় না—এখন যে আমরা বাড়ীশুদ্ধ না খাইয়া মরিতেছি, কর্ত্তা, উপায় কি?"

অশ্বিনীকুমারেরা গরুটাকে দেখিতে চাহিলেন, গরুটাকে তাঁহাদের কাছে আনা হইল। গরুটার বাঁট ভালরূপ পরীক্ষা করিয়া তাঁহারা একটা তৈল সেই বাঁটে মালিস করিতে দিলেন, আর একটা ঔষধ দিলেন ঘাসের সহিত খাইতে। ইহার পর গরুটা দুই সের করিয়া দুধ দিতে লাগিল, এবং ক্রমাগত ঔষধ খাওয়াইয়া এই দুধের পরিমাণ আট সের পর্য্যন্ত হইল। তাহার স্ফুর্ত্তি এখন দেখে কে?

শর্য্যাত নামক এক প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন, ইনি যেরূপ সোমরস প্রস্তুত করিতে পারিতেন সেরূপ আর কেহ করিতে পারিতেন না। স্বয়ং ইন্দ্র অন্য সমস্ত সোমরস ফেলিয়া ইঁহারই প্রস্তুত রস পান করিতেন এবং বাহবা দিতেন।

এই রাজার বাড়ীতে রাত্রিদিন আমোদ আহ্লাদ চলিত। ইঁহার একটি মেয়ে ছিল—তার নাম 'সুকন্যা।' সুকন্যা নাচিতে গাহিতে এমন পারিত যে, আর কেউ তার সমকক্ষ ছিল না। তার মত সুন্দরীও সেকালে বড় বেশী দেখা যাইত না। কেবলই আমোদ আহ্লাদ ও কৌতুকে সুকন্যা মাতিয়া থাকিত।

সে সবে মাত্র যৌবনে পা দিয়াছিল। রঙ্গরস ভালবাসিলেও সুকন্যার মত দৃঢ় চরিত্র মেয়ে খুব কমই ছিল। শর্য্যাত রাজা কন্যাকে প্রাণের মত ভালবাসিতেন। রাজা যেখানে যেখানে যাইতেন, সেখানে সেখানে সুকন্যাকে সঙ্গে নিতেন। একবার তিনি শীকার করিতে গিয়াছেন, সঙ্গে শত শত সৈন্য, আর একজন তাঁহার সমস্ত শ্রান্তি দূর করিবার জন্য সঙ্গে সঙ্গে ছিল—সে সুকন্যা। রাজা মৃগয়া করিয়া ক্লান্ত হইয়া শিবিরে বসিতেন, সুকন্যা সেই সময় গান গাহিয়া রাজার মনোরঞ্জন করিত।

একদিন রাজা শিকারে গিয়াছেন, প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে,—রাজার এখন ফিরিবার সময়, ত্রস্তপদে সুকন্যা শিবিরের দিকে আসিতেছে, বনদেবীর মত বনটা ঘুরিয়া দেখিতেছিল, এমন সময় সে দেখিল একটা উঁচু জায়গা, তার চারিদিক ঘিরিয়া বনলতা ও ছোট ছোট গাছ,—সে ঘন ঘন গাছের ছোট পাতার আড়ালে সুকন্যা দেখিতে পাইল, কি যেন দুইখণ্ড কাঁচের মত জ্বলিতেছে।

সুকন্যা তাড়াতাড়ি একটা কাঠি লইয়া সেই ঝোপটি নাড়িয়া দেখিতে লাগিল ; সেই উজ্জ্বল জিনিষ দুইটী মাটীর নীচে ; হাত দিয়া ধরিতে যাইয়া কুমারী তাহা ছুঁইতে পারিল না, অত নীচে আঙ্গুল ঢোকে না, তখন কাঠি দুইটি দিয়া উহা খোঁচাইয়া বাহির করার মতলবে সুকন্যা খুব জোরে সেই দুইটা শক্ত কাঠি দিয়া চক্‌মকে জিনিষ দুইটার উপর ঘা দিল।

ওগো, একি অদ্ভুত কাণ্ড! চ্যবন ঋষি তপস্যা করিতেছিলেন, তাহার উপর কত যুগ চলিয়া গিয়াছে। ঋষি একটা মাটীর ঢিপিতে পরিণত হইয়াছেন, সেই ঢিপির উপর কত শত গাছ জন্মিয়াছে ; সেই দুইটা চক্‌চকে জিনিষ আর কিছু নয় উহা সেই ঋষির দুইটা চোখ। ঋষি সুকন্যাকে দেখিয়া জপ তপ যোগ ভুলিয়া গিয়াছিলেন, জ্বলজ্বলে চোখ খুলিয়া সুকন্যাকে দেখিতেছিলেন।

এই চোখ দুইটাকে বহু মূল্য কোন পাথর ভাবিয়া সুকন্যা কাঠি দিয়া খোঁচাইতেছিল।

ঋষি তখনই লতাগুল্ম ভেদ করিয়া,—মাটীর ঢিপি ভেদ করিয়া সুকন্যার সাম্‌নে দাঁড়াইলেন, তাঁর সাদা সাদা দাড়ী মৃত্তিকা মলিন শরীরের উপর বুক বাহিয়া গঙ্গাধারার ন্যায় শোভা পাইতেছিল; তাঁর নখগুলি কোঁকড়াইয়া গিয়া মহিষের শিঙ্গের মত বাঁকা হইয়া গিয়াছিল। তাঁর মাথার উপর জটায় মাটী জমিয়াছিল একরাশ, তাতে সুন্দর সুন্দর লাল ফুল দেখা যাইতেছিল। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় তাঁর যোগবলে যে চক্ষু দুটীর জ্যোতিঃ হীরার মত হইয়াছিল, তাহা সেই সুকন্যার কাঠির খোঁচা খাইয়া একেবারে অন্ধ হইয়া গিয়াছিল, কাঠি দুইটা সেই চক্ষু দুটীতে বিঁধিয়াই ছিল, তাহা হইতে ঝর ঝর করিয়া রক্ত পড়িতেছিল।

রঙ্গরস-প্রিয় কুমারীর সমস্ত কৌতুক ফুরাইয়া গেল, ঋষির শাপের ভয়ে থরথর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে সুকন্যা চ্যবনের পায়ের নীচে পড়িয়া গেল। সে দুটী পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "ক্ষমা করুন ঋষি, আমি অজ্ঞান বালিকা, রাগ করিবেন না; আমি আপনাকে কষ্ট দিয়া নিজে সুখী হইতে চাই না, আমি আজীবন আপনার দুখের ভার নিজে লইব, আমার এই সামান্য রূপ দেখিবার জন্য যদি আপনার চক্ষু এই ঝোপের মধ্য হইতে অমন উজ্জ্বলভাবে চাহিয়া থাকে—তবে এই রূপ—যাহা এই অনর্থ ঘটাইল, তাহা আপনাকেই দিব। আমি আজ হইতে আপনার সেবা করিবার দাবী চাহিতেছি, আজ হইতে সুকন্যা আপনার "ধর্ম্ম-পত্নী"।

ঋষির রাগ পড়িয়া গেল, তাহার চক্ষু নষ্ট হওয়ার দুঃখ যেন সুকন্যার মধুর কথায় দূর লইয়া গেল। তিনি বলিলেন,—"সুকন্যা, আমি বৃদ্ধ, অন্ধ, আমাকে

লইয়া তুমি কি করিবে ?” সুকন্যা বলিল—“আমি আপনার যোগবলের অংশ চাই—আপনি আমাকে জীবনের কি বড় উদ্দেশ্য তাই শিখাইয়া দিন, এই শরীরের রূপ তুচ্ছ, এই শরীর—যাহা পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়, মাটীতে রাখিলে মাটী হইয়া যায়, ইহা অতি তুচ্ছ ; আপনি আমাকে আত্মার সম্পদ দিন্। আমি আপনাকে পাইয়া পরম সৌভাগ্যবতী হইব ! কখন সূর্য্য রথে চড়িয়া দেবলোকে ভ্রমণ করেন, কখন এই বনে সন্ধ্যামালতীর লাল দলগুলি অস্তগত সূর্য্যের আভায় আরও লাল হইয়া ফোটে, আমি তাহা আমার এই দুই চক্ষে দেখিয়া আপনাকে দেখাইব ; আপনি আপনার মনে সেই ছবি আঁকিয়া ফেলিবেন। আমি কথার দ্বারা, নিজে যাহা দেখিব সব আপনাকে দেখাইব। আমি আপনার চক্ষু নষ্ট করিয়া সেই অনুতাপে নিজের চক্ষু দুটি এখনই নষ্ট করিয়া ফেলিতে পারি, তাহাতে আমি দুঃখ বোধ করিব না। কিন্তু আমার চক্ষু যতক্ষণ আপনার দৃষ্টির অভাব পূরণ করিবে, ততক্ষণ হতভাগিনীর এই দুটি চক্ষের দাম আছে।”

ইহার মধ্যে শর্য্যাত রাজা সমস্ত কথা শুনিয়া একটু বিরক্ত হইলেন। এক অতি বৃদ্ধ জরাজীর্ণ ঋষি, তাঁহার আয়ু ত ফুরাইয়া আসিয়াছে, তাঁহার চোখের দৃষ্টিই বা কতদিন থাকিত, ইহার জন্য পৃথিবীর মধ্য-মণির ন্যায় সুন্দরী বালিকা তার জীবনটা ব্যর্থ করিতে বসিয়াছে, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া চ্যবনকে বরণ করিয়া ফেলিয়াছে,—এখন আর উপায় নাই। কি করিবেন ? তিনি বলিলেন, “সুকন্যা, আমার সঙ্গে রাজ-প্রাসাদে চল, তোমার স্বামী যে ভাবে তপস্যা করিতেছিলেন—তাহাই করুন।” কিন্তু রাজকুমারী কিছুতেই স্বীকৃত হইলেন না, বিরক্ত হইয়া শর্য্যাত রাজা গৃহে ফিরিয়া গেলেন।

এদিকে তার স্বামী যখন প্রাতঃকালে সূর্য্যের দিকে মুখ ফিরাইয়া কিছুই না দেখিয়া বিমর্ষভাবে বসিয়া থাকেন, তখন সুকন্যার দুটি চোখ জলে ভরিয়া আসে।

যখন অন্ধ ঋষির আশ্রমের কাছে রজনীগন্ধা, চম্পক প্রভৃতি ফোটে তখন ঋষি বলেন, চাঁপার বর্ণটি কি সুন্দর, রজনী গন্ধার ঝাড় কি সাদা, যখন চোখ ছিল, তখন যদি জানিতাম, চোখ হারাইব, তবে জপ তপ ভুলিয়া সারাদিন এই ফুলবনের ফুলগুলি দেখিয়া কাটাইতাম। এই বিলাপ শুনিয়া সুকন্যার বুকে যেন শেল বিঁধিত। আহার নিদ্রা ছাড়িয়া সুকন্যা এই অবস্থায় অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের নিকট মনে মনে বর প্রার্থনা করিতেন। মানুষের মন যখন দেবতার জন্য কাঁদিয়া উঠে, তখন দেবতার প্রাণেও সাড়া দেয়। অশ্বিনীকুমারদ্বয় পরম রূপবান যুবক ছিলেন, তাঁহারা একদিন সুকন্যার কাছে নির্জ্জনে আসিয়া তাহার প্রণয়-প্রার্থী হইয়া বলিলেন, "এই অন্ধ বুড়ো ঋষিকে দিয়া তুমি কি করিবে, তোমার জীবনটা একবারে মাটী করিতে বসিয়াছ?" তাঁহারা সুকন্যার মন বুঝিবার জন্য তাহাকে নানারূপ প্রলোভন দেখাইলেন। সুকন্যা বলিলেন, "তোমাদের মূর্ত্তি এমন সুন্দর, তাহা দেখিয়া আনন্দ হইতেছে, কিন্তু তোমাদের এ সকল কথা আমার কাণে বিঁধিতেছে। আমি তুচ্ছ দেহের সুখ চাই না, এই অন্ধ বৃদ্ধের পায়ের ধূলির নিকট আমি সমস্ত পৃথিবীটা তুচ্ছ মনে করি, ইঁনি আমার প্রাণ মন অধিকার করিয়া আছেন, যে সকল স্ত্রী রূপ-যৌবন লালসা করে আপনারা তাহাদের নিকট যাউন, এই আশ্রমকে অপমান করিবেন না।" এই বলিয়া তিনি ঘৃণায় মুখ ফিরাইলেন এবং মাটিতে চক্ষু দুটি নত করিয়া বিন্দু বিন্দু অশ্রু ফেলিতে লাগিলেন। তখন অশ্বিনীকুমারদ্বয় বলিলেন, "আমরা তোমার মনের বল পরীক্ষা করিবার জন্য এই সকল প্রলোভন দেখাইয়াছি, আমরা অশ্বিনীকুমার, তুমি আমাদের মনে মনে শরণ লইয়াছ, এজন্য আমরা আসিয়াছি।"

অশ্বিনীকুমারেরা চ্যবনের চক্ষু ভাল করিয়া দিলেন। শুধু তাহাই নহে, তাঁহার শরীর এরূপ শক্তিমান করিয়া দিলেন যে তাহাতে নব যুবকের কান্তি খেলিতে লাগিল। এই চ্যবন ঋষি ও সুকন্যা মহাকবি বাল্মিকীর মাতা পিতা।



"আমার দেশের" পাঠক পাঠিকাদের প্রিয় লেখক ৺যতীন্দ্রনাথ পাল।

ঘুম ভাঙ্গানো কল।

[৺ যতীন্দ্রনাথ পালের রচিত প্রবন্ধ ছড়া, তোমাদের আর দিতে পারিব না বলিয়া দুঃখ করিয়াছিলাম—একটু আনন্দের কথা, যে এখনো দু'টি ছড়া আমাদের কাছে ছিল—একটি এই, আর একটিও পরে তোমরা পড়িতে পাইবে।]

(১)

এক দেশে এক বুড়ি ছিল,
বেজায় দজ্জাল ;
যখন তখন যাকে তাকে,
দিত কেবল গাল।

(২)

এক কাঁড়ি তার টাকা ছিল,
পোঁতা ঘরের মেঝে ;
ফোঁটা চন্দন পরে বুড়ি,
থাকতো সদাই সেজে।

(৩)

পৃথিবীতে কেউ ছিল না,
থাকতো একা ঘরে ;
রাত্রে বুড়ির ঘুম হতো না,
চোর ডাকাতের ডরে।

(৪)

ভাবলে বুড়ি এমন করে,
রাত কত যায় জাগা ;
চোর তাড়ানোর মন্ত্র কিংবা,
বাঁধতে হবে তাগা।

(৫)

রোজার বাড়ী গেল বুড়ি,
বল্লে সমুদয় ;
শুনে রোজা বল্লে বুড়ি,
ঘুচুবো তোর ভয়।

(৬)

বুড়ির সঙ্গে এলো রোজা,
ঘুচুতে বুড়ির ডর ;
মন্ত্র পড়ে গণ্ডি দিলে,
বুড়ির সকল ঘর।

(৭)

কার্য্য সেরে টাকা নিয়ে,
রোজা গেল বাড়ী ;
বুড়ির কিন্তু ঘুচ্‌লো না ভয়,
নিয়ে টাকার কাঁড়ী।

(৮)

তবু ত বুড়ির ঘুম হয় না,
খুট কল্লেই ওঠে ;
যা-তা বলে গাল পাড়ে আর,
দোরের দিকে ছোটে।

(৯)

ভাব্‌তে ভাব্‌তে ভাবার বুড়ির,
ফল্লো একটা ফল ;
বের কল্লে খাসা ভেবে,
ঘুম ভাঙ্গান কল।

(১০)

প্রকাণ্ড এক পাথর এনে,
তুল্‌লে নিজের ঘরে ;
মাথার ওপর ঝুলিয়ে দিলে,
জুতটা খাসা করে।



মাথার উপর ঝুলিয়া দিলে,

(১১)

তার সঙ্গে বাঁধলে দড়ি,
লম্বা পাঁচ হাত;
কায়দা করে বাঁধলে সেটা,
নিয়ে দোরের সাত।

(১২)

এমনি মজার সে বাঁধনে,
ফল হলো ভাই শেষে;
খুল্‌লে দরজা নামবে পাথর,
ঠেক্‌বে মাথায় এসে।

(১৩)

ভাবলে বুড়ি আর ভয় কি,
জবদ্ চোরের দল;
কেমন মজার বার করেছি,
ঘুম ভাঙ্গান কল।

(১৪)

দোর খুল্‌লেই ঠেক্‌বে পাথর,
ভাঙ্গবে আমার ঘুম;
রাত দুপুরে ছুটিয়ে দেব,
গালাগালির ধুম।

(১৫)

চীৎকারেতে পাড়ার লোক,
আস্‌বে সবাই জুটে;
ভয়ে ভয়ে চোর গুলো সব,
পালিয়ে যাবে ছুটে।

(১৬)

আমোদ বুড়ির হলো বেজায়,
ভাবনা গেল তার;
নাক ডাকিয়ে ঘুমোয় সুখে,
ভয়টা কিসের আর।

(১৭)

দিনের পরে দিন চলে যায়,
রাত চলে যায় খাশা;
চোরেরা কিন্তু সুযোগ খোঁজে,
মিটুতে তাদের আশা।

(১৮)

সেদিন ছিল ঘুর ঘুটে রাত,
চম্‌কে ওঠে পিলে;
বুড়ির ঘরে চোরের দল,
ঢুক্‌লো সবাই মিলে।

(১৯)

দরজা ঠেলে ঢুক্‌লো যেমন,
ঘরে চোরের দল—
অমনি সটাং নেমে এলো,
ঘুম ভাঙ্গানো কল।

(২০)

প্রকাণ্ড সে পাথরখানা,
হিমালয়ের চুড়ো ;
যেমন বুড়ির লাগ্‌লো মাথায়,
অমনি মাথা গুঁড়ো।

(২১)

চোর তাড়ানো বেরিয়ে গেল,
উঠ্‌লো মহা গোল ;
বুড়ি হলো ইতি সেথায়,
বাজা সবাই ঢোল।

(২২)

বুদ্ধি যাদের বুড়ির মত,
এম্‌নি পায় ফল ;
তারাই করে এমনি ধারা,
ঘুম-ভাঙ্গান কল।



অমনি মাথা গুঁড়ো।

শিল্প-কলা।

বিশ্বশিল্পী।

মিলে

জন্ম ১৮১৫, মৃত্যু ১৮৭৫

গির্জ্জার ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল, কৃষকদ্বয় মাঠের কাজ ফেলিয়া অমনি নতমস্তকে যুক্ত করে দাঁড়াইয়া পড়িল। মনের মধ্যে সেই করুণাময়ের রূপজ্যোতিঃ ভাসিয়া উঠিল—আপনা হইতে মাথা নত হইয়া পড়িল।

এই ছবিখানির শিল্পীর নাম—জিন্ ফ্রাঙ্কো মিলে। এঁরই সম্বন্ধে একটা কথা প্রচলিত ছিল যে তিনি শস্যক্ষেত্রের মধ্যকার কবিত্ব অন্তর দিয়া দেখিতে জানিতেন, চাষীদের ভালবাসিতেন এবং যখনই তাহাদের আঁকিয়াছেন, তাঁহার অন্তর নিহিত প্রগাঢ় সহানুভূতিতে চিত্রগুলি বেশী করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

এই সুন্দর ছবিখানি মিলে ১০৫০৲ টাকায় বিক্রয় করিয়াছিলেন, বহু হাত ঘুরিয়া সম্প্রতি প্যারীর এক ভদ্রলোক ছবিখানি ৪৮০০০০৲ টাকা মূল্যে ক্রয় করিয়াছেন। যাঁহার অঙ্কিত ছবির এত দাম তোমরা নিশ্চই ভাবিতেছ তিনি বেশ অর্থশালী ব্যক্তিই ছিলেন। না গো, মিলের সারাজীবন দুঃখের সঙ্গে সংগ্রাম করিতেই কাটিয়া গিয়াছিল, শেষ জীবন ত দারিদ্র্য সাগরে আকণ্ঠ ডুবিয়াইছিলেন। সেই যে আমাদের দ্বিজেন্দ্রলাল বলিয়াছেন—হায় মা! যারাই কি গো তোমার ভক্ত তারাই কি মা নিঃস্ব তত! এ খেদ এ ক্ষোভ সব দেশে সব শিল্পীরই জীবনের কথা। কিন্তু শিল্পীর পক্ষে সে ক্ষোভ নয়, লজ্জাও নয়। সেই মহাকবিই বলিয়াছেন—

তবু সে লজ্জা তবু সে দৈন্য সহেছি মা সুখে তোমারই জন্য!



"যেতে নাহি দিব"— সার জন্ মিলে।

যে সময়ে ইওরোপে রোম্যান পোপের সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতারও অপব্যয় হইতেছিল, সেই সময়ে একদল লোক পোপের অত্যাচারের বিরুদ্ধে মস্তকো-ত্তোলন করিয়া দাঁড়ায়—ইহাদের নাম হইয়াছিল, প্রোটেষ্ট্যাণ্ট। প্রোটে-ষ্ট্যাণ্টদের আবার হিউজনট্ও বলা হইয়া থাকিত। ক্যাথলিক ও প্রোটেষ্ট্যাণ্টদের মধ্যে এক সময়ে বিপ্লব উপস্থিত হয়। সেই সময়কারই এক ঘটনা লইয়া শিল্পী এই চিত্রখানি অাঁকিয়া ছিলেন। যুবক সেই বিপ্লবে উপস্থিত হইয়া যুদ্ধ করিবে—মেয়েটির নিকট বিদায় চাহিতেছে। মেয়েটি কিন্তু কিছুতেই ছাড়িবে না। সুদৃঢ় বন্ধনে প্রিয়তমকে বাঁধিয়া বলিতেছে—যেতে নাহি দিব।

মিলে তেইশ বৎসর বয়সের সময় এই ছবিখানি অাঁকিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার প্রভূত যশ হইয়াছিল।

———



স্বপ্নাবিষ্ট— এ্যালবার্ট মূর

স্বপ্ন দেখে সবাই! কত সুখের স্বপ্ন, কত দুঃখের স্বপ্ন, কত দেশ-বিদেশের সোণার স্বপ্ন, কত চাঁদের জোৎস্না মাখা স্বপ্ন নিদ্রিতাবস্থায় মানুষের অন্তর ভরিয়া উঠে! নিদ্রার ঘোরে স্বপ্নের আবেশে কত আনন্দ, কত দুঃখ, কত উদ্বেগ, কত উৎকণ্ঠা যে ফুটিয়া উঠে তার স্থিরতা নাই। এই চিত্রখানিতে দেখ, একজনের ঘুমন্ত মুখখানি কোনো এক স্বপ্নের ঘোরে কেমন গম্ভীর ভাব ধারণ করিয়াছে; আর একজনের দেখ, নিদ্রিত গোলাপটির মত কেমন প্রফুল্ল মুখখানি—আর একজন! সে নিদ্রা যায় নাই তবুও স্বপ্ন দেখিতেছে। স্বপ্নে তাহার চোখের দৃষ্টি কত দূরে—দূরে চলিয়া গেছে, যেন সে এ জগতে নাই, কোন্ দূরান্তরে স্বপ্ন রাজ্যে বেড়াইতেছে।

———



জীবন— **ফ্রেডরিক ওয়াকার**

এই ছবিখানিতে শিল্পী অতি অল্পের মধ্যে একটি বাস্তব জগৎ ফুটাইয়া দিয়াছেন। গ্রামের লোক ঐ যে মর্ম্মরমূর্ত্তিটি—একদিন যে জীবন্ত ও প্রত্যক্ষ ছিল এবং গ্রামের লোকেরাই বড় বলিয়া যাহার মর্ম্মর মূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছে—জীবন সংগ্রামে বহু ঝঞ্ঝা, বহু বিপদ আপদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া চিরশান্তি বিরাজিত লোকে গমন করিয়াছে, তাহাকেই ঘিরিয়া বসিয়া ও দাঁড়াইয়া! এদিকে একটি রূপলাবণ্যময়ী মেয়ে, তাহার হাত ধরিয়া এক অতি বৃদ্ধা কুব্জপৃষ্ঠ ন্যুব্জদেহে চলিয়াছে। অন্যদিকে যৌবন দর্পিত এক চাষী—বিশ্বের, ভবিষ্যতের কোন ভাবনাই যাহার নাই, কেবল গায়ের জোরেই মেদিনী বক্ষ বিদীর্ণ করিতেছে—এই ত পৃথিবী!

ওয়াকার মাত্র ৩৫ বৎসর বয়সে মারা যান। সেই বয়সেই তাঁহার খ্যাতি দিগদিগন্তে বিস্তারিত হইয়া পড়িয়াছিল।





ব্লু বয়—

গেন্‌সবোরো

১৭২৭—১৭৮৫

মাষ্টার বাটালের প্রতিমূর্ত্তি। এমন সব পোষাক-পরিচ্ছদ সত্ত্বেও ছেলেটির সর্ব্বাঙ্গে কেমন একটা স্নিগ্ধ কমনীয়তা একটা শান্তসরলতা বিরাজ করিতেছে। ছবিটিতে রঙের বিশেষ জাঁকজমক নেই, রঙের মধ্যে নীল রঙটাই যা প্রকাশ হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতেই কত শোভা।

———





প
বি
ত্র
তা





সার
জো
সুয়া
রেণ
ল্ডস্।
১৭২৩
—
১৭৯২



এই যে মেয়েটি বসিয়া রহিয়াছে দেখ দেখ, কি পবিত্র, নির্দ্দোষ, সরলতামাখা তার মুখখানি। এ সেই বয়সের একটি সুকুমার শিশুর ছবি যে বয়সে সংসারের ভাবনা, চিন্তা কিছু থাকে না। কপটতা, ছলনা—এ সব যখন মনে স্থান পায় না—সেই সময়কার ছবি। রেণল্ডসের অঙ্কিত চিত্রগুলির মধ্যে এই খানিকেই অনেকে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর ও নয়নরঞ্জক ছবি বলিয়া মনে করেন।

আহুতি।

নিঃস্তব্ধ নিশীথে কৃষ্ণ সমুদ্রের উপর দিয়া জাহাজখানি ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিল। কৃষ্ণ আকাশে মিটি মিটি তারার আলো কালো জলের উপর চিক মিক করিতেছিল। গভীর রাত্রি। যাত্রীগণ গভীর নিদ্রামগ্ন। হঠাৎ সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া কে মরণের আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল—আগুন! আগুন!

কোথায় রহিল নিদ্রা, কোথায় রহিল নীরবতা! যাত্রীরা সব শয্যা ফেলিয়া ডেকের উপর আসিয়া হৈ চৈ করিতে লাগিল। জাহাজে আগুন ধরিয়াছে। জাহাজের এঞ্জিন ঘর দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে।

ক্রমে আগুন এঞ্জিনঘর ছাড়িয়া বাহিরে ছড়াইয়া পড়িল। তখন মা ছেলেকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন, ভ্রাতা ভগ্নীকে বুকে তুলিয়া লইলেন, স্বামী স্ত্রীকে বাহুপাশে বাঁধিয়া মরণের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। আর রক্ষা নাই। জাহাজের আগুনের রশ্মি কালো জলকে রাঙাইয়া তুলিল—আকাশও রঙীন হইয়া উঠিল—আর আকাশে ও সমুদ্রের বক্ষে শত সহস্রের আর্ত্তনাদ প্রতিধ্বনি তুলিয়া দিগবিদিক ছাইয়া ফেলিল।

হঠাৎ কাপ্তেন দিঙ্‌নির্ণয় যন্ত্রের সাহায্যে জানিতে পারিলেন যে তীর নিকটেই আছে। কোনমতে দশটি মিনিট জাহাজখানি চালাইয়া লইতে পারিলে রক্ষা পাওয়া যাইতে পারে। তিনি যাত্রীদের সেই কথা জানাইলেন। মরণোন্মুখ যাত্রীদের মনে একটু আশার সঞ্চার হইল।

কিন্তু জাহাজ চলিবে কিরূপে? কর্ণধারের কক্ষেও যে আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে। কর্ণধার কিরূপে কল চালাইবেন?

কাপ্তেন হাঁকিলেন—কর্ণধার, তুমি কি আছ?

কর্ণধার আগুনের মধ্যে কলটি ধরিয়াই বসিয়াছিলেন, বলিলেন—আছি মহাশয়!

কর্ণধার ডেকের যাত্রীদের একবার দেখিয়া লইলেন। যাত্রীদের মুখে আশার আনন্দ জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিয়াছে দেখিয়া আবার নিজের কাজেই মন দিলেন।

আগুন আরো বাড়িয়া উঠিল, যাত্রীদের মধ্যে আবার আর্ত্তনাদ উঠিতে লাগিল—কিন্তু ঠিক সেই সময়েই জাহাজ কূলে আসিয়া পঁহুছিল।

হু হু করিয়া লোক কূলে নামিয়া গেল, যাত্রী, নাবিক, কাপ্তেন সব গেল। কাপ্তেন সকলকেই পাইলেন। পাইলেন না কেবল কর্ণধার মেনার্ডকে!

ফায়ার ব্রিগেড্ আগুণ নিভাইল, কাপ্তেন জাহাজে উঠিয়া কেবলমাত্র কর্ণধার মেনার্ডের দগ্ধ মৃতদেহই দেখিতে পাইলেন।

অগণিত যাত্রী, নরনারী, শিশুদের রক্ষা করিতে মেনার্ড নিজ প্রাণ আহুতি দিতেও ছাড়িলেন না।

রেলের যাত্রী।

কেন্টিশ সহরে গাড়ী আসিলে প্রথম শ্রেণীর কামরার জানালা দিয়া একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক মুখ বাড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"গার্ড! এই কি বেড্‌ফোর্ড?"

গার্ড উত্তর করিলেন "না মহাশয় ইহা বেড্‌ফোর্ড নয়। বেড্‌ফোর্ডে পৌঁছিয়া আমি আপনাকে আসিয়া বলিব।"

গাড়ী চলিতে লাগিল, এবং বৃদ্ধ ভদ্রলোকটী স্থিরমনে একখানা খবরের কাগজ পাঠ করিতে লাগিলেন, পরের ষ্টেশনে গাড়ী দাঁড়াইল।

বৃদ্ধ ভদ্রলোকটী পুনরায় অতিশয় ব্যস্ততার সহিত ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "গার্ড, গা-আ-র্ড, ওহে গার্ড এই কি বেড্‌ফোর্ড?

গার্ড পুনরায় বলিলেন "না, না মহাশয়, বের্ডফোর্ডে আসিয়া আমি আপনাকে বলিব।" হুইসিল্ দিয়া গাড়ী পুনর্ব্বার অগ্রসর হইতে লাগিল।

ইহার পরের ষ্টেশনে আসিয়াও ভদ্রলোক ও গার্ড—সাহেবের মধ্যে এই একই প্রকার কথোপকথন হইল। গার্ডসাহেব বলিলেন—যে বেড্‌ফোর্ডে আসিলে তিনি তাহাকে জানাইতে কোন প্রকার ভুল করিবেন না।

অবশেষে বেড্‌ফোর্ড ষ্টেশনে গাড়ী আসিল; গার্ড—সাহেব নানা কাজের ব্যস্ততা বশতঃ প্রথম শ্রেণীর কামরার সেই ভদ্র লোকটীর কথা একেবারে ভুলিয়া গেলেন, ভদ্রলোকটীও আর গার্ডকে জিজ্ঞাসা করা প্রয়োজন বোধ করিলেন না। এবং যেই মাত্র বেডফোর্ড হইতে গাড়ী ছাড়িল অমনি গার্ড সাহেবের ভদ্রলোকটীর কথা মনে হইল, ভদ্রলোকটীর নিকট যে কথা দিয়াছিলেন তাহা স্মরণ হওয়ায় তিনি তাড়াতাড়ি আসন হইতে উঠিয়া গাড়ী থামাইবার সাঙ্কেতিক শিকল ধরিয়া টানিলেন, গাড়ী থামিল।

গার্ড সাহেব তাড়াতাড়ি গাড়ী হইতে লাফাইয়া নামিলেন এবং ভদ্রলোকটীর কামরার নিকট আসিলেন। কেবল এই ভদ্রলোকটীর জন্যই তাঁহার এত কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। তিনি চিৎকার করিয়া বলিলেন, "মহাশয়, এই বেডফোর্ড, শীঘ্র করুন, আপনার গাঁটরীটি আমার হাতে দিন, আপনার জন্যই আমায় গাড়ী থামাইতে হইয়াছে।"

বৃদ্ধ ভদ্রলোকটী গার্ড সাহেবের দিকে চাহিলেন। গার্ড অতিশয় উৎকণ্ঠার

সহিত অনুরোধ করিতে লাগিলেন "মহাশয় শীঘ্র অবতরণ করুন, শীঘ্র নামুন, গাড়ী আর বিলম্ব করা যায় না", এই বলিয়া গার্ড নিজহাতে ভদ্রলোকটীর গাঁটরী ধরিয়া তাড়াতাড়ি—প্ল্যাটফরমে নামাইয়া রাখিলেন।

বৃদ্ধ ভদ্রলোকটী গার্ড সাহেবকে ধন্যবাদ দিয়া সন্তুষ্টের ভান করিয়া বলিলেন "আমার এখানে নামিবার আদৌ ইচ্ছা ছিল না, আমার জন্য যে আপনি এতটা কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন তজ্জন্য আপনাকে ধন্যবাদ দিতেছি এবং দুঃখ প্রকাশ করিতেছি। আসলে আমার স্ত্রী আমাকে বেডফোর্ডে আসিয়া—একমাত্রা কুইনাইন্ সেবন করিতে বলিয়াছিলেন, সেই কারণেই আমি পুনঃ পুনঃ জানিতে চাহিলাম যে বেড্‌ফোর্ডে আসিয়াছি কিনা, আমি বেড্‌ফোর্ডে নামিব এই জন্য জিজ্ঞাসা করি নাই, আমার কুইনাইন্ সেবনের সময় ঠিক করিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম।"

হরি! হরি!

শ্রীনিবারণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

মুস্কল-আসান।

(গল্প)

জামাতা জানকীরাম কর্ম্মস্থানে বদ্‌লি হচ্ছেন বলে তাঁর কিছু তৈজস্‌পত্র শ্বশুর মহাশয়ের বাড়ী গচ্ছিত রেখে গেছেন।

আপিস্ থেকে তাঁর শ্বশুর জীবন বাবু. বাড়ী ঢুকেই দোর গোড়ায় গুটী-পাঁচ ছয় বাক্স পেঁট্‌রা দেখে চাকর ভোলাকে চেঁচিয়ে ডেকে জিজ্ঞেস কল্লেন—"এসব কি?"

ভোলা সংক্ষেপে জানিয়ে দিলে—"জামাই বাবু বদ্‌লি হয়েছেন বলে এই সব জিনিষ এখানে রেখে গেছেন। তাড়াতাড়ি চলে গেলেন বলে আপনার সঙ্গে দেখা কত্তে পারেন নি।"

পরের বোঝা ঘাড়ে পড়্‌লো দেখে আর নিজের বাড়ীর স্থান অকুলান ভেবে জীবন বাবু মহাবিরক্ত হয়ে বল্লেন—"ভ্যালা মুস্কিল।"

তারপর ভোলার দিকে চেয়ে চোক গরম করে বল্লেন—"তা তুই ব্যাটা কি ঠুঁটো হয়েছিস্—? তুলে ফেল্‌না এগুলোকে ঘরে।"

ভোলা মুড়িমুড়কি চিবুতেই ব্যস্ত ছিল। বল্লে—"ঘরে আর জায়গা থাক্‌লে ত?"

"তবে আর কি? থাক তবে ঐখানেই পড়ে। পরের ঝঞ্ঝাট ঘাড়ে পড়ে আচ্ছা মুস্কিলেই পড়া গেল যাহোক।"—মহা রাগে বিরক্ত হয়ে তিনি গজগজ্‌ করে বক্‌তে বক্‌তে ভেতরে ঢুকে চেঁচিয়ে বাড়ী মাথায় করে ফেল্লেন। তাঁর বিরক্তি দেখে ছেলে বুড়ো রাঁধুনি বামুন সকলেই ভয়ে ত্রস্ত।

গৃহিণী ব্যাপার বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস কল্লেন—"কি হয়েছে কি?"

জীবনবাবু গৃহিণীর ন্যাকামো দেখে রেগে দশখানা হয়ে বল্লেন—"এই—যত মুস্কিল তোমার জন্যেই ত। যখন রাখ্‌তে এসেছিল তখন যদি বারণ কত্তে—তা'হলে ত আর এ পরের ঝঞ্ঝাট ঘাড়ে পড়্‌তো না ছিঃ—ছিঃ—ছিঃ—দেখদিকিনি এখন সব থাকে কোথায়? কি মুস্কিল, কি মুস্কিল!"

আপিস্ থেকে এইমাত্র আস্‌ছেন, মেজাজের ঠিক নেই ভেবে গৃহিণী আর কোন কথা বল্লেন না। জিনিষগুলো বাইরে যেমন ভাবে পড়েছিল তেমনি ভাবেই পড়ে রইলো। কেউ তার তত্ত্বাবধান করা প্রয়োজন মনে কল্লে না—ভোলাও না।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। রাস্তায় গ্যাস আলোগুলো তখনও জ্বেলে যায় নি। গলি ঘুঁজির পথ—লোক চলাচল তত নেই।

এমন সময় জীবনবাবুর বাড়ী একটা আল্‌খাল্লা পরা লোক, হাতে একটা পেতলের সরার ওপর চারমুখো একটা পেতলের পিদ্দীম্ জ্বালিয়ে কাঁপাগলায় হেঁড়ে স্বরে গান ধর্‌লে—

"ঈঁয়াপীর 'মুস্কিল আসান'
যাঁহা মুস্কিল, তাঁহা আসান"—

তার গান অর্দ্ধপথেই থেমে গেল। হাতের আলোটা 'দপ্' করে নিবিয়ে দিয়ে সামনেই প্রচুর ভিক্ষা দেখে একটী ছোট রকম পেঁট্‌রা আল্‌খাল্লায় পুরে সে এক পয়সার ভিক্ষের মায়া ত্যাগ করে অন্য বাড়ীর ভিক্ষের আশায় বেরিয়ে যাচ্ছিল।—

এই এত বড় 'মুস্কিল' থেকে কি করে রেহাই পেতে পারেন' তারই একটা উপায় চিন্তা কত্তে কত্তে জীবনবাবু মুখ হাত ধুচ্ছিলেন। লোকটাকে আলো হাতে বাড়ীতে ঢুকতে দেখেছিলেন, কিন্তু হঠাৎ আলোটা নিবে যাওয়ার কারণ কি বুঝতে না পেরে উঁকি মেরে দেখ্‌তে গিয়ে দেখেন—লোকটা বগলদাবাই ক'রে চুপি চুপি সরে পড়বার উদ্যোগ কচ্ছে!

হাত মুখ ধোওয়া মাথায় রেখে তিনি গিয়ে লোকটার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়লেন। লোকটার হাত থেকে তার পিদ্দীমটা ছিট্‌কে রাস্তায় গিয়ে পড়্‌লো! বাক্সটা তার আল্‌খাল্লা গলে পড়ে ঝন্ ঝন্ শব্দে বাড়ীটা কাঁপিয়ে দিলে।

তার পর দু'জনে সে কি ধস্তাধস্তি!

ভোলা নিজের ঘরটীতে চুপ্ করে বসে ব্যাপারটা কতদূর গড়ায় তাই দেখ্‌ছিল।

বার্-বাড়ীতে ভীষণ শব্দ হ'ল শুনে মেয়েরা উঁকি দিয়ে দেখেন কি কাণ্ড। জীবনবাবুর জীবন তখন প্রায় কণ্ঠাগত। গায়ের দু' এক জায়গায় আঁচড় কামড়ের দাগ দিয়ে ফুটে ফুটে রক্ত ঝরছে, বেচারা-মুস্কিল-আসান তার ঢের আগেই তাঁর হাত থেকে ছাড়িয়ে-'ছুড়িয়ে' ভিক্ষের মায়া ত্যাগ করে পালিয়ে বেঁচেছে। জীবনবাবু হতভম্বের মতো সেইখানেই দাঁড়িয়ে আছেন।

মেয়ে তরুলতা বাইরে বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস কল্লে—"কি হয়েছিল বাবা?"

তরুলতার কথায়, জীবনবাবুর রাগটা যেন আবার জ্বলে উঠ্‌লো। তিনি মুখ খিঁচিয়ে চেঁচিয়ে বল্লেন—"হয়েছিল আবার কি? তোর জানকীর ফ্যাসাদে পড়েই ত এই জ্বালা। ছিঃ—ছিঃ কি মুস্কিল! এমন মুস্কিলে মানুষেও পড়ে!"

তারপর ভোলাকে নিজের ঘরে চুপ্ করে বসে থাক্‌তে দেখে মহা রেগে, ঘুঁষি পাকিয়ে, চোখ রাঙ্গিয়ে বল্লেন—"আরে এই ব্যাটা ভোলা! ভোজা-গাঢ়োলের মত কচ্ছিস্ কি হারামজাদা? কেবল খাবি-দাবি আর ঘুমুবি—কোন একটা কাজে নেই। দেখ্‌দিকিনি—তোর জ্বালায় চোরে এক্ষুণি সব নিয়ে যেত—। ব্যাটাদের নিয়ে—কি মুস্কিল! কি মুস্কিল। কি মুস্কিলেই পড়া গেছে।

জীবনবাবুর ধমক খেয়ে ভোলা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে—মুখ্‌টা কুঁচুমাচু করে বল্লে—"ও চোর কেন হবে বাবু? ও তো 'মুস্কিল-আসান'। আপনার 'মুস্কিল' দেখেই তো 'আসান' করে দিতে এসেছিল।—আর খানিকক্ষণ টের না পেলেই আপনার সকল মুস্কিলের আসান করে দিয়ে যেত।"

ভোলার কথা বলার ধরণে এত মুস্কিলের মধ্যেও সকলে হেসে ফেল্লেন। জীবনবাবু ছাড়া!

শ্রীমৃত্যুঞ্জয় বরাট সেনগুপ্ত।

ইংলণ্ড।

আমাদের দেশের রাজা কে? তাঁহাদের বাড়ী কোথায়? কোন একটি ছোট ছেলেকেও যদি সে কথা জিজ্ঞাসা করা যায়, সে অমনি উত্তর দিবে—ইংরেজ আমাদের রাজা, আর ইংলণ্ড তাঁহাদের দেশ।" সেই ইংলণ্ডের সম্বন্ধেই কয়েকটী কথা এখানে বলিতেছি।

আজ যেমন ইংরেজের এত প্রতাপ, এত ক্ষমতা, জগৎজোড়া রাজ্য—এত বড় রাজ্য যে সূর্য্য পর্য্যন্ত কখনও সে রাজ্যে অস্ত যায় না! এত যুদ্ধের জাহাজ, উড়োজাহাজ, কামান, বন্দুক, অতুল ঐশ্বর্য্য ও ধন রত্ন যে বলিয়া বুঝান যায় না। কিন্তু একদিন ছিল, প্রায় দুই হাজার বছর আগে, এত বড় ক্ষমতাশালী স্বাধীন ইংরেজ জাতিও, আমাদেরি মত অধীন ছিলেন। বোডাসিয়া কারেক্টাসের শত বীরত্বও রোমানদের হাত হইতে ইংলণ্ডকে বাঁচাইতে পারে না।

সে কবে—কোন্ যুগে—জান? রোমান্‌রা অর্থাৎ রোমের লোকেরা যখন পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতি, সে সময়ে ইংলণ্ড রোমান্‌দের অধীন ছিল। তখন ইংরেজদের হাতে না ছিল অস্ত্রশস্ত্র, না ছিল তাহাদের এমন ক্ষমতা যে যুদ্ধ করিতে শিক্ষা করিবে, রোমান্‌রা তাহাদিগকে নিরস্ত্র করিয়াই রাখিয়াছিল; তাঁহারা একবারও এ কথাটা ভাবেন নাই যে একটা জাতিকে এইরূপ নিরস্ত্র ও অসহায় ভাবে রাখিলে—যদি কোনদিন তাঁহারা সে দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যান তাহা হইলে সেই ইংরেজ জাতি আপনাদিগকে কেমন করিয়া বিদেশী শত্রুর হাত হইতে রক্ষা করিবে?

একদিন কিন্তু সত্য সত্যই ইংরেজদের সে অবস্থা হইল। রোমানদের আপনার দেশে এক ভয়ানক গোলযোগ উপস্থিত হইল, তখন তাঁহারা নিজেদের



ব্রিটনদের রাণী বোডেসিয়া—"রোমানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কর, প্রাণ দাও, ব্রিটন স্বাধীন কর।"

দেশের শান্তির রক্ষার জন্য রোমে চলিয়া গেলেন। •ইংরেজরা ইংলণ্ডে অসহায় অবস্থায় পড়িলেন। রোমান্‌রা এতদিন বিদেশী শত্রুর হাত হইতে ইংরেজদের রক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা যখন তাহাদিগকে ফেলিয়া চলিয়া গেলেন, তখন তাঁহাদের অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইল—চারিদিক হইতে শত্রুরা তাহাদিগকে নিরস্ত্র ও অসহায় পাইয়া দেশ আক্রমণ করিল।

এইবার ইংরেজেরা বুঝিলেন যে এখন আর আপনার পায়ে দাঁড়াইতে না পারিলে, পৃথিবীর বুকে তাহাদের বাঁচিয়া থাকা অসম্ভব। অমনি আবার তাঁহারা প্রাণপণে বহুদিনের আলস্য ও জড়তা দূর করিয়া আপনার দেশ ও জাতির যাহাতে স্বাধীনতা বজায় থাকে সেজন্য মনোযোগী হইলেন। সকলে যদি মিলিয়া মিশিয়া একতাবদ্ধ হইয়া কাজ করিতে থাকেন, পরের উপর নির্ভর করিয়া থাকার আলস্য ও মূর্খতাটা ঝড়িয়া ফেলিয়া'দিতে প্রতিজ্ঞা করেন, তাহা হইলে সে আর কতদিন লাগে?

ইংরেজদের ঘুম ভাঙ্গিল, তাঁহারা জাগিয়া উঠিলেন—কত বিদেশী শত্রু আসিল—কত অত্যাচার অবিচার লুঠ-তরাজ চলিতে লাগিল, তাঁহারা এবার আর পরমুখাপেক্ষী হইলেন না। প্রাণ যাক্ ক্ষতি নাই, শত সহস্র লোকের মৃত্যু হয় হউক ক্ষতি নাই, তবু দেশকে আর পরের হাতে সঁপিয়া দিয়া নিরস্ত্র ও অসহায় হইবেন না। তাঁহারা এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া বিদেশী শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কোথাও জয়ী হইলেন, কোথাও হারিয়া গেলেন, কিন্তু শেষটায় একতার, সাহসের ও দেশ-প্রীতির সুফল'ফলিল। ইংরেজেরা স্বাধীন ভাবে দেশে বাস করিবার উপযুক্ত হইলেন। আপনাদের দেশ আপনাদের হাতেই রহিয়া গেল। সেই যে দুই হাজার বৎসর আগে তাঁহারা স্বাধীনতালাভ করিয়াছিলেন, সেই' স্বাধীনতা—সেই শক্তি ও জাতীয় গৌরব আজ পর্য্যন্ত



রোমানদের বিচার মণ্ডপে কারেক্‌টাকাস্‌...'বল সম্রাট কে বেশী অপরাধী ?"

তাঁহাদের অক্ষুণ্ণ আছে। ইংরেজদের এই প্রাচীন আদর্শ—আপনার পায়ে দাঁড়াইবার চেষ্টা—নিঃসহায় অবস্থায় পড়িলেও হাল ছাড়িয়া না দিয়া একতাবদ্ধ হইয়া আত্মরক্ষা করিবার ও দেশের স্বাধীনতার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে প্রস্তুত থাকা—এই আদর্শ মতে চলিলে যে কোনও জাতি পৃথিবীর মধ্যে স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ আছে কি ?

রোমানরা চলিয়া গেলে—ইংরেজেরা এবার আপনার পায়ে দাঁড়াইয়া স্বাধীন হইল। 'আমরা রোমানদের অপেক্ষা কিসে কম ?' এই আত্মবিশ্বাসের বলেই আজ ইংরেজ পৃথিবীতে বড় হইতে পারিয়াছেন। তাহাই আজ ইংরাজকে অর্দ্ধ পৃথিবীর ঈশ্বর করিয়াছে।

সেকালে রাজ্য মাত্রেরই রাজা থাকিতেন। ইংলণ্ডেও বৎসরের পর বৎসর রাজার পর রাজা হইতে লাগিলেন। কোন রাজা দেশের জন্য, প্রজাদের উপকারের জন্য নানা কাজ করিয়া অমর হইয়া গিয়াছেন। কেহ বা ছিলেন ভয়ানক অত্যাচারী। ধর্ম্ম পথের জন্যও কত মহাপুরুষ ইংলণ্ডের বণিকের নিকট কত অত্যাচার সহ্য করিয়া গিয়াছেন : ল্যাটিমারের মত কত উপাসক মহাপ্রাণ ব্যক্তি নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করিয়া ত্যাগ, মহাপ্রাণতার ইচ্ছা দেখাইয়া গিয়াছেন। একজন অত্যাচারী রাজার কথা বলিতেছি শোন, তাঁহার নাম ছিল জন। জন এমন নিষ্ঠুর ছিলেন যে আপনার ভাইপো আর্থারের চক্ষু উপাড়াইয়া ফেলিতেও ইতস্ততঃ করেন নাই। যিনি আপনার জনের উপর এমন পশুর মত ব্যবহার করিতে পারেন, প্রজাদের উপর অত্যাচার করা ত তাঁহার পক্ষে খুবই স্বাভাবিক।

জন সত্য সত্যই প্রজাদের প্রতি অতি ভীষণ অত্যাচার আরম্ভ করিলেন, ফলে প্রজারাও দল বাঁধিয়া রাজার অন্যায় ব্যবহারের প্রতিশোধ লইতে প্রবৃত্ত



সিজারের ব্রিটন জয়।

হইলেন। তাঁহারা রাজাকে বিস্তর ভয় দেখাইয়া পরে তাহাদের সুবিধাজনক কতকগুলি সর্ত্ত লিখিয়া রাজা জনকে কহিলেন—"আপনি ইহা মানিয়া লইয়া এইরূপ ভাবে রাজ্য শাসন করিতে রাজি আছেন তাহা স্বীকার করিয়া নাম সহি করিয়া দিন্।" জন নানা আপত্তি করিলেন, কিন্তু তাঁহার আপত্তি টিকিল না, অবশেষে তিনি নাম লিখিয়া দিলেন। এসর্ত্তে প্রজাদের অনেকটা সুবিধা হইল। রাজার স্বীকার করিতে হইল যে—"দেশের আইন মানিয়া তাঁহাকে চলিতে হইবে। বিনা বিচারে খাম্‌খেয়ালি মতে কাহাকেও দণ্ড দিতে পারিবেন না। কেহ বিচার প্রার্থী হইলে তৎক্ষণাৎ নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিবেন, দশজনে এক হইয়া যদি কোন কাজে অগ্রসর হয়, তাহা হইলে কাহার সাধ্য যে তাহাকে বাধা দেয়? এই ভাবে প্রথমতঃ প্রজা সাধারণের মতানুযায়ী রাজ্যশাসনের ব্যবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল। আজকাল ইংরেজদের যে পৃথিবী-বিখ্যাত মন্ত্রণা-সভা বা পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভা দেখিতেছে, এই ভাবেই তাহার প্রথম সৃষ্টি হয়।

এখানে আর একটা কথা তোমাদিগকে বলিতেছি। ইংরেজেরা যে এত বড় হইতে পারিয়াছেন, তাঁহাদের ধর্ম্মও এবিষয়ে তাঁহাদিগকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছে। ইউরোপে নানাস্থানে যীশুখৃষ্ট নামক একজন মহাপুরুষের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের প্রচলন আরম্ভ হইয়াছিল, যাহারা এই ধর্ম্মাবলম্বী, তাহারা খৃষ্টান নামে পরিচিত। আজ ইংলণ্ডে ছোট বড় সকলেই খৃষ্টান। এক ধর্ম্ম এবং একজাতি এই দুইটি প্রধান কারণও ইংরেজদিগকে একতা-সূত্রে আবদ্ধ করিয়াছিল।

জনের পর আবার অনেক ভাল ভাল রাজা দেশের অনেক উন্নতি করিয়াছিলেন। রাণী এলিজাবেথ্ নামে একজন রাণী হইয়াছিলেন, তেমন বড় রাণী একটা দেখা যায় না। তাঁহার সময় হইতেই ইংরেজদের মধ্যে এক নবজীবনের সূত্রপাত হইয়াছিল। ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যতীত যে কোন জাতি বড় হইতে



রাজা এলফ্রেডের রণতরী নির্ম্মাণ।

পারে না, এ সময়ে ইংরেজদিগের এই দিকে লক্ষ্য পড়িয়াছিল। তাঁহারা এ সময়ে এটা বেশ বুঝতে পারিয়াছিলেন যে কেবল দেশে বসিয়া শস্য উৎপন্ন ও দেশের মধ্যে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে চলাচল ব্যবসা-বাণিজ্য করিলে কোনমতেই দেশ বড় হইতে পারিবে না। শুধু আপনাআপনির মধ্যে একজন ধনী ও অপর দরিদ্র হইবে।

মানুষ যখন কোন বিষয়ে অভাব বোধ করে, তখনই তাহার প্রতিকারের জন্য মনোযোগী হইয়া থাকে। ইংরেজরাও দেখিলেন যে পর্ত্তুগাল ইটালী এসব দেশের কোন কোন নাবিক সমুদ্র-পথে নানাস্থানে ঘুরিয়া অনেক নূতন নূতন দেশ আবিষ্কার করিয়াছেন, তখন ইংরেজেরাও সমুদ্র-পথে নানাদিকে যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিলেন,—মাটিন ফ্রোবিসার এবং জন ডেভিস্ নামে নামে দুইজন নাবিক উত্তর আমেরিকায় যাইবার পথ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। সার ওয়ালটার রেলে নামক একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি আমেরিকায় যাইয়া সেখানে ইংরেজদের জন্য একটী উপনিবেশ স্থাপন করিতে পরিয়াছিলেন। আজ এই যে তোমরা গোল আলু ও তামাক দেখিতে পাইতেছ, ওয়ালটার রেলেই আমেরিকা হইতে এই দুইটি জিনিষ ইংলণ্ডে আনিয়াছিলেন।

এইরূপ যাতায়াতের ফলে দেশের অনেক লোকই জাহাজে চড়িয়া, কেহ আমেরিকা, কেহ ভারতবর্ষ, কেহ আফ্রিকা, কেহ মিশর, প্রভৃতি দেশে যাইয়া ব্যবসাবাণিজ্য করিতে আরম্ভ করিলেন। সে দেশের জিনিষ ইংলণ্ডে আসিল, আর ইংলণ্ডের জিনিষ সেদেশে বেশী দামে বিক্রী হইয়া ইংরেজ বণিকেরা দু'পয়সা লাভ করিতে আরম্ভ করিলেন। দেশের লোকেরাও বুঝিতে পারিল যে তাহাদের প্রস্তুত কোন্ কোন্ জিনিষ বিদেশীরা চাহেন, কাজেই শ্রমজীবি-সম্প্রদায়ের উপর সে সকল জিনিষ তৈয়ারী করিবার ভার পড়িল। এই ভাবে



অত্যাচারী রাজা জনের আদেশে, বন্দী অবস্থায়
তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র বালক প্রিন্স আর্থার।

ব্যবসা বাণিজ্যই যে জাতির উন্নতির কারণ ইংরেজ জাতি একথাটা বেশ ভাল বুঝিলেন, ফলে এলিজাবেথের সময় হইতে ইংরেজ বণিকেরা ব্যবসাবাণিজ্যের উন্নতির জন্য মনোযোগী হইলেন, সেই বাণিজ্য প্রবৃত্তি দিন দিন বৃদ্ধি পাইয়া আজ তাহারা পৃথিবীর মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়াছেন। এই জন্যই ইংরেজদের লোকে বণিকের জাতি বলিয়া থাকে।

আর একদিক দিয়াও ইংরেজ জাতি এ সময়ে এক নূতন ভাব ও আদর্শের পরিচয় দিয়াছিলেন। সেটা হইল—সাহিত্যের দিক্ দিয়া। রাজ্ঞী এলিজাবেথের রাজত্বকালেই জগদ্বিখ্যাত কবি ও নাট্যকার সেক্সপীয়রের অভ্যুদয় হয়। তিনি ইংলণ্ডে নাট্যাভিনয়ের প্রথা প্রচলন করেন। সেক্সপীয়র নূতন নাটক লিখিয়া রাজ্ঞী এলিজাবেথকে শুনাইতেন। রাজ্ঞী তাঁহার রচনা শুনিয়া সুখ্যাতি করিতেন এবং সময় সময় অভিনয় দর্শন করিয়া উৎসাহ দিতেন।

আজ ইংরেজদের মত নৌ-শক্তি পৃথিবীতে আর কাহারও নাই। ইংরেজের সহিত নৌ-যুদ্ধে কেহই আঁটিয়া উঠিতে পারে না—এই শক্তির প্রথম বিকাশও রাজ্ঞী এলিজাবেথের সময়েই হইয়াছিল।

সে সময়ে স্পেন দেশে ফিলিপ্ নামে এক রাজা ছিলেন। ফিলিপ ইংরেজদিগকে একেবারেই দেখিতে পারিতেন না। কেমন করিয়া ইংরেজদের জব্দ করিবেন, দিন রাত কেবল সে ভাবনাই ভাবিতেন। একবার ফিলিপ্ ইংরেজদিগকে পরাজিত করিবার জন্য মস্ত এক নৌবহর পাঠাইলেন। সে একখানা দু'খানা জাহাজ নয়, বড় বড় ১৩২ খানা জাহাজ। সে সব জাহাজ সাহসী নাবিক সৈন্যে ভরা ছিল। ফিলিপ নৌ-বহরের সেনাপতির উপর আদেশ দিলেন যে—ইংলণ্ডের ও ফরাসী দেশের মধ্যে যে ইংলিসচ্যানেল নামে সাগর আছে, সেই সাগরের ভিতর দিয়া জাহাজগুলিকে লইয়া যাইয়া ইংলণ্ড অক্রমণ করিবে। স্পেন্



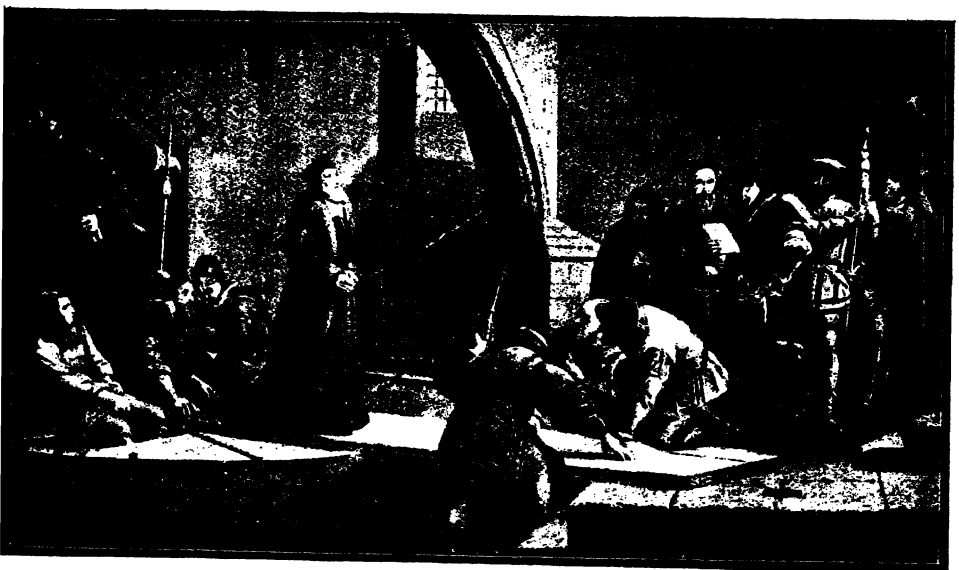
সঙ্গী ধর্ম্মামতাবলম্বীদের নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড স্বচক্ষে দেখিয়া যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া ক্ষণিক দুর্ব্বলতা বশতঃ ক্র্যানমার স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে রাজি হইলেন, কিন্তু দুর্ব্বৃত্তেরা তাহাদের কথা রাখিল না, তাঁহাকে জীবন্ত দাহ করিবার আদেশ দিল। ক্র্যানমার অনুশোচনায় দগ্ধ হইয়া জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে সর্ব্বাগ্রে তাঁহার দক্ষিণ হস্ত প্রবেশ করাইয়া দিলেন—যে দক্ষিণ হস্ত তাঁহার ধর্ম্মমত পরিত্যাগের কথা লিখিয়া দিয়াছিল।

দেশের রাজার জাহাজগুলি খুব বড় বড় ছিল। ইংরেজেরা যখন জানিতে পারিলেন যে স্পেনের নৌ-বহর আরমাডা ইংলণ্ড জয় করিতে আসিতেছে, তখন ইংলণ্ডেও সাজ সাজ রব পড়িয়া গেল।

ইংরেজদের মাত্র চৌত্রিশখানা যুদ্ধের জাহাজ ছিল, আর ইংরেজ বণিকেরা তাহাদের ১৬৩ খানা বাণিজ্য জাহাজ দিয়াছিলেন। ইংরেজেদের এই সব জাহাজগুলি ও আবার খুব ছোট ছিল, কাজেই কোন দিক্ দিয়াই স্পেনিস্ আরমাডার সমকক্ষ ছিল না। কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে, ইংরেজ নাবিক সেনাপতিরা যেমন সাহসী ও তেমনি চতুর ছিলেন, তাঁহারা কতকগুলি পুরাণো জাহাজে আগুন লাগাইয়া স্পেনিস্ আরমাডার মধ্যে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন—এ কাজটী এত কৌশলে গভীর রাত্রিতে করিয়াছিলেন যে স্পেনিস আরমাডার দল মধ্যে একটা বিভীষিকার সৃষ্টি করিয়াছিল। কে কোথায় পালাইবে, তাহাই ঠিক পাইতেছিল না। তারপর ইংরেজদের ছোট জাহাজগুলি যেমন দ্রুত যাতায়াত করিতে পারিত, আরমাডার বড় বড় জাহাজগুলি তাহা পারিত না আরমাডা পরাজিত ও ছিন্ন ভিন্ন হইয়া—সমুদ্রের মধ্যে গেল।

স্পেনিস্দের আবার এমনি দুর্ভাগ্য যে তাহারা পলাইবার অনুকূল বাতাসও পায় নাই।

একটা প্রচণ্ড ঝড়ে তাহাদের সমস্ত জাহাজ লণ্ডভণ্ড হইয়া গেল—সেই হইতে স্পেনিস আরমাডার নাম আর কেহ শুনে নাই। এই জয়ের পর হইতেই ইংরেজেরা বুঝিলেন যে যদি তাঁহারা নৌ-যুদ্ধে মনোযোগী হন, তাহা হইলে পৃথিবীর মধ্যে এমন কোন শক্তি থাকিবে না, যাহারা তাঁহাদিগকে হারাইতে পারে। সত্য সত্যই ইংরেজদের সেই আশা পূর্ণ হইয়াছে; কিন্তু ইহার প্রথম সূত্রপাত যে আরমাডাজয়ের গৌরব হইতে আরম্ভ তাহা যেন তোমাদের মনে থাকে।



ক্র্যানমারের আত্মোৎসর্গ ।

সেই যে জনের সময়ে প্রজাশক্তির অভ্যুত্থানের কথা বলিয়াছি, কেমন করিয়া ধীরে ধীরে তাহার প্রসার বৃদ্ধি পাইল এইবার সেই কথা শোন। জনের পর হইতেই ইংলণ্ডের রাজারা জনসাধারণের মত লইয়া রাজ্য শাসন করিতেন। রাজার নিজেরও মন্ত্রী থাকিত, আর রাজ্যের নানা প্রদেশের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি-গণও প্রজাদের পক্ষ হইতে কিরূপভাবে কার্য্য করিলে, রাজ্যশাসনের সুবিধা হয় এবং দেশের লোকের উপর কোন অত্যাচার অবিচার না হইতে পারে সে বিষয়ে পরামর্শ দিতেন। কোন কোন রাজা এই প্রতিনিধি সভার কথা মানিয়া চলিতেন, কেহ বা তাহা গ্রাহ্যই করিতেন না। কারণ তখন পর্য্যন্ত সেই প্রতিনিধি সভা বা পার্লিয়ামেণ্টের তেমন ক্ষমতা হয় নাই। পল্লীগ্রাম হইতে যাঁহারা সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়া আসিতেন, অনেক সময়ে তাঁহারা দেশের বড় বড় লোক ও জমিদারদের সম্মুখে তেমন সাহস করিয়া তর্ক বিতর্ক করিতে পারিতেন না। কিন্তু ধীরে ধীরে এমন সময় আসিল, যখন সে সব দুর্ব্বলতা দূর হইয়া গেল এবং প্রতিনিধি-সভাই রাজ্য-শাসনের প্রধানতম যন্ত্র হইল।

কিন্তু বেশীদিন এমনভাবে চলিল না। প্রথম চার্লস্ নামে একজন দাম্ভিক রাজা মনে করিতেন যে রাজা ঈশ্বরের প্রতিনিধি, তাঁহার মতের বিরুদ্ধে কাহারও চলিবার কোন অধিকার নাই। তিনি পার্লিয়ামেণ্টের ক্ষমতা অগ্রাহ্য করিলেন। কাহারও সদুপদেশে যখন কোন ফল হইল না, তখন প্রজা-সাধারণ পার্লিয়ামেণ্টের ক্ষমতা অব্যাহত রাখিবার জন্য যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন, দেশের মধ্যে রাজা ও প্রজার মধ্যে কলহ আরম্ভ হইল। রাজা চার্লসও তাঁহার প্রাধান্য রক্ষার জন্য যুদ্ধ করিলেন—কিন্তু প্রজাপক্ষের সহিত পারিয়া উঠিলেন না। তিনি যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া পার্লিয়ামেণ্টের বিচারে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। এই সময় হইতে



স্পেনিস আরমাডার আসিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে ড্রেক বল খেলিতেছেন।

পার্লিয়ামেণ্ট বিশেষ ভাবে প্রতিষ্ঠালাভ করিল। কিছুদিনের জন্য পার্লিয়ামেণ্টের বিধান মতে অলিভার ক্রমওয়েল নামক এক ব্যক্তি প্রতিনিধি শাসনকর্ত্তারূপে দেশ শাসন করিয়াছিলেন।

তাঁহার পরে আবার দেশে রাজা হইলেন বটে, কিন্তু পার্লিয়ামেণ্টের শক্তি অব্যাহত রহিল। ইহার পর হইতে যখন যিনি রাজা হইয়াছেন, তাঁহাকেই পার্লিয়ামেণ্টের কথা শুনিয়া চলিতে হইতেছে। দেশের লোকের প্রথম প্রথম যে ভয় ও দুর্ব্বলতাটুকু ছিল, তাহা একেবারে লোপ পাইল। রাজার স্বেচ্ছাচারিতা একেবারেই লুপ্ত হইল—দেশের প্রতিনিধি সভাই প্রকৃত পক্ষে রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন।

দিনের পর দিন যাইতে লাগিল, ইংরেজ জাতি নানা দিক্ দিয়াই প্রতিষ্ঠালাভ করিতে আরম্ভ করিলেন। পূর্ব্বে রাজার সহিত প্রজার যে অশান্তির কারণ ছিল তাহা সম্পূর্ণ লোপ পাইল। রাজার খাম্‌খেয়ালী কাজ করিবার কোন পথই রহিল না। দেশে সুখ শান্তি থাকিলে লোকের আপনা হইতেই চরিদিকে দৃষ্টি পড়ে। ইংরেজেরও তাহাই হইল। তাহারা ধীরে ধীরে পৃথিবীর চারিদিকে রাজ্য বিস্তারে মনোযোগী হইলেন। এক এক রাজার সময় এক এক দেশ অধিকৃত হইয়া ইংরেজ রাজার রাজ্যভুক্ত হইতে আরম্ভ হইল। কোথায় অষ্ট্রেলিয়া, কোথায় আমেরিকা, কোথায় ভারতবর্ষ, কোথায় আফ্রিকা, কোথায় মিশর—পৃথিবীর মানচিত্র খুলিলে এমন একটী মহাদেশ পাইবে না, যেখানে ইংরেজের রাজত্ব নাই।

ইংরেজ জাতি পৃথিবীর মধ্যে এত বড় হইল কেমন করিয়া সে কথা বাস্তবিকই চিন্তা করিবার ও আলোচনা করিবার বিষয়। ইংরেজ সাহসী এবং বাণিজ্য-প্রিয়। বাণিজ্য করিবার জন্য এক এক দেশে যাইয়া, পরে তাঁহারা ধীরে ধীরে সে দেশের



বালিকা ভিক্টোরিয়াকে ইংলণ্ডেশ্বরী হইতে হইবে,
সেই সংবাদ......দিতে আসিয়াছে।

রাজা হইয়াছেন। ভারতবর্ষেও তাঁহারা প্রথমে বাণিজ্য করিতে আসিয়া অবশেষে দেশের রাজা হইয়াছেন।

ইংরেজ জাতি ব্যবসাবাণিজ্যে অত্যন্ত সুনিপুণ। পৃথিবীর এমন স্থান নাই, যে দেশে ইঁহারা বাণিজ্য করিতে না গিয়াছেন। একতা ভিন্ন কোন জাতিই বড় হইতে পারে না, ইংরেজ যেমন একতাবদ্ধ হইয়া কাজ করিতে পারেন, এমন পৃথিবীর অতি অল্প জাতিই পারেন।

সময়ের মূল্য ইংরেজের কাছে অত্যন্ত বেশী। প্রত্যেক কাজটী ইঁহারা নিয়মিত সময়ে করিয়া থাকেন। পরিশ্রম, দক্ষতা, কষ্ট-সহিষ্ণুতা সব দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে ইংরেজদের তুলনা পৃথিবীতে মিলে না।

ইংরেজ জাতি শুধু যে রাজত্বে, সাহসিকতায় ও যুদ্ধ-বিগ্রহেই বড় তাহা নহে। বিদ্যাবুদ্ধিতেও তাঁহারা কম বড় জাতি নহেন। কত বড় বড় কবি, ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত যে ইংরেজ জাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, শুধু তাঁহাদের নামের তালিকা দিতে গেলেও একখানা বড় বহি হয়।

রেল, জাহাজের আবিষ্কার, ছাপাখানার প্রচার, টেলিগ্রাফ, উড়োজাহাজ, নৌযুদ্ধের বড় বড় জাহাজ এ সকল ইংরেজ প্রস্তুত করিয়া পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতিরূপে পরিণত হইয়াছেন।

ইংরেজ সারা পৃথিবীর কোথায় কি আছে, তাহা খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য প্রাণপণ করিতেছেন। পৃথিবীর উত্তর সীমার শেষ কোথায়, সেখানে কি আছে, তাহা জানিবার জন্য, আবিষ্কার করিবার জন্যই বা কতজনে প্রাণ দিয়াছেন।

হিমালয়ের মত উচ্চ পর্ব্বত পৃথিবীতে আর একটীও নাই। সেই হিমালয়ের উচ্চ শৃঙ্গ গৌরীশঙ্করের মাথায় আরোহণ করিবার জন্যই বা আজ দুইবৎসর যাবত



আমাদের বর্ত্তমান সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ।

তাঁহারা কতই না চেষ্টা করিতেছেন। হয়ত আর দুই এক বৎসর পরে তাঁহাদের এই অভিযান সার্থক হইবে।

ইংলণ্ডের মহারাণী ভিক্টোরিয়া অত্যন্ত দয়াবতী, গুণবতী এবং বুদ্ধিমতী সম্রাজ্ঞী ছিলেন। তাঁহার পর তাঁহার ছেলে সপ্তম এড্‌ওয়ার্ড সম্রাট্ হইয়াছিলেন। আজ প্রায় বার বৎসর হইল সপ্তম এড্‌ওয়ার্ডের মৃত্যুর পর সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের একছত্র অধিপতি হইয়াছেন। ইঁহার রাজত্ব কালে জর্ম্মানদের সহিত পৃথিবীর প্রায় সব জাতির এক ভীষণ যুদ্ধ হইয়াছিল, সে যুদ্ধেও ইংরেজেরা ও তাঁহার সহযোগীরা জয় লাভ করিয়াছেন।

তোমাদের একটা কথা মনে রাখা উচিত—কি ব্যক্তিগত জীবনে কি জাতির দিক্ দিয়া যদি কোন জাতি আপনাকে নিঃসহায় ও দুর্ব্বল মনে করিয়া হাল ছাড়িয়া দেয় তাহা হইলে তাহার উঠিবার ক্ষমতা কোন দিন হইবে না। এখানে ইংলণ্ডের প্রথম অবস্থার কথা মনে কর, রোমানরা চলিয়া গেলে ইংরেজরা ভাবিয়াছিল—আমরা কি করিতে পারি, আমাদের শক্তি সামর্থ্য কোথায় ? কিন্তু যখন দৃঢ় হৃদয়ে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবৃত্ত হইলেন, আপনার শক্তিতে আপনি বিশ্বাস করিলেন—তখন আর কেহ তাঁহাদের গতি রোধ করিতে পারিল না এইরূপ বিশ্বাস সবজাতিরই উন্নতির সোপান।

ইংরাজ জাতির কাছে আমরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, সময়, নিষ্ঠা, একতা, শিক্ষা দীক্ষা ও কর্ম্মতৎপরতা এই কয়টি মহৎ আদর্শ গ্রহণ করিতে পারি। যদি তোমরা ছেলে বেলা হইতেই ইংরেজ জাতির এসকল মহৎ আদর্শ গ্রহণ করিতে পার তাহা হইলে জীবনে যেমন সুখ শান্তি লাভ করিবে, তেমনি জাতির গৌরবস্বরূপ হইতে পারিবে।

প্রভাত।

প্রভাত এসেছে, হের, তরুণতপণ
আলোকি ধরণী করে কর বরিষণ।
দিন এল, দিকে দিকে পুলক ছুটিল,
হরষে পাখিরা সব ডাকিয়া উঠিল।
সে ডাকে জাগিল যত ধরাবাসিজন,
সানন্দে আপন কর্ম্মে নিয়োজিল মন।
কাননে কাননে কত কুসুম ফুটিল,
সমীরণ সে খবর ভৃঙ্গে বিলাইল।
খবর পাইয়া যত ভ্রমরের দল
পরিমল লোভে ছুটে হইয়ে পাগল।
পুষ্পে পুষ্পে বসি পুষ্প আসার পিয়ায়
মৃদু মৃদু গুঞ্জরণে বিভুগুণ গায়।
এস ভাই যথা কাজে নিবেসাই মন,
নব শক্তি এনেছে এ প্রভাত নূতন।
ভক্তিভরে কর সবে তাঁহার বন্দনা,
যাঁর পরসাদে বিশ্ব লভিল চেতনা।

শ্রীগোপেন্দ্রনাথ সরকার।

"আমার দেশ" সেবা-ভাণ্ডার।

উত্তর বঙ্গের বন্যাভাসা দেশগুলির দুঃস্থ অধিবাসীদের সাহায্যের জন্য কি সহরে কি পাড়াগাঁয়ে—সবাই পথে পথে ঘুরিয়া গান গাহিয়া ভিক্ষা সংগ্রহ করিয়া বেড়াইতেছে। ধনীর দুলাল নাই, গরীবের ছেলে নাই, মান—অপমানের কথা নাই, আপন-পর নাই, রৌদ্রে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দ্বারে-দ্বারে টাকা পয়সা, কাপড়, চাল সংগ্রহ করিয়া বেড়াইতেছে। যাহা পাইতেছে, গিয়া আচার্য্যদেব প্রফুল্লচন্দ্রের নিকট দিয়া আসিতেছে। প্রায় তিনলক্ষ টাকা উঠিয়াছে, কাপড়ও অনেক আসিয়াছে, আর আসিয়াছে চাল-ডাল। তা ছাড়া কত কোমল হৃদয়া মেয়ে গায়ের গয়না খুলিয়া দিয়াছে, কত ছেলে জলখাবার না খাইয়া সেই পয়সা জমাইয়া দিয়া দিয়াছে। কিন্তু আরো চাই, আরো চাই। শুধুই সে অভাগারা খাইতে পাইয়াছে, পরণে কাপড় দিতে পারিয়াছে, এখনো তাহাদের গৃহ হয় নাই, এখনো গাছের তলায় তাহাদের বাস, তাই আরো চাই, আরো দিতে হইবে। "আমার দেশের" গ্রাহক, পাঠক ও বন্ধুরাও যে সেই সব অভাগাদের সাহায্য করিবার জন্য তৎপর হইয়াছেন, বড়ই সুখের কথা। আমাদের একটি গ্রাহিকা, কুমারী সুষমা নাগ টাকা পাঠাইবার সময় পত্রে লিখিয়াছেন—"আমার সেই অভাগা ভাই বোন্‌গুলির সাহায্যের জন্য সামান্য…টাকা পাঠাইলাম। ভগবান তাঁহাদের দুঃখ দূর করুন, ইহাই আমার প্রার্থনা।" এই চিঠিখানিতে সুষমার দুঃখপীড়িত হৃদয়ের ভাবটি কেমন ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই ত চাই! পরের দুঃখে যার হৃদয় এমন কাঁদে সেই ত মানুষ! আমরা অত্যল্প সময়ের মধ্যে যে সাহায্য পাইয়াছি, নিম্নে তাহার তালিকা দিলাম :—

(গ্রাহিকা) কুমারী সুষমা নাগ (রাঁচি) ২৲

(বন্ধু) শ্রীমান অর্ণবকুমার বসু (রাঁচি) ১৲

(কুমারী সুষমা এ টাকাটিও পাঠাইয়াছেন)

(বন্ধু) শ্রীমান বিজয়কুমার মিত্র (কলিকাতা) ৫৲

(গ্রাহিকা) কুমারী মীনা সেন (বিহার) ২৲

আগামী মাসে নিশ্চয়ই আরো অনেক নাম দিতে পারিব, এ আশা আমাদের বিলক্ষণ আছে।

খবরাখবর।

প্রকৃতির কাছে মানুষ যে কত দুর্ব্বল, কত অসহায়াতা ভাবতে গেলে অনেক সময় জ্ঞান হারাতে হয়। এই প্রকৃতির বুকের ওপর শ্যাম দুর্ব্বাদল লতা পাতার ওপর মানুষ তাদের বুদ্ধি বিবেচনামত বাস, ব্যবসার উপযোগী করে' কত বড় বড় বাড়ী তৈরী করছে, কত রেল-পুল গঠন করছে, নিজের শক্তি, সামর্থ্যে তার এতই বিশ্বাস যে মানুষ তা'তেই বিশ্বাস করে' এই সব করে যায়! শুধু যে করে যায় তা নয়, আবার তারই জন্য তার কত দর্প, কত দম্ভ। কিন্তু তার সকল দর্প, দম্ভ-গর্ব্বের সঙ্গেই তার সেই অভ্রভেদী অট্টালিকা শ্রেণী, লৌহ-ইস্পাতগড়া রেল-পুল-সব এক মুহূর্ত্তে প্রকৃতির সংঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায়। সম্প্রতি চিলির অন্তর্গত কোকুইম্বো, সারেনা প্রভৃতি ক'টা বড়, বড় সহর এমনি চুরমার হ'য়ে গেছে, এক ভূমিকম্পে! শুধু যে সেই বাড়ী ঘরই গেছে তা নয়, সহস্রাধিক লোকের প্রাণও গেছে! এই ত মানুষ, আর এই তার ক্ষমতা! তার কত শত বৎসরের প্রাণান্ত চেষ্টা, যত্ন উদ্যম, অর্থ ব্যয়ে সে যা যা গড়েছিল, তিনটি মিনিট দেরী সয় না, সব কোথায় কি হ'য়ে যায়!

আমরা দু'টি পাম্‌পাস কেরোসিন ষ্টোভ উপহার পাইয়াছি। ব্যবহার করিয়া দেখিলাম, 'পাম্‌পাস' কোন অংশেই বিলাতী ষ্টোভের চেয়ে খারাপ হয় নি। ষ্টোভ আমাদের আজকাল সব বাড়ীতেই একটা-আধটার দরকার হয়। এতদিন পর্য্যন্ত সে দরকার মেটাতে আমাদের পয়সা দিতে হ'ত, পরকে বিদেশীকে, এখন থেকে আর তা হ'বে না। এখন দেশের কড়ি দেশেই থাকবে, অথচ গুণে যে জিনিষ পাওয়া যাবে—তা বিলিতির চেয়ে খারাপ

হ'বেই না। আমারদেশের গ্রাহক-গ্রাহিকারা ষ্টোভের দরকার হ'লে বাপ-মাকে 'পাম্পাসের' কথা বলো।

অত বড় যোয়ান, অত বড় পালোয়ান ভীম ভবানী তিন দিনের জ্বরে মারা গেলেন। জ্বর তা'ও বেশী নয়। তবে চিকিৎসা হয় নাই, এ কথা ঠিক। মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ সাহেব ভবানীর দেহ ভেদ করিয়া ঔষধ পুরিতে চাহিয়াছিলেন, পালোয়ানের দেহে সুচ বিদ্ধ করতে পারেন নি। ভীম ভবানী নির্বীর্য্য,শক্তিহীন বাঙ্গালী জাতির গৌরব স্বরূপ ছিলেন। এই সেদিন বিজয় বাবু ভীম-ভবানীর জীবন কথা তোমাদের শুনাইয়াছিলেন। তখন কে জানিত—সেই যুবক বীরের নূতন কোন শক্তি খেলার পরিচয় আর বাঙ্গালী পাইবে না! কে জানিত যে যৌবনের মধ্যেই তাঁর জীবনের দিন শেষ হ'য়েছিল। বীরের শবদেহ ন'জন পালোয়ানে ঘাটে নিয়ে যায়। এই ছবিখানা দেখে তোমরা বুঝতে পারবে মৃত্যুর পরও তাঁর দেহটি কেমন সুন্দর হৃষ্টপুষ্ট, মুখটি কেমন তেজঃপুঞ্জ প্রশান্ত ছিল। * * * *



মৃত্যু শয্যায় ভীম ভবানী।

নূতন ধাঁধা।

১। দশখানা যান করলে একত্র মিলন
প্রাচীন নৃপতি এক দেয় দরশন
বল দেখি ত্বরা করি কি তাঁহার নাম
কেবা সেই পুণ্যবান নৃপতি প্রধান ?

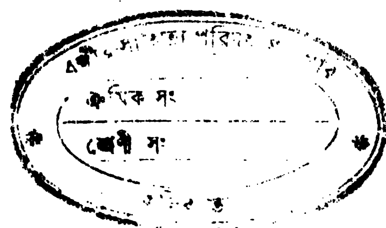
শ্রীনিবারণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

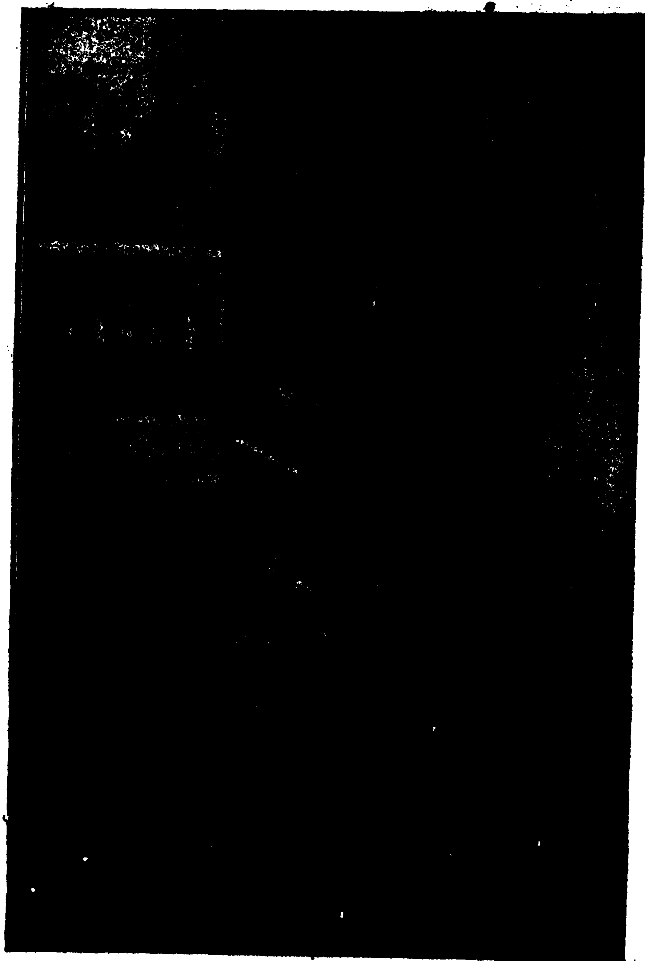
২। বারি মধ্যে থাকি আমি জলে নামি না
বনমধ্যে থাকি আমি লতা দেখি না,
বর সাথে থাকি আমি কনে চিনি না
বল দেখি শিশু মোরে কোথা দেখেছ
বাতাসে লুকাবো আমি কোথা খুঁজিছ ?

শ্রীতরুণচন্দ্র সিংহ।

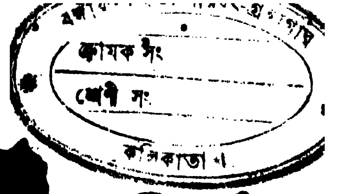
৩। এক লেজ চার পদ নাম তিনাক্ষরে
কিন্তু এক বৃদ্ধ এসে দুটি অর্থ করে।
এক অর্থে স্বর্গবাসী পূজ্য সবাকার,
আর অর্থে যোদ্ধা সে যে ছিল হেথাকার।
ত্যজিলে মধ্যমাক্ষর ভীষণ দর্শন
লেজ সহ বীর এক বলে রামায়ণ।
আদ্য অক্ষর ত্যজি দেখিবে সকলে
ফল হয়ে বসে আছে কণ্টকিত ডালে।

শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়।





কুমারী।



আমার দেশ

২য় বর্ষ, ১২শ সংখ্যা। পৌষ, ১৩২৯।

হাসিয়ে দিলে !

বাপরে ওরে, বাপরে ওরে
কি হাসিটাই হাসিয়ে দিলে
গেলাম গেলাম তলিয়ে গেলাম,
হাসির বানে ভাসিয়ে দিলে।
পেট বুক সব ফাঁপিয়ে দিলে,
লিভার পিলে কাঁপিয়ে দিলে,
মলাম মলাম হাঁপিয়ে দিলে
মাজ্জার কাপড় ফাঁসিয়ে দিলে।
চায়ের পেয়ালা ভাঙ্‌লো—হোঃ হোঃ
চেয়ার হতে পড়্‌বো নাকি
হিহি, হাহা, হাস্‌তে হাস্‌তে
দম আটকে মরব নাকি ?
উল্টে গিয়ে দোয়াত, হা, হা,
কাপড় জামা ভিজল আহা,
আস্‌ছে কান্না আন্না আন্না
হাঁচিয়ে দিলে কাশিয়ে দিলে।
মুখের চুরুট, কোথায় গেল
ধরল আগুন জামায় বুঝি,
চশমা কোথায় ? হাঁসপাতালে
নিতে হলো আমায় বুঝি।

শ্রীকালিদাস রায়।

ব্যয় ও সদ্ব্যয়

আমাদের দেশে ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় [illegible] সুনামধন্য পুরুষ ছিলেন। একসময়ে তিনি বঙ্গদেশের স্কুলসমূহের [illegible] কর্তাও হইয়াছিলেন—ডিরেক্টার অব্ পাবলিক ইনস্ট্রাকসনস্। কাজেই [illegible] বিশ ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে ভূদেব বাবুর যে রোজগার ছিল তাহাতে তাঁহাকে ধনী বলিলেও বেশী বলা হইত না। তোমরা বোধ হয় জান ভূদেব বাবুর বাড়ী ছিল হুগলী জেলার অন্তর্গত চুঁচুড়ায়। যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন তাঁহাব পুত্রগণ হুগলী কলেজিয়েট স্কুলে লেখা পড়া করিতেন। একদিন ভূদেব বাবুব একটি পুত্র পিতাকে কহিল—বাবা আমাদের বাড়ী দূর্গা পূজা হয় না কেন?

ভূদেব বাবু বলিলেন—কেন, আমাদের বাড়ীতে ত বরাবরই ঘটস্থাপনা কবিয়া দূর্গাপূজা হইয়া থাকে। তুমি কি জান না?

পুত্র বলিল—কিন্তু অন্যলোকেব বাড়ীতে··

আর বলিতে হইল না। পিতা বুঝিলেন, কহিলেন—না ঢাকঢোল বাজে না, যাত্রা থিয়েটার হয় না। ওগুলার সঙ্গে পূজার কোন সম্পর্ক নাই।

পুত্র আর কিছু বলিল না। হয়ত ছেলেমানুষ বেচারার কথাটা মনঃপূত হয় নাই। কারণ সে বেচারাকে স্কুলের শিক্ষক মহাশয় ঐ প্রশ্নটি কবিয়া বলিয়াছিলেন—তোমার বাবা বড় কৃপণ। অত রোজগার করেন, সবই জমান, কিছুই ব্যয় করিতে চাহেন না।

বোধ হয় ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে ভূদেব বাবুর মৃত্যুর পূর্ব্বে একদিন লোকে এ কথার উত্তর পাইয়াছিল, যেদিন ভূদেব বাবু প্রায় দুইলক্ষ মুদ্রা এই দেশেব অধিবাসীদের শিক্ষার সাহায্যে দান করিয়াছিলেন।

ভূদেববাবু দূর্গা পূজায় ঢাক ঢোল বাজাইয়া সমারোহ করিয়া ব্যয় করেন নাই বটে, কিন্তু তাঁহার সদ্ব্যয়ে বাঙ্গালা দেশে তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইয়া আছে।

শিল্প-কলা।

বিশ্বশিল্পী।

রসেটী	...	অত্যদ্ভুত সংবাদ।
মেসোনিয়ার	...	দ্বন্দ্ব।
গ্রুজ	...	ভগ্ন কলস।
ভেলাসকুয়েজ	...	পোপ দশম, ইনোসেণ্ট।
ফোর্ড ম্যাডক্স ব্রাউন	...	শেষবার।
		শিশুর তন্ময়তা।

অত্যদ্ভুত সংবাদ— রসেটি

ভারজিন শয্যায় শুইয়াছিলেন, অকস্মাৎ দেবদূত আসিয়া নিদ্রাভঙ্গ করিয়া জানাইলেন, পরম পিতা জগদীশ্বর তাঁহার সন্তানরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এই সংবাদে ভারজিনের সারা অঙ্গে আনন্দের বাণ ডাকিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে কেমন একটা আতঙ্কও আসিল, ঈশ্বর-জননী! ভারজিন বলিলেন—অদৃষ্টে যাহা থাকে হইবে! ঠিক সেই সময়ে খোলা জানলা দিয়া স্বর্গীয় আত্মার রূপ ধরিয়া এক পারাবত প্রবেশ করিল। ছবিখানিতে দেখ, যীশুর ভাবী মাতার মুখখানি আনন্দে ও ভয়ে কেমন এক বিচিত্র ভাব ধারণ করিয়াছে। আকাশে যেন একই সময়ে মেঘ ও রৌদ্র খেলা করিতেছে। কি সুন্দর, কি পবিত্র।



দ্বন্দ্ব

মোসোনিয়ার

মেসোনিয়ারের ছবি দেখিয়া সমালোচকগণ বলিতেন, 'মেসোনিয়ার চিত্রে কার্য্যক্ষমতা দেখাইতে অভ্যস্ত নন। শিল্পী—সেই অপবাদ খণ্ডনোদ্দেশ্যেই এই বিরোধের চিত্রখানি অঙ্কিত করেন। চিত্রখানিকে যতদূর সম্ভব জীবন্ত করিবার জন্য তিনি একজন লোককে দুইটি হৃষ্টপুষ্ট গুণ্ডা গোছের লোক দ্বারা ধরাইয়া রাখিয়াছিলেন। ধৃত ব্যক্তি আত্মমুক্ত হইয়া আক্রমণকারীদের উদ্দেশে ছুটিবার চেষ্টা করিতেছে, শিল্পী ঠিক সেই সময়ই চিত্রখানি আঁকিয়া ফেলিয়াছিলেন।

মেসোনিয়ার—এক ঔষধ প্রস্তুতকারকের পুত্র ১৮১৫ খৃঃ লায়ণসে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৯১ সালে পয়সিতে তাঁহার মৃত্যু হয়।

তাঁর ছবির বিশেষত্বই ছিল, প্রকৃতির অতি ক্ষুদ্র, অতি তুচ্ছ বস্তুও তাঁর চিত্রের মধ্যে দৃষ্ট হইত, যা সাধারণ চোখে লোকে দেখিতে পাইত না।





ভগ্ন কলস—

গ্রুজ

মেয়েটির সরল পবিত্র ছায়ামণ্ডিত মুখের উপরে কেমন একটি করুণ দুঃখ ফুটিয়া রহিয়াছে—দেখ! আহা! সে যাইতেছিল, বারি আনিতে, কলস তাহার ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আর তাহার সে উৎসাহ নাই, চাঞ্চল্য নাই—সব স্থির ধীর হইয়া গিয়াছে।



পোপ দশম ইনোসেণ্ট— ভেলাস্‌কুয়েজ্‌

এক ক্রুর, নৃশংস ধর্ম্মাধিকরণের প্রতিমূর্ত্তি। বিখ্যাত ইংরাজ মনস্বী রাসকিন্‌ ভেলাস্‌কুয়েজের ছবি সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—ভেলাস্‌কুয়েজ যাহা করে তাহা সম্পূর্ণ নির্ভুল এবং যে কোন শিক্ষার্থী তাহা নির্ভয়ে গ্রহণ করিতে পারে। এই ছবিখানিতেই দেখ, পোপের কুঞ্চিত ললাট, ক্রুর বঙ্কিম দৃষ্টি, মুখের কেমন একটা পৈশাচিক ভাব সমস্তর সম্মিলনে লোকটার কুটিল অন্তঃকরণ কি সুস্পষ্টই না হইয়া উঠিয়াছে।

———



শেষবার— ফোর্ড ম্যাডক্স ব্রাউন

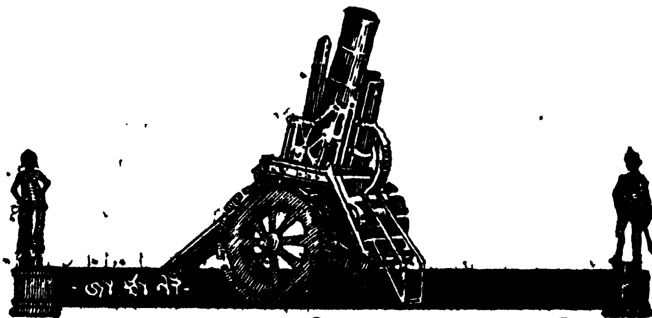
ভাগ্যবিতাড়িত দম্পতী দেশ ছাড়িয়া চলিয়াছে ; দেশে আর তাহাদের স্থান নাই, ভাগ্যান্বেষণে কোথায় চলিয়াছে তাহার স্থিরতা নাই। ধীরে ধীরে জাহাজ তটভূমি ত্যাগ করিয়া যাইতেছে, শেষবার শেষবার ইহারা তাহাদের প্রিয় ভূমির দিকে চাহিয়া লইতেছে। দৃঢ়চিত্ত পুরুষ, উদ্বেগাকুল দৃষ্টিতে তটভূমির দিকে চাহিয়া ভাগ্যালোচনা করিতেছে. আর রমণী, বুঝি অন্তরমধ্যে অন্তর তাহার ভাঙ্গিয়া যাইতেছে ; চোখে মুখে অপরিসীম ব্যথা বেদনা ক্ষরিয়া পড়িতেছে। পিছনে আর যে সব যাত্রী, যে যার আপন চিন্তায় আপন ভাবেই বিভোর। একজন হতভাগ্য তাহার মধ্যে মাতৃভূমির উদ্দেশে ঘুঁষি বাগাইয়া তুলিয়াছে আর তাহার সঙ্গী, নেশার ঘোরে আমোদ উপভোগ করিতেছে।





শিশুর তন্ময়তা—

সার ওয়ালটার রেলের নাম তোমরা নিশ্চয়ই শুনিয়াছ। আমেরিকার অনেকগুলি দেশ তিনিই আবিষ্কার করিয়াছিলেন: গোল আলু তামাক তিনিই প্রথম আমদানী করিয়াছিলেন। সমুদ্র-উপকূলে ঐ-যে বালকটি বহুদূরদেশ প্রত্যাগত নাবিকের পরিভ্রমণ কাহিনী শুনিতে শুনিতে তন্ময় হইয়া গিয়াছে, উরুদ্বয়ে হাত রাখিয়া, বাহ্যজ্ঞান ভুলিয়া নাবিকের কথা গ্রাস করিতেছে ঐ বালকই পরজীবনে সার ওয়ালটার রেলে বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। দেশবিদেশের কাহিনী শুনিবার একাগ্রতা, আগ্রহ দেখিলেই মনে হয় সেই ঐকান্তিকতাই তাঁহাকে ভবিষ্যৎ জীবনে দিক্‌বিদিকে ছুটাইয়া লইয়া বেড়াইয়াছিল।



দুই হাজার বৎসরের কথা। ইউরোপের অধীশ্বরী রোমের দিগ্বিজয়ী বীর জুলিয়াস্ সীজার পশ্চিম-ইউরোপ বিজয়ে চলিয়াছেন। তখন রোমরাজ্যের খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে—বোমের দিগ্বিজয়ী সেনাদলেব নামে শত্রুব হৃৎকম্প উপস্থিত হইত—বোমকে বাধা দিতে পাবে এমন সাহসী জাতি বড় দেখা যাইত না।

স্পেন দেশ, ফ্রান্স দেশ প্রভৃতি জয় ক'রয়া সীজাব ফ্রান্সেব পূর্ব্বে রাইন নদীব তীবে পৌঁছিলেন। আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না,—এই নদীতীরে এক নূতন বীর জাতি তাঁহাকে বাধা দিল।

সংবাদ আসিল, এই জাতি অতি সাহসী, তাহাদেব শরীব দৈত্যদানবেব মত ভয়ঙ্কর, বড় বড় পশু মাবিয়া সেই পশুর মুণ্ড মাথায় পরিয়া তাহারা যুদ্ধ করে—তাহাদের ঢাল দুর্ভেদ্য—বর্শা অতি তীক্ষ্ণ।

সীজারের সৈন্যদল এই সব শুনিয়া ভয় পাইল—তাহারা যুদ্ধ না করিয়া ফিরিয়া যাইতে চাহিল। এতদিন যুদ্ধ জয় করিয়া আসিয়া যদি এই নূতন শত্রুর কাছে হটিতে হয়—তবে আর অপমানের সীমা থাকিবে না।

সীজার শত্রুর শিবিরে দূত পাঠাইলেন—যদি যুদ্ধ বন্ধ হয়। সমান দর্পে শত্রু উত্তর করিল—"বিনাযুদ্ধে আমরা নদীতীর ছাড়িয়া যাইব না।"

অবশেষে যুদ্ধ হইল—সীজার (জার্মেনিকাস) জয়ী হইলেন বটে কিন্তু রাইন নদীর পারে রোমের অধিকার বাড়াইতে পারিলেন না।

এই নূতন যোদ্ধা জাতিই জার্ম্মান্ জাতির পূর্ব্ব পুরুষ। পশ্চিমে রাইন নদী, দক্ষিণে ডানিয়ুব নদ, পূর্ব্বে কার্পেথিয়ান পর্ব্বত, উত্তরে জার্ম্মান সাগর এবং বাল্টিক সাগর, এই চারি সীমার মধ্যবর্ত্তী প্রদেশটির নাম জার্ম্মানী।

পঞ্চাশ বৎসর পরে জার্ম্মান্ জাতি রোমের উপর এই পরাজয়ের প্রতিশোধ লইয়াছিল। সে বৎসর রোমসম্রাট আর এক দল সেনা জার্ম্মান্ জয় করিবার জন্য পাঠান। জার্ম্মান্‌বীর হার্ম্মান্ (আর্মেনিকাস) তাহাদের হারাইয়া দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করেন। বনে জঙ্গলে—হার্ম্মানের আক্রমণে এই রোমসৈন্য সমস্ত ধ্বংস হইয়া যায়। এই পরাজয়ের দুঃখ রোম সম্রাটের বুকে বড় বাজিয়াছিল—মাঝে মাঝে এমন কি ঘুমের ঘোরে সম্রাট চীৎকার করিয়া উঠিতেন—"আমার সে সৈন্যদল কোথায় গেল—আবার তাহাদের ফিরাইয়া আনিয়া দাও"। এক উঁচু পাহাড়ের উপর প্রতিষ্ঠিত একটি পাথরের মূর্ত্তি এখনও এই বীর হার্ম্মানের স্মৃতি রক্ষা করিতেছে।

রোম রাজ্য ধ্বংস হইলে এই জার্ম্মান্ অথবা টিউটন্ জাতি সমস্ত পশ্চিম ইউরোপ ছাইয়া ফেলে। ইংলণ্ডে ইহাদের এক দল রাজ্যস্থাপন করে,—এবং ফ্রাঙ্ক নামে আর একদল ফ্রান্স অধিকার করে। জার্ম্মানীতে এমন কি ইটালীতে পর্য্যন্ত তাহারা রাজ্যস্থাপন করে। তাহারা প্রথমে অসভ্য বর্ব্বর ছিল—গাছ পাথর পূজা করিত—ক্রমে ক্রমে সভ্যতায় উন্নত হইয়া উঠে এবং খৃষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করে।

প্রাচীন জার্ম্মান্ জাতির দুইটি বিশেষত্ব এখনও ইউরোপে টিঁকিয়া আছে। একটি নারীজাতির প্রতি শ্রদ্ধা—আর একটি প্রজাদের মত লইয়া রাজ্যশাসন। আমাদের দেশে রাজপুত নারীরা যে রকম ছিলেন—জার্ম্মান্ নারীরাও সেই



আর্মেনিকাস ও জার্মেণিকাসের যুদ্ধ।

রকম ছিল—যুদ্ধের সময় তাহারা পুরুষদের পাশে বা পিছনে থাকিত—তাহাদের যুদ্ধে উৎসাহ দিত। যুদ্ধস্থল হইতে পালাইলে তাহারা পুরুষদের ঘৃণা করিত। কত যুদ্ধে তাহারা নিজেরাই অস্ত্র শস্ত্র লইয়া আগাইয়া গিয়াছে। রাজপুতদের মতই জার্ম্মান পুরুষরাও তাহাদের সেইরূপ শ্রদ্ধা করিত।

জার্ম্মান জাতিয়দলের সভা ছিল—সেই সভায় রাজা বা নেতারা সকলকে ডাকিয়া রাজকার্য্যে তাহাদের পরামর্শ লইতেন। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে এখন যে রকম পার্লামেণ্টের শাসন দেখা যায়—অর্থাৎ প্রজাদের নেতারা এক স্থানে মিলিত হইয়া রাজকার্য্যের পরামর্শ করেন—পণ্ডিতেরা বলেন—ইহার মূল ঐ প্রাচীন জার্ম্মান্ সভা।

জার্ম্মানী দেশ বহু শত বৎসর অনেকগুলি ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত ছিল—তাহারা পরস্পর যুদ্ধবিবাদ কাটাকাটি করিত—ইংলণ্ড বা ফ্রান্সের মত এক দেশ হইয়া যায় নাই। আবার এদিকে একজন জার্ম্মান্ সম্রাটও ছিলেন—সব রাজ্যগুলি নামে তাঁহার অধীন কিন্তু কাজে সম্রাটের বিশেষ ক্ষমতা ছিল না। এক একজন সম্রাট অবশ্য খুব ক্ষমতাশালী ছিলেন। শার্লমান এইরকম একজন সম্রাট—তার পরে ফ্রেডারিক—প্রথম এবং দ্বিতীয়, ইত্যাদি।

এই সময়ে সমস্ত খৃষ্টিয়ানদের কর্ত্তা ছিলেন রোমের পোপ অর্থাৎ প্রধান ধর্ম্মযাজক। তিনি প্রথমে জার্ম্মান্ সম্রাটের বন্ধু ছিলেন কিন্তু শীঘ্রই তুজনে বিবাদ বাধিল। পোপ চান—তিনি সমস্ত ইউরোপের একমাত্র কর্ত্তা হইবেন—কারণ তিনি ধর্ম্মের কর্ত্তা। সম্রাট চান—তিনি কর্ত্তা হইবেন। প্রায় তুই শত বৎসর অনেক যুদ্ধবিগ্রহ চলিবার পর পোপ জিতিলেন—জার্ম্মানীর সম্রাটের সকল ক্ষমতা কমিয়া গেল।

ধর্ম্মের জন্য অনেকবার জার্ম্মানীকে যুদ্ধ করিতে হইয়াছে—এই সকল



ফ্রেডারিক দি গ্রেটের কবর-ভূমিতে নেপোলিয়ন।

যুদ্ধের ফলে জার্ম্মানীতে অরাজকতা বাড়িয়া চলিল। কিছুকাল পরে জার্ম্মানীতে দুইটী রাজ্য শক্তিশালী হইয়া উঠিল—একটি প্রুশিয়া আর একটি অষ্ট্রিয়া। ফ্রেডারিক উইলিয়ম, প্রভৃতি প্রুশিয়ার রাজা এমন এক দল সুশিক্ষিত রণনিপুণ সেনা তৈয়ার করিলেন—যে তাহার কাছে ইউরোপের অনেক রাজ্যের সেনা হঠিয়া গেল। এই সেনার বলে প্রুশিয়া অনেকগুলি নূতন নূতন প্রদেশ জয় করিয়া লইল। সেনাবলে এবং শাসন বলে প্রুশিয়া ইউরোপের মধ্যে এক প্রধান রাজ্য বলিয়া গণ্য হইল। এই সময়ে ফরাসী সম্রাট নেপোলিয়ন আসিয়া জার্ম্মানীর অধিকাংশ জয় করিয়া লইলেন। বাধা দিতে চেষ্টা করিয়া প্রুশিয়া অর্দ্ধেক রাজ্য হারাইল।

স্বদেশের এই দুর্দ্দশায়—এই পরাধীনতায়—এতদিন যে জার্ম্মান্ রাজ্যগুলি পৃথক্ ছিল—তাহারা আবার এক হইবার জন্য ব্যস্ত হইল। সমস্ত জার্ম্মানী নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়া উঠিল—ফরাসীসেনা দূর করিয়া আবার স্বাধীনতা ফিরাইয়া পাইতে হইবে।—সকলে এক হইয়া লড়িবে কিন্তু স্বাধীনতার যুদ্ধের নেতা হইবে কে? শক্তিশালী প্রুশিয়াকে সকলে নেতার পদে বরণ করিল—প্রুশিয়ার অধীনে একত্র যুদ্ধ করিয়া আবার তাহারা স্বদেশ উদ্ধার করিল।

স্বাধীন হইবার পরেও এই একতার ভাব লোপ পাইল না। ইতিমধ্যে প্রিন্স বিস্‌মার্ক নামে একজন মহা রাজনীতিজ্ঞ পণ্ডিত প্রুশিয়ার রাজমন্ত্রী হইলেন। বাল্যকালে বিদ্যালয়ে এক সহপাঠির সঙ্গে বাজী রাখিয়া এই বিস্‌মার্ক বলিয়াছিলেন—"বিশ বৎসরের মধ্যে সমস্ত জার্ম্মানী এক হইয়া এক বৃহৎ সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠিবে"—তখন কে জানিত কালে এই বালকই সেই মহৎ স্বাধীনতার কার্য্য সাধন করিবে।

বিস্‌মার্ক মোল্ট্‌কে নামে এক বীর সেনাপতির সাহায্যে সমস্ত প্রুশিয়াকে



প্রিন্স বিসমার্ক।

যুদ্ধ বিদ্যায় সুশিক্ষিত করিয়া তুলিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল—সেনাবলেই জার্ম্মান্ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবেন।

সাত বৎসরের মধ্যে বিস্‌মার্ক জার্ম্মানী এবং ইউরোপের অবস্থার এক আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন করিয়া দিলেন। মাত্র সাতটি সপ্তাহে প্রুশিয়ার নূতন, শিক্ষিত সেনাদল অষ্ট্রিয়াকে পরাজিত করিল। স্যাডোয়ার ভীষণ যুদ্ধে অষ্ট্রিয়া প্রুশিয়ার প্রাধান্য স্বীকার করিয়া জার্ম্মানী হইতে সরিয়া গেল। সমস্ত উত্তর জার্ম্মানী প্রুশিয়ার অধীনে মিলিত হইয়া এক নূতন সাম্রাজ্য গঠিত হইল। ইহার পরে ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধ বাঁধিল। উত্তর দক্ষিণে—সমস্ত জার্ম্মান্ রাজ্যগুলি আসিয়া প্রুশিয়ার সহিত যোগ দিল। এক মাসের মধ্যে সীডানের যুদ্ধক্ষেত্রে তিরাসী হাজার ফরাশী সৈন্য বিনাযুদ্ধে জার্ম্মান্ সেনাপতির হস্তে আত্মসমর্পণ করিল—ফরাশী সম্রাট পর্য্যন্ত বন্দী হইলেন। পনর দিনের মধ্যে জার্ম্মান্ সৈন্য ফ্রান্সের রাজধানী প্যারী নগর অবরোধ করিল। চার মাস পরে প্যারী জার্ম্মান্ সৈন্যের হস্তগত হইল। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ফরাসী সম্রাটের বিখ্যাত ভার্সেলিস্ রাজপ্রাসাদে—সমস্ত জার্ম্মান্ রাজগণ মিলিত হইয়া প্রুশিয়ারাজ প্রথম উইলিয়ামকে জার্ম্মান্ সম্রাট বা 'কাইসার' পদে বরণ করিলেন। বহুযুগ পরে জার্ম্মানী এক হইল—সমস্ত জার্ম্মানীতে একটা জাতীয় উৎসবের সাড়া পড়িয়া গেল। ফ্রান্সের কয়টি প্রদেশ অধিকার করিয়া জার্ম্মানী ইউরোপে এক প্রধান শক্তিশালী সাম্রাজ্য বলিয়া গণ্য হইল।

কিন্তু জার্ম্মানীর এ সম্রাটবংশ স্থায়ী হইল না। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মানী ইউরোপ-ব্যাপী মহাযুদ্ধ ঘোষণা করিল। এই যুদ্ধে জার্ম্মানী পরাজিত হইয়াছে। জার্ম্মান্ সম্রাটবংশ রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়াছে—জার্ম্মান্ কাইসার এখন হল্যাণ্ডে নির্ব্বাসিত। সম্রাটের বদলে "রিপাব্‌লিক" বা



লুথার ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন।

প্রজাতন্ত্র শাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। জার্ম্মানী আজ বিপুল ঋণভারে জর্জ্জরিত, জার্ম্মানীর বুকে এখন ফরাসী ইংরাজের সেনাদল রাজত্ব করিতেছে। কিন্তু আবার জার্ম্মানী সকল বিপদ্ কাটাইয়া ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিতেছে। আবার হয়ত জার্ম্মনী বড় হইয়া উঠিবে, হয়ত বা জগতে একটা কীর্ত্তি রাখিয়া যাইবে।

শুধু শক্তিতে নহে—জার্ম্মানীর গৌরব তাহার জ্ঞানে বিজ্ঞানে, শিক্ষা দীক্ষায়, ব্যবসা বাণিজ্যে। জার্ম্মান্ জাতির গৌরব মার্টিন লুথার খৃষ্টিয়ান ধর্ম্মকে নূতনভাবে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। ইউরোপে খৃষ্টধর্ম্মের দুইটি শাখা আছে—একটির নাম রোমান ক্যাথলিক আর একটির নাম প্রোটেষ্ট্যাণ্ট। রোমান ক্যাথলিক প্রাচীন শাখা—তাহারা রোমের পোপ বা প্রধান ধর্ম্মযাজককে গুরু বলিয়া মানে, ধর্ম্মসম্বন্ধে পোপের আদেশই তাহারা সকলের উপরে বলিয়া মনে করে। ফ্রান্স, অষ্ট্রীয়া, স্পেন প্রভৃতি দেশ প্রোটেষ্ট্যাণ্ট। এই প্রোটেষ্ট্যাণ্ট ধর্ম্মের জনক ছিলেন লুথার। লুথার একজন মহাপণ্ডিত অধ্যাপক ছিলেন। একদিন তিনি দেখিলেন—জার্ম্মানীর নগরে নগরে পোপের একজন কর্ম্মচারী সকলকে ডাকিয়া বলিতেছে—"পাপীগণ! আর তোমাদের পরকালের ভয় নাই, এই দেখ মহামান্য পোপ তোমাদের পাপের মার্জ্জনা পত্র পাঠাইয়াছেন—সামান্য অর্থের বিনিময়ে এই মার্জ্জনাপত্র লও—সকল পাপের দায় হইতে মুক্তি পাইবে।" ধর্ম্মের নামে এই ব্যবসা করিতে দেখিয়া লুথার উত্তেজিত হইলেন—তিনি প্রচার করিলেন—"পোপের পাপ মার্জ্জনা করিবার কোনও ক্ষমতা নাই—ধর্ম্ম সম্বন্ধে পবিত্র বাইবেল গ্রন্থই খৃষ্টিয়ানদিগের একমাত্র গুরু, পোপ ধর্ম্মের কর্ত্তা নহেন।" প্রেটেষ্ট্যাণ্টগণ অনেক অত্যাচার উৎপীড়ন সহ্য করিয়াও তাহাদের মত বদলাইল না। এখন জার্ম্মানী লথারের ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন।

জার্ম্মানী, কবি গ্যেটের জন্মভূমি—যিনি এখনও জার্ম্মানীর জাতীয় কবি হইয়া আছেন এবং যিনি এককালে ইউরোপের শ্রেষ্ঠ মনিষী বলিয়া সম্মানিত হইয়া ছিলেন। জার্ম্মানীর সকলের চাইতে গৌরব বিজ্ঞান চর্চ্চায়। বিজ্ঞানের এত উন্নতি জার্ম্মানীতে হইয়াছে—যে জার্ম্মানীর প্রস্তুত কলকারখানা, যন্ত্রপাতি জগতে সর্ব্বত্র আদর পাইয়াছে। এত সস্তায়, এত সব সুন্দর সুন্দর জিনিষ জার্ম্মানীতে তৈয়ার হয়—সেরূপ আর কোথাও হয় না। সেই জন্যই সমস্ত পৃথিবী জুড়িয়া জার্ম্মানীর প্রকাণ্ড বাণিজ্য চলিতেছে—বিদেশ হইতে কোটি কোটি টাকা আনিয়া জার্ম্মান বণিক্‌গণ মহাসমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। গত ইউরোপীয় যুদ্ধে যখন জার্ম্মানীর জিনিস আমদানী বন্ধ হইয়াছিল—তখন জার্ম্মান জিনিষের অভাবে পৃথিবীশুদ্ধ লোক অল্পবিস্তর অসুবিধায় পড়িয়াছিল। এই যুদ্ধের সময় যুদ্ধের উপকরণ অস্ত্রশস্ত্র, গোলাগুলি, কামানবন্দুক, রণতরী, ব্যোমযান প্রভৃতি নির্ম্মাণে জার্ম্মানী যে যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছে তাহা অপূর্ব্ব। জলের নীচে চলে যে সাব্‌মেরিন যুদ্ধজাহাজ, আকাশগামী বিশাল জেপেলিন নামক ব্যোমযান প্রভৃতি জার্ম্মানীর বৈজ্ঞানিকগণের কীর্ত্তি। এই বিরাট যুদ্ধে পরাজিত—ঋণভার পীড়িত হইয়াও জার্ম্মানী এত শীঘ্র আবার বাণিজ্যবিস্তার করিতেছে যে অন্যান্য ইউরোপীয় জাতি শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছেন।

জার্ম্মানীর রাজধানী বার্লিন অতি সুদৃশ্য সহর—সুন্দর প্রশস্ত রাজপথ —রাজপথের দুধারে ফুটপাথ—ফুটপাথের পর বাগান লতাকুঞ্জ—তারপর গাড়ী চলাচলের রাস্তা—দুধারে সুন্দর সুদৃশ্য অট্টালিকা—এই সহরের গঠন প্রণালী এত সুন্দর যে অন্যান্য অনেক ইউরোপীয় সহর বার্লিনের আদর্শে গঠিত হইতেছে। হাম্‌বার্গ, ব্রিমেন, প্রভৃতি জার্ম্মানীর বাণিজ্য-প্রধান সহর।

জার্ম্মানীর উত্তরে উত্তর সমুদ্রের হেলিগোল্যাণ্ড নামে একটী দ্বীপ আছে—এই দ্বীপটী জার্ম্মান্ রণতরীর আড্ডা ছিল—এইখানে ষাট মাইল লম্বা একটী গভীর খাল কাটা আছে। এই খালটি জার্ম্মানীর এক অপূর্ব্ব কীর্ত্তি—এখন এই দ্বীপ এবং খাল ইংরাজের হস্তে।

জার্ম্মানীতে শিক্ষাদানের জন্য বিশটীর অধিক বিশ্ববিদ্যালয় আছে। জার্ম্মানীর ছাত্র এবং পণ্ডিতগণ বিদ্যালোচনায় কঠোর পরিশ্রম করেন। তাঁহারা যে যে বিষয়ে হাত দেন—অতি সূক্ষ্মভাবে তাহার সকল দিক আলোচনা না করিয়া ছাড়েন না। কি ইতিহাসে কি বিজ্ঞানে কি রাষ্ট্রনীতি বা অর্থনীতিতে—সকল বিদ্যায় জার্ম্মান পণ্ডিতের লিখিত পুস্তক মহামূল্য—জার্ম্মান অনুসন্ধান প্রণালী সর্ব্বত্র আদরণীয় হইইয়াছে। জার্ম্মান পণ্ডিত ম্যাক্সমূলার প্রভৃতি আমাদের দেশের প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য—বেদ পুরাণ ইতিহাস প্রভৃতির যেমন আলোচনা করিয়াছেন ও করিতেছেন—আমরা সেরূপ পারিব না। সংস্কৃতের আলোচনায় জার্ম্মানী ইউরোপের মধ্যে অগ্রণী।

জার্ম্মান জাতি যেন ইউরোপের ক্ষত্রিয়জাতি। তেজে শক্তিতে, দর্পে, নবীনতায়, স্বদেশের মহিমা-প্রচারে জার্ম্মানের সমকক্ষ জাতি ইউরোপে আর নাই। সেনাবলের সম্মান জার্ম্মানদিগের মত কেহ করে না। এতদিন সেনাদল সমস্ত জার্ম্মানীর উপর প্রভুত্ব করিত—জার্ম্মান্ সমাজে একজন সেনাপতির যে সম্মান ছিল—একজন বিচারপতি বা জ্ঞানীর তাহা ছিল না। জার্ম্মানীর প্রত্যেক যুবককে সেনাদলে ভর্ত্তি হইয়া যুদ্ধ শিক্ষা করিতে হইত।—সেজন্য প্রত্যেক জার্ম্মানের মনে আজ্ঞানুবর্ত্তীতার ভাব প্রবল। সেনাপতির পোষাক যেখানে দেখিবে সেইখানেই জার্ম্মান্ যুবক মাথা হেঁট করিবে। একদিন এক কারামুক্ত কয়েদী কোনও উপায়ে এক সৈনাধ্যক্ষের পোষাক

সংগ্রহ করিয়াছিল—ঐ পোষাকের জোরে সে একদল সৈন্যের অধ্যক্ষ হইয়া একটি ছোট সহরে প্রবেশ করিল। সহরের শাসনকর্ত্তা তাহাকে সসম্মানে অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইল। সে সম্রাটের আদেশ জানাইয়া শাসনকর্ত্তার নিকট হইতে রাজকোষের সমস্ত টাকাকড়ি সংগ্রহ করিল—তার পরে শাসনকর্ত্তাকে বন্দী করিয়া বার্লিনে পাঠাইল। শাসনকর্ত্তা এবং সেনাদল বিনাবাক্যব্যয়ে তাহার সমস্ত আদেশ পালন করিল—একবার সন্দেহ বা জিজ্ঞাসাও করিল না—সে বাস্তবিকই সৈন্যাধ্যক্ষ কিনা—পোষাকের এমনই সম্মান। শেষে যখন সেই কয়েদী রাজকোষের সমস্ত অর্থ লইয়া ধীরে ধীরে অদৃশ্য হইল—তখন সৈন্যগণের চোখ ফুটিল। এমনই জার্ম্মান্ সেনানীর আজ্ঞানুবর্ত্তীতা।

এই সেনাবলের প্রাধান্য—সেনাবলের সাহায্যে ইউরোপে প্রভুত্ব স্থাপনের প্রয়াস—ইহা প্রুশিয়ান্ 'মিলিটারিজম্' নামে খ্যাত হইয়াছে। 'মিলিটারিজম্' অর্থে সৈন্যশক্তির সাহায্যে শাসন। গত ইউরোপীয় যুদ্ধে জার্ম্মানীর পরাজয়ে প্রমাণ হইয়াছে—শুধু সৈন্যশক্তিতে একটা জাতি আর একটা জাতির উপর প্রভুত্ব করিতে পারে না—বা বড় হইতে পারে না। এই যুদ্ধ বোধ হয় জার্ম্মানী এবং ইউরোপের একটা বড় পরীক্ষা। জার্ম্মানী এই মিলিটারিজম্ পরিত্যাগ করিলে—তাহার অতুলনীয় প্রতিভা এবং শক্তি অন্য দিকে নিয়োগ করিলে—হয়ত সে আবার বড় হইয়া উঠিবে, জগতে কীর্ত্তি রাখিয়া যাইবে।

রাজা।

সে আজ অনেক কাল আগের কথা। বারাণসী নগরে অরিন্দম নামে এক রাজা ছিলেন। কত দেশ জোড়া রাজ্য তাঁর, মস্ত বড় রাজা তিনি—অন্যান্য দেশের রাজারা তাঁর নাম শুনে ভয়ে কাঁপতেন। রাজা অরিন্দম ছিলেন যেমন সাহসী তেমনি বীর, তেমনি নিষ্ঠুর। পরের রাজ্য জয় করে সেই সোণার দেশ ছার খার করে শ্মশান করে দিতে তাঁর বিন্দুমাত্র দয়া হোত না। যে দেশের লোকেরা তাঁর কথা মানত না সে দেশের ছেলে বুড়ো নারীদের তিনি সমানে হত্যা করবার আদেশ দিতেন। তাদের প্রাণ ভরা ব্যথা দুঃখের করুণ অশ্রুতে তাঁর হৃদয় এতটুকু গলত না। এত গর্ব্বিত আর ক্ষমতাপ্রিয় রাজা ছিলেন অরিন্দম যে তিনি কোনো মানুষকে তো মানুষ বলে গ্রাহ্যই করতেন না—ভগবান বলে যে একজন কেউ আছেন সবার উপরে তাও তিনি মানতে চাইতেন না। যা তাঁর খুসী তিনি তাই করে যেতেন। কেউ কোনো ভাল কথা বা উপদেশ দিলে তিনি তা কখনো শুনতেন না—আর কার ঘাড়ে কটা মাথা যে রাজা অরিন্দমের কথার উপর কথা কয়! এমন বদ্ মেজাজী অত্যাচারী রাজার রাজ্যে বাস করে প্রজাদের সব দুঃখের সীমা ছিল না। হুকুমের যার ন্যায় অন্যায় জ্ঞান নেই, ছেলের মত প্রজাদের সুখদুঃখের দিকে যে রাজার দৃষ্টি নেই তার রাজ্যে সুখ আসবে কোথা থেকে। রাজার খেয়ালের খেয়ালী তাঁর জনকত পার্শ্বচর ছাড়া,—মন্ত্রীরা ও সভাসদেরা যারা রাজার মঙ্গল কামনা করতেন তাঁরা সকলেই রাজার এই অবস্থা দেখে মহা দুঃখে দিন কাটাতে লাগলেন। যত বড় ক্ষমতা শালীই হোন না কেন তিনি লোকে যাকে চায় না—যার অত্যাচারে অবিচারে, হাজার হাজার দরিদ্রের দীর্ঘশ্বাসে ভগবানের সিংহাসন কেঁপে উঠছে তার ক্ষমতার দর্প আর কতদিন

থাকতে পারে ? সকল রাজার রাজা যিনি, ব্যথিতের চোখের জল দেখলে তিনি যে আর স্থির থাকতে পারেন না।

রাজা অরিন্দম আজ শীকারে চলেছেন—কত হাতী ঘোড়া লোক লস্কর সব রাজার বাড়ীর সমুখের পথে সার দিয়ে দাঁড়িয়েছে। কত নিশান, কত তলোয়ার বল্লম, ধনুক বাণ সব শীকারীদের হাতে হাতে। বাজনা ওয়ালার দল কত রকমের বাজনা নিয়ে দলের সম্মুখে দাঁড়িয়ে তালে তালে বাজাচ্ছে। হাতী ঘোড়া গুলো বাজনার তালে তালে পা ফেলে সমুখ পানে ছুটে চলবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠছে। হাতীর উপরকার হাওদা সব জরী দিয়ে মোড়া—রাজার হাতীর দাঁত গুলো সব—সোণায় জড়ান ; হাতীর মাথায় সোণার মুকুট ঝলমল কচ্ছে। ঘোড়া গুলো সব, সেই বা কি বিচিত্র সাজে সেজেছে। রাজ্যের লোক ভেঙ্গে সব এই তামাসা দেখতে চলে এসেছে। রাজা বাহাদুর অন্দর মহল থেকে বের হয়ে সিংহদ্বার দিয়ে হাতীর উপর উঠবার সময় প্রজারা যদি রাজ দর্শন একবার পায়! কত দূর দূরান্তর থেকে লক্ষ লক্ষ লোক রাজাকে শুধু একটিবার চোখের দেখা দেখে পুণ্য সঞ্চয় করতে এসেছে। সে কি ভিড়! মাঝে মাছে হঠ্ হঠ্ শব্দ শোনা যাচ্ছে—আর পথের ওপর দিয়ে হাতী চলিয়ে লোকের ভীড় পরিস্কার করে দেওয়া হচ্ছে।

একদল শীকারী কুকুরের ঘেঁউ ঘেউ ডাক শোনা গেল। এবং তার পরই জয়ের শব্দ হোল 'জয় রাজা বাহাদুরের জয়—জয় রাজা বাহাদুরের জয়!' রাজা বাহাদুরের জয় জয় শব্দে আকাশ পাতাল যেন কেঁপে উঠল। লক্ষ লক্ষ প্রজার এক কণ্ঠের শব্দ 'জয় রাজা বাহাদুরের জয়!'

সিংহ দ্বারের সমুখে এসে রাজাবাহাদুর চোখ চেয়ে একবার শীকারিদের সন্ধান দেখলেন। লক্ষ লক্ষ প্রজাদের পানে চেয়ে বললেন, 'এই এ লোকসবকো

হটায় দেও—চালাও হাতী।' হুকুম পেতে না পেতে লোকজনের ভীড় কমিয়ে দেবার জন্য হাতী ছুটলো। লক্ষ লক্ষ লোক কেউ মনেও করেনি যে রাজ দর্শনে পুণ্য সঞ্চয় করতে এসে তাদের হাতীর চাপনে স্বর্গ দর্শন হবে। রাজার হুকুমে হাতী সত্যি সত্যিই তাদের উপর দিয়ে চলল দেখে তারা যে যে দিকে পারল ছুটতে লাগল। অত অত লোকের ভীড়—ছুটে যে পালান সেও এক অসম্ভব ব্যাপার। কত লোক পালিয়ে প্রাণ বাঁচাল, কত কত হাতীর পায়ের চাপে মরে গেল। শিকারী কুকুর গুলোও রাজার ইঙ্গিত পেয়ে হতভাগ্য প্রজাদের পানে ছুটল। দেখতে দেখতে লোকের ভীড় পরিস্কার হয়ে গেল। রাজা অরিন্দমের হাতী পারিজাত তার বিরাট দেহ নিয়ে হেলতে দুলতে এসে সিংহদ্বারের সমুখে দাঁড়াল। সব চুপ্ চাপ্, কারো মুখে টু শব্দটি পর্য্যন্ত নেই—রাজা বাহাদুর এখন হাতীতে উঠবেন। এমন সময় দূরে একটা গানের আওয়াজ শোনা গেল। গান যেন ক্রমেই কাছে শোনা যেতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে এক-তারার মধুর মন মাতান আওয়াজ। গান শোনা যেতে লাগল :—

'সকল রাজার রাজা তুমি
আমার ভগবান
সকল জীবের প্রভু তুমি
ও গো আমার প্রাণ
'নয়নের মণি পরাণের ধন—তুমি
ও গো ভগবান।'

সঙ্গীতের মধুর তানে মুহূর্ত্তের মধ্যে দলের সব লোক শীকারের ভাবনা ভুলে গিয়ে সেই দিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়ল। রাঙ্গা রবির কিরণ তখন ভর পৃথিবীর পানে ছড়িয়ে পড়েছে। লতায় পাতায় নিশার শিশির গুলো ঝলমল কর্ছে। রাজার

মাথার সোণার মুকুট আর তার হীরে মুক্তো গুলোর দিকে চাইলে চোখ যেন ঝলসে যায়। মনে হয় আকাশের যে সোণার থালাখানি সোনালি কিরণ বর্ষণ করে সারা পৃথিবীকে হাসাচ্ছে রাজা আরিন্দমের মাথায়-ও যেন তারই একখানা শোভা পাচ্ছে। দেখতে দেখতে বীণ বাজাতে বাজাতে এক দীন ভিখিরী রাজার হাতীর সমুখে এসে পড়ল—

'ভগবান ভগবান আমার ভগবান।' সকালে উঠেই শীকারে বের হবার হাঙ্গামে ও হাতী চালাবার হুকুম দিয়ে রাজার মেজাজ বড় ভাল ছিল না। রাজা ভিখিরীকে ডেকে বললেন 'কে তোকে আমার শীকারে বের হবার পথে গান গাইতে বলেছে? জানিস এ পথে ভিখিরীদের চলা নিষেধ।' ভিখিরী রাজার অগ্নি দৃষ্টির দিকে তার মধুর হাসি ভরা চোখদুটি রেখে বললে 'কে জানে মহারাজ, যে ভগবানের রাজ্যে কারো কোন পথে চলতে মানা আছে।'

রাজা অরিন্দমের মুখের সামনে দাঁড়িয়ে এই কথা! কে এ ভিখিরী একি কোনো দিন রাজা অরিন্দমের নাম শোনে নি? শীকারীর দল, পাত্র মিত্র, সভাসদেরা প্রমাদ গণলেন। এ ভাবে রাজাকে চটানোর জন্য ভিখিরীর জান তো যাবেই—তারপর তাঁদের কার ভাগ্যে কি আছে তাই-বা কে জানে!

রাজা গর্জ্জন করে উঠলেন। 'কে তোর ভগবান—বেটা, রাজা অরিন্দমের রাজ্যে বাস করে ভগবান ভগবান ভগবান করছিস। দেখাচ্ছি তোর কোন্ ভগবান তোকে রক্ষা করে আজ! শীকারের সব আমোদ আজ মাটি করে দিলে সব ছোট লোকের দল। এ বেটাকে আমার সমুখে হাত পা বেঁধে পঞ্চাশ কোড়া লাগিয়ে ছেড়ে দে। আচ্ছা ভগবান টের পাবেন এখন।

রাজার হুকুম। তখনই ভিখিরীকে বেঁধে পঞ্চাশ কোড়া মারা হোল।

ভিখিরী রাজার সিংহদ্বারের সম্মুখে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। রাজাবাহাদুর দলবল নিয়ে শীকারে বের হয়ে পড়লেন।

শীকার করতে করতে শীকারীর দল ক্রমেই গভীর বনে গিয়ে পড়ছে। বাঘ ভালুক তখন অনেক শীকার হয়ে গেছে, এখন হরিণ শীকার করবার জন্য রাজা বাহাদুর ঘোড়ায় চড়ে এগিয়ে চলেছেন। দেখতে দেখতে একটা হরিণ বনের ভেতর থেকে লাফিয়ে বের হয়ে ছুটে চললো। রাজা হরিণের পিছু পিছু ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন। রাজা এই হরিণের নাগাল পান পান—এই হরিণ হোঁচট খেয়ে পড়ে পড়ে কিন্তু ধরি ধরি করেও রাজাবাহাদুর তাকে ধরতে পারেন না, সে ছুটে পালিয়ে যায় রাজা ঘোড়া আরো ছুটিয়ে দিলেন। প্রায় ধরেছেন এমন সময় সম্মুখে একটা খাল পেয়ে হরিণ ছানা জলের ভেতর ঝাঁপিয়ে পড়ে ওপার পানে সাঁতরে চললো। রাজাও খুব ভাল সাঁতার জানতেন। মনে ভাবলেন 'এবার বাছা যাবে কোথা—জলে থাকতে থাকতেই তোমায় ধরছি'। এই ভেবে ঘোড়া থেকে লাফিয়ে পড়ে তাড়াতাড়ি রাজবেশ খুলে রেখে জলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন—প্রায় ওপারে গিয়ে পৌঁছেছেন এমন সময় রাজা হরিণের শিং হাতে চেপে ধরবেন ভেবে হাত বাড়িয়েছেন,—একি—কোথায় গেল হরিণ—কোথায় বা তার শিং! কিছু নেই—কিছুই নেই—রাজার হাত ফিরে এসে জলে পড়ল। রাজা অবাক হয়ে গেলেন! এ হরিণ তো হরিণ নয় যে, রাজা তাকে খুঁজে পাবেন। ভোরের বেলায় শীকারে বের হবার সময় রাজা যাকে সিংহদ্বারের সম্মুখ দিয়ে গান গাইতে গাইতে যেতে দেখেছিলেন—সে একজন দেবদূত। মানুষ বড় হয়ে ছোটয় উপর কত অত্যাচার করতে পারে তাই দেখবার জন্যই স্বর্গ থেকে ভগবান তাকে মর্ত্তে পাঠিয়েছিলেন। সেই দেবদূতই হরিণের বেশ ধরে ছলনা করে রাজাকে বনপথে ঘোড়ায় চাপিয়ে ক'দিনের রাস্তায় এনে ফেলেছে।

ওপারে উঠে রাজা হরিণের সন্ধানে এদিক ওদিক চাইতে লাগলেন। এর মধ্যে তিনি দেখতে পেলেন একটা লোক ওপারে তাঁর রাজবেশ নিজের অঙ্গে পরছে। রাজা ভাবলেন একি, ও কেন আমার পোষাক গায় দিচ্ছে? দেখতে দেখতে লোকটা রাজার পোষাক পরে রাজার ঘোড়ায় লাফিয়ে উঠে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলে। রাজার ঘোড়া পক্ষীরাজ—দেখতে দেখতে ঘোড়া কোথায় উধাও হয়ে গেল!

রাজা ভাবলেন 'একি আমার পোষাক পরে আমার ঘোড়া ছুটিয়ে গেল—সাহস তো ওর কম নয়!' এ কিন্তু আর কেউ নয়—এ সেই দেবদূত। দেবদূত ঘোড়া ছুটিয়ে রাজা অরিন্দম সেজে শীকারের লোকজন সব জুটিয়ে নিয়ে রাজ্যে ফিরে চললেন। রাজা অরিন্দম তখন গভীর গহন বনের ভেতর খালের ধারে প্রায় উলঙ্গভাবে পড়ে আকাশ পাতাল ভাবতে লাগলেন।

বনের ভেতর কালসন্ধ্যা ঘনিয়ে এল, সমস্ত বন আঁধারে ছেয়ে গেল। রাজা ভাবলেন 'এখন কি করি—অজানা অচেনা বন। কোনদিকে যে বাড়ী ঘর আছে সেও বোধ হচ্ছে না। এই বনে কি করে রাত কাটাই।' এমন অবস্থায় তো রাজা কোনদিন পড়েন নাই। হুকুমে যার হুকুম তামিল করবার জন্য কত শত লোক সব সময় প্রস্তুত, আজ এই গহন বনে তার হুকুম তামিল করবার জন্য তো কেউ নেই। কি করে যে রাত কাটাবেন কোথায় যাবেন কিছুই তিনি ভেবে ঠিক পাচ্ছিলেন না।

মনের দুঃখে গহন বনে বসে রাজা অরিন্দম ভাবতে লাগলেন। অন্ধকারে বন ছেয়ে গেছে। চারিদিকে চাইতে চাইতে রাজা দেখতে পেলেন, দূরে অনেক দূরে একটা আলো যেন দেখা যাচ্ছে। রাজা ভাবলেন এ বোধ হয় তাঁরই শীকারীর দল ঐখানে তাঁবু ফেলে রাত্রের আহারের আয়োজন কচ্ছে। রাজা

আশায় আশায় আলোর পানে ছুটতে লাগলেন। চলতে চলতে আঁধারে পা ফসকে রাজা হঠাৎ একটা কাঁটা-ভরা গর্তের ভেতর পড়ে গেলেন। সেই গর্ত থেকে অনেক কষ্টে রাজা যখন উপরে উঠলেন তখন তাঁর ডান পা খানা প্রায় খোঁড়া হয়ে গেছে—সমস্ত গা কাঁটায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে। খোঁড়াতে খোঁড়াতে আলো লক্ষ্য করে রাজা চলতে লাগলেন।

অনেকক্ষণ পর তিনি আলোর কাছে গিয়ে দেখলেন সে জায়গায় মিস্ত্রীরা সব ইটের পাঁজা পোড়াচ্ছে। পিপাসায় রাজার কথা বের হচ্ছিল না—অনেক কষ্টে তিনি তাদের বললেন 'একটু জল তোমরা আমায় দাও।' এত রাত্রে বনের মাঝে মানুষের আওয়াজ পেয়ে মিস্ত্রীরা সব বের হয়ে এসে দেখে একটা খোঁড়া মানুষ প্রায় উলঙ্গ হয়ে এসে একটু জল চাইছে। সমস্ত গায় তার ঘায় মত কাঁটা চেরায় ক্ষত। মিস্ত্রীরা রাজাকে জল দিতে তিনি বলিলেন, 'জল তো দিলে এখন কিছু খাবার না দিলে তো মারা যাই।' লোকটার অবস্থা দেখে মিস্ত্রীদের বড় দয়া হোল। তারা তাদের বাসি ভাত আর শুকনো ডাল কিছু এনে রাজাকে দিল, পরবার জন্য একখানা পুরোনো কাপড়ও দিল। অরিন্দম জীবনে কখনো এমন খাবার খান নাই—এ খাবার মুখে তুলতেও তাঁর ঘেন্না করতে লাগল। কিন্তু উপায় নেই—কথায় বলে পেটের ক্ষিদেয় বাঘে ঘাস খায়—রাজা চোখ মুখ বুজে তাই খেয়ে পেটের ক্ষিদের শান্তি করলেন। খাবার সময় মিস্ত্রীরা সব রাজাকে জিজ্ঞাসা কচ্ছিল 'কে তুমি, কেমন করে এই গহন বনে হাত পা ভেঙ্গে রাত্রে উপস্থিত হলে?' রাজা বললেন 'খেয়ে ঠাণ্ডা হয়ে সব বলছি।' আহার শেষ হয়ে গেলে রাজা বললেন 'আমি তোমাদের রাজা অরিন্দম—চল আমার রাজধানীতে তোমরা আমায় পৌঁছে দাও—যথেষ্ট পুরস্কার দেব তোমাদের।'

এক ভিখিরীর মুখে সে তাদের রাজা অরিন্দম এই কথা শুনে মিস্ত্রীরা তো সব অবাক্! বলে কি-এ লোকটা—পাগল না কি এ? যে রাজা অরিন্দম যার ভয়ে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায় সে কিনা এমন অবস্থায় এখানে আসবে! একথায় কারই বা বিশ্বাস হয়। মিস্ত্রীরা সব বললে 'ওসব পাগলামো রাখ বাছা, কে তুমি সত্যি করে বল, নইলে রাত্রে এখানে থাকতে পাবে না। চোর ডাকাতকে আশ্রয় দিয়ে শেষে কি ধনে প্রাণে মারা যাব?

অরিন্দমের রাজ মেজাজ তখনো যায় নাই। তিনি মিস্ত্রীদের মুখে ঐ কথা শুনে রাগে জ্বলে উঠে বললেন 'কি বেটাদের যত বড় মুখ নয়—তত বড় কথা! সব বেটাদের কোতল কোরব—এই কোই হায়!!!

ও বাবা যার খায় তারই সর্ব্বনাশ করে, মিস্ত্রীরা সব 'মার বেটাকে মার!' বলে খুব উত্তম মধ্যম দিয়ে রাজাকে তাদের ইঁটখোলা থেকে বের করে দিলে।

আঁধার বনে রাজা আবার একাকী চলতে লাগলেন। চলতে চলতে তিনি আবার একটা আলো দেখতে পেয়ে সেইখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সে আর একটা ইঁট খোলা। সেখানকার মিস্ত্রীরাও সব রাজাকে কিছু খাবার দিলে। খেয়ে দেয়ে রাজা বললেন 'আমি তোমাদের রাজা—আমার রাজধানীতে পৌঁছে দাও।' মিস্ত্রীরা সব পাগলের প্রলাপ ভেবে হাসতে লাগল। মিস্ত্রীদের হাসতে দেখে অরিন্দম তাদের যা-তা বলতে লাগলেন। তারা তা সহ্য করবে কেন। বেশ ঘা কতক দিয়ে তারাও অরিন্দমকে তাদের ইঁটখোলা থেকে বের করে দিল। রাত্রি অনেক হয়ে গেছে—চলতে চলতে অবসন্ন হয়ে রাজা বনের মাঝে একটা গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে শুয়ে পড়লেন।

রাত ভোর হয়ে গেল। আবার পূবের দিকে সোণার কিরণ ছড়িয়ে পড়ে সমস্ত জগৎ আলো করে দিল। রাজার মনে হতে লাগল—কাল এমন সময়

সিংহদ্বারে জরী মোড়া হাওদায় সেজে সোনার মুকুট মাথায় দিয়ে পারিজাত তাঁর অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিল—আর আজ—কোথায় বা রাজধানী, কোথায় বা তিনি!

ভোর হয়ে গেল, রাজা আবার পথ চল্‌তে লাগলেন। চলতে চলতে আবার তিনি একটা ইঁটখোলায় গিয়ে উপস্থিত হলেন। খোঁড়া ভিখিরী দেখে তাদের দয়া হোল, তারা তাকে কিছু খাবার দিলে। খাবার সময় সময় রাজা আর চোট পাট না করে জিজ্ঞাসা করলেন—'বলতে পার কোন পথে রাজধানীতে যাব—সে কতদূর?' মিস্ত্রীরা বল্‌লে 'সে অনেক দূরের পথ—সোজা পূবে দু'দিন সমানে চললে তবে রাজধানীর নাগাল পাওয়া যাবে। তবে তুমি খোঁড়া মানুষ—তুমি চারদিনের কমে পৌঁছতে পারবে না।' এক রাত্রির মধ্যেই রাজাকে এমন বুড়ো দেখাচ্ছিল ও চেহারা এত বদলে গিয়েছিল যে তাকে আর দেখে চেনা যায় না।

চলতে চলতে রাজা ছোট একটা সহরে এসে উপস্থিত হলেন। সহরে বেজায় চোরের উপদ্রব, বাইরের লোক দেখলেই পাহারাওয়ালা তাকে আটকে রেখে সহর কোতোয়ালের কাছে গিয়ে হাজির করে। রাজা অমনি অবস্থায় সহরে যেতেই পাহারাওয়ালা তাকে ধরলে। সহর কোতোয়াল সন্দেহ করে কোথা থেকে সে আসছে কোথায় যাবে সব জিজ্ঞাসা করলে। রাজা বললেন রাজধানী থেকে তিনি আসছেন আবার রাজধানীতেই যাবেন। কোতোয়াল বললে এযে উল্টো পথ।' এই বলে সন্দেহ করে তার হাতে হাতকড়ি লাগিয়ে পাহারা-ওয়ালার জিম্মা করে তাকে রাজধানীতে পাঠিয়ে দিলে।

রাজধানীতে গিয়ে কোতোয়ালীর লোকেরা তাকে এক অন্ধকার কারাগৃহে ফেলে রাখল। অনেকদিন চলে গেল—সে কত দিন—কত মাস—একদিন

কারাগারের রক্ষক এসে সব কয়েদীদের খোঁজ নিতে নিতে রাজার অন্ধকার ঘরে এসে তার খোঁজ জিজ্ঞাসা কল্লেন। রাজা কাঁদতে কাঁদতে বললেন 'আমিই তোমাদের রাজা ছিলাম' এই বলে তিনি সব ঘটনা বললেন। কিন্তু কারারক্ষক অনেক দিন রাজা অরিন্দমকে দেখেছে। এতো সে চেহারা নয়। এমন বিশ্রী ঠেঙ্গা চেহারার খোঁড়া রাজা তো তাদের ছিল না। এই মস্ত বড় বড় দাড়ি—জটাওয়ালা চুল সে কি তাদের রাজা অরিন্দম হতে পারে? কিন্তু অরিন্দম বার বারই বলতে লাগলেন যে তিনিই তাদের রাজা। কারাগারের আরও অনেক কর্ত্তারা পাগল দেখতে ছুটে এলেন। সকলে বললেন 'এতো দেখছি আচ্ছা পাগল—একেবারে রাজা বনে যেতে চায়! এ পাগলটাকে রেখে শুধু শুধু আর রাজার অন্ন ধ্বংস করিয়ে কি লাভ! এটাকে ছেড়ে দাও!" সকলে অরিন্দমকে পাগল বলে কারাগারের বের করে দিল। এতদিন কারাগারে থেকে তবু রাজার দুটো খাবার জুটতো, কিন্তু কারাগারের বাইরে এসে তাঁর যা অবস্থা হোল সে আর কি বলবো!

কোনোদিন কোনো কাজ শেখেন নি তিনি যাতে খেটে খেতে পারেন তার উপর খোঁড়া পা এ অবস্থায় কি করে চলে! এক ভিক্ষা মাত্র সম্বল, সে কোন দিন বা মেলে কোন দিন বা মেলে না। এমনি ভাবে রাজার দিন যায়—রাজা শুধু ভাবেন 'হায় এ কি হোল!'

এদিকে দেব দূত রাজার পোষাক পরে ঘোড়া ছুটিয়ে এসে সব শীকারিদের জুটিয়ে রাজধানীতে ফিরে এলেন। পরের দিন থেকে দেখা গেল রাজা অরিন্দম আর তেমন খেয়ালী রাজা নাই। প্রজাদের সুখ দুঃখ, অভাব অভিযোগ সব তিনি নিজে দেখে বেড়াচ্ছেন। দেখতে দেখতে অন্যায় অবিচার সব রাজ্য থেকে দূর হয়ে গেল। রাজা যেখানে ভাল সে রাজ্যে কি কোন দুঃখ থাকে? প্রজারা সব রাজাকে ধন্য ধন্য করতে লাগল।

কিন্তু রাজা অরিন্দম যিনি সত্যি রাজা—দিন দিনই তার দুঃখ বেশী হতে চলল। সে দুঃখ দেখলে পাষাণেরও জল আসে। তিনবছর পরে দেবদূত রাজা এক মহা ভোজের আয়োজন করলেন। রাজ্যের যত ধনী দরিদ্র, বড় ছোট সবারই নেমন্তন্ন হয়েছে, পাত্র মিত্র নিয়ে রাজা নিজে সব খাবার বিলাচ্ছেন। সেদিন রাজা অরিন্দমও ভিখারীর বেশে নেমন্তন্নে এসেছেন। রাজা আব সবাইকে যা খাবার দিলেন অরিন্দমকে তার দুনো দিলেন। খাবার দিয়ে বিদায় করবার সময় দীন দুঃখীদের কিছু অর্থও দিলেন, রাজা নিজের হাতে সবাইকে যা অর্থ দিলেন অরিন্দমকে তারও দুনো দিলেন।

দিন যায় যেমন সুখে দুঃখে সবারই যায়। তিন বছর পরে রাজা আর এক ভোজ দিলেন। সেবারও আর সবাইকে যা দিলেন অরিন্দকে তার দুনো দিলেন।

রাতে চাঁদ দিনে সূর্য্য ওঠে,—দিন যেমনি যাবার তেমনি যায়। আবার তিন বছর পরে দেবদূত রাজা রাজ্যের সবাইকে নেমন্তন্ন করে আর এক ভোজ দিলেন। সবাইকে বিদায় দেবার পর দেবদূত রাজা অরিন্দমকে রাজপ্রাসাদের এক কক্ষে নিয়ে বললেন 'দশ বছর ভগবান তোমার গর্ব্ব পুড়িয়ে খাঁটি সোনা করে দিয়েছেন। প্রজাদের নিয়েই রাজত্ব, তাদের দেখো, শুধু নিজের সুখেই নিজে মত্ত থেকো না। ভাল হয়ে চল। তোমার রাজত্ব তুমি নাও, সুশাসন কর, আমি স্বর্গে চল্লুম।"

এই বলে অরিন্দমের গায় হাত দিতেই তাঁর পূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ফিরে এল। আবার রাজবেশ তাঁর অঙ্গে শোভা পেতে লাগল।

দেবদূত বললেন 'যাও ঐ কক্ষে তোমার পাত্র মিত্র তোমার অপেক্ষায় বসে আছে। তুমি গেলে সবাই তোমায় রাজা বলে নেবে, কেউ আর তোমায় ভিখারী মনে করবে না। ভগবান তোমার মঙ্গল করবেন।" দেবদূতকে আর দেখা গেল না, রাজা অরিন্দম করজোড়ে ভগবানকে প্রণাম করে রাজা হয়ে রাজ্য শাসন করতে লাগলেন।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।

তীর মেরে ফল চুরি।

শুন ভাই সব, কাহিনী আজব,
আফ্রিকার কাফ্রিদের ;
উইলিয়াম টেল, রাখিয়া আপেল,
শিরোপরি তনয়ের,
করে খান খান, আছে হে বাখান,
ইতিহাস দেখ পড়ে ;

বিদ্যার প্রসার, সোহালি (১) মাঝার,
হতেছে ক্রমশঃ করে।
টেলের ঐ গল্প, ছেলে অল্প স্বল্প,
কেতাবে পড়িল যবে,



ফলের চেঙ্গারা লয়ে এক নারী—

ফলের চেঙ্গারী, লয়ে এক নারী,
পথ বেয়ে আসে তবে ;
ছোঁড়া দুইজনা, বেজায় সেয়ানা,
আসিতে দেখিয়া তারে,

১। সোহালি—আফ্রিকার জাতি বিশেষ ;

তীর ধনু নিয়ে, ঘাপটী মারিয়ে,
বসিল জানালা ধারে ;
বাম হাতে করে, খঞ্জনী ঝুলায়ে,
ডান হাত কটিদেশে,
ছোঁড়াদের দিকে, আড়ে আড়ে চেয়ে,
চলে সে মুচকি হেসে।
ওই সামনের খেজুর গাছের
কাছাকাছি এল যাই,
ছুঁড়ে এক তীর, বিন্ধে ফল বীর,
হর্ষে হাত তোলে তাই ;

ফল সুদ্ধ তীর, বিন্ধিল গভীর,
খেজুর গাছের গায় ;
জোর্‌সে জ্যা টানি, দোসরা পরাণি,
ছোঁড়ে তীর কি ত্বরায় !
ফলেরে ভেদিয়া, গাছেতে বিন্ধিয়া
বাঁকা হয়ে ঝুলে তীর ;
ডাকাতি দুপুরে, করে তীর ছুঁড়ে,
নাহি জ্ঞান রমণীর ;
চিন্তা বিরহিত, সে অবিশঙ্কিত,
হনহনি চলি যায় ;



ঐ আসে, ছুটে ঊর্দ্ধশ্বাসে—

দৃষ্টির বাহিরে, হেরিয়া নারীরে,
হুড়মুড়ি দোঁহে ধায় ;
দেখনা ঐ আসে, ছুটে উর্দ্ধশ্বাসে,
ফল পানে চেয়ে ঠায় ;
যার ফল যেটি, পেড়ে নিয়ে সেটি,
আটখানা দুজনায় ;
ঐ হাত ঘুরায়ে, সে ফল দেখায়ে,
নাচ সুরু করে ছায় ;

কয় উভরায় যা কাফ্রী ভাষায়,
কহি আমি তা বাংলায়
"তীর মেরে ফল চুরি,
দেখ কেয়া বাহাদুরি,
হিপ্ হিপ্ হুর্‌রে ইয়ার ;
(২) বানা তবে জাম্বো এবে,
ফল দুটো খেতে হবে,
ভুলো নাক 'টেলে' আফ্রিকার।"

শ্রীধানি লঙ্কা।

২। বানা—মহাশয়, জাম্বো—নমস্কার।

নৈতিক গল্পগুচ্ছ।

(১)

"আহারের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা কোন সময় উপযুক্ত ?" এই প্রশ্ন কোন এক সাধুপুরুষকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তরে বলিলেন—"একজন ধনীর পক্ষে যে সময় তিনি ক্ষুধা বোধ করেন এবং গরীবের পক্ষে যখন সে আহার প্রাপ্ত হয়।"

(২)

একদা একটী সুচতুর বালক একটী প্রজ্বলিত প্রদীপ লইয়া যাইতেছিল। একজন সাধু পুরুষ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"অগ্নি নির্ব্বাপিত হইলে কোথায় যায় ?" বালক······আপনি বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেন, উহা কোথা হইতে আসে।

প্রশ্নের অবতারণা করা মীমাংসা করা অপেক্ষা অনেক কঠিন।

(৩)

প্রশ্ন—কোন্ জিনিষ ভাল হইলেও মুখদ্বারা ব্যক্ত করা যায় না ?

উত্তর—আত্মপ্রশংসা।

(৪)

কোন্ শ্রেণীর লোক মৃত্যুকালে অত্যন্ত দুঃখ প্রাপ্ত হয় ?"—উত্তর এই যে, যে ব্যক্তি প্রভূত ধনসম্পত্তি থাকিতেও আহারে কৃপণতা করে এবং কোন বিষয় জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও প্রকাশ করিতে পারে না।

(৫)

জিজ্ঞাসু। সাধো! তোমার গৃহ এত ভগ্নপ্রবণ কেন ?

সাধু। একজন নশ্বর জীবের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট।

জি। তোমার মুখ এত কদর্য্য কেন ?

সা। তুমি আমাকে অথবা আমার এই কদর্য্য বদন মণ্ডলের নির্ম্মাণকারী ঈশ্বরকে নিন্দাবাদ করিতেছ।

শ্রীপ্রমোদনাথ মুখোপাধ্যায়।

অশোক।

হিন্দুরাজত্ব কালে ভারতবর্ষে যে সকল রাজগণ রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন তন্মধ্যে মহারাজ অশোকের রাজত্বই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। চন্দ্রগুপ্ত নামে একজন হিন্দুরাজা ভারতে মৌর্য্যবংশ নামে একটী রাজবংশ স্থাপন করেন। অশোক মৌর্য্যবংশের তৃতীয় রাজা। চন্দ্রগুপ্তের পুত্র বিন্দুসার। বিন্দুসারের পুত্র ছিলেন--অশোক।

যীশুখৃষ্টের জন্মের প্রায় ২৭২ বৎসর পূর্ব্বে অশোক মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। হিন্দুরাজাদের রাজধানী মগধ নগরে ছিল। অশোক বাল্য কালে বড় দুর্দ্দান্ত ছিলেন। তাঁহার উশৃঙ্খলতা দেখিয়া ছোটবেলা সকলে তাঁহাকে 'চণ্ডাশোক' বলিত। পরে তিনি অতিশয় ধার্ম্মিক ও সৎলোক বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন।

অশোক সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই রাজ্যবিস্তারে মনোনিবেশ করিলেন। প্রথমে তিনি কলিঙ্গ দেশ জয় করিতে গমন করেন। কলিঙ্গ জয় করিতে যাইয়া তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে অসংখ্য নরনারীর মৃত্যু দেখিয়া ও রক্তের স্রোত প্রবাহিত হইতে অবলোকন করিয়া পর রাজ্য জয় বাসনা পরিত্যাগ করিলেন। কলিঙ্গ বিজয় করিতে যাইয়া তাঁহার মন পরিবর্ত্তিত হইল। এখন তিনি রাজ্যলাভের আশা একেবারে পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হইলেন।

অতঃপর তিনি উপগুপ্ত নামক একজন বৌদ্ধ ভিক্ষুর নিকট হইতে বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তিনি বৌদ্ধ ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া রাজ্যে বৌদ্ধ ধর্ম্ম বিস্তারে মনোনিবেশ করিলেন। তাঁহার চেষ্টায় বৌদ্ধ ধর্ম্মের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়। পৃথিবীর নানা দেশে এই ধর্ম্ম প্রচারের জন্য তিনি অনেক ধর্ম্মপ্রচারক প্রেরণ

করিয়াছিলেন। তিনি ভারতের সমস্ত স্থানে এবং এশিয়া ও ইউরোপের অনেক স্থানে এই ধর্ম্ম প্রচার করিতে বৌদ্ধ ভিক্ষু প্রেরণ করেন। চীন, জাপান, তিব্বত, ব্রহ্ম প্রভৃতি দূর দেশে তাঁহার চেষ্টায়ই বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রচার হইয়াছিল। তিনি এই ধর্ম্মের উন্নতিকল্পে ইহাকে রাজ ধর্ম্ম বলিয়া ঘোষণা করেন। তিনি স্থানে স্থানে মঠ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে প্রচুর অর্থ প্রদান করিতেন। তিনি বহু বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদিগকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। অশোক সর্ব্বসাধারণের অবগতির নিমিত্ত পর্ব্বতগাত্রে, প্রস্তর স্তম্ভে বৌদ্ধ ধর্ম্মের সার সংগ্রহ করিয়া তাহাতে খোদিত করিয়াছিলেন। এখনও ভারতের কোন কোন স্থানে অশোকের শিলালিপি দেখিতে পাওয়া যায়। অশোকের চেষ্টা ও উৎসাহ ব্যতীত দেশ দেশান্তরে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব বিস্তৃত হইতে পারিত কিনা সন্দেহ।

অশোক অতিশয় প্রজাপ্রিয় নরপতি ছিলেন। তিনি প্রজাদের সুখের জন্য অনেক সদনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন। জন সাধারণের সুবিধার জন্য তিনি স্থানে স্থানে কূপ ও পুষ্করিণী খনন করিয়া লোকের জলকষ্ট দূর করেন। পথের দুই ধারে বৃক্ষ রোপণ করিয়া পথিকদের যাতায়াতের সুবিধা করিয়াছিলেন। মনুষ্য ও পশুদের চিকিৎসার জন্য অনেক দাতব্য চিকিৎসালয় ও হাঁসপাতাল স্থাপন করিয়াছিলেন। লোকেদের শিক্ষার জন্য অনেক স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রজাদের অবস্থাদি পরিদর্শন করিবার জন্য তিনি কর্ম্মচারী নিযুক্ত করেন। সর্ব্বসাধারণের ধর্ম্ম শিক্ষার্থ তিনি স্থানে স্থানে স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া তাহার গায়ে সুনীতিপূর্ণ ধর্ম্মের সারভাগ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি রাজ্যমধ্যে সময় সময় ধর্ম্মসভা আহবান করিয়া জটিল ধর্ম্মের মীমাংসা করিতেন।

অশোকের রাজ্য খুব বিস্তৃত ছিল। ধর্ম্ম প্রচার করিয়া তিনি সুদূর এশিয়া ইউরোপেও সুখ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। করি দ্বিজেন্দ্রলাল গাহিয়াছেন—

"অশোক যাহার কীর্ত্তি ছাইল গান্ধার হইতে জলধি শেষ।"

ইহা হইতেই অশোকের রাজত্ব কতদূর বিস্তৃত জানা যায়। খৃঃ পূঃ ২৩১ অব্দে অশোক প্রাণত্যাগ করেন। আজ এত বর্ষ অতিবাহিত হইল অশোক পরলোক গমন করিয়াছেন কিন্তু তাঁহার কীর্ত্তি আজিও তাঁহার নাম জগতে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে।

শ্রীনিবারণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

খোকন।

কোন্ স্বরগের বুক-খসা ধন
তুইরে খোকন সোনা,
নন্দনেরি মন্দার ফুল,
কিংবা চাঁদের কোণা?
এক অঞ্জলি পঙ্কজ রাগ?
ছুঁড়ে ফেলা এক মুঠি ফাগ?
কোন্ পাহাড়ের আপেল রে তুই
কোন্ বাগানের নোনা?
কোন্ জননীর বুকের হারা
রতনমণি সোনা?

ভালোবাসার মণির তারে
গড়া মায়ার ফাঁদ?
নিখিল ভুবন-উজল-করা
তুই কি রাকা চাঁদ?
একটা ফোটা বস্‌রা গোলাব্
সিঁদূর ভাঙা টুকটুকে আব্?
খোকন হারা কোন্ ভুবনের
পরম পরসাদ?
ভালোবাসার মণির তারে
গড়া মায়ার ফাঁদ!

নক্ত মালের রক্ত শোভা
তুই কিরে খোকন ?
কোন্ কাঙালের আঁধার মাণিক
বুক-জুড়ান ধন ?
তুই কি সুধা এক পিয়ালা ?
এক রাশি ফুল কোথাও ঢালা ?

চাঁদ চুয়ানো আলোক সরের
দীপ্তি বিমোহন ?
কোন্ যশোদার নীলমণি তুই
প্রাণের আকিঞ্চন ?

শ্রীগোপেন্দ্রনাথ সরকার।

দীর্ঘজীবন লাভ করিতে হইলেঃ—

১। বেশী আহার করিবে না। ২। পানীয় অতিরিক্ত মাত্রায় খাইবে না, মাদক দ্রব্য মিশ্রিত পানীয় ত নয়ই। ৩। অত্যধিক বা অত্যল্প পরিশ্রম করিও না। ৪। বরং পরের কাজেও সহায়তা করিবে, অলসভাবে বসিয়া থাকিবে না। ৫। সাধারণের উপকার হয় এমন কাজ করিবে, অন্য কোন কাজ, কাজই নয়। ৬। কম বেশী সময় ঘুমাইয়া দেখিয়া লইবে, কতটুকুতে শরীর বেশ সুস্থ থাকে, ততটুকুই ঘুমাইবে, তার বেশী নয়। ৭। আমোদ আহ্লাদ করিবে, নতুবা জীবন উৎসাহহীন হইয়া পড়িবে। ৮। সর্ব্বদাই তাড়াতাড়ি বা ছটফট করিবে না। ৯। পোষাক পরিচ্ছদ শরীরের স্বাচ্ছন্দ্য মত পরিবে, চাল বা ফ্যাসানের জন্য পোষাক নয়, স্মরণ রাখিও। ১০। দুঃখ কষ্টকে মনে বেশীক্ষণ স্থান দিবে না। এরা মন ভেঙ্গে দেয়। ১১। যারা তোমার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বেশী বক্তৃতা দেন, তাঁদের সঙ্গ ত্যাগ করাই শ্রেয়। ১২। এই গুলো মানিয়া চলিলে তোমার আয়ু বৃদ্ধি ও শরীর সুস্থ থাকিবে।

উতলা।

আজ্‌কে আমার মন যে উতল কেন
বুঝ্‌তে নারি কিছু,
অবশেষে মনে হল, মাস ত প্রায় শেষ
তবু নাহি আসে **আমার দেশ,**
তাইত আমার মনটি উদাস,
হয়েছে তার পিছু।
'আমার দেশের' লাগি সবাই পথটি চেয়ে থাকে,
এত দেরী কর্‌তে কি হয় পাঠিয়ে দিতে তাকে ?
আস্‌ছে মাসে না হয় দেরী এ প্রার্থনা করি,
আস্‌তে সাধের 'আমার দেশের,' সকল বিপদ তরি'।

কুমারী উর্ম্মিলা সেন।

সম্পাদকের কৈফিয়ৎ।

"আমার দেশে"র গ্রাহিকার' উতলা হইবার কারণ আছে বৈ-কি ! ছেলেদের কাগজ বাহির হইতে দেরি হইলে বিরক্ত হইবার কথাই। এক খানা অনুযোগ নয়, এ রকম অভিযোগ, অনুযোগ পূর্ণ কত চিঠি যে আমাদের হস্তগত হইয়া থাকে—তাহার ঠিক নাই। যে সব চিঠির কোন উত্তরই আমরা দিতে পারি না তবে মনে মনে লজ্জা পাই আর চুপ করিয়া দোষ মানিয়া লই।

"আমার দেশ" যাহাদের শিক্ষা ও আনন্দ দিবার জন্য তাহার প্রচারিত, তাহাদিগকে বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ করিয়া আমরা যে বিন্দুমাত্র শান্তি পাই না—এ

কথা তোমরা নিশ্চয়ই বুঝিতে পার। কবে ছাপাখানার গহ্বর হইতে, চিত্রকর ও প্রতিলিপি (Block) কারকের কল হইতে টানিয়া টুনিয়া "আমার দেশ" বাহির করিয়া তাহার প্রিয়জনদিগের নিকট পাঠাইয়া দিতে পারিব, দিনরাত আমাদের এই ভাবনাই জাগিয়া থাকে! কিন্তু ছবি আঁকাইতে, তাহার ব্লক করাইতে, আবার ছাপাখানার সঙ্গে লড়াই করিতে করিতে মনের সকল সঙ্কল্পই মিথ্যা হইয়া যায়। যাহা করিব ভাবিয়া মনে মনে মনে আকাশে হর্ম্ম্য গড়িতেছিলাম, হঠাৎ সব ফাঁকা হইয়া গেল। ব্লক-কারক হয়ত আসিয়া বলিলেন, আকাশে খুব রৌদ্র নাই নেগেটিভ হইতেছে না মহাশয়, দু'একদিন দেরী হইবে।—ব্যাস্! নয় ত বলিলেন, আমার যতগুলি কারিকর সব বিবাহ করিতে গিয়াছে। কখন বা সব জ্বরে পড়িয়াছে। তাঁর কৈফিয়ৎ যে কত দূর সত্য তা আমরা বুঝি, কিন্তু তাঁহাকে সত্য মিথ্যার উপদেশ দিতে গেলে, কাজ ত হইবেই না, এবং তিনিও না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী করিয়া প্রস্থান করিবেন। ছাপাখানার ম্যানেজার তাঁর চটিজুতার শব্দে আমাদের আফিস্-গৃহ কাঁপাইয়া আসিয়া কহিলেন, লোক সব দেশে চলিয়া গেছে মহাশয়, নয় ত, মেসিন দুদিন একেবারে বন্ধ! এই রকমে কত অজানা, অপ্রত্যাশিত উপদ্রব যে জুটিয়া যায়, তাহার ইয়ত্তা নাই। সম্পাদক এবং তাঁর কর্ম্মাধক্ষ্যগণ যখন প্রাণপণ চেষ্টায় কাগজখানিকে সুন্দর, সুশ্রী করিতে, নিয়মিত সময়ে বাহির করিতে তৎপর, ঠিক সেই সময়ে এই-সব নানান্-বিপৎপাত! কাজেই গ্রাহক-গ্রাহিকা, পাঠক-পাঠিকাদের অনুযোগ অভিযোগ ক্রোধ বিরক্তি-সব সহিয়া থাকিতে হয়। কিল খাইয়া কিল চুরী করা ছাড়া অন্য উপায় থাকে না।

এত দিন এইরকমই চলিতেছিল। এখন হইতে একটা উপায় করিয়া ফেলিয়াছি। একজন ব্লক কারকের উপর নির্ভর না করিয়া দুইজনের সঙ্গে

বন্দোবস্ত করা হইল, প্রেসেরও একটা সুব্যবস্থা হইয়াছে। এখন হইতে "আমার দেশের" গ্রাহক-গ্রাহিকাগণকে অকুতোভয়ে বলিতে পারি তাঁহারা মাসের প্রথমেই "আমার দেশ" পাইবেন। এখন হইতে আমাদের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য হইবে,—"আমার দেশ"কে ঠিক নিয়মিত সময়ে বাহির করা।

প্রবন্ধ সম্ভারে, গল্প ও ছবির সৌন্দর্য্যে "আমার দেশ" পূর্ব্বের অপেক্ষা হীন ত হইবেই না, বরং উত্তরোত্তর যাহাতে আরও উন্নত হয় তাহার চেষ্টাই আমরা করিতেছি এবং করিব।

এই সংখ্যা "আমার দেশের" দ্বিতীয় বর্ষ পূর্ণ হইয়া গেল। হয়ত অনেক ক্রটী, অনেক দোষ রহিয়া গিয়াছে, তা স্বত্বেও আমরা ভগবানকে এই বলিয়া ধন্যবাদ দিতেছি "আমার দেশের" শিশু-কালের আর একটি বর্ষ অতিবাহিত হইল। বাঙ্গালার শিশু মহলে "আমার দেশ" সুপ্রতিষ্ঠিত হইল।

মাঘ মাস হইতে তৃতীয় বর্ষ আরম্ভ। ২৫ শে পৌষ নাগাদ মাঘ ১৩২৯—তৃতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যা "আমার দেশ" প্রকাশিত হইবে। ২৬ শে, ২৮ শে তারিখে গ্রাহক-গ্রাহিকাগণের নিকট কাগজ ভিঃ পিতে প্রেরণ করিব, সম্ভবতঃ ৩০ শের মধ্যেই তাঁহারা তৃতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যা কাগজ পাইয়া যাইবেন। এই ভিঃ পি করা ছাড়া আর এক উপায় আছে। সেটি তোমাদের এবং আমাদের উভয়ের পক্ষেই সুবিধা জনক। তোমরা যদি ১৫ই পৌষের মধ্যে বার্ষিক মূল্যটি পাঠাইয়া দাও, তবে আর আমাদের ভিঃ পি করিতে হয় না, তোমাদের রেজিষ্ট্রেসন্ খরচ বাবদ ৵০ আনা বেশী খরচ হয় না। মনি-অর্ডার করিলে ৶৵০ খরচ আর ভিপিতে ৩৷০ কেন এই দু'আনা অতিরিক্ত খরচ হয়? এবং তাহার টাকা আসিয়া পৌঁছিতেও সময় সময় অনেক দেরী হয়; ভি-পি লইয়াছ কি না আমরা জানিতে না পারায় পরবর্ত্তী সংখ্যাও পাঠাইয়া উঠিতে

পারি না, ইহাতে তোমাদের বড়ই অসুবিধা হয়। কাজেই **তোমরা যদি ১-ই পৌষের মধ্যে ৩৲ টি টাকা মণি-অর্ডার কর, ত কোন হাঙ্গামা নাই—ঠিক ২৬ শে ৩০ শে তারিখ মধ্যে কাগজ টি পাইয়া গেলে।**

তোমাদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া, সর্ব্বনিয়ন্তা ভগবানের চরণ উদ্দেশে প্রণাম করিয়া পুরাতন বর্ষকে বিদায় দিয়া ও নববর্ষকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাইয়া অগ্রসর হইলাম।

খবরাখবর।

সম্প্রতি কাগজে একটি তালিকা বেরিয়েছে, কোন দেশে কত কৃষিজীবি আছে তারই হিসেবে আছে তা'তে। তাতেই দেখা যায় যে এই ভারতবর্ষেই কৃষিজীবির সংখ্যা সব চেয়ে বেশী। অন্য সব দেশেও কৃষক আছে বটে কিন্তু অন্যান্য কাজও সে-দেশের অধিবাসীদের এত রকমের আছে যে সবাইকে কৃষি কাজ করতে হয় না।

তোমরা ভেব না যে কৃষিকাজটা হীন কাজ বা অপমানের কাজ! দুর্ভাগ্য সে দেশের নয় যে দেশের অধিবাসীরা চাষ-বাস করে' শস্য উৎপন্ন করে—হতভাগ্য সেই দেশের অধিবাসী যারা অন্নের জন্য পর-দেশের মুখের দিকে হা-পিত্যেশ করে চেয়ে থাকে। ভারতবর্ষে সে দুর্দ্দিন কখনো আসেনি, আসবেও না। তবে এর মধ্যেও দুঃখের কথা আছে। আমাদের দেশের দিকে দিকে এত শস্য ক্ষেত্র, আর এত কৃষক, থাক্‌তেও এই দেশের অধিবাসীরা

যে পেটভরে খেতে পায় না, অর্থ সঞ্চয় দূরের কথা, নিজের নিজের অভাবই মেটাতে পারে না, তার যে কারণ, তোমরা ছেলে মানুষ, আজ তোমরা বুঝতে পারবে না। বড় হও, লেখাপড়া শেখো, আপনা থেকেই তখন সব তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট হ'য়ে যাবে।

* * *

তোমরা ফরাসী ঔপন্যাসিক-আচার্য্য ভিকটর হুগোর নাম নিশ্চয়ই শুনেছ। তাঁর লেখা বহি পড়বার বয়স বা জ্ঞান তোমাদের এখনো হয়নি, তবে অনেকে হয় ত সেই মহাকবির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ **লা মিজারেবল** বহিটির আলোক চিত্র (বায়াস্কোপ) দেখেছ, অনেকে হয়ত ঐ বহিটির বাঙ্গালা অনুবাদ ও পড়ে থাক্‌বে। তাই সেই কবির ও তাঁর প্রকাশকের সম্বন্ধে একটি গল্প তোমাদের বল্‌ছি শোন। ভিক্টর হুগো তখন নবীন লেখক। দিব্যি একখানি খাতায় রুল টেনে বর্ডার দিয়ে একখানি বহি লিখে, বগলদাবায় পুরে—এক প্রকাশকের দোকানে এসে হাজির হ'লেন। দোকানের যিনি কর্ত্তা তাঁর কাছে উপস্থিত হ'য়ে খাতাখানা দিলেন। কর্ত্তা মশাই খাতা খুলেই দেখেন, কবিতা! আর বেশ লাইন কেটে ধরে ধরে লিখে আনা! মুখটা কাঁচু মাচু করে বল্লেন—বড়ই দুঃখিত, মহাশয়, কবিতার বহি আমরা ছাপিনে। —বলে কর্ত্তা-মশাই খাতাটি আগন্তুকের সামনে বাড়িয়ে দিলেন!

হুগো খাতাখানি আবার বগলে পুরে, বল্লেন, দেখুন, আমার ইচ্ছে ছিল, আমার এই বহিটির যিনিই প্রকাশক হ'বেন, আমারি ভবিষ্যতের যত বহি সবের প্রকাশক তাঁকেই করব। তা আপনাকে অনর্থক কষ্ট দিলাম, মাপ করবেন।—ব'লে নবীন কবি বেরিয়ে গেলেন।

এখন, কর্ত্তামশাই ভাবতে লাগলেন যে লোকটি কে! এত বড় আত্ম-

নির্ভর লোক কে হতে পারে যে একখানি কবিতার বহি এনে ভবিষ্যতের লোভ দেখাতে পারে। ভাবটা যেন ভবিষ্যতের তাঁর বহি ছেপে আমি আকাশের চাঁদ পাব! হয় পাগল, নয়...কি যে তা কর্ত্তা মশাই তখন ভেবেও পান্ নি।

অবশ্য পরে পেয়েছিলেন! নইলে তাঁরই উত্তরাধিকারীগণ এখনো হুগোর বহির প্রকাশক থাক্‌তে পারতেন না।

*   *   *

তোমরা নোবেল প্রাইজের নামটা শুনেছ! সেই যে গো আমাদের রবি বাবু পেয়েছিলেন—এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা পুরস্কার! পৃথিবীর মধ্যে যে ব্যক্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যাবত্তার পরিচয় দিতে পারবেন, তিনিই পাবেন। রবি ঠাকুর সে-বছর সাহিত্যের জন্য পেয়েছিলেন। এ বছর পদার্থ বিদ্যায় পারদর্শিতা দেখিয়ে নিক্‌লবের সাহেব—নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন। এর আগের বছর ফরাসী ঔপন্যাসিক আনাতোল ফ্রাঁস এই পুরস্কার পেয়েছিলেন, রাসিয়ায় তখন ভীষণ দূর্ভিক্ষ, মহামতি ফ্রাঁস রুষ অধিবাসীদের জন্য সব টাকা দান করেছিলেন। এ বছর রসায়ণ বিদ্যায়—ডঃ এ্যাস্‌টন আর সাহিত্যের জন্য জ্যাসিণ্টো বেনভিণ্টি নেবেল পুরস্কার পেয়েছেন।

*   *   *

সংসারে থেকে সন্ন্যাসী, মানুষের দেহে দেবতা—এমন একজন বাঙ্গালীর নাম করতে হ'লে আচার্য্যদেব প্রধুল্লচন্দ্রের নাম করতে হয়। প্রফুল্লচন্দ্র আজীবন রসায়ণ শাস্ত্রচর্চ্চা করিয়া অদ্বিতীয় রসায়ণ শাস্ত্রবিৎ বলিয়া ভূমণ্ডলে পুজিত ও আদৃত। আমাদের দেশের বেঙ্গল কেমিক্যাল আচার্য্যদেব প্রফুল্ল চন্দ্রের আর এক কীর্ত্তি।

তারপর, বঙ্গবাসী প্রতি মুহূর্ত্তেই তাঁর নূতন নূতন মহত্বের পরিচয়

পাইতেছে। আর সে কি যেমন তেমন পরিচয়! মনে করিতেও বুক ভরিয়া উঠে, হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হয়! আমরাও যে বাঙ্গালী আমরাও যে আচার্য্যদেবের জন্মভূমি বাঙ্গালাদেশে জন্মিয়াছি—এই ভাবিয়া গৌরব অনুভব করি। আচার্য্য তাঁর শত সহস্র কার্য্যের মধ্যেও সমস্ত বাঙ্গালা দেশটায় খদ্দর প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন। দেশবাসী যাহাতে লজ্জা নিবারণের জন্য পর দেশের মুখ চাহিয়া না থাকে তারই জন্য তিনি সকলকে দেশের তুলায়, দেশ বাসীর হাতে কাটা সূতার, হাতে বোনা খদ্দর পরিতে বলিতেছেন। তারপর উত্তর বঙ্গের বন্যার কথা! সে আর বলিবার নয়। আচার্য্যদেব না থাকিলে সেই অভাগাদের যে কি হইত বলা যায় না। আবার তাঁর এক নূতন পরিচয় পেয়েছি—বিশ্ববিদ্যালয়ের এখন টাকার বড়ই টানাটানি! তা দেখিয়া আচার্য্যদেব পাঁচ বৎসর তাঁর বড় সাধের বড় যত্নের বিজ্ঞান কলেজের অধ্যক্ষতা বিনা বেতনে করিবেন বলিয়াছেন। মাহিনা ছিল, মাসে ১৪০০৲ টাকা। তোমরা ভাব একবার, এ কতখানি ত্যাগ। আর যে করিতে পারে সে মানুষটাই বা কত বড়!

* * *

নির্ব্বুদ্ধিদের আশা। সার উলিয়াম ম্যাকইউয়েন বলেছেন মস্তিষ্কে অস্ত্র চালনা করে নির্ব্বুদ্ধি লোকদের বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন করা যেতে পারে। মস্তিষ্কে এমনি সূক্ষ্ম তন্ত্রসমূহ আছে যে ডাক্তারেরা খুবই ভরসা করেন যে অস্ত্র করে অদ্ভুত ও চমকপ্রদ কায দেখাতে পারবেন। কথা যদি সত্যি হয় তবে বোকা লোকদের আর ভাবনা নেই ; চিকিৎসা করিয়ে দিব্যি বুদ্ধিমান হ'য়ে যাবে।

* * * *

মার্কাস লরেনঝো ২০০ ফ্রাঙ্ক দিয়ে এক টুকরা মানুষের চামড়া কিনেছিলেন। চামড়াটা একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের, কোন ডাক্তার তার মৃতদেহ পরীক্ষা করবার

জন্যে কিনেছিলেন। চিত্রকর সেই চামড়াটার ওপর সাঁত মাস অক্লান্ত পরিশ্রম করে এমনি এক ছবি এঁকেছিলেন যে বহু বড় বড় প্রদর্শনীতে সেটি দেখান হয়েছিল এবং শেষে চিত্রকর ছবিখানির দাম পেয়েছিলেন ৮৪০০০ ফ্রাঙ্ক। দেখা যাচ্ছে যে মানুষের চামড়া খুব ভালো কাজে লাগে, তাতে ছবি খুব ভালো হয় এবং টাকাও আসে অনেক।

* * * *

তুর্কীর সুলতান এতদিন ছিলেন মুসলমান ধর্ম্মজগতের গুরু। তুর্কীর প্রধান সেনাপতি কামাল পাশার দল সুলতানকে সিংহাসনচ্যুত করেছেন। সুলতান ইংরেজের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। কামাল পাশারা নতুন একজনকে সুলতান পদে বরণ করিয়াছেন তবে নূতন সুলতান খালিফ বা ধর্ম্মগুরুর আসন পাবেন না, স্থির হয়েছে।

* * * *

গ্রীসেরা এসিয়া মাইনর অঞ্চলে যুদ্ধ করে দেশের ক্ষতি সাধন করেছে এবং যারা সেই যুদ্ধ করার মন্ত্রণা দিয়েছিল, বর্ত্তমান গ্রীক্‌-সরকার সেই সব মন্ত্রীদের প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন। পাঁচজনের প্রাণদণ্ড হ'য়ে গেছে, আর দু'জন যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে চলে গেছেন।

* * * *

১৯১৪ থেকে ১৯১৯ পর্য্যন্ত ইয়ুরোপব্যাপী যে মহাসমর চলেছিল, ইংলণ্ডের বহুলোক সেই যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলো। যুদ্ধ মিটে গেলে পর তারা ফিরে এসে পূর্ব্বের কাজ কর্ম্ম আর পেলে না তখন তা'দের অবস্থা ভীষণ হ'য়ে দাঁড়াল। তখনকার প্রধান মন্ত্রী লয়েড জর্জ্জ তাদের কিছু কিছু অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু সামান্য সাহায্যে তারা সন্তুষ্ট নয়। আর সত্যিই ত!

সাহায্যে আর ক'দিন চলে ! কাজ কর্ম্ম করলে, রোজগার করলে তবে না সংসার চলে ! তারা সব এখনকার প্রধান মন্ত্রী বোনার ল'র সঙ্গে এই সব কথার মীমাংসা করতে দেখা চেয়েছিলে, বোনার ল—দেখা করেন কি। বেকার লোকেরা সব ভীষণ ক্ষেপে আছে।

*　　*　　*　　*

দাঁতের উপর যে পালিস থাকে তার চেয়ে শক্ত তন্ত্র আর মানুষের দেহে নাই।

*　　*　　*　　*

ব্রিটেন অন্যান্য দেশ থেকে বৎসরে ৪৫৯০০০০০০৲ টাকার কাঠ আমদানী করে।

*　　*　　*　　*

খড়ের ছাওয়া ছাদ ত্রিশবছর বেশ থাকে।

*　　*　　*　　*

লণ্ডন হোয়াইটহলের এ্যাড্‌মিরালটি বিল্ডিংস—ঠিক দু'শ বছর আগেকার গড়া।

আমার দেশ সেবা-ভাণ্ডার।

উত্তর বঙ্গের বন্যা প্রপীড়িত দুঃস্থগণের সাহায্যার্থ "আমার দেশ সেবা ভাণ্ডারে" নিম্নলিখিত দান প্রাপ্ত হইয়াছি। ভবিষ্যতে আরও পাইব, আশা আছে।

পূর্ব্বের প্রাপ্ত :—

কুমারী সুষমা নাগ	২৲	শ্রীমান অর্ণবকুমার বসু	১৲
শ্রীমান বিজয়কুমার মিত্র	৫৲	কুমারী মীনা সেন	২৲

মোট ১০৲



১। কুমারী কল্যাণকলিকা দত্ত (বন্ধু) পাটনা — ১৲

২। কুমারী আশামুকুল দত্ত (গ্রাহিকা) পাটনা — ১৲

৩। কুমারী মুকুলরাণী দাস (গ্রাহিকা) মজঃফরপুর। — ১৲

৪। শ্রীমান বিভূতি ভূষণ মিত্র (গ্রাহক) বর্দ্ধমান — ২৲

৫। শ্রীমান সুকুমার মিত্র—যশোহর (গ্রাহক) — ১৲

৬। শ্রীমান জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মজুমদার (গ্রাহক) রাজনগর — ১৲

৭। কুমারি আভারাণী মজুমদার (গ্রাহিকা) — ১৲

৮। কুমারি বেলারাণী বসু (বন্ধু) — ১৲

৯। কামাখ্যাচরণ চট্টোপাধ্যায় — ॥০

১০। শ্রীমতী বিজলীপ্রভা দেবী (গ্রাহিকা) — ৫৲

১১। শ্রীমান সুকুমার মিত্র (গ্রাহক) (বেনারস সিটি) — ৪৲

মোট ২৮॥০

নূতন ধাঁধা।

নিম্ন লিখিত পত্রখানার "—" কোটেসানাবদ্ধ শব্দগুলির পরিবর্ত্তে একটী করিয়া স্বাভাবিক ও অর্থবোধক শব্দ বসাইয়া পত্রখানা পাঠ কর:—

"বীরের দেশ"

প্রিয় "বায়ু" চন্দ্র, ১ দেবসেনাপতি ১৩২৯

তোমার পত্র পাইয়াছি, "অযোধ্যার জনপ্রিয় যুবরাজ" বাবু "কৈকেয়ীর পুত্রের বাড়ী" গিয়াছেন, শুনিলাম বিদ্রোহিরা তাঁহাকে তথাকার দুর্গে "পাঞ্জাব প্রদেশের একটী নগর" করিয়া রাখিয়াছে। এই সংবাদে চিন্তিত আছি। তুমি "দীর্ঘদিনের" ছুটিতে বাড়ী আসিবে, তখন তোমাকে নিয়া আমি "শক্র ঘাতকের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা" বাবুকে দেখিতে যাইব। গত কল্য "পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ শিখর" বাবু আমাদের এখানে আসিয়াছেন; তিনি শীঘ্রই "সম্মানের দেশে" রওনা হইবেন—তথায় "মাটীর নীচে" তাহার একটী চাকুরী হইয়াছে। তোমার "সপ্তাহের সেই বার" লিখিবে, আমরা ভাল আছি। ইতি—

তোমার—
"ব্রহ্মদেশের উপসাগর"
—শ্রীনিবারণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

২। তিন অক্ষরে নাম মোর জানহ সকলে,
মনুষ্য অক্ষম হয় আমারে হারালে।
প্রথম অক্ষর ছাড় যদি হই তবে রণ,
শেষাক্ষর ছাড়লে করি সংবাদ বহন।

৩। আমি একটি স্থান। আমার নাম তিন অক্ষরে। প্রথম অক্ষর ছাড়লে হই রোগের আকর, দ্বিতীয় ছাড়লে পাথর, এবং তৃতীয় ছাড়লে হই একটি তরকারী। এইখানে বলে রাখি আমি শীত প্রধান দেশ। বলত আমি কোন জায়গা?

কুমারী মীনারাণী সেন।

৪।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২

কোন এক হোটেলে একবার এক সন্ধ্যাকালে তেরো জন পথিক এসে উপস্থিত হ'য়ে হোটেলের কর্ত্তা চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকে বল্লে যে আমাদের সকলকে এক-একটা ঘর দাও, আমরা রাত্রে থাক্‌ব। এখন হোটেলে বারটা বই ঘর ছিল না। চক্রবর্ত্তী তা স্বীকার না করে সবাইকে আলাদা ঘর দেব বলে রাজী হয়ে প্রথম দু'জনকে ১ নং ঘরে বসতে বলে, তৃতীয় পথিককে ২ নং ঘরে নিয়ে গেল; চতুর্থ পথিককে ৩ নং ঘরে এবং সেই রকম করে দ্বাদশ পথিককে ১১ নং ঘরে রেখে দিলে; তার পর ত্রয়োদশ পথিককে নিয়ে যেখানে দুজনকে রেখে এসেছিল, তাদের একজনকে এনে ১২ নং ঘরে শুতে দিলে। সবাই স্থান পেল— রহস্য কি, বল ত ভাই?

৫। ভূগোল যারা পড়নি, তারা এর উত্তর না দিলেও দোষ হবে না।

১। ইওরোপের একটি দেশ
২। ইংলণ্ডের একটি নদী
৩। এসিয়ার একটি দেশ
৪। স্কটলণ্ডের একটি নদী
৫। মধ্যসাগরের মধ্যস্থিত একটি দ্বীপ
৬। রাসিয়ার একটী নগর
৭। পর্ত্তুগ্যালের একটি নগর
৮। রাসিয়ার সীমায় পর্ব্বতশ্রেণী
৯। ইতালীর একটি নগর
১০। ইংলণ্ডের একটি নগর।

তোমরা নিশ্চয়ই একটু আধটু ভূগোল পড়ে থাক। উপরের নামগুলি ইংরেজীতে লিখে তার প্রথম অক্ষরগুলি নীচে নীচে যদি পড়ে যাও—তাহ'লে একটা ইংরেজ বন্দরের নাম হয়। অবশ্য উত্তর এর ইংরেজীতে দিতে হ'বে।

কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসের ধাঁধার উত্তর।

১। ২৮ দিন ; ২। আলোক ; ১। দশরথ, ২। "ব" ৩। নকুল।

নিম্নলিখিত গ্রাহক গ্রাহিকাগণ সব ক'টি ধাঁধারই উত্তর দিতে পারিয়াছেন :—

কুমারী মীনারাণী সেন, বিহার ; রাজপৎ সিং, জিয়াগঞ্জ ; রাজা জ্যোতির্ম্ময়ানন্দ বাহুবলীন্দ্র, ময়নাগড় ; শ্রীমতী অমিয়াবালা রায়, ভবানীপুর ; সুশীলচন্দ্র সান্যাল, ব্রাহ্মণগাটা ; কালীকুমার কুণ্ডু, কুমারখালি ; নৃপেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী, ওয়ারী ; প্রমোদকুমার দাশগুপ্ত ; মুকুলরাণী দাস, মজঃফরপুর , হিমাংশুভূষণ গাঙ্গুলী, মেদিনীপুর ; বিভূতিভূষণ মিত্র, বর্দ্ধমান ; শৈলেন্দ্রকুমার ঘোষ ; অনিলকুমার সেন, আগরতলা ; কুমারী আশামুকুল দত্ত পাটনা ; প্রমীলাবালা রায়, পুরী ; অজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বালিগঞ্জ ; সুধাংশুশেখর গুপ্ত, ঢাকা ; সিদ্ধেশ্বর সাহা, নেত্রকোণা ; সন্তোষকুমার রায়, সিদ্ধান্ত বাগমারা ; সুধীরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ব্রাহ্মণগাঁ ; রাজেন্দ্রনাথ কবিরাজ, রামপাল ; মনময় বন্দ্যোপাধ্যায়, টিটাগড় ; শরচ্চন্দ্র পাণ্ডা, কণ্টাই ; সরোজপ্রতিমা বসু, নীলাব্জ, মণিরামপুর ; সুধীন্দ্রনাথ রায়, বেহালা ; মঙ্গলচরণ গাঙ্গুলী গোরক্ষপুর ; সিদ্ধেশ্বর সাহা, নেত্রকণা ; শান্তিলতা হালদার, পাটনা ; উমাতারা সিংহ, ভালুকা ; গগনেন্দুবিকাশ ভট্টাচার্য্য কানপুর ; অসীতানন্দ রায়, খুলডাঙ্গা , বিনয়েন্দ্রনারায়ণ সিংহ, ঝাউকুটি ; গোষ্ঠবিহারী দত্ত, পটুয়াখালি ; এম্ নসের আলি সিকদার, ধাইধা ; কুমারী আভারাণী মজুমদার, কলিকাতা ; সলিলকুমার মিত্র, কলিকাতা ; বেলারাণী বসু, কলিকাতা ; কুমারী হাসিরাণী মিত্র, কলিকাতা ; সৌরীন্দ্রমোহন ঘোষ, সুব্রত সেন, রঘুনাথ গঞ্জ, রবীন্দ্রকুমার বসাক কলিকাতা ; মতিলাল পাল রেঙ্গুন।

যাঁহারা ৫ টির কম ধাঁধার উত্তর দিতে পারিয়াছেন :—

লীলাবতী দেবী, ডাউহিল্ ; কালিপদ দে, সিরাজগঞ্জ ; সুধীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, পাটনা ; বিনয়েন্দ্রকুমার লাহিড়ী, কলিকাতা ; বিকাশচন্দ্র মল্লিক, আর্য্যকুমার গুপ্ত, প্রভাতকুমার গুপ্ত, নিতীশচন্দ্র মল্লিক ও ক্ষিতীশচন্দ্র মল্লিক, কলিকাতা ; দীনেশচন্দ্র গুপ্ত, ওয়ারী ; মথুরাপ্রসাদ সাহা, সামসের নগর ; লজ্জাবতী সেনগুপ্ত, [illegible]থা ; অর্দ্ধেন্দু বসু, গোরক্ষপুর ; ঊষা মিত্র, মণীন্দ্রচন্দ্র নাগ, কুলউড়া ; শম্ভুচরণ সেনগুপ্ত, পাটনা ; জ্ঞানশরণ রায় পাবনা।

ছেলেমেয়েদের উপন্যাস—কোহিনুর রত্ন

শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী, বি, এ, প্রণীত

পঞ্চুলাল।

ছেলেমেয়েদের একখানি উপন্যাস।

যাহারা গ্রন্থকর্ত্রীর অন্যান্য গল্প পড়িয়াছেন

তাঁহারা

জানেন ছেলেমেয়েদের

গল্প লিখিতে লেখিকা কিরূপ সিদ্ধহস্ত।

"পঞ্চুলালের"

জন্য ছেলেমেয়েদের মধ্যে

রীতিমত কাড়াকাড়ি পড়িয়া যাইবে—

আমরা দিব্য চক্ষে দেখিতেছি।

অল্প সংখ্যাই আছে—

না ফুরা[redacted]

এক[redacted]

সংগ্রহ[redacted]

[redacted] ৷৹ বার আনা মাত্র।

"আমার দে[redacted]র্য্যালয়—

[redacted]শের পাবলিসিং হাউস, কলেজ [redacted]ট, কলিকাতায়—প্রাপ্তব্য।